বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য

Banglar Samajik Jiban O Natya Sahitya.

Social Life of Bengal & Bengali Drama

(1850—1905)

by

DR. PRADYOT SENGUPTA

Price : Rupees Thirty Only

বাংলার সামাজিক জীবন
ও
নাট্যসাহিত্য

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

আমার পিতামহ ৺সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পবিত্র ও স্নেহময় স্মৃতির উদ্দেশে—যাঁর প্রভাব এই গবেষণাগ্রন্থের অঙ্কুরপর্বে আমাকে ভাবিত, উদ্দীপিত ও সদানিবিষ্ট করে রেখেছিল।

ভূমিকা

নাটক ও নাটকের অভিনয় কেবল আনন্দ বিতরণের সুলভতম পন্থা নয়, এর মধ্য দিয়ে একটা জাতির শিল্পচেতনা ও অধিমানসের স্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে। তাই নাট্যসাহিত্য ও তার অভিনয় গোটা জাতির চিত্তমুকুর বলে গ্রহণীয়। আমার ছাত্র শ্রীমান প্রদ্যোত সেনগুপ্ত আমার কাছে এ-বিষয়ে অনেকদিন ধ'রে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই মুদ্রিত সংস্করণ।

তিনি আমার ছাত্র, সুতরাং তাঁর রচনাকর্ম কেমন হয়েছে তা আমার পক্ষে ব্যাখ্যান করা বোধ হয় উচিত হবে না। বৃহত্তর পাঠকসমাজই তার যথার্থ বিচারক। অতএব গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ তাঁদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। এখানে এই গবেষণা ও অন্যান্য সমীক্ষা সম্বন্ধে দু' একটি কথা নিবেদন করতে চাই। এর কারণ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্. ডি. উপাধি-প্রাপ্ত বাংলা গবেষণা সম্পর্কে সাধারণ রসিক পাঠক কখনো অনীহা বোধ করে থাকেন, কখনো এই-সমস্ত নীরস ব্যাপার সম্বন্ধে বক্র মন্তব্য করেন। যাঁরা আমার কাছে গবেষণা করেন, তাঁদের মুখ চেয়ে এ-সম্পর্কে আমার কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প—যে-কোন বিষয়ের গবেষণা মূলতঃ মননশীল কর্ম। এর কতকগুলি চর্যা, শীল, অনুশাসন বা 'ডিসিপ্লিন' আছে। যাঁরা সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের কমলবনে কখনো মত্ত মধুকর, কখনও রাজহংস, তাঁরা স্বভাববৈগুণ্যে জ্ঞানের সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল ও অনাগ্রহী। কারণ তাঁরা মননকেন্দ্রিক রচনাকর্মের মূলে প্রবেশ করতে অপারগ, ফলে বাংলা সাহিত্যের গবেষণাগ্রন্থের সঙ্গে ভীতি ও চিত্তবিক্ষেপের সম্পর্ক তাঁরা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এক-আঙুল পরিমাণ রম্যরচনার তরল স্বাদ এবং দৈনিক রবিবাসরীয় সাহিত্য আলোচনা ও গ্রন্থ সমালোচনার গোষ্পদে বিহার করে যে-কোনো গভীর, পরিশ্রমসাধ্য 'সীরিয়স' ধরনের সাহিত্যকর্মের প্রতি তাঁদের একপ্রকার মানসিক জড়তা সৃষ্টি হয়। অলস ব্যক্তি যেমন যে-কোন পরিশ্রমসাধ্য কাজকর্মকে ডরায়, রসসাহিত্যের কমল--বনবিলাসীদেরও দশা প্রায় সেই রকম। মনে রাখতে হবে, গবেষণাকর্ম গল্প-

কবিতা-উপন্যাস-নাটক-রঙ্গকৌতুক নয়, এমন কি রম্যরচনাও নয়। তথ্যের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ ও সিদ্ধান্তে যাওয়া যে-কোনো গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও নিঃস্পৃহভাব না থাকলে গবেষণা অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যাঁরা গবেষণাগ্রন্থ পড়বেন, তাঁরা যেন সব সময়ে জ্ঞানের সাহিত্য ও রসের সাহিত্যের ফারাক সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। অবশ্য দু'একজন এমন লেখক-গবেষক আছেন, যাঁদের কলমে রসের ইঙ্গিতও যথেষ্ট থাকে, তবে তাঁরা আঙ্গুলে গণনীয়। পাঠক তাঁদের রচনা থেকে উপ্‌রি-পাওনা হিসেবে রসের আনন্দও পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেটা অধিকন্তু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত যে সমস্ত গবেষণার থীসিস মুদ্রিত হয়েছে সে সম্পর্কেও এখানে-সেখানে কিছু কিছু বক্রমন্তব্য শোনা যায়। বলা বাহুল্য সব জিনিসের তর-তম আছে, রন্ধন-ক্রিয়ায় সকলেই সমান দক্ষ নয়। সব মুদ্রিত গবেষণাগ্রন্থই কিছু গুণবান নয়, সুপাঠ্যও নয়। হয়তো গবেষক বহু পরিশ্রমে অসংখ্য অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ধার করেছেন, কিন্তু গৃহিণীপনার অভাবে ঠিক মতো সাজাতে পারেননি, প্রকাশভঙ্গিমাও হয়তো চারুত্ব লাভ করেনি। কাজেই কৌতূহলী ও আগ্রহী পাঠক যদি তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ না করেন, তবে সেই অপরাধে তাঁকে নিন্দা করা চলবে না। গবেষণাকর্ম হলেও সেগুলি তো সাহিত্যকর্ম, সুতরাং বক্তব্যের চারুত্ব থেকে বঞ্চিত হলে তা তো পাঠ-যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলবে। আমার মতে, এই সমস্ত প্রকাশিত গবেষণার অধিকাংশই অপাঠ্য নীরস ব্যাপারে বোঝাই নয়। সব বিষয়েই অধিকারীভেদ আছে, সাহিত্যের ব্যাপারেও তার অন্যথা হবার উপায় নেই। যিনি যে 'লাইনের' লোক নন, সে ধরনের রচনা তো তাঁর কাছে নীরস বলে মনে হবেই। বাংলা নাটক সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, তাঁর কাছে এই বিষয়ে-লেখা যে-কোনো গ্রন্থই আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবে না। আজ যে গল্প-উপন্যাস-কাব্যকবিতাদি নিয়েই শুধু বাংলা সাহিত্যের কারবার নয়, পরন্তু নানা ধরনের মননকর্ম এ ভাষা ও সাহিত্যের দারিদ্র্য ঘোচাতে বদ্ধপরিকর হয়েছে—এটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতির মানসিক বলাধানের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাঁরা শুধু রসসমুদ্রের ডুবুরী—তাঁরা একথাটা ভেবে দেখলে ভালো হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর—এঁরা চিন্তার কর্মে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অবতারণার জন্য অনেক কথাই বলে গেছেন। আজ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দুর্বলতা অনেকটা ঘুচেছে। সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা

নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, গবেষণাগ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হচ্ছে। বাংলা নিবন্ধসাহিত্যের একটা মানদণ্ড তৈরি হয়ে গেছে। এ-বিষয়ে বাংলা গবেষণাগ্রন্থগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই আলোচনার পটভূমিকায় আমি ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্তের 'বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য' (১৮৫০—১৯০৫) শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থটি উপস্থাপিত করতে চাই। অবশ্য ইতিপূর্বেই তাঁর দু-একখানি বই ছাপা হয়েছে এবং তাতে তিনি যে কুশলী রচনাকার, তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। পরিচ্ছন্ন, তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ভাষাভঙ্গী,—কিন্তু ভঙ্গীসর্বস্বতা বর্জিত—এই হচ্ছে তাঁর প্রকাশ-রীতি। তিনি যদি শুষ্ক কাষ্ঠ ভাষায় গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করতেন, তা হলে হয়তো সাধারণ পাঠক এ গ্রন্থকে দূর থেকে নমস্কার করেই পাশ কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু এই সুবৃহৎ গবেষণাগ্রন্থটি এমন স্বচ্ছ ভঙ্গিমায় রচিত, এমন প্রসন্ন-মানসিকতায় লালিত যে, এ-সব বিষয়ের প্রতি উদাসীন পাঠকও গ্রন্থটির দু-চার পৃষ্ঠা পড়লেই অভ্যন্তরে প্রবেশের মানসিক তাগিদ উপলব্ধি করবেন। এইখানে গবেষকের জিত; দুরূহ, নীরস, তথ্য সর্বস্ব, বিতর্কমূলক ব্যাপারকে তিনি শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন—এটি তাঁর অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। এই শ্রেণীর কিছু কিছু গ্রন্থ আমার হাতে এসেছে। তার পৃথুল কলেবর নানা তথ্যে বোঝাই এবং তার গবেষণাগত যোগ্যতা নিশ্চয় স্বীকার্য। কিন্তু তাতে যদি দেবী সরস্বতীর কৃপাকণিকা বর্ষিত না হয়, তাহলে সাধারণ পাঠক কিসের লোভে এ-সব ভীতি সঞ্চারী মহাগ্রন্থপাঠে প্রলুব্ধ হবেন? এইজন্য ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্তকে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দিত করি এবং স্নেহাশীর্বাদ জানাই। তিনি শুধু খনিত্র নিয়ে গবেষণার পাথুরে মাটি বিদীর্ণ করেননি, তার অন্তর দিয়ে যে রসের ঝরণা অলক্ষ্যে বয়ে চলেছে—তারও চলবার পথ করে দিয়েছেন।

গ্রন্থটি বিশাল-কলেবর এবং বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। অনেক সনতারিখ, মাপজোখ, তালিকা ইত্যাদি এর মধ্যে নিপুণভাবে সজ্জিত। সে-সব ব্যাপার পাঠককেই নিজে খুঁজে নিতে হবে। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' সাহিত্যে অচল। তবু এখানে বিষয় প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই। এ গবেষণা পাঁচটি পর্বে বিভক্ত—১৮৫০সাল থেকে বঙ্গভঙ্গের সূচনাকাল পর্যন্ত এ আলোচনা বিস্তৃত। লেখকের মূল উদ্দেশ্য—বিবিধ সামাজিক আন্দোলন (কোন কোন সামাজিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূচনা করেছিল) কীভাবে

বাংলা নাটককে প্রভাবিত, সংক্রামিত ও উদ্দীপ্ত করেছে, তারই পরিমাপ করা। এ গ্রন্থ নাট্যসাহিত্যের সাহিত্যগত আলোচনা নয়, পাঠক প্রথমে একথা মনে রাখলে এ আলোচনার যথার্থ বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবেন। কথা প্রসঙ্গে লেখক সবিস্তারে উনিশ শতকের বাঙালীর সমাজপ্রভাবগত বিবিধ চেতনাপ্রবাহের পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের নবজাগরণ অনেকটাই নাগরিক, যদিও তার উত্তাপ ও আলোক গ্রামীণ জনগণকেও কিঞ্চিৎ স্পর্শ করেছিল। আখ্যানে, কাব্যে ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে এ-সমস্ত আন্দোলনের প্রভাব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু নাটকে তার পরিচয় জীবন্ত আকারে ধরা পড়েছে। সমাজের সেই পরিবর্তন, ভাবের সঙ্গে ভাবের সংঘাত, নতুন পুরাতনের দ্বৈরথ—এ আলোচনায় ছবির মত স্পষ্ট হয়েছে। ছবির সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে এই যে, ছবি মূক,—এ আলোচনার পটভূমিকা তীব্র-তীক্ষ্ণ বাণীময়। বহু গ্রন্থ পাঠের নানা চিহ্ন এ রচনার অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। শুধু অধ্যয়ন নয়, তাকে স্বীকরণের দ্বারা একটি বিশেষ তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া অল্প প্রশংসার বিষয় নয়। বস্তুতঃ নাগরিক কলকাতার মানসিক মানচিত্র এ আলোচনায় অতিশয় স্পষ্ট হয়েছে। পুরাতন কলকাতার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি-বিস্মৃতি লেখকের কলমে আবার যেন পুনর্জীবন লাভ করেছে। তিনি বহু তথ্য-তত্ত্বের নির্যাস গ্রহণ করে নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন। বাঙালীর সমাজজীবন নিয়ে সেকালে কত নাটক-নাটিকা প্রহসন-কৌতুকনাট্য লেখা হয়েছিল, একালের পাঠক তার ধারণাও করতে পারবেন না। নাড়ী চঞ্চল হলে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুরাতন কলকাতার সেই চাঞ্চল্য এই সমস্ত নাটক-নাটিকায় পাওয়া যাবে—যার থেকে সামাজিক উত্তাপটাও ধারণা করা যাবে। সুতরাং আমার মতে এ গ্রন্থ শুধু একখানি সাহিত্যঘটিত গবেষণার বই নয়, এর সংগে দেশ কাল গভীরভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে—লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতার যথার্থ ইতিহাসের গোটা রূপ এখনও কোন সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও বিস্তর দলিল দস্তাবেজ জোগাড় হয়েছে, পুরাতন সাময়িকপত্রের সংগ্রহ বহুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে একাধিক গ্রন্থও ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রধান পার্থক্য, এটি প্রধানতঃ বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখকের ব্যক্তিগত বাঁধাধরা ছক এর গতি নিয়ন্ত্রিত করেনি। কোন কোন লেখক শুধু য়ুরোপের সমাজবিজ্ঞানঘটিত গ্রন্থের সূত্রানুসারে

বাঙালীর নাগরিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির কল্পিত সমাজতাত্ত্বিক রূপায়ণে উৎসাহিত হয়েছেন। এই ধরনের পূর্বসিদ্ধান্তের অকারণ অনুপ্রবেশ ডক্টর সেনগুপ্ত ঠেকিয়ে রেখেছেন এবং কেবলমাত্র বস্তু উপাদানের সাহায্যে সূক্ষ্মতর সমাজমানসের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নাটক প্রহসনের আলোচনা করেছেন। —আমার মনে হয়, এটিই আদর্শ গবেষণাকর্মের পদ্ধতি হওয়া উচিত। বলাই বাহুল্য জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনেক বিচার, বিতর্ক ও মতভেদের রসদ পাবেন এবং যে কোনো সতর্ক পাঠক ডক্টর সেনগুপ্তের এই গবেষণা গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। উনিশ শতকের নাটক-নাটিকা প্রহসনের জন্মলগ্নে যে কতকগুলি সামাজিক কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল, লেখক নানা তথ্য প্রমাণ সহযোগে সেই সমাজ-মানসিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। যেভাবে মানুষ শৈশব-বাল্য থেকে ক্রমিক বিবর্তনের পথ ধরে উত্তরোত্তর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, ঠিক সেইভাবে সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবেই তা লক্ষ্য করা যায়। লেখক পাঁচটি পর্বে সেই বিবর্তনের গতিপথ নির্দেশ করেছেন। বলাই বাহুল্য, এই বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিমার্গীয়। বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধে যে সুলভ ভাবালুতার অতিরেক লক্ষ্য করা যায়, তিনি সে সমস্ত মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত। বাংলা নাটক বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি তা স্বীকার করতে হবে। কেন পারেনি তার কারণ নানাবিধ। তবে লেখকের বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করলে মনে হবে, বিশেষ ধরনের সামাজিক-চেতনার প্রবল প্রেরণা না থাকলে বাংলা নাটকের যতটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, হয়তো ততটুকুও হতো না।

লেখকের আলোচনার কালসীমা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পরেও সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা বাংলা নাটককে উত্তাপে ও উত্তেজনায় ভরিয়ে দিয়েছিল। আবার অন্যদিকে স্বাদেশিক রক্তরাগের নাটকগুলি বাঙালীকে নতুনভাবে দীক্ষা দিয়েছিল। বাংলা নাটক বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সামাজিক প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে সমগ্র জাতির মানসিক বোধকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। লেখক যদি এই বিশাল অংশটি দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থে আলোচনা করেন তাহলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা বড়ো রকমের শূন্যতা দূর হবে। তিনি যে নাটকপ্রহসনের আখ্যান ভাগ বর্ণনা করেননি, বা চরিত্রগুলির সাধারণ বিশ্লেষণ করেই গবেষণা সমাধা করেননি

তার জন্ত তাঁকে সাধুবাদ দিই। আমাদের শিক্ষা থেকে যেমন নোট বইয়ের শাসন ঘুচল না, তেমনি গবেষণা থেকেও পল্লবগ্রাহিতা ও বিস্বাদ পুনরাবৃত্তির নীরস বাগবাহুল্যও সংকুচিত হল না। নতুন তথ্যের আবিষ্কার, সন্ধান ও পরিমাপ এবং তাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার—সাহিত্যের গবেষণার এইটাই আদর্শ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, কোন কোন বাংলা গবেষণা গ্রন্থে তার যথেষ্ট অভাব আছে। কিন্তু ডক্টর সেনগুপ্ত আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। বাংলা গবেষণার একটি মৌলিক দৃষ্টান্তরূপে তাঁর গ্রন্থটি প্রচার লাভ করুক, এই আমার একান্ত বাসনা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

প্রায় সাত বছর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান মদীয় শিক্ষাগুরু ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় 'উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য' (১৮৫০—১৯০৫) বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। তারই মুদ্রিত ফলশ্রুতি বক্ষ্যমাণ আলোচনা-গ্রন্থ। আলোচনার বিষয়বস্তু গ্রহণের উদ্দেশ্য বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদনের প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্য-ইতিহাসের যে কোন শাখাই জাতীয়জীবনের সমগ্রতার সংগে অন্বিত—নাট্যশাখাও এই অনিবার্গ সত্য তাৎপর্য থেকে কোন-ক্রমেই বিচ্ছিন্ন নয়। যুগ ও জাতির জীবনচিন্তায় ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে নাটক-নাটকাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দৃশ্যকাব্যরূপে মানুষের মনের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ ঘটিয়ে নাটক জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির দ্বারে যে আবেগাত্মক ও গঠনপন্থী আবেদন এনেছে—তা শুধুমাত্র ভাবসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়নি। বাঙালীর সমাজবোধ ও রাষ্ট্র-চেতনাকে তা শুভ ও সচেতন জীবন-সাধনার স্তরে উন্নীত করতে সহায়তা করেছে। বাংলা নাট্যসমীক্ষার ক্ষেত্রে এই গভীরতা ও ব্যাপকতার পরিস্ফুটনে আলোচ্য কালসীমার নানা সামাজিক অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি, সংরক্ষণ পন্থী ও প্রগতিশীল বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাত নিরন্তর ক্রিয়াশীল ছিল। আলোচ্য কালসীমার নাট্যসাহিত্যের পথরেখার ধারাবাহিকতার চিত্রাঙ্কনেও নাট্যকারেরা জাতির অধিমানসের বিচিত্র প্রকাশের রহস্যময় জীবন্ত বাক্‌প্রতিমার চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। বাঙালী জাতির জীবন ও সমাজচেতনের ধাতুপ্রকৃতির নেপথ্যে দৃষ্টি সঞ্চার করে তার তাৎপর্য নির্ধারণের অর্থ নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করা। কাজেই যুগধর্মের ও সমাজপ্রকৃতির অনিবার্য টানে নাট্যকারেরা কিভাবে প্রভাবিত হয়ে নাটক রচনা করেছিলেন—সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা প্রতিপাদনে সহায়তা করেছিলেন, নাট্যকারদের চিত্ত-সংকট ও নাটকের মধ্যে স্বাদেশিকতার চিন্তাস্রোত জাতীয়ভাব প্রচারে কতোখানি সক্রিয় ছিল—তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক নানা বৈপ্লবিক ভাবধারার বিস্তার সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচার ও গণচেতনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে নাট্য-মাধ্যমে সমাজাভিপ্রায়কে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা-ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা নাটকের এই সামাজিক পট-

ভূমিকা ধারাবাহিকতার পারম্পর্যে বিচার করতে গিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের বিস্তৃততর আলোচনা করেছি। নাটকে সমাজজীবন ও সমাজজীবনে নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অস্তিত্বে কতোখানি ক্রিয়াশীল ছিল—নানা তথ্যসমন্বিত অন্তর্গামী দৃষ্টিভংগীর বস্তুধর্মী বিশ্লেষণে তা বিধৃত হয়েছে। তাই আমার আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই আলোচ্য পর্বের বাংলা নাটকের রূপ-রীতির বিচার বা রসগ্রাহী আলোচনা স্থান পায়নি। বস্তুধর্মী দৃককোণে ও ইতিহাসের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশাখার স্বরূপ ও তার পথচলার বিবর্তনের তাৎপর্য নির্ণীত হয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিতে সাহিত্যের বিচারের কাম্য দিকটি আজও হয়তো বাংলাসাহিত্য সমালোচনায় কিছুটা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। সমষ্টিগত চেতনা নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে তৎক্ষণিক আবেদন আনে—তার মধ্য দিয়েই সমাজ ও নাটকের সমন্বিত প্রাণশক্তি কিভাবে অগ্রসরমান, বাংলা সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তিনধারার নাট্যবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেই সামাজিক গতিপ্রকৃতি ও দৃষ্টিকোণের পরিচয় বিধৃত করেছি। বাংলা নাটকের প্রাক্-রামনারায়ণ পর্বের আলোচনায় সেই সামগ্রিক আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্যষ্টিভাব 'জাগরণ পর্ব' সৃষ্টি করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের প্রাচীন যাত্রারীতির সঙ্গে নবযুগের চাহিদা ও ও চেতনা কিভাবে সংমিশ্রিত হযে ইংরেজী নাটক ও রঙ্গালয়ের প্রতি আনু-গত্যের ভাব সৃষ্টি করেছিল এবং পূর্ব-পটভূমি হিসেবে পরবর্তী নাট্যধারাকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার গুরুত্ব নির্ণীত হয়েছে। ১৮৫৪ সাল থেকেই নানাজাতীয় সামাজিক আন্দোলনের কোলাহল সামাজিক নকশা নাটকের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রচারিত হয়েছে—উক্ত কালসীমার সামাজিক-ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় তার কৌতূহলদ্দীপক পরিচয় দিয়ে যথাসাধ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

সামাজিক কলকোলাহলের সংগে সুনির্দিষ্ট গণচেতনা, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে মিলিত হযে 'নীলদর্পণ' নাটকে কিভাবে প্রকাশিত —সেই সামাজিক ইতিহাসও আমরা আলোচনা করেছি। বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় সামাজিক-চেতনা জাতীয়তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবার সংগে সংগে বাংলার সমাজজীবনে একটি বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র ধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা নীলবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। দেশ-

সত্তা বিষয়ে বাংলা নাটকে স্বাদেশিক ভাবধারা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে সংগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পর্বান্তরকে সূচিত করেছিল এবং বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছিল—সমাজ-চিত্রের সেই ব্যাপকতার পরিচয়ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। দেশাত্মবোধের বিকাশের সংগে সংগে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী সাবালকত্বের স্বাভাবিক প্রকাশের সংগে সংগেই জাতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল। বাংলা নাটকে এই যুগের প্রতিফলন বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি। বাংলা নাটকে জাতীয়তার এই ভাবযোগের পর্ব—পরবর্তী যুগে স্বদেশী আমলে কর্ম-যোগের পর্ব সৃষ্টি করেছিল। বাংলা নাটকের এখানেই আধুনিক যুগের সুরু। কর্মযোগের এই পর্বকে বিভিন্ন নাট্যকারেরা কিভাবে সৃষ্টি তাৎপর্যে মুখর করেছিলেন, উদ্দেশ্যমূলকতা সত্ত্বেও জীবন ও মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ভাস্বর করে তুলেছিলেন, জীবনসত্যের সুস্থির মূল্যবোধকে তদানীন্তন নাট্যশালাগুলি কিভাবে জনমনের অনুকূলে কর্মমুখর করে তুলেছিলেন—তারও পরিচয় বিবৃত করেছি। ভারতবর্ষে স্বাদেশিক সংগ্রামে যদিচ বাঙালীর নেতৃত্বের একক পরিচয় ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত—তথাপি কর্মযোগের আলোচ্য সময়সীমা পর্যন্তই জাতীয়তার বাণী প্রচারে বাঙালী নাট্যকারেরা সুনির্দিষ্ট নীতিনিয়ম ও নির্দেশনার বাণীকেই প্রচার করেছিলেন। এই সময় বাঙালী জনচিত্তে নাট্যমঞ্চের আবেদন সৃষ্টিতে যে স্বাদেশিকচেতনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল—পরবর্তীকালে তা-ই দিক্-নির্দেশনার কাজ করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে বহু দুষ্প্রাপ্য নাটকের নতুন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি কিংবা নাট্য-সমালোচকদের কাম্য সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—এমন কয়েকখানি নতুন নাটকের পরিচয় ও নাটকের বিস্তৃত আলোচনা আমি উপস্থিত করেছি। বিশেষ কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য 'টাইটেল পেজে'র আলোকচিত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অনেক পুরাতন গ্রন্থ, অতীত সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠা ও নানা নথীপত্র থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য যেমন মূল আলোচনায় গৃহীত হয়েছে—তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ 'পরিশিষ্ট' অংশও সংযোজিত হয়েছে। 'গ্রন্থপঞ্জী'তে এ গ্রন্থ প্রকাশকাল পর্যন্ত এর বিষয়-বস্তুর সংগে সংশ্লিষ্ট প্রায় সমুদয় আকর-গ্রন্থের একটি বাংলা ও ইংরেজী নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এটি পাঠক-পাঠিকাদের সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থগুলির সংগে পরিচায়নে সহায়তা করবে বলে মনে করি।

আমার পরম পূজনীয় শিক্ষাগুরু ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ ও নির্দেশেই এই আলোচনা সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর অতিশয় কর্ম-ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার প্রতি স্বতোচ্ছলিত স্নেহবশতঃ একটি মূল্যবান সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি এ গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার অপর দু'জন শিক্ষাগুরু ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ—এঁদের প্রতিও আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম নিবেদন করি। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থগুলি থেকে আমি প্রচুর তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর নিমাইসাধন বসু এ গবেষণাকর্মে আমাকে নিয়ত অনুপ্রাণিত করেছেন। এই গবেষণাকর্ম সমাপ্তির নেপথ্যে তাঁর স্নেহ-শাসন আগাগোড়া সক্রিয় ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের আর একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক অমলেন্দু দে—আমার এই গ্রন্থটি বিষয়ে নানা সময় জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের দু'জনকেই আমি প্রণাম জানাই। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলার রীডার আমার আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু আমার এই গবেষণাকর্মে তাঁর শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস জানিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম রইল। গ্রন্থ-খানির প্রকাশকালে নানাভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার রীডার ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তাঁকে আন্তরিক প্রীতি নিবেদন করছি। শ্রীমতী জলি সেনগুপ্ত নানাভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। শ্রীমান রাজর্ষি সেনগুপ্ত অফুরন্ত প্রেরণা যুগিয়েছে। আমার কয়েকজন ছাত্রী এই গ্রন্থের কিছু অংশের 'প্রেসকপি' তৈরী করে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন—শ্রীমতী অনুরাধা সোম, শ্রীমতী মিতা দাস, শ্রীমতী রেখা চৌধুরী, শ্রীমতী ঝর্ণা দত্ত ও শ্রীমতী ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁদের আমার স্নেহ জানাই। সহকর্মী বন্ধুবর অধ্যাপক প্রতাপরঞ্জন হাজরা 'নির্দেশিকা' প্রস্তুত করার কাজে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে সহায়তা করেছেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কোন্নগর শিবচন্দ্র দেব লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর

কর্তৃপক্ষ বিশেষ কয়েকখানি নাটকের 'টাইটেল পেজে'র আলোক-প্রতিলিপি তুলতে অনুমতি দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করেছেন।

প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে গ্রন্থখানির আঙ্গিক-সৌকর্য-সম্পাদন করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

পরিশেষে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষকে। এই দুর্মূল্যের দিনে এই জাতীয় বিপুলায়তন গ্রন্থের এরূপ উচ্চমানের প্রকাশন-প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অনুজকল্প শ্রীমান শ্যামল-ঘোষ প্রকাশনার নানাজাতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার শ্রম লাঘব করেছেন। গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠকের অনুমোদন লাভ করলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত—

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

সূচী পত্র

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

পঞ্চম পর্ব পৃ. ৩৭২

চিত্রসূচী

বাংলার সামাজিক জীবন
ও
নাট্যসাহিত্য

(১৮৫০—১৯০৫)

ভূমিকা ঃ পূর্বকথা

সমাজ-সামাজিকভাবোধ ও মানব-প্রত্যয়

প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশ দিয়ে রচিত সামাজিক রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক সামাজিক মানুষ ও জাতির এক একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনীত হয়ে থাকে। মানুষ একাধারে সমাজ-সচেতন ও নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতার জন্যেই সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় যেমন প্রয়াসী—আবার অপর মানুষের সংগে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য' যোগে যুক্ত হতেও সে চেয়েছে। অনিবার্য আন্তঃপ্রেরণায় মানুষ বহুর সংগে সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছে। এই সংযোগরক্ষার মধ্য দিয়েই তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের সমাজসচেতনতা সমাজের অপরাপর মানুষের সমানুভূতির অংশীদার হয়ে সহযোগিতা করতে চায়। সমাজসচেতন মানুষ হিসেবে এইভাবেই সে যুগপৎ মানসিক ভারসাম্য অর্জন ও রক্ষণের প্রয়াসী। শরীর, বুদ্ধি ও ভাবগত আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি-জীবনের প্রতিষ্ঠা—সমাজ-নিরপেক্ষ জীব হিসেবে মানুষকে কল্পনা করাই অসম্ভব। সামাজিক নির্ভরতা মানুষের ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য প্রাকৃতিক ঘটনা এবং এই সামাজিক জীবনধারাও বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল। স্মৃতিশক্তি, অভিযোজন ক্ষমতা এবং সবাক্ ভাষা এ তিনের সমন্বয়ে মানবজীবনের বিকাশ-ধারায় যে শক্তির প্রকাশ ঘটেছে—তা প্রয়োজনের মধ্যেঃ সীমিত থাকেনি। তা মানুষের সামগ্রিক ঐতিহ্যে, সামাজিক সংগঠনে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পনৈপুণ্যে ব্যাপ্ত ও বিকশিত হয়েছে। এরই সংশ্লিষ্ট ফল হল জৈবস্তর উত্তীর্ণ চেতনাশ্রয়ী জীবন বা চরিত্র যা মানুষের সামাজিক আচার-আচরণের পার্থক্য নির্ণয় করে। কাজেই এক থেকে বহুর মধ্যে সেতু রচনার প্রয়াসেই মানবিক অস্তিত্বের চিরকালীন পরিচয়টি নিহিত। পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পসাহিত্যের আন্তঃপ্রেরণাও এই 'সংযোগস্থাপন' বা 'কমিউনিকেশনের' স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই সংসক্ত।

এ-কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে—সাহিত্যেরও মূল সমস্যা 'সংযোগ সংস্থাপনের' প্রসংগ। আমাদের আলঙ্কারিক নির্দেশনায় সাহিত্য একক মানুষের সৃষ্টি হলেও তা আসলে সামাজিক কর্ম। কেননা সহৃদয় সামাজিকের মনে স্থিতি না পেলে তার রসতাৎপর্যের প্রকাশ নেই। সমাজের চিন্তা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালে তা লোকায়ত হয়ে ওঠে। আপন চেতনার মধ্য দিয়েই সাহিত্যিক তখন সার্বজনীনতাকে রূপ দিতে চান। সমাজের বিভিন্ন মানুষের জীবনচর্যা, সমাজের বস্তুধর্মী গঠন তাৎপর্যকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করে সাহিত্য-শিল্পী সর্বাঙ্গীন মানবসমাজকে অনুধাবন করতে চান। পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায় 'means-end-schema', i. e. a frame of reference involving values, means and conditions' (John Dewey) ; ঠিক অনুরূপ সুরেই অপর একজন সমালোচক বলেছেন,—'The Philosophy of social science aims at discovering the structure of the real, whole or complete man and society. This is facilitated by the conceptual frame work of a triangular interaction or transaction between Man, his behaviour and society or between persons, values and culture which encompasses the entire range of phenomena dealt with by various social sciences in their different dimensions.' (Sociology, Social Research and Social Problems : Saksena) সর্তাধীন সমাজোপকরণের মধ্য দিয়ে একটি মহার্ঘ মূল্যবোধের তাৎপর্য আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। সমাজ অন্তর্গত মানব সমষ্টির বাহিরচারী ক্রিয়াবিশেষ ও অন্তর্মুখী ইংগিতমুখর তাৎপর্যই ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই সামগ্রিক নির্দেশনার অভিনিবিষ্ট অবলম্বনটি হল ঐতিহ্যের যথার্থ বিচার বা পুনর্বিচার। আবার—"the study of traditions in the ultimate analysis involves that of symbols which under certain conditions and on particular levels are explosively creative and dynamic, and therefore, the values and norms retain and enrich their intellectual noetic connection with specific social structures and concrete historical situations." এ ক্ষেত্রেও শিল্পীর সামাজিক সত্তার পরিচয়ই

তাকে পরিচালিত করে। তাঁর ব্যক্তি মানসের সমস্ত প্রক্ষেপও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ সমাজ ব্যক্তি-জীবনেরই সমষ্টি। সমাজ-সচেতনতা শিল্পীর মুক্তি এনে দেয়, তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব পূর্ণতা পায় এবং শিল্পসৃষ্টি মানবিক দরদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।[১]

সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের বিস্তৃত বিচারের পূর্বে মানব-প্রকৃতির বিশ্লেষণের পটভূমিতে সমাজ ও সামাজিকতার বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধির জন্যে আমাদের অনিবার্যভাবেই মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিক পরিবেশের মানসিক ক্রিয়া ও চৈতন্যের বিকাশের ক্ষেত্রে জৈবশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের মনন বৈশিষ্ট্য, চৈতন্যের স্বরূপ ও আচরণের বিশ্লেষণে সামাজিক ও পরিবেশগত কতকগুলি বিশিষ্ট উদ্দীপক শক্তির লক্ষণীয় ভূমিকা আছে যা মানবমনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক শারীরবিদ্‌রাও স্বীকার করে নিয়েছেন। মন বস্তুটি যেহেতু মস্তিষ্কাশ্রিত সেই হেতু মানবমনের সামাজিক বিকাশের বিশ্লেষণের জন্যও মানবমস্তিষ্কের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের সম্যক ধারণা প্রয়োজন। শরীরবৃত্তের ক্রিয়াকলাপের পটভূমি থেকে বিচার করলে নিম্নপ্রাণী ও মানব মস্তিষ্কের মধ্যে সমধর্মিতার পরিচয় মেলে। নিম্নমস্তিষ্ক, মস্তিষ্ক বল্কলের অধস্তন কেন্দ্রসমূহ (sub-cortical centres) ও মস্তিষ্ক বল্কলের বিশিষ্ট অস্তিত্বের দিক দিয়ে মানবমস্তিষ্কের এ্যানাটমি স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে না। মস্তিষ্ক বল্কল (cerebral cortex) মানুষের ক্ষেত্রে বহুলাংশেই বর্ধিত, জটিল ও অনেকগুলি অংশ নবসংযোজিত। পাঠ্য-শ্রাব্য ও কথ্যভাষার মাধ্যমে সৃষ্ট মানুষের বাঙ্ময় জগৎ সাপেক্ষ পরিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex System)-র গুণময় বৈশিষ্ট্যে রচিত। মানুষের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষ পরিবর্ত ক্রিয়ার উদ্ভবের পেছনে আছে সমাজবদ্ধ যৌথ জীবনধারার সঙ্গে সক্রিয় মানুষের লক্ষ লক্ষ বছরেব অভিযোজন প্রয়াস। ভাষার উদ্ভব ও মানুষের অন্তর্জীবনের বিকাশের সঙ্গে

১ শিল্পকর্মের এজাতীয় লক্ষ্য প্রসংগে মার্কস বলেছিলেন : "Objectivisation of human existence both in a theoretical and practical way means making man's senses human as well as creating, human senses corresponding to the vast richness of human & natural life."

সঙ্গে মানুষের গুরুমস্তিষ্কে বিশিষ্ট কতকগুলি অনুষঙ্গের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। নতুন মানবীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনকে বাচনিক চিন্তায় ও মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ায় সামান্যীকরণ ও বিমূর্তকরণের উপায়রূপে গৃহীত হল। মানুষের সামাজিক ও পরিবেশগত কতকগুলি উদ্দীপক মানুষের গুরুমস্তিষ্ককে নিয়ত প্রভাবিত করছে এবং শারীর ক্রিয়াকেও পরিচালিত করছে। এ-ক্ষেত্রে "mind is the functioning of the highest parts of the brain in the life-long process of adaptation to the conditions of life"; পাভ্‌লভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন যে, মানুষের গুরুমস্তিষ্ক শুধুমাত্র বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থি বা অন্তর্যন্ত্রকেই পরিচালিত করে না—মানুষের সামগ্রিক আচরণ ও ব্যবহারেরও নিয়ামক এই গুরুমস্তিষ্ক। মানুষের বহির্বাস্তব মনে তার সামাজিক জীবনই সামগ্রিক চরিত্র গঠন করে। উচ্চমস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার সামাজিক পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল। মানুষের সক্রিয় সামাজিক অভিজ্ঞতাই তার মধ্যে চিন্তা, ভাব বা মননক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশিষ্ট দিক। মানুষের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি এ সমস্তই তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ফল। মনস্তত্ত্ব সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারাই নিরূপিত হয়। সমাজের, কোন দেশের বা জাতির আর্থনীতিক কাঠামো, তার আচার-ব্যবহাব, চিন্তাধারা নিয়ে ব্যাপক মানসিকতা গড়ে ওঠে। ইতিহাসেও এ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা শুধুমাত্র একটি সমসাময়িক ব্যাপার নয়—সে পরিবেশ যুগান্তর-ব্যাপী। সামাজিক মন ও জাতীয় মানসিকতাকে ইতিহাসই সুফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। সমাজের আচাব-ব্যবহার ও রীতিনীতির মধ্যেই সামাজিক মনের প্রকাশ। আবার জাতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে জাতীয় মানসিকতা প্রতিফলিত—তার সংরক্ষণেও ইতিহাসের দায়িত্ব আছে।[২] এ-ক্ষেত্রে "German Philosophical literature abounds

২ "...History is not a substantive, but an attribute of an evolving collectivity, it is not only a record of change but also an account of that which changes...the historicity of thing has even become subject of a special autology developed without regard to the social subjects of change."

—Karl Mannheim

in personification of history as a productive force and as an inexorable power. Here again we encounter the notion of a pre-ordained course of events of which society is the passive object rather than the author or the performer. This reluctance to face social reality as the matrix of change also explains the over-worked dichotomy of nature and history"—এবং সেই কারণেই 'History conceived without its social medium is like motion perceived without that which is moving", কাজেই প্রত্যক্ষ ও সমাজনির্ভর সাহিত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে দেখবার ক্ষমতা (encyclopaedic scope) চাই। ইতিহাসবোধ ও ব্যক্তি মানসের উপরে সমাজব্যবস্থার প্রভাব বিষয়ে অভিমত উপলব্ধির দিকটিও অনস্বীকার্য। সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজ-বিশ্লেষণের দিকটি শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নয়—ইতিহাস উপলব্ধি করারও একটি মৌলিক দিক।

২

ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার নিরন্তর টানাপোড়েনে মানবচিত্ত পীড়িত। কেননা—"The concept of social adaptation reveals an extension of the biological use. Social adaptation, however, always involve some standard of values—it is a conditional adaptation. Various sociologists speak of the process of adjustment or of accomodation, though the latter term has sometimes been used to stress the adaptation of the social being to the given conditions rather than the adaptation of the conditions to the social being". (Society : An introductory analysis—Maciver And Page) মানবচিত্তের বিকাশ বা তার ব্যক্তিত্বের জাগরণের পশ্চাতে একটি অনিবার্য সামাজিক প্রভাব সক্রিয়। শৈশবে যে সামাজিক প্রভাবের উপর তার ব্যক্তিত্ব নির্ভরশীল—তা হল পারিবারিক পরিবেশ। ক্রমশঃ পারিবারিক

পরিবেশকে উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জাগরণ ঘটে। চরিত্রগঠনে সমাজগঠন ও সমাজগঠনে চরিত্রগঠনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আছে। সুতরাং মানব চরিত্রকে অনুধাবন করতে গেলে ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস যেমন জানা প্রয়োজন—তেমনি সমাজের ইতিহাসও জানা প্রয়োজন।

ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপাদান মনোবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আবার ক্রমোন্মুখ ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপাদানের মধ্যে পারিবারিক উপাদানই একমাত্র উপাদান নয়। শিক্ষায়তন, কর্মক্ষেত্র ও অপরাপর সামাজিক প্রভাব দ্বারাও ব্যক্তিত্ব নির্ণীত হয়। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই অনিবার্য সম্পর্ক নিয়ে মতদ্বৈধতাও রয়েছে। কেউ ব্যক্তিসত্তার অন্তরায় রূপেই সামাজিক সত্তাকে চিহ্নিত করে থাকেন—আবার কেউ বা সামাজিক সত্তাবিবিক্ত ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়কে হাস্যকর বলে মনে করেন। মানুষের সামাজিক সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ব্যক্তি অস্তিত্বমাত্রের সমর্থনে ফ্রান্সে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এবং এই চিন্তাধারা পরে অন্যান্য দেশেও বিস্তারিত হয়েছিল। চিন্তাবিদ রুশো ছিলেন সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক অভিযোজনশীল মতের প্রবক্তা। আপন স্বার্থ চরিতার্থতা মানববৃত্তির একটি মৌলিক দিক এবং এই চরিতার্থতার ক্ষেত্রে নানারূপ বাধার সম্মুখীনও তাকে হতে হয়। আবার মানুষের অবচেতন মনের স্তরে স্তরে সামাজিক সমৃদ্ধির একটি গতিশীল বাসনাও সংযুক্ত থাকে। রুশো রচিত সমাজচেতনা বিষয়ে মানুষের এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব বা ইচ্ছার সংঘাত বিষয়টি অ্যাবসার্ড থিয়েটারের প্রবক্তা ইউনেস্কো বিপরীত চিন্তা-ক্রমের সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। জনৈক সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "মানুষের সচেতন অভিলাষ যখন ঐতিহাসিক পথ ধরে নিজেকে চরিতার্থ করতে চায়, তখনই তার মধ্যে একটি বিপরীত ইচ্ছা জাগে। সেটি সম্পর্কে সচেতন না হলেই বিপদ। তাঁর মতে আমাদের মধ্যে কিছু করার বাসনা যখন জাগে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেটি না করার বাসনাও দেখা দেয়। ইচ্ছা ও বিপরীত ইচ্ছা থাকে। এই বিরুদ্ধ ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। কারণ এটা থাকে গোপনে। কিন্তু ঘটনার অভিজ্ঞতায় এই দ্বিমুখী ইচ্ছার সংঘাত ধরা পড়ে।"[৩]

৩ শিল্পচিন্তায় বিরুদ্ধমত : যুগান্তর ৮ই জুলাই, ১৯৬৭।

একক ব্যক্তিসত্তার অভিলাষ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—কিন্তু ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সমাজক্ষেত্রে শুভবোধের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। ইউনেস্কোর মতে,—'Social man is hell and people are hell ; if only one could do without them,' কিন্তু শিল্পচিন্তায় ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধতার প্রসংগটি নিয়ে জার্মানীর কমিটেড নাট্যকার ব্রেখ্‌ট সামাজিকতা সম্পৃক্ত মানবপ্রত্যয়ের গুরুত্ব ও গভীরতাকে স্বীকার করেছেন। মানুষের যৌথজীবন ও সত্তায় তাঁর বিশ্বাস 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের' পথেই সমাজকল্যাণকে আনতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবীরা হলেন সমাজের বহিরঙ্গ সংস্কারক। সমাজের আভ্যন্তর চারিত্র্য বা মানসিকতাকে পরিবর্তিত করে নতুন রূপ দিতে পারেন একমাত্র সাহিত্যশিল্পী একাই। ব্যক্তিসত্তার সংগে সামাজিক সংযোগের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি একজন দরদী মাধ্যম এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের রূপায়ণে সে সমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

সামাজিক-আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সমাজে স্থিতিশীল ও প্রগতিবাদী দ্বন্দ্বের বিবর্তন, যুগভেদে সমাজচিত্রের পরিবর্তন এগুলি খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, তাদের সামাজিক বিকাশের পারম্পর্য ও মাত্রাগত বিভিন্নতা সমাজ সম্পর্কিত ধারণার পরিপূরক।

সাহিত্যিক-সৃষ্টি ও সামাজিক-জীবন

সাহিত্য ও সমাজ জীবনের পারস্পরিক যোগসূত্র নিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন,—"Society has been compared by Caudwell to the oyster and literature to the pearl within it. Society is the soil from which the flower of literature springs.[8] ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয়ে যেখানে ভারসাম্য বজায় থাকে - সেখানেই সামাজিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিমনের সর্বাঙ্গীন স্ফূরণে সহায়তা করে। রোজার ফ্রাই তাই মহৎ আর্টকে 'সামাজিক' অভিধায় চিহ্নিত করে বলেছিলেন: 'What the history of art definitely elucidates is that the greatest art has always been communal, the expression in

8 Studies in social History : O. P. Bhatnagar P. 311.

highly individual ways no doubt—of common aspiration and ideals.' লৌকিক ও সামাজিক জীবনকে পাশাপাশি নিয়েই সাহিত্যিক সৃষ্টিকলা চলে। কাজেই সজীব মন ও প্রত্যক্ষ জীবনের অনিবার্য ছায়াপাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক একটি উপাদান। পাঠক ও লেখক উভয়েই সামাজিক মানুষ। অতএব সামাজিক উপকরণগুলি যুগপৎ তাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক মনকে নাড়া দেয়। সাহিত্যিকের সামাজিক ও সাহিত্যিকসত্তা নিরন্তর অভিযোজনশীল। তথাপি সামাজিক মন ও জীবনের সংগে কখনও কখনও সাহিত্যিকের শিল্পীমনের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ বা অবিরোধের বিশ্লেষণও সাহিত্যিকের সামাজিক বোধচেতনারই পরিচায়ক। বাহ্যিক উপকরণকে যখন কোনক্রমেই কবি আত্মসাৎ করে নিতে পারেন না—তখন তাঁর রূপতন্ত্র নির্মাণে চারপার্শ্বিক সমাজ অনুপস্থিত থাকে। সামাজিক মন ও জীবন-বিবিক্ত সেই রূপতন্ত্র নির্মাণে কবি বা সাহিত্যিকের গজদন্তমিনারে স্বয়ংস্বতন্ত্র বাস। কিন্তু কবির সামাজিক বুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ বেশিদিন তাঁকে এই আত্মময় বৃত্তে থাকতে দেয় না। অবশ্য এই আত্মময় বৃত্ত সম্বন্ধেও পুনর্বিচারের অবকাশ রয়েছে। এ বিষয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন,—"প্রতিভার সৃষ্টি যা মানুষের সভ্যতাকে গড়ে তোলে, অনেক সময়েই তা নগদ বিদায় নয়। 'এস্কেপিজম্' যদি সাহিত্যিক দোষ হয় তবে তার কারণও সাহিত্যিক, সামাজিক নয়। লৌকিক মন ও জীবন থেকে যে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন, তার ধারা হয় ক্ষীণ। সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত ছাড়া বয় না। এই জন্যে পৃথিবীর যা বড় সাহিত্য, মানুষের লৌকিক মন ও জীবন তার উপকরণ।" [৫] যে কবির কাব্য 'এস্কেপিষ্ট'—তার মূলে হয়তো বিশাল ও জটিল উপকরণে সাহিত্যিকের প্রতিভার অক্ষমতা বা অনীহা কিংবা অন্যতর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতি তার মানসপ্রবণতাই দায়ী। আবার এমনও হয়—কবি মন বেশিদিন সামাজিকতা সম্পর্কহীন মানস-উজ্জয়িনীতে উজ্জীবিত হতে পারে না। কেননা—'Creative literature conveys many levels of meaning, some intended by the author, some quite unintentional. An artist sets out to invent a plot to describe action, to depict

---

৫ কাব্যজিজ্ঞাসা।

the inter-relationship of characters, to emphasise certain values, he stamps his work with uniqueness through an imaginative selection of problems and personages. By this very process of selection—an aspect of creativity—he presents an explicit or implicit picture of man's orientation to his society……the writer offers a picture of changing view about the comperative importance of Psychic and social forces."[৬] সৃষ্টি ও সমালোচনা উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক সূত্রের সঙ্গে শিল্প অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত থাকে। অনুভূতি, কল্পনাপ্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও এই সামাজিক সূত্রের সংগে জড়িত। তাই বলা হয়েছে,—"The method has had one steadfast purpose to convince people, often including the artist himself of the validity of certain social direction or redirection—political, religious, economic and the like. Hence all its creations must be called works of 'directive art.' "[৭]

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজবন্ধনের এই বিবর্তন ধারার তাই সমাজগত একটি প্রতিফলনও আছে। সাহিত্যের সংগে মানুষের চিত্তগত একটি সংযোগ আছে। সেই চিত্তসংযোগের প্রত্যক্ষ ভাবগত আদান-প্রদান এবং প্রত্যক্ষ রস উদ্দীপন সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধিরই নিয়ামক। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের দৃষ্টিভংগী জীবনযাত্রার সেই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে তাঁর শিল্পের বিষয় করে তোলে।

নাটক ও সমাজ

নাটক সাহিত্যেরই একটি অন্যতম শাখা। এর সৃষ্টি এবং পরিপুষ্টির মূলেও সমাজসত্য-ভিত্তিক মূল্যায়নই বড় কথা। ব্যক্তিমানসের সত্য সমাজ-মানসের পর্যায়ে উন্নীত না হলে তা সাহিত্যের সত্যরূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জনৈক সমালোচকের মতে,—"The relation of art to social life is a question that has always figured largely in all

৬ Literature and the the Image of Man : Lowenthal P. 3.

৭ Art and the social order : Gotshalk P. 213.

literature that has reached a definite stage of development …the function of art is to assist the development of man's consciousness to improve social system." বাহিরের সমাজ-জগৎ ও আন্তর-জগৎ এই দুই জগৎ নিয়েই সাহিত্যের জগৎ। এই দুই জগতের শিল্পগত অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চিত্তজগতের নানা উপাদানই আপন স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত-অবচেতন (personal unconscious), সমষ্টি-অবচেতন (collective unconscious) ও মনের শুদ্ধনীতিনির্ধারণ (principles)—বিজ্ঞান-গণিত ইত্যাদির অমূর্ত রূপ সব মিলিয়েই শিল্পবস্তু। সমাজ-সত্যভিত্তিক নাট্যসাহিত্য শিল্পগত সমস্ত উপায়ের মধ্যে সেরা। নাটক দেশের ও সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে এই সত্যকে আহরণ করে নিতে সমর্থ। প্রায় প্রত্যেক জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েই শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের ফলশ্রুতিই লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর দৃষ্টি বহুজনের মনের দর্পণরূপে কাজ করে। কাজেই শিল্পীর মধ্য দিয়ে তাঁর আপন অন্তর্দ্বন্দ্ব-নিরসনের ফলশ্রুতিই বহুমানুষের তথা সহৃদয় সামাজিকের অন্তর্বিরোধের নিরসন ঘটায়। আপন মর্মগত দ্বন্দ্বের নিরসন-কল্পেই নাট্যকার নাটক রচনা করেন—তার মধ্যে তাঁর চিত্তের নানা পক্ষীয় জটিল দ্বন্দ্ব একটা সাময়িক স্থিতির পর্যায়ে পৌঁছয়। অবশ্য এই স্থিতিস্থাপকতাও চলিষ্ণু। এরই মধ্য দিয়ে নাট্যকার আপন চরিত্রগত ও মর্মগত অন্তর্বিরোধের উপসম সন্ধান করে থাকেন। নাট্যকারের এই জাতীয় বিরোধের মর্মমূল অনুসন্ধান করে জনৈক সমালোচক বলেছেন, "এই বিরোধ তাঁব বাল্যকালের কোন অবদমিত আকাঙ্ক্ষার সংগে বাস্তব অবস্থার বিরোধ হতে পারে, এই বিরোধ তাঁর ব্যক্তিগত চেতন-মন (personal conscious) এর সংগে সার্বজনিক নির্জ্ঞানের (collective unconscious) হতে পারে আবার এই বিরোধ মানুষের Pure Mental drive-এর অন্তর্নিহিত dialectics হতে পাবে।"[৮] শিল্পীর চিত্তে সমাজ অর্থে বস্তুজগৎ ও কৃষ্টিজগৎ উভয়ের মিলিত একটা সামগ্রিক পরিবেশের সংগে শিল্পীর ব্যক্তিমনের সাজুয্য। নাট্যকারের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সচেতন সমাজসজ্ঞানতা অখণ্ডতার দিকে বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব বা conflict এর মাধ্যম

৮ বাংলা নাটকে বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গ—মানবমন : অক্টোবর ১৯৬৭।

রূপেই সমুপস্থিত। সমাজ মূলত বিবর্তনশীল। সমাজদেহে পরস্পর বিরোধী সংঘর্ষের অবস্থান। তার গতি কখনও শিথিল, কখনও বেগবান, কখনও চিরায়ত ঐতিহ্যের ফলশ্রুতিতে রূপময়, কখনও বা শিল্পচৈতন্য সমসাময়িক যুগের মূল্যবিচারের মুখাপেক্ষী—সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কাছে সাহিত্যের অভিপ্রায় একই সুরে সুর মিলিয়েছে। সমাজের পরিবর্তমান পটভূমিতে মনুষ্যভাবের এই মুহুর্মুহু মন্থন—সাহিত্য সেই সিদ্ধান্তসমূহের কাছেই দায়বদ্ধ। নাট্যকারের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও এই সমাজ-মানসিকতার মন্থনের দিকটাই বড় কথা। নাট্যকার তাঁর আন্তরলোকের স্বভাবের দ্বন্দ্বকেই নাট্যরূপের আশ্রয়ে বাহ্যরূপে প্রকট করেন। নাটক নাট্যকারের মনস্তত্ত্বগত আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশের এই বিশিষ্ট রূপকল্পের আশ্রয়েই নাট্যকার তাঁর চিত্তের দ্বিধা বা যন্ত্রণাকে প্রকারান্তরে আপন অজ্ঞাতসারেই উপসম করেন। সাময়িক দ্বিধার উপসমজাত এই যে, নাট্যকারের চিত্তের ভারসাম্য—এর মধ্য দিয়েই তো 'ক্যাথারসিস্' তত্ত্বের উৎপত্তি। নাট্যকার নাটকের আশ্রয়ে আপন অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন করে সমষ্টিমনেব ব্যাপক লোকে উত্তীর্ণ হন। ব্যক্তিকচেতনা থেকে এভাবেই নাট্যকার নৈব্যক্তিক মানসস্তরে উপনীত হন—এ হল বৃহত্তর সমাজমনের সামগ্রিক ও ব্যাপক লোকে নাট্যকারের উত্তরণ (self-transcedence)। এই উত্তরণের মধ্যে আছে একটা সুতীব্র প্রকাশ-কামনা, যার মধ্যে নিহিত আছে জগতের রূপ ও রস। বস্তুনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার তাই একটা সত্য প্রকাশের জন্যেই উন্মুখ। এই সত্যবোধ কখনও হৃদয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিজাত দ্বন্দ্বে মুখর, কখনও জীবনতত্ত্ব আবার কখনও বা বৃহত্তর সমাজসমস্যাও এই সত্যবোধ হতে পাবে। বস্তু আর বক্তব্য এইভাবেই নাট্যদেহে দু'টি বিশিষ্ট উপাদান হয়ে দেখা দেয়। এ বক্তব্য হল জীবন-অভিজ্ঞতার বক্তব্য। এই জীবন-অভিজ্ঞতার বক্তব্যের দিক দিয়ে নাট্যকারের শিল্পসজ্ঞানতায় সমষ্টিমনের সংগে সহৃদয় সরাসরি যোগাযোগের প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের সংগে নাট্যকারের সবব্যাপী সহানুভূতিও থাকা প্রয়োজন—যা সমাজমনের তাৎপর্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করবে। সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলই নাট্যকারের রচিত নাটককে সত্য করে তোলে এবং শিল্পজ্ঞানের বর্ণালিম্পন এই সত্য অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত রূপলাভে সহায়তা করে। অভিনয়ের

মাধ্যমে আবার এই সত্য অভিজ্ঞতার ভাবের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে মানুষের বিশেষ সামাজিক অভিজ্ঞতাই সব রকম ভাবের জনক। নাট্যকারের শিল্পীসত্তা ও সামাজিক সত্তাও এইভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করে। সামাজিক নাটকের সার্থকতা নাট্যকারের মনের বিশেষ প্রবণতায় সামাজিক সমস্যার যথার্থ বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। এ-ক্ষেত্রে নাট্যকারের বহির্বাস্তব মনের দ্বন্দ্বসংঘাতের সঠিক বিশ্লেষণ ছাড়া মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ বোধগম্য হতে পারে না। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নির্জ্ঞান মনের প্রেরণাই মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রক। তাঁর মতে মানুষের সামাজিক মত বা মানসিকতা সমস্তই অযৌক্তিক ও বাধ্যতামূলক। সমাজমানসিকতা সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় এই তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত নয়। সমাজে মানুষের ব্যবহারে ও মানসিকতায় যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে তা নির্জ্ঞান মনের প্রেরণাজাত নয়। সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সুস্থ মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব। ফ্রম্, হর্ণি, সুলিভ্যানের মতো অযৌক্তিক তত্ত্ব ও নির্জ্ঞানবাদী সমাজেও ওয়েলস্ ও হার্টের মতো প্রতিফলনতত্ত্বে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। নাট্যকার টেনেসি উইলিয়মস্ চিত্রিত চরিত্রগুলি তাদের যাবতীয় মনোবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাকে যন্ত্রসভ্যতার নিষ্ঠুর আঘাতসঞ্জাত বেদনার পটভূমিতে সমাজপরিপ্রেক্ষিতকেই চিত্রিত করেছে।

২

পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন সম্বন্ধে যেমন নাট্যকারের কুশাগ্রধী অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি নাট্যশিল্প ও মঞ্চশিল্প সম্বন্ধেও তাঁর সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। জাতি ও সংস্কৃতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে নাটকাভিনয় ও নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বৃহত্তর অর্থে সহৃদয় সামাজিকের পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে রচিত হয় বলেই নাটক যৌথশিল্প। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ব্যাপক ভূমিকাও তাই এই যৌথশিল্পের অন্তর্গত। বিশেষজ্ঞের মতে,—"Drama is conceivable as communal artistic desire for communication. But the desire on the otherhand, will only reveal itself through communal participation···The history of Drama shows that the theatre

has often been an important instrument in promoting communal feelings on a national scale···Romain Rolland, inspired by the theatre of such Revolution, wrote a number of plays on historical themes which were to display great political and social interests for which humanity has been fighting for the last century."[১] সমষ্টিগত যে চেতনা নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে আবেদন আনে—তার মধ্যে একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব আছে। সমসাময়িক সমাজের রুচি-প্রকৃতি বা প্রয়োজনকেই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার রূপ দেন। বাংলা সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তিনধারার নাটক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই, সমাজের গতিপ্রকৃতির মূলধারাই নাট্যরচনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। সামাজিক বাস্তব দিকটিই দর্শকদের সমষ্টিগত-চেতনাকে জাগ্রত করে।

৩

জন্মসূত্র থেকেই বাংলা নাটক সামাজিক সূত্রের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাও বাংলা নাট্য-সমীক্ষার একটি স্বতন্ত্র পাঠ। সমাজসম্পর্কের সঙ্গে অন্বিত নাট্য-ইতিহাসের কিছুটা প্রাক্-কথন এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করবো।

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটার বলতে আমরা সাধারণত: যে কোন প্রকার 'অভিনয়' বুঝে থাকি। আদিম মানুষ যখন যুদ্ধে বা শিকারে সাফল্য লাভ করে যুদ্ধ বা শিকারের অভিনয় করেছিল, তখনই থিয়েটার জন্মলাভ করেছিল। এই অভিনয় বা থিয়েটারের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন নেই—কেননা এ-জাতীয় অভিনয় যে কোন স্থানেই সম্ভব। এ অভিনয়—ব্যাপকার্থে অভিনয়। বাংলাদেশে আমরা বিশেষ ধরনের একজাতীয় অভিনয়কেই 'থিয়েটার' অভিধায় অভিহিত করে থাকি—বিশেষ ধরনে রচিত ও বিশেষ রীতিতে রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় হয়ে থাকে। যাত্রা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে এই রীতি ও অর্থের ব্যাপ্তি অনুপস্থিত। ভারতীয় এই বিশেষ রীতির থিয়েটারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করতে গেলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের

১ Drama and Education : Philip A. Coggin P. 275.

যুগরেখার পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের ইতিহাসকে আমরা কতকগুলি বিশেষ পর্বে ভাগ করে নিতে পারি :—

(১) হিন্দুযুগের থিয়েটার (২) মুসলমানযুগীয় থিয়েটার (৩) ইংরেজ-আমলের থিয়েটার (৪) স্বাধীনতা-উত্তর যুগের থিয়েটার।

হিন্দুযুগের থিয়েটারকে আমরা প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয় রূপেও ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হিন্দুযুগের শেষ পর্যন্ত এই সময় কালকে নির্ধারিত করা যেতে পারে। নাট্যের উৎপত্তি হয়েছিল গীতিকাব্য ও বর্ণনাধর্মী কাব্য রচনারও পরবর্তীকালে। অন্যদিকে মূকাভিনয় নাট্যাভিনয়ের চেয়েও প্রাচীন। আদিম সমাজের মানুষ তাদের সামাজিক-চেতনা নিয়ে বা প্রাক্‌নৈয়ায়িক মনের আদিম অধিকার নিয়ে সামাজিক উৎসবে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে অনুকরণাত্মক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করতেন—তার মধ্যে অভিনয়-অংশ একটি বিশেষীভূত দিক হলেও যথার্থ নাট্যধর্মের গুণবৈশিষ্ট্যে তা স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি। নাট্যাভিনয়ের মূল বস্তু নাটকের তখন সৃষ্টি হয়নি। নাটক বা নাট্যবেদ পরবর্তী উন্নত সমাজের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মতন্ত্রে সার্ববর্ণিক লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা বরং লোকশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হবার পরে দেখা গেল, বর্ণনিরপেক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে বৌদ্ধরা নীতিধর্ম প্রচার করতে গিয়ে লোকচিত্তহারী আখ্যানাদি রচনা সুরু করলেন। হিন্দুধর্মের প্রাবল্য বা হিন্দু রাজার আধিপত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল—তখন মূলত বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করবার জন্যেই বৌদ্ধ-পন্থানুসরণে হিন্দুধর্মানুগতরাও নানাপ্রকার জনমনোরঞ্জনকর লোকশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এই সময়েই বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান ও দেবদেবীর চরিত্র অবলম্বনে নাট্য প্রয়োগের সুরু হয়। কাজেই এর মর্মমূলেও একটা অনিবার্য সামাজিক কার্যকারণ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সার্ববর্ণিক লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই বৈদিক যুগের পরে ভারতবর্ষে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এর স্পষ্টরূপ বিবৃত হয়েছে। কোন সময়ে অনধ্যায়কালে আত্রেয় প্রমুখ দেবগণ নাট্য কোবিদ্ ভরতমুণিকে নাট্যবেদ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করায় তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, 'সত্যযুগ অতীত হলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড যখন গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্ত কামলোভের বশীভূত হবে, ত্রিলোক যখন ঈর্ষা-ক্রোধবিমূঢ় ও সুখেদুঃখে বিচলিত হল, দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষাদি দ্বারা যখন লোকপাল

প্রতিষ্ঠিত জম্বু দ্বীপ সমাক্রান্ত হল, তখন ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আমরা এরূপ ক্রীড়নীয়ক চাই যা যুগপৎ-দৃশ্য ও শ্রব্য হবে।' 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' কালিদাস গণদাসের মুখ দিয়ে এই প্রসংগটিই নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছিলেন :

"দেবের বাঞ্ছিত অতি নেত্র তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুণিগণ ;
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে হরগৌরী দুই ভাগে
করেন স্থাপন ;
ত্রৈগুণ্য সমুদ্ভব নানারস সমন্বিত
লোকের চরিত্র ই থে হয় প্রদর্শিত ;
নানাবিধ প্রকৃতির ভিন্ন রুচি লোক যত
—সবারি সমান প্রিয়, সর্ব আরাধিত ॥"

ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঋগ্বেদ থেকে 'কথা', যজুর্বেদ থেকে 'ক্রিয়া', সামবেদ থেকে 'গান', অথর্ববেদ থেকে 'রস' সংগ্রহ করে উপাদান-সংশ্লেষে পঞ্চমবেদ স্বরূপ নাট্যবেদ রচনা করেন। কথা-ক্রিয়া-গান-রসের যৌগিক সমবায়ে রচিত এই নাট্যরীতি। সার্বধর্মিক প্রেরণা এর মূলে নিহিত। আর্যদের দাবী—শূদ্রজাতিকে বেদমন্ত্র শ্রবণে অধিকার দেওয়া হবে না। কিন্তু তারাও বেদের অংশভাগী। সার্ববর্ণিক পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করে তারই মাধ্যমে শূদ্রদের সন্তুষ্ট রাখার এই চেষ্টা লক্ষিত হয়। বৌদ্ধদের প্রতিরোধ করবার জন্যেই ব্রাহ্মণেরা বর্ণনিরপেক্ষ লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ নাটক ও নাট্যপ্রয়োগের সৃষ্টি করলেন। নাট্যপ্রয়োগ লোকশিক্ষার কিরূপ উপযোগী সেই সামাজিক তাৎপর্যও নাট্যশাস্ত্রে নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে : "এর নাট্যে কোথাও দ্বন্দ্ব, কোথাও ক্রীড়া, কোথাও হাস্য, কোথাও বা যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে।···ধর্ম প্রবৃত্তের ধর্ম, কামীর কাম, দুর্বীনিতের নিগ্রহ, ধনাভিমানীর উৎসাহ, অবরোধের বিরোধ, রাজার বিলাস ও দুঃখার্তের ধৈর্য নানাবস্থার নানাভাব এই নাট্যে মথিত হয়েছে। ইহা লোক চরিত্রের অনুকরণ। উত্তম-মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধধর্মের লোকেরই কর্ম ইহাতে কীর্তিত হয়েছে। এই নাট্যে যাহা না দৃষ্ট হইবে এমন বিদ্যা নাই, এমন কলা নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম নাই।"[১০]

১০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : নাচঘর, ৮ই শ্রাবণ ১৩৩২।

ভারতীয় সমাজে আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্ব এক দীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক দ্বন্দ্ব। বেদে এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ভারতীয় প্রথম নাটকের প্রথম অভিনয়ের একটি ইতিহাস বিবৃত আছে—যার মধ্যে এই দীর্ঘকালাগত শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটি সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে। ভারতবর্ষ তখন জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত এবং ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থা তখন রাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্তরে পৌঁছেছে। নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সংগে সংগতি রক্ষা করে মনোজীবক প্রাণী মানুষকে কতকগুলি বিশেষ যুগের মধ্য দিয়ে অনিবার্য প্রেরণায় অগ্রসর হতে হয়। আহরণযুগ, শিকারযুগ, পশুপালনযুগ, কৃষিযুগ ও শিল্পযুগ প্রভৃতি স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হতে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের রহস্যকেও জেনেছে। আদিমযুগের অতিপ্রাকৃত শক্তিকেও এই রহস্যের মধ্যে আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল। সেই প্রাথমিক স্তরেব সমাজ-ধারণার মধ্যে জীবন ও জীবনের নানামুখী ধারণা এইভাবেই বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এই মানসিক বিকাশ যতই সম্মুখবর্তী হয়েছে—নৈয়ায়িক বুদ্ধির উন্মেষত পর্বে অতিপ্রাকৃতের চেতনা ক্রমশঃ দেবতামুখীন হয়েছে। এই দৈবশক্তির প্রতিভূ-রূপেই সমাজে পুরোহিতশ্রেণী ও ব্রাহ্মণশ্রেণী প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈদিক সমাজে যাগ-যজ্ঞাদিব মাধ্যমে প্রকৃতিকে বশীভূত করে বাস্তব-সমৃদ্ধি আনয়নের দিকেই একান্ত লক্ষ্য ছিল না। রাজতন্ত্র কিংবা লোকপাল প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীর অনুশাসনে সমাজমন বাঁধা ছিল। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের আর্য উপলব্ধি দ্বারা প্রকৃতিতে ও জীবজগতে পাশাপাশি দুই বিপরীত লীলার সহাবস্থান লক্ষ্য করেছেন—একটি হল প্রাণের পরিপোষক শক্তিপ্রদায়িনী শক্তি, অপরটি প্রাণপরিপোষক শক্তির বিপরীত অপশক্তি। প্রথমোক্ত শক্তিটি সমাজে 'দেবতা' শক্তিরূপে, দ্বিতীয়টি দৈত্যশক্তিরূপে আখ্যাত হল। এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব সেই আদিম সমাজমনকে অধিকাব করে বসল। সমাজের এই দ্বন্দ্বমূলক শক্তির মধ্য দিয়েই প্রথম নাট্যকাহিনী নির্বাচিত হয়েছিল। বৈদিক সমাজের এই নাট্য উৎসবটির নাম 'মহেন্দ্র বিজয়োৎসব'। ভবতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী ইন্দ্রোৎসবে এই প্রথম নাটকটি অভিনীত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্মা সদলবলে 'ত্রিপুরদহে' শিবকে নাটকাভিনয় দেখিয়ে এসেছিলেন। বৈদিক-সমাজের কৃষি-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র এবং সে কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় সমাজের

প্রাচীনতর সংস্কৃতির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্বমূলক নাট্যশক্তির বিশ্লেষণ করে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন : "নানাদেশের প্রাচীন সমাজে শস্যোৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখা দিয়েছিল, তাতে দেব-অসুরের দ্বন্দ্বের অভিনয় অন্যতম অঙ্গ ছিল। দেবের জয়ে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি, অসুরের পরাজয়ে সমস্ত বাধার অপসারণ, এই ধারণা প্রাচীনসমাজে বদ্ধমূল হয়েছিল। আমাদের দেবাসুরের যুদ্ধও মূলতঃ প্রকৃতির আচরকশক্তি ও মারণশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশক শক্তির, প্রজনন শক্তির ও বিবর্ধক শক্তির দ্বন্দ্বের রূপক এবং শিবের ও কৃষ্ণের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই সময়ের উদ্ভাবিত কাহিনী।"[১১] নাট্য-ইতিহাসের গোড়ার দিকে শিবোৎসব ও কৃষ্ণোৎসবের সামাজিক ইতিহাসের সংগে নাটকের যোগাযোগ অনেক সমালোচক আবিষ্কার করেছেন।

চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা এই নাটক। জনজীবনে এবং জনচিত্তে রেখাপাত করানোর ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষমতা অপ্রচুর মোটেই নয়। সমাজ-প্রশ্নের সংগে জড়িত ভারতবর্ষীয় নাট্যকলার ইতিবৃত্ত যেমন সুপ্রাচীন, তেমনি গৌরবময়। অনভিজাত সম্প্রদায়ে যদিও এর জন্ম—তথাপি নাট্যকলার প্রাচীনতা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ঋগ্বেদের যুগেই এই নাট্যকলার জন্ম। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আদিম নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বৈদিকযুগ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রাহ্মণযুগ সুরু হল এবং যজ্ঞ-সংস্কার এগুলির মধ্য দিয়ে অভিনয়-ক্ষম অনেক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল। অনভিজাত-অসংস্কৃত সম্প্রদায় থেকে ধর্মের আয়তনের মধ্যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থান পেলো নাটক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাণিনির 'নটসূত্রের' পরিচয় পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুর ত্রেতাযুগের সুরুতে দেখা যায় যে, মানুষ ধর্মবুদ্ধি হারিয়ে ক্রমশঃ লোভ ও কামের কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং গ্রাম্যধর্ম ক্রমশঃ অতিপ্রকট হচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশে বিপুল জনসাধারণ যখন ধর্মবিচ্যুত হয়ে অধর্মাচরণে লিপ্ত হয়—তখনই গ্রাম্যধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মাশ্রয়ী অবস্থার মধ্যে মানুষ যখন আত্মনির্ভরশীল—তখন নাট্যসৃষ্টির অবকাশ দেখা দেয়নি। কিন্তু মানুষের সমাজবদ্ধ যৌথ জীবনধারণার মহামুহূর্তেই নাটক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

---

১১ ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় : রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃ. ২২০।

এই নাট্যকলার ধারণা প্রসংগে কিছু মতান্তরের বক্তব্যের পরিচয়ও পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যেও সমাজ-উপাদানের প্রশ্নটি একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'নাচঘর' (১৩৩৬) পত্রিকায় 'রঙ্গালয়' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে :

"ওয়েবর প্রমুখ কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন—আমাদের নাট্যকলা দেশের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে কালসহকারে স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ধিত হয়নি, পরন্তু বিদেশীয় গ্রীসদের সংস্রব প্রভাবে হয়েছে। ওয়েবর এরূপ অনুমান করেন, যখন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের দরবারে গ্রীসীয় নাটকের অভিনয় হত, সেইসকল অভিনয় দেখে পাঞ্জাব ও গুজরাটের হিন্দুদের অনুকরণবৃত্তি উত্তেজিত হয় এবং এরূপে হিন্দুনাট্যের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু ওয়েবর সেই সংগে এই কথাও বলেছেন যে, গ্রীসীয় ও হিন্দু নাট্যসাহিত্যের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ যোগ দৃষ্ট হয় না। সাহিত্যকলা সম্বন্ধে গ্রীসই য়ুরোপের আদিম শিক্ষাগুরু।"

৪

ভারতীয় থিয়েটারের অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ধারার মধ্যেও সামাজিক ভাব-ধারণার একটি অন্যোন্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। আমরা পূর্বেই জেনেছি, ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা 'নাট্যগৃহ' নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে বিকৃষ্ট, চতুরস্র, ত্র্যস্র প্রভৃতি রঙ্গগৃহের বিস্তৃত পরিচয়, সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে নানারূপ দৃশ্যসজ্জার সন্নিবেশ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতে একদিকে ছিল প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত নাট্যপ্রয়াস এবং অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহান্তর্গত রমণীয় দৃশ্যসজ্জাসম্পন্ন থিয়েটারের রীতি। এই নেপথ্য দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে 'পুস্ত' রচনার রীতি প্রচলিত ছিল :

শৈলযান বিমানানি·চর্মবর্মধ্বজা নগাঃ।
যে ক্রিয়স্তোইনাট্যে তু স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এই জাতীয় পুস্ত নির্মাণ প্রণালীর মধ্য দিয়ে নাট্যপ্রযোজকেরা বাস্তবকল্প পটভূমি সৃষ্টির জন্যে যথোচিত চেষ্টা করতেন। তবে থিয়েটারে বাস্তবতার প্রশ্নটি আপেক্ষিক প্রশ্ন। সুতরাং এই বাস্তবতা সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষযুগের

বাস্তবচেতনা ও শিল্পধর্মের মধ্যে তার অভিযোজন প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতে প্রেক্ষাগৃহযুক্ত অভিনয়রীতির ধারার সংগে সংগে প্রেক্ষাগৃহ বিবর্জিত অভিনয়রীতিও নানা সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে সংস্কৃত নাটকে অবক্ষয়েব লক্ষণ দেখা গেল। মুরারি ও রাজশেখরের নাটকের মধ্যে সেই লক্ষণ অতিমাত্রায় প্রকট ছিল। সামাজিকসত্য ও গণসংযোগের স্বাভাবিকতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল ব'লে, এ নাটকগুলিতে বর্ণনাধর্মিতাই বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাট্যকারদের কবিত্বসর্বস্বতা শুধুমাত্র রাজসভার কিছু সংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রের উপভোগের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারতের মুসলমান আক্রমণ নাটকের ক্ষেত্রে এই জনসংযোগহীনতার জন্যে কিছুটা দায়ী। হিন্দু-সংস্কৃতি তখন ব্যাপক অবনতির পথে চলেছে—স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ততা তার মধ্যে নেই। অবশ্য এই মুসলমান আক্রমণের কারণটিই নাট্য অবনতির জন্যে শুধুমাত্র দায়ী নয়। প্রচলিত লোকভাষা ও নাট্যভাষার মধ্যে তখন যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষিত হয়—নাট্য অবনতির পশ্চাতে এই সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্কের প্রশ্নটিই সেদিন ছিল মূল প্রশ্ন। ভাস কিংবা কালিদাসের যুগে লোকনাটকের মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহার সাধারণ জনমানসেব আয়ত্তাধীন ছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এই নাট্য ভাষাবিষয়ক সমস্যা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অপভ্রংশ স্তর থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময় জন্মলাভ করছিল এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত লোকভাষা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগল। ইতিপূর্বে কালিদাসের নাটকে ব্রাহ্মণ পরিচালিত সমাজরূপের প্রসারিত দিকটিরই প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি। শাস্ত্রের শাসন ও সংস্কৃতবাণীকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণবর্ণ সমাজব্যবস্থায় সর্বনিয়ন্তার ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জনসংযোগ থেকেই দূবে সবে গিয়েছিল সংস্কৃত নাটক। আবার একাদশ শতাব্দীতেই দেখা গেল প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রায় হ্রাস পেতে চলেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে বা নাটমন্দিবে যাত্রাভিনয়ও এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান আধিপত্যেব সম্প্রসারণ যত হচ্ছিল—প্রেক্ষাগৃহান্তর্গত অভিনয়ের ধারা তত সংকুচিত হচ্ছিল। প্রেক্ষা-গৃহবিবর্জিত এই নাট্যপ্রয়োগ ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আশ্রয়ী হয়ে পড়েছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় বিকশিত হতে লাগল। দেবমাহাত্ম্য-

ব্যাপক এই যাত্রাগুলির মধ্যে জনসংযোগের পূর্বলুপ্ত ধারাটি পুনরুজ্জীবিত হতে লাগল। জনসাধারণের ভাষায় রচিত এই জাতীয় নাটকগুলির মধ্যে হনুমান রচিত মহানাটক, রামকৃষ্ণ রচিত 'গোপাল কেলিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি যাত্রাধর্মী নাটক স্মরণীয়। এর মধ্য দিয়েও সেদিন সমাজ-সংস্কৃতির নব্যধারার জীবনসত্যেরই ছায়াপাত ঘটেছিল। এই প্রসংগেই জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন : "জনগণের রুচির চাহিদা মেটানোর জন্যে এই যে প্রবণতা এসেছিল তা থেকেই ক্রমে ক্রমে ধর্মবিশ্বাসানুসারে স্পষ্টভাষায় রামলীলা কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি নাটক রচিত হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহবিবর্জিত রীতিতে অভিনয় হয়েছিল। বিদ্যাপতির সংস্কৃতে প্রাকৃতে কথোপকথন এবং মৈথিলী-ভাষায় সংগীত রচনার মধ্যে আমরা যেন সন্ধিকালের রূপটিকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি—নাটকের ভাষা সংস্কৃত প্রাকৃতেব কৃত্রিম স্তর পেরিয়ে ক্রমশঃ লোকভাষার স্তরে নেমে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সংলাপমিশ্র নাট্যলক্ষণের মধ্যে সমালোচক বর্ণিত এই প্রবণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যপ্রয়াসেব এই উপাদান প্রাধান্যের মধ্যে সমাজ চাহিদার দিকটি কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। বৃহত্তর অর্থে একে সমাজপ্রবৃত্তিরূপে চিহ্নিত করতে পারি। নাট্যশাস্ত্রী ভবত তাঁব নাট্য পরিকল্পনায় উপাদানগত ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণী বা বৃত্তিব পবিকল্পনা করেছিলেন। এই বৃত্তিগুলি হল : (১) সংলাপ প্রাধান্যময় ভারতীবৃত্তি (২) আবেগ ও উত্তেজনা প্রধান সাত্বতী বৃত্তি (৩) উত্তেজক ঘটনা ও বীভৎস বস প্রধান আবর্ভাবী (৪) নৃত্য ও সংগীতপ্রধান কৌশিকী। এইভাবেই মানুষের প্রবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে ভরত বৃত্তিভেদে মূলত নাট্যরস পার্থক্যকেই সমাজ মনস্তত্ত্ব অনুসরণে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। কুশাগ্রধী দৃষ্টির নিপুণতা ও পর্যালোচনার সামর্থ্যের পূর্ণ অধিকার নিয়েই ভারতবর্ষীয় জনপদগুলির মধ্যে সামাজিক ও মানসিক প্রবণতার সন্ধান তিনি নিয়েছিলেন। আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যায় কৌশিকীবৃত্তি, পূর্বভারতীয় লোকদের মধ্যে সংলাপপ্রিয়তা, পশ্চিম ভারতীয় লোকেরা ঘটনা ও যুদ্ধ প্রাধান্যকেই ভালোবাসে, উত্তর ভারতের লোকেরা সাত্বতীবৃত্তি-প্রিয়। সমাজান্তর্গত মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলি একটি বিশেষ জাতীয় মানসিকতার মানদণ্ড সৃষ্টির সহায়তা করে থাকে। পূর্বজন্মের সংস্কারের মতো এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষের সহজাত চেতন স্তরের মধ্যেই লালিত

হয়ে থাকে। তাই এর স্বরূপ অজরামরবৎ। তাই মুসলমান অধিকারের সংকট সময়ে আমাদের নাট্যাভিনয় যখন মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আত্মরক্ষা প্রয়াসে বাধ্য হয়েছিল—তখন এই প্রবৃত্তির দুর্দম শক্তিই কার্যকর হয়েছিল। উত্তর ভারতের রামযাত্রা এবং পূর্বভারতের কৃষ্ণযাত্রায় গীতিপ্রাধান্য প্রবণতার মূলেও ওড্রমাগধী প্রবৃত্তিকেই সক্রিয় দেখতে পাই। ভারতীয় জীবনে ও নাট্যাভিনয়ে ইংরেজজাতির আগমনের ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজজীবনের পরিবর্তন ও নাটকের উপর তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথম পব ঃ প্রথম অধ্যায়

সামাজিক পূর্বপটভূমি ঃ নাট্যপ্রস্তুতির পূর্বকাল

বাংলা নাটককে আত্মমুক্তির জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাহিত্যমাত্রেই সমাজজীবনকেন্দ্রিক ও পারিপার্শ্বিক মানসচেতনা সমুখ একটি বিশিষ্ট বস্তু। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ এই পরিপার্শ্বচেতনায় নানাদিক দিয়েই সমৃদ্ধ। এর সামগ্রিক রসরূপ কিংবা প্রাণবস্তুর মধ্য দিয়ে সমাজজীবন, ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা, আত্মশক্তি ও আত্মচেতনার সম্যক বিকাশ ঘটেছে। আর এই ক্রমোন্মুখ মানসবিকাশের ধারার মধ্য দিয়েই প্রাজ্ঞ, বিচারশীল, অভিযোজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাভিব্যক্তির সংগে সংগতি রক্ষা করে ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবন পূর্ণ পরিণতির পথগামী হতে পেরেছে। বাঙালী-মানসে নাট্যমুক্তির ইতিহাসের পশ্চাতেও এই জাতীয় সমাজনীতি, দেশ-কাল-সত্তার নানা ভাব পবিণতিব ইতিহাস জড়িত আছে। নাটক অন্যান্য সাহিত্যশাখার মতো যেহেতু একটি বিশিষ্ট শাখা এবং সর্বোপরি যেহেতু জনমত ও জনরুচি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণতম ক্ষমতা এই শাখাটির আছে—সেইহেতু এর পশ্চাৎভূমির সামাজিক ইতিহাসেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্য-সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে আমাদের দীর্ঘলালিত যে সংস্কারগুলি জাত য় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল—তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনার দায়িত্ব নিয়েছিল বাংলা নাটক। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও কাল সচেতনতার পটভূমিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা নাটকের আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিক মানদণ্ডের সংগতিরক্ষার কারণেই আমরা প্রাক্-উনিশ শতক ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করে নাট্য-প্রস্তুতির প্রাণসন্ধানকালের স্বরূপ নির্ণয় করবো :

প্রাক্-উনিশ শতকের ধর্ম-শিক্ষা-সাহিত্য-রাজনীতি ও সমাজের উপাদান-গুলির পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে ইতিহাসের আত্মা নিহিত আছে। প্রাক্-উনিশ শতকের এই ইতিহাসের মর্ম বিশ্লেষণের জন্যে যুগরেখাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি: (১) স্বদেশীয় ধর্মান্দোলনের ধারা (২) ইসলামী ধর্মান্দোলনের ধারা (৩) পলাশীর যুদ্ধশেষ ও খৃষ্টধর্মান্দোলন।

এই সমাজ-পার্থক্য ও যুগভেদের সংগে সংগে সাহিত্য ও সমাজের আত্মা ও দেহও পরিবর্তিত হয়েছে। আবেগতরল ও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশে নানাধরনের ভক্তিবাদ এই শতকের গৌড়বঙ্গের ঐতিহ্যজীবনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মসাধনা সে যুগের সাহিত্যেরও একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়ে পড়েছিল বলে সে সাধন-পন্থার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল না। গৌড়রাজমহল, জাহাঙ্গীরনগর-মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক কূট-ষড়যন্ত্রের অগ্নি ধূমায়িত হলেও—এ যুগের সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষাত্মক প্রতিফলন পড়েনি। তাতার-তুর্কী-হাবসী-পাঠান-মুঘল-ওলন্দাজ-দিনেমার ও পর্তুগীজের লণ্ডভণ্ডকাণ্ড সত্ত্বেও ঈশ্বর-ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ভাবের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়নি। প্রত্যক্ষের প্রতি বীতরাগ ঐশী সিদ্ধি ঋদ্ধির কামনায় রসসাধনা ও আত্মাশক্তির অনুশীলন করেছে। প্রাক্ উনিশ শতক থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত নানা খণ্ড বিদ্রোহ সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। তখন মধ্যযুগীয় তন্ত্রের সূক্ষ্ম ধারণা ভৌম দেহাবলম্বন করে দেহাতীত চৈতন্যে পূর্বের মতো আর উদ্বর্তিত হল না। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় বৃটিশ বিজয়ের শেষেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিস্তার ঘটল। বিভিন্ন অঞ্চলে চাষী-তাঁতী-লবণ শিল্পে মালঙ্গীদের বিদ্রোহ দেখা দিল। অবশ্য এই বিদ্রোহ-বিক্ষোভ কোন সুগঠিত সংগঠন কিংবা মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত নয়। ধীবে ধীবে এই বিদ্রোহগুলি মতাদর্শের সমন্বয়ে, সাংগঠনিক রূপলাভ কবেছিল। সামাজিক ও বাজনৈতিক কারণেই মধ্যযুগীয় দেবকৃপানির্ভর সমাজব্যবস্থায় মোহভঙ্গেব ভাঙন দেখা দিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলমগীর বাদশাহের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীব যুদ্ধশেষ এই কালসীমা মধ্যযুগীয় জীবনসাধনার মধ্যে নতুন বিপর্যয়েব সূচনা করল। গ্রামীণ জীবনের অতিনিরূপিত ভাবরূপের মধ্যে গ্রামীণ জীবনেব অতি স্থির আত্মকেন্দ্রিকতার মুক্তি ঘটল। পরিবর্তন-বিমুখী গ্রাম-কেন্দ্রিক স্বয়ং সংস্থিতির মধ্যে অর্থ নৈতিক কৃচ্ছ্রতা প্রবেশ করল। বৈশ্যতন্ত্রমূলক সামাজিক জীবনরূপ গড়ে উঠল। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যয় ধারণা আব প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল না—কাল ও যুগের প্রয়োজন রূপক বা প্রতীকের অন্তরাল থেকে মুক্তি প্রত্যাশী হল :

'দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নাহি ভাল ॥

বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজকষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ ॥'

দৃঢ়সংবদ্ধ কোন রাজনৈতিক শাসন তখনও গড়ে ওঠেনি। তুর্কী অভিযান-কালে গৌড় সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়েও সেনরাজারা মধ্য ও পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার রক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা নামেমাত্র এক শাসনকর্তার অধীন হলেও প্রান্তীয় শাসকেরা অধিকাংশ স্বাধীন ছিলেন। সমাজের স্তর বিন্যাসের মধ্যেও নানা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর্যাভিগমনের পূর্বে দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতি ও তাদের অনার্য ধর্মানুষ্ঠানের পরিচয় মেলে। সমাজদেহে স্তর বিন্যাসের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের পাঠান আমলেও সামন্ততান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রিক শাসনের মন্দীভূত প্রবাহ লক্ষ্য করা গেল। মুঘল সাম্রাজ্যবাদের মুসলমান সংস্কৃতি এ দেশের সমাজ ও জীবনকে প্রায় অধিকার করে বসল। মুঘল শাসনের ছত্রছায়াতলেই প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় জীবনের সংগে বাঙালীর যোগাযোগ ঘটল। কিন্তু শাসনকার্য প্রধানত অভিজাত সমাজের ব্যাপারেই কেন্দ্রিত ছিল। গ্রামীণ জীবন তার স্বয়ম্ভর সম্পূর্ণতার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে শান্তি বিঘ্নিত হলেও গ্রামীণ সমাজজীবনের বিকেন্দ্রিত স্বরূপের মধ্যে তা খুব একটা বিক্ষোভের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শাঠ্য ষড়যন্ত্র সমগ্র জাতীয় জীবনকে সামগ্রিক বিনষ্টির শেষ সীমায় এনে ফেলল। ইসলামী শাসনের নীতিভ্রষ্টতার মধ্যেও বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় শিক্ষা ঐতিহ্য, সাহিত্য ও ধর্মাদর্শের যে শুভাদর্শ বর্তমান ছিল—তার পালাশেষের মুহূর্ত ঘনায়মান হল। ইংরেজ বণিক-সভ্যতাগত শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্রদর্শনের নবপর্যায়ের সূত্রপাত হল। সমাজরূপের মধ্যে নতুন জীবন ও ঐতিহ্যের পদসঞ্চার ঘটল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে জাতির আত্মিক যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু এখনও সমাজই মর্মস্থান। রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্ববর্তী এই সামাজিক প্রস্তুতি পর্বটিও সর্বৈবরূপে সমাজতাত্ত্বিক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজ-আন্দোলনগুলির মধ্যে চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের যুক্তি ও বুদ্ধিজাগর পর্বটিই পরবর্তী রাষ্ট্রীয় চেতনার জন্যে দায়ী। এই প্রসংগে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্জীবনের স্বরূপের কিছুটা স্বল্প রেখায় পরিচয় নিলে প্রাক্-উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ জীবনের প্রাথমিক

স্তরের উপাদানগুলি বিশ্লেষিত হতে পারে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলীর অধিনায়কত্বে ত্রস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ-নীতির বিস্তার ঘটেছিল তার ফল শুভময় হয়নি। ১৮শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের মধ্যে সমাজরূপের মধ্যে বণিকের বৈশ্যবুদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেলেও তার সংগে সামাজিক অশুভ নীতিনিয়মের মিলন সংসাধিত হল। উনিশ শতকে তার ফলে সামন্তযুগের কৌলীন্য ও রক্ত সম্পর্কের মহার্ঘমূল্য মুদ্রাশক্তির কাছে পরাজিত হল। স্থিতিশীল গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতামুখী হয়ে পড়ল। ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ও নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার নবায়নে সমাজে শ্রেণীরূপের মধ্য দিয়ে নতুন ব্যক্তিসত্তার জাগরণ ঘটল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে জমিদারী-প্রথার উদ্ভব হল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে যেটুকু অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা সংরক্ষিত হত—জমিদারদের আরামপ্রিয় বাবু মনোবৃত্তির নিবৃত্তিতে সেই স্থিতিস্থাপকতাটুকুও প্রায় নিঃশেষিত। বৃটিশ-পুঁজির ভারত আবিষ্কারের মূল বৈশিষ্ট্য এই চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারকে বিলুপ্ত করে দিয়ে ১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের মাটিতে আধুনিক যন্ত্রচালিত বিভিন্ন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃটিশ পুঁজির প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভারতীয় জাতীয় জীবনের লক্ষণীয় প্রভাব প্রতিফলিত করে। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটায় ভারতে বৃটিশ পুঁজি যে কুশলী অধিকার আদায় করেছে—তার সংগে রাজনৈতিক প্রশ্নও সংশ্লিষ্ট ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের আত্মস্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হল এবং তারা নিঃসঙ্কোচে বৃটিশ পদছায়াতলে নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করল। সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধি জমিদারতন্ত্রের মধ্যেও দুর্বলতা দেখা দিল এবং সেই সংগে সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির সামগ্রিক মানদণ্ডও বিচ্যুত হল। বিত্তলোভী এবং কৌলীন্য-বর্জিত যে ব্যক্তিগণ হঠাৎ কাঞ্চনকৌলীন্যের বিভ্রান্তিতে সমাজের উচ্চ চূড়ায় স্থান পেলো, এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "তাহারা জীবনাদর্শের এত নিম্নস্তরে অবস্থিত হল যে, পুরাতন ব্যবস্থার অনুকল্পস্বরূপ কোন শিক্ষা বা সংস্কৃতি নবতর পন্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। উপরন্তু সমাজের অনুজ্ঞা সত্ত্বেও বৎসর বৎসর এক লক্ষ টাকা কোম্পানীর রাজকোষে সঞ্চিত হইতে থাকে; কিন্তু

জনশিক্ষার কোন প্রয়াসই গড়িয়া উঠে নাই।"[১] আবার অপরদিকে ইংরেজের যন্ত্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের বুভুক্ষায় স্থানীয় ব্যবসায় বাণিজ্য রুদ্ধ হল।[২] ভারতবর্ষ বস্তুপিণ্ড উৎপাদনের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হলেও শুল্ক-নির্ধারণে তারতম্য ও য়ুরোপ থেকে নবাগত যন্ত্রশিল্পের সংরক্ষণে দেশীয় শ্রমজীবীগণ বৃত্তিচ্যুতির অভিশাপ পেলো। যন্ত্রবিজ্ঞানের অভিশাপ ও ব্যাপক প্রসারিত দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিপার্শ্ব বাঙালীর মানস-মুক্তির সূচক। বৈষয়িক জীবনের বন্ধ্যাত্ব এবং আধ্যাত্মিক জীবনের নব সমারোহের বিপরীত পরিণতির ভাব সংঘর্ষ দেখা দিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, ভূস্বামীদের অস্তিত্বরক্ষা ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে পড়েছে। জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিপত্তির সুযোগে হঠাৎ বিত্তবান সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এর মধ্য দিয়েই নতুন মধ্য বিত্তশ্রেণীর উদ্ভব সূচিত হল।

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে এই মধ্যবিত্তের ভূমিকা ও বিকাশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মেলে উনিশ শতকেব প্রথমার্ধে। ঐতিহাসিক পোলার্ড এই মধ্যবিত্তের ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে উল্লেখ কবেছেন: "Now, the industrial and commercial system of modern history requires two factors which feudalism did not provide, it requires a middle class and it requries an urban population", য়ুরোপে অষ্টাদশ শতকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অনাচারের বিকল্পরূপে এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মাধ্যমে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থাব সূত্রপাত ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা হয়েছিল। এঁদের শ্রেণীরূপের মধ্যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার নীতির পরিপোষণের সংগে জাতীয়তাবাদকে লালিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপের এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল শিল্পপতি এবং বণিকসম্প্রদায়। ইংরেজ শাসনসূত্রেই য়ুরোপীয় বণিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এ দেশে বৈশ্যনীতি সঞ্চারিত হয়েছিল এবং এই ভাবধারা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ শাসনপুষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই শ্রেণীরূপের সংগে অর্থ-নৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার কোন সম্পর্কসূত্র ছিল না। নতুন অর্থনৈতিক

---

১ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলাসাহিত্য—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১২৫।

২ বিলাতী যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' (১৮৪৩) ব্যঙ্গের সংগে উল্লেখ করেছেন: কোম্পানী বাহাদুর এক্ষণে কলে কৌশলে রাজ্য করিতে বড় নিপুণ হইয়াছেন।'

ভিত্তির উন্নয়নের কোন চেতনা তাঁদের ছিল না।[৩] প্রগতিশীল নেতৃত্ব দান করে কোন সামাজিক বিপ্লব সাধনের সামর্থ্যও যে তাঁদের ছিল না ওয়াহবি আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদির সংগে সম্পর্কিত তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকাটির যথার্থ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের স্বরূপ তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। তথাপি বাংলাদেশে নবযুগের ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ১৮৬৯ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লেখেন: 'মধ্যবিত্ত লোকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে ··সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিকতর উপকারীরূপে পরিগণিত হন।' (৯ই ডিসেম্বর) কলকাতা শহরের আর্থিক কর্ম-জীবনকে কেন্দ্র করে নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী বিকাশ লাভ করল। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে চাকুরীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্তের স্তরায়ণ ইংরেজি শিক্ষার দ্বিতীয় পর্বে (১৮১৭—৫৭) অর্থাৎ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত্ররূপের মধ্যে সরকারা চাকুরী প্রিয়তার আসক্তি লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে—'western education was to that extent reinforced by the new pressure of urbanism, whose primary function in society was to attract people to new professions and services.' গভীরতর অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত মধ্যবিত্ত বৃত্ত গঠনের যে সম্ভাবনা অষ্টাদশ শতকের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী ইত্যাদির মধ্যে ছিল—উনিশ শতকের প্রথম দিকে সে সম্ভাবনা কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: 'the essentially rural proclivities of the Bengali commercial class, furnished with a fresh impulse by the new land settlement, tended to

৩ "প্রাক্-বৃটিশ আমলের সামন্তশ্রেণীর স্বত্ব-স্বামিত্ব না থাকিলেও সম্রাটের প্রতি তাহাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল, কিন্তু উক্ত শ্রেণীর বৃটিশ সংস্করণে তাহাও রহিত হয়। বরং, যেন দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদই তাহাদের স্বত্ব-সামিত্ব স্বীকৃত হইতে থাকে; আর দেশজ ভৌমিক প্রথায় এই নবীনশ্রেণীর কোনরূপ স্বীকৃতি না থাকায় এবং বিদেশী স্বার্থানুকূল্যে সৃষ্ট বলিয়া এই শ্রেণীর অস্তিত্বও একান্ত কোম্পানীরাজ নির্ভর ছিল। ফলে এই শ্রেণীর সামাজিক আচরণ নানাভাবে বিকৃত, পঙ্গু।"—বঙ্কিম-মানস: অরবিন্দ পোদ্দার।

draw that class back into the past and into a social role that centred round the patronage of tradition.'[8] ইংরেজি শিক্ষা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকাকে প্রগতিশীল ভাবধারা বিস্তারে সহায়তা করেছে—সরকারী, বেসরকারী কিংবা মিশনারী যে জাতীয় উদ্যোগেই তা প্রচারিত হোক্ না কেন। ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে বিশ্বানুভূতির স্বাদ পেয়ে তাঁরা যথার্থই উপলব্ধি কবলেন,—যুরোপীয় শিক্ষা স্পর্শেই দেশের বন্ধনমুক্তি সম্ভব। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইংলণ্ডের বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসন্ন-প্রসারিত ঐতিহ্যের বিপুল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদা ও সামাজিক নিপীড়নের অবসান দেখে সেই ভূমিকাটি তাদের উদ্দীপিত করল। হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজে যাঁরা নতুন শিক্ষা পেয়েছিলেন—তখনও তাঁদের সংখ্যা এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডী এতো সীমাবদ্ধ ছিল যে, কোন সক্রিয় আন্দোলন সংসাধিত হয়নি। তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর উগ্রতা ও একদেশদর্শিতাও বৃহত্তর লোক-সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কহীন ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঐতিহাসিক ভূমিকাব তাৎপর্য নিহিত ছিল। 'বঙ্গদূত' পত্রিকা এই আশাবাদী ভূমিকার প্রতি আস্থা পোষণ করেছেন : "এই নতুন শ্রেণী হইতে অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে, কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূবে এই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।" সমাজরূপের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের শক্তিকেই এই বুদ্ধিজীবী-শক্তি সঞ্চারিত করছিলেন এবং সে-ক্ষেত্রে 'the renaissance or the awakening of the 19th century, moving on the axis of the upper stratum alone of the society, the 'Bhadralokas', সামন্ত সমাজের জড়তা ও বিদেশী ইংরেজি শাসনের বাধা ঠেলে পুনর্জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয় হলেও তাঁদের চিন্তায় প্রথমেই ইংবেজ শাসনের উচ্ছেদের প্রসঙ্গ আসেনি। তথাপি উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পবিবর্তে নতুনতর পাশ্চাত্য ভাব দীক্ষায় অগ্রণী উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়ী পত্তনকে চাইলেন। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায় (১৮২৯, ১৩ই জুন) এই নতুন সমাজশক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলা

8 Aspects of Social History—P. Sinha, P. 92.

হয়েছে: 'It is a dawn of a new era. Wherever such an order of men has been created freedom has followed their train' ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের রাজসিক রূপ দেখে ও তার অনুসরণে এদেশেও অর্থনৈতিক মনোন্নয়ন তথা ধনতন্ত্রের বিকাশ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনকে কাম্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়নের পশ্চাৎপটে য়ুরোপীয় 'এনসাইক্লোপিডিষ্ট'দের যুক্তিবিচার—মানবহিতসাধন ও বিজ্ঞান সাধনার ধারণা কার্যকর ছিল। এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে যে সকল সামাজিক কর্মে নিয়োজিত করেছিলেন, জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের রাজনৈতিক কর্মটিও তার অন্তর্নিহিত ছিল। ১৮৫৪ সালে উডসাহেবের বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রান্ত সনদ প্রচারিত হবার পরেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হল—সমাজের সর্বস্তরে ইংরেজি শিক্ষা সর্বাভিমুখী হয়ে উঠল। ১৮৫৬—৫৭ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ ১৮৪৩ সালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বর্ধিত হল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার অর্থাৎ চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের সংখ্যাধিক্য ঘটে। উনিশ শতকের প্রথম পাদের সামাজিক স্তরে কুলগত মানদণ্ডের পরিবর্তে বিত্তগত শ্রেণী বিন্যাসের মানদণ্ডই বড় হয়ে উঠল—স্থিতিশীলতার সঙ্গে গতিশীলতা অন্বিত হল।[৫] শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে দ্রুত প্রসারতা ঘটে—তাও বাংলার সামাজিক জীবনে সচলতা বৃদ্ধির সহায়তা নিঃসন্দেহে করেছিল। আর ইতিপূর্বেই সামাজিক কিংবা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মানদণ্ডে নতুন চেতনার সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কেননা—'The thirties and forties of the 19th century afford opportunity for a study of contradictory trends, social potentialities and frustrated possibilities. Though lacking in the firmness of the later era, it has greater breadth and wider, though uncertain vision. Economically Bengali society was still subject to the possibilities represented by

৫ "এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগী ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে।"—বঙ্গদূত: ১৮২৯।

commerce and capital. Socially and intellectually it had been abruptly opened to new forces."[৬]

২

নব্যশ্রেণীর প্রবর্তকদের ভাবাদর্শ ও সমাজমানস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্ব পর্যন্ত কলকাতা-কেন্দ্রিক নব্যজীবনধারণার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। কলকাতায় বৃটিশ ভারতের রাজধানীস্থাপন যুগান্তকারী রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করেছিল এবং এই আন্দোলন আমাদের চিত্তমুক্তির ক্ষেত্রেও সংলক্ষ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পূর্ববর্তী সমাজসংস্থায় ব্যক্তির গৌণস্থানটি 'বর্ণভেদে বৃত্তিভেদের' পরিমণ্ডলে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, বিধিবিধান, বর্ণ এবং গ্রাম্য গোষ্ঠীসমাজ বা পঞ্চায়েতের বিধানের সংগে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু এতে ব্যক্তিমানস আত্মচেতনা থেকে বঞ্চিত থাকতো। আবার অপরদিকে গোষ্ঠী সমাজমনের অর্থনৈতিক বিন্যাসের মূল পরিমাপক হবার ফলে অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যেও সৃষ্টিধর্মী গতিশীলতার অভাব ছিল। দেশীয় জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় চেতনা এবং বোধশক্তি সংকীর্ণতায় সীমায়িত হলেও প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তাঁরা নতুন ভূস্বামী ও বণিকশ্রেণীকে ইংরেজের কাছে টেনেছে—যুক্তি, বলিষ্ঠতা এবং সৃষ্টিধর্মী প্রেরণায় সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাচরণে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে—নতুন সংস্কৃতি ও সৃষ্টির আবর্তে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নেতিধর্মী জীবনাচরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত যে শিক্ষাব্যবস্থা পুরাতনী সর্ববিধ মূল্য ও ভাবাদর্শকে অস্বীকার করেছিল—নতুন বুদ্ধিজীবী চিন্তানায়করা সেই শক্তিরই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপকরণে পরিণত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক স্বীকৃতির অভাবে তাঁদের মধ্যে সামাজিক ফাঁকভরাট ও স্থিতিলাভের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক আচরণের এই অন্তর্বিরোধ তাঁদের রাজনৈতিক আচরণের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিল। বাস্তববুদ্ধি ও বস্তুনিষ্ঠার মানদণ্ডে চিন্তানায়কগণ সংরক্ষণপন্থীদের থেকে দূরবর্তী হয়ে যে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—সেই আকৃতি এক বিশিষ্ট সামাজিক ক্রিয়ারূপে কাজ করেছে। সেই প্রবণতার পরিণতিরূপে ইংরেজের অসংগত আচরণও সামাজিক ন্যায়বিচারের ছাড়পত্র পেয়েছে। বৃটিশ

৬ **History of Bengal: Ed. by N. K. sinha P. 397.**

বণিকতন্ত্রের ভাঙ্গাগড়ার নেপথ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণ ও পূর্বতন অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তি ঘটলেও সমাজজীবন কালের মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছে। ব্যক্তিমনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনিরপেক্ষ সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা এই সাংস্কৃতিক চিত্ত-আন্দোলনে যুগান্তর সমুপস্থিত করেছিল। যাহোক্ আমাদের উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনীব্যক্তিরা শহরবাসী হয়ে সমাজের নায়কত্ব করেছেন এবং জাতীয় চিন্তাধারার ও কর্মযোগের প্রধান কেন্দ্র কলকাতা থেকেই বিভিন্ন পল্লীসমাজও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মানবাত্মার যে নতুন মুক্তিবাণী ঘোষিত হল, তার মধ্যে সমষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তনে ও যন্ত্রযুগের অনুকূলতায় শহরকেন্দ্রিক সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। রামমোহন, হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি ব্যক্তি-শিক্ষাকেন্দ্র কিংবা পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে কলকাতার নাগরিক জীবনে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা ও বাস্তব পরিপার্শ্বে চেতনার আনুকূল্য শিক্ষিত বাঙালীর মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। রামমোহনপন্থী, ডিরোজিও শিষ্যানুশিষ্যদল ও রাধাকান্ত দেব-বাহাদুরের ধর্মসভার বাদ-বিবাদ বিচার করলে উনিশ শতকীয় নবজাগ্রত বাঙালীর আধিমানসিক যাথার্থ্যের স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

৩

মুক্তির পূজারী রামমোহন

মুঘলশাসনের অবক্ষয়ের যুগে বাঙালীর নৈয়ায়িক সংস্কার যেভাবে ব্যাহত হয়েছিল—তাতে ব্রাহ্ম-সমাজসংস্কৃতিমূলক বেদান্তসূত্রের শংকরভাষ্য, দ্বৈতবাদী ভাষ্যের সংগে স্মৃতিমীমাংসার আলোচনায় পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা সুরু হয়। রামমোহন নৈয়ায়িক কুশাগ্রবী চেতনাকে পুনরুদ্ধার করলেন। উনিশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহনের ভূমিকা প্রত্যয়নিষ্ঠ যুগ-লক্ষণেরই ধারক ও উদ্ভিন্ন ভাব প্রচারক। বিজ্ঞান-মনস্কতায় জাতীয় শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করে রামমোহন মানব-হিতবাদের প্রসারে স্বাধিকার বাসনার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন।[৭] সমাজবিষয়ক

৭ "স্পেনীয় ভাষায় লিখিত ম্যানিলা কোম্পানির এক পুস্তক—যাহাতে বিপ্লবের ফলে যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তিত হয়, সেই তন্ত্র আছে—যা রামমোহনকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।"—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া: প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জ্ঞানকর্মবাদী ও আধ্যাত্মিক স্বসম্পূর্ণতা তাঁর প্রতিভায় যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার সংগে তাঁর পরিচয় ছিল—সেই পরিচয় তাঁর মনোলোকে গণতান্ত্রিক মুক্তিচেতনার ব্যাপক অনুভূতি জাগিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফ্রান্স-ইতালী-গ্রীস ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের প্রতিও তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

রামমোহনের প্রচারিত বেদান্ততত্ত্বে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ একেশ্বরবাদে গৃহীদের অধিকার সীমাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ব্যবহারিক সমাজ চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বেদান্ততত্ত্বকে তিনি অবিরোধে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। রামমোহনের প্রচেষ্টার মূলকথা হল একজাতীয় উপযোগবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতা, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক স্থিতিস্থাপকতা আছে। তার আবিষ্কৃত অধিকার তত্ত্ব ভারতীয় ভাবধারার সামাজিক ও সার্বজনীন কল্যাণ প্রত্যয়ের মধ্যেই দানা বেঁধেছে। প্রকৃতিগত অধিকারের সংগে সামাজিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করে মানবিক কল্যাণের নিরঙ্কুশ বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি ঐহিকতাকেই সবাধিক স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। জাতি-শ্রেণী-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে এক-ব্রহ্মের উপাসনার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন। নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় চিন্তায় তাঁর শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না—তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান চিন্তার অনুভাবনায় এদেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদ্পদ জনমনের সংগে প্রগতিভাবনাকে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। যুক্তি-বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ অভিজ্ঞার দ্বারা মানুষের ব্যবহারিক প্রতীতিগত বস্তুসত্তাকে রামমোহন স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন: "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest" তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাজনীতি মূলতঃ একই বৃন্তে বিধৃত শুভময় শক্তি। তাই বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকেই ধর্মকে রামমোহন জীবনানুগ করতে চেয়েছেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার মাধ্যমেই স্বাদেশিক চিত্তশুদ্ধির পবিত্র কর্ম তিনি সম্পাদনা করতে চেয়েছেন। 'ব্রহ্মসভা' কিংবা 'আত্মীয়সভা' স্থাপনের উৎসেও এই মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকর হতে দেখি। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে সমাজমনকে মুক্ত করে যে বিশ্বভৌম বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত তিনি

রচনা করতে চেয়েছিলেন—সেক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনও প্রতীচ্য শিক্ষাকে যতখানি সম্ভব তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন—'the greater our intercourse with European gentlemen the greater will be our improvement in literary, social and political affairs.' রামমোহনের ধর্মসংস্কার রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য বিধানেরই সংশ্লেষিত, অতি-সম্পন্ন, ঐশ্বর্যদীপ্ত রূপ। বেদান্তের ধর্মীয় ব্যাখ্যানের পটভূমিতে জাতির ঐহিক মূল্য প্রবর্তনা ও হিতৈষণাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য—'that some change should take place in their religion at least for their political advantage and social comfort'

রাষ্ট্রনীতির মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহনের ধারণা বাস্তববোধ ও উপযোগবাদ-কেন্দ্রিক ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়েছিল—সেখানেও ভূস্বামীদের সুবিধার কারণে রামমোহন তার অর্থনৈতিক চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেননি। জমিদারদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষার কারণে তিনি মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছেন। ধর্মক্ষেত্রের মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা থাকলেও সমাজবিপ্লবের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রবিপ্লবের মানস-প্রবণতার সন্ধান পেয়েছিলেন। এই সম্পর্ক সূত্রেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সংগে সামাজিক গণতন্ত্রের সংশ্লেষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করে নারীর সম্পত্তিতে অধিকারদান, বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধন করে জুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাজস্ববিভাগে ভারতীয় নিয়োগ, রাজকার্যে য়ুরোপীয়দের সংগে ভারতীয়দের সমানাধিকার, শ্রমজীবী কৃষকদের ভূমির উপরে চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান, মুদ্রণ স্বাধীনতা-অর্জন, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি রামমোহন-কৃত গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার ভাবভূমিতেই পরবর্তীকালের চিন্তানায়কেরা সামাজিক চেতনার পরিপুষ্টি ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার অন্তঃমূলে শক্তি সংযোজনা করেছিলেন।[৮] বাস্তব বিশ্বাসের প্রতীতিগত বস্তুসত্তাকে ব্যবহারিক সত্তায় স্বীকৃতি দিয়ে রামমোহন উনিশ শতকের উজ্জীবনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

৮ "রামমোহন রাষ্ট্রনৈতিক যে প্রবাহের সৃষ্টি করিলেন, তাহার ধারা ক্ষীণ হয় নাই। তদীয় অনুচর দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার সংস্পর্শ হইতে যে প্রেরণা লাভ করেন, তাহাই পরে মূর্ত হইয়া প্রকাশ পায় তাঁহাদের পরবর্তীকালের রাষ্ট্রিক কার্যাবলীর মধ্যে।" —ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : —প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৪

'ইয়ংবেঙ্গলের' গঠনমূলক চিত্তপ্রকর্ষ ও নাট্যসম্ভাবনা

উনিশ শতকের প্রথমদিকে স্পষ্টতঃ দুটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পরিচয় আমরা পাই—রামমোহন-অনুসারী ও ডিরোজিও-পন্থী। রামমোহন-অনুসারী গোষ্ঠীর মধ্যে আবার কতকগুলি 'উপ-এলিট' গোষ্ঠীর পরিচয় লাভ করা যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এরই মাধ্যমে এদেশে পশ্চিমী চিত্ত-প্রকর্ষের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে উঠল। উপনিষদের নচিকেতার মন্ত্রলাভের মতো অমৃতমন্ত্র লাভ করবার উপায়স্বরূপ কলকাতাতেও বহুবিধ সংস্কৃতি-চক্র স্থাপিত হয়েছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ, ফরাসী বিপ্লবের স্বাধিকার-বাসনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ও প্রত্যয়দীপ্ত, সামাজিক ইহমুখীন প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভংগীর বাহকরূপে জাতির ইতিহাসে নব প্রাণাধান করলেন ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসংগে ঐতিহাসিক সত্য সমর্থন করে যথার্থই বলেছেন,—"হিন্দুকলেজ ও রামমোহন একে অপরের পরিপূরক। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ ডিরোজিওর বহ্নিস্পর্শ লাভ না করিলে রামমোহনের আবির্ভাব অরণ্য-রোদনে পর্যবসিত হইত বলিয়া মনে হয়।" দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে সাধনধর্মগত দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে মিল আছে। বুদ্ধি এবং বিত্তকৌলীন্য য়ুরোপীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ডে যে কতোখানি প্রেরণার উৎস—য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের চিত্তধর্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের ভিত গঠন করেছিলেন জমিদারশ্রেণী। সামাজিক এই নব্যধনতন্ত্রের আদর্শটি রামমোহনের মৃত্যুর পরেই অবসিত হল। ইয়ংবেঙ্গলেরা বর্ণগত বদ্ধতা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বদ্ধতাকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উদার বুদ্ধির প্রাবল্যে জয় করেছিলেন।[১] এর উৎসমূলে ছিল বেন্থামের

[১] উগ্র ইয়ংবেঙ্গলদের প্রতি বিদ্রূপাস্ত্র নিক্ষেপ করে রূপচাঁদ পক্ষী প্রতিক্রিয়াশীল মতামত দিয়েছিলেন :

"লেখাপড়া যাক্ গোল্লায়, যদি ডিনার পার্টিতে যায়।
তথাচ শরীরে বল পায়, তবে দশজন ইংরেজে চেনে॥
... ...
খগ কহে একি বিপদ, ধর্মকর্ম হল রদ,
গোডিম ফুটেই খোঁজেন মদ, যান সদ্য শমনভবনে॥"

জ্ঞানাত্মিকা রাজনৈতিক মতবাদ, এডাম স্মিথের অর্থনৈতিক অনুভাবনা, টমাস পেইনের যুক্তিবাদ ইত্যাদি প্রগতিমূলক দর্শন তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদকে গঠন করল। এর পূর্বে আমাদের সামাজিকদের মনে এই প্রগতিদর্শন বিষয়ক স্পষ্ট ও বিপ্লবাত্মক কোন ধারণা ছিল না। প্রসংগক্রমে এদিক থেকে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, সেখানেও মানবমন আধ্যাত্মিকতার দৈবী বৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র হয়নি। প্রাচীন ক্ল্যাসিকালযুগের উপরে স্থাপিত অচল বিশ্বাসের মধ্যে মানসিক স্থবিরতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই মানসিক স্থবিরতা মুক্তির চিন্তানায়কত্ব করেছিলেন বেকন, দেকার্তে, ভল্‌তার, দিদেরো প্রভৃতি এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট। বিজ্ঞানের সংগে মানুষের জ্ঞানান্বেষণের পন্থাকে বস্তুবাদী সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁরা এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক সেই আন্দোলন প্রচারে ইয়ংবেঙ্গলদের ভূমিকা স্মরণীয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কারসাধনে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু, 'The real failure of the Young Bengal trend, inevitable perhaps in the circumstances, was the failure to build up a sustained movement and developing ideology. Its most positive aspects are a fearless rationalism and a candid appreciation of the regenerating new thought from the west.[১০] মূলত ইয়ংবেঙ্গল তৎকালীন সামাজিক আলোড়নের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর নাম। সামাজিক জীবনপর্যালোচনায় শক্তিশালী হলেও এককভাবে কোন গোষ্ঠীর পক্ষে সর্বজনের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। তথাপি ইয়ংবেঙ্গলের সামাজিক গোষ্ঠীগত রূপের মধ্যে তাঁদের মানসিক ও সামাজিক রূপায়ণের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল। একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক স্তর হিসেবে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীসমাজে ইয়ংবেঙ্গলের অধিষ্ঠান ছিল। তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজগোষ্ঠী কিংবা 'গৌড়ীয় সমাজগোষ্ঠী' থেকে দু'দিক দিয়েই তাঁদের সংগে প্রভেদ ছিল—সামাজিক মর্যাদা ও চিন্তাধারার প্রভেদ। প্রাচীন কিংবা নবীনের সংঘর্ষজাত গোষ্ঠীভেদ পুরাতন কালাগত। গোষ্ঠীর বিকাশের সংগে সংগে আদর্শগত ভেদ-বিভেদ মানুষের সমাজে নতুন নয়।

---

১০ Studies in the Bengal Renaissance : Ed. by A. C. Gupta.—P. 31

কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলরূপী সামাজিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বিদ্যাবুদ্ধির সামাজিক প্রয়োগ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন,—"তবে এলিট' গোষ্ঠীভুক্ত হবার সামাজিক মানদণ্ডগুলির যে পরিবর্তন হয়েছিল তাতে অর্থনীতিক মানদণ্ডের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং তার ফলে ইয়ংবেঙ্গলের অভ্যুদয়কালে তার গোষ্ঠীসীমানা উচ্চমধ্যবিত্তের (upper middle class) স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।"[১১] ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার পর ইয়ংবেঙ্গল দলের যখন আবির্ভাব হয়—পাশ্চাত্য প্রভাবে এদেশীয় সমাজমনে বিত্তের মর্যাদা স্বীকৃত হওয়ায় তখন এ-দেশীয় সামাজিক ও অর্থ নৈতিক গড়নের মধ্যেও লক্ষণীয় পার্থক্য এসেছে। বর্ণগত কিংবা জাতিগত মানদণ্ডের ক্ষেত্রে বিত্তলব্ধ মর্যাদার নতুন সামাজিক অভিপ্রায় বিশিষ্ট মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুকলেজ তখন অভিজাত শিক্ষায়তন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য যাঁরা এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন—তাঁরা প্রায় সকলেই তখন অভিজাত হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বিত্তের জোরে প্রতিষ্ঠাবানেরা ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে আরও সামাজিক প্রতিপত্তি চেয়েছিলেন। তাই হিন্দুকলেজের চারদিকে শুরু থেকেই হিন্দুয়ানী তিরোধানের প্রবণতার সংগে বিত্ত ও বর্ণের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। হিন্দুসমাজের বাহিরের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের প্রতিরোধ করে সমাজের অন্তর্নিহিত মূলীভূত শক্তির উৎস তাঁরা নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। বাহিরের সংস্কারকামী বিচিত্র কোলাহলের মধ্যেও এ সামাজিক শক্তি সহজে পর্যুদস্ত হবার মতো চরিত্রের নয়। জড়তার কোন উপাদান তাদের গোষ্ঠীবিন্যাসে ছিল না। নব্যবঙ্গের এই আন্দোলন সুরু হয় হিন্দুকলেজকে কেন্দ্র করেই। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে নিহিতার্থ ছিল—সেই শিক্ষানীতি থেকেই নব্যবঙ্গের যুক্তিজাগর ও মুক্তিচেতন আন্দোলন কেন্দ্রিত হতে পেরেছিল—

(1) The primary object of this institution is, the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia.

---

১১ শনিবারের চিঠি : বৈশাখ, ১৩৭২

(2) In the school shall be taught English and Bengali Reading, Writing, Grammer and Arithmetic by the improved method of instruction

(3) In the Academy besides the study of such language as cannot be so conveniently taught in the school, instruction shall be given in History, Geography, Chronology, Astronomy and Mathematics, Chemistry and other Sciences

ইয়ংবেঙ্গলের হিন্দুকলেজের শিক্ষানীতিতে যে আদর্শবোধ ছিল—তা 'founded upon a comprehensive view of the constitution of society, and the phenomena of nature', 'শিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়ে এই নতুন চিন্তাবৃত্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন ডিরোজিও। ডিরোজিওর বাড়িতে স্থাপিত এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে যে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত হয়—সেখানে কলেজের বাইরেও ছাত্রদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। এভাবেই হিন্দুকলেজের গতানুগতিক পাঠধারার মধ্যে সপ্তসমুদ্রের কলধ্বনি হিল্লোলিত হয়ে সমাজদেহে এক নবকোলাহলের সৃষ্টি করল। ডিরোজিওর দেশাত্মবোধ এবং রাজনৈতিক বিবেক যা সমকালীন বিভিন্ন য়ুরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল—হিন্দুকলেজের ছাত্ররাও সেই জাতীয় অভ্যুত্থানে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশিষ্ট মনন শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই একটি সর্বতোমুখী পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ধর্মের কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সাম্য ও মৈত্রীভাবনা এবং ইতিহাসের অনুরাগের মধ্যে বিশ্লেষণ-তীক্ষ্ণ বাস্তব সমাজ পর্যালোচনার মাধ্যমে তারা মানুষের নৈতিক-সংস্কারের সংগে স্বাধিকার চেতনাকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিদের ভাষায়—'The mind of the young Bengal was a flame with love for the twin God of liberty and rationalism'[১২] নবশিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজভিত্তিকে ইয়ংবেঙ্গলেরা মন, ভাব ও বিবেকের বিকাশের সূত্রে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সমাজদেহকে পরিব্যাপ্ত করে এই সময়ে যেমন বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল মানস জিজ্ঞাসার পরিচয় লাভ করা যায়—

১২ Modern Bengal—N. K. Bose.

তেমনি জাতীয়তাবাদী সমাজচেতনতার উদ্দীপনে সামাজিক ও ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতার অচলায়তন ভেঙে যাবার মতো হয়েছিল।

সমাজদেহে সার্বিকসংস্কারের ব্যাপ্তিতে—'reform everywhere was their motto and they raised the cry for monogamy among Hindus as well as widow re-marriage, full one decade before Vidyasagar's great crusade got under way education for women as well as equal right for all.' সমাজদেহে এই সার্বিক সংস্কারের যে ভিত্তি ইয়ংবেঙ্গলেরা গঠন করেছিলেন, তার মধ্যে সনাতন-বিরোধী ধারাই ছিল মূল প্রতিপাদ্য। ফলে তাঁদের দ্বারা সংঘটিত যে ক্রিয়ারূপ (action) সমাজদেহকে পরিব্যাপ্ত করেছিল, তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় বিচ্ছিন্ন একক শক্তিরূপের প্রতিক্রিয়া ছিল।[১৩] পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্বসমৃদ্ধ, কৃত্রিমতা বিরোধী নব্যতন্ত্রীদের এই বিরোধ মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের কৃত্রিমতার ও প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে। বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ ও পর্যবেক্ষণনীতির মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাধিকার চেতনার বিস্তৃতি ঘটানো ছিল তাঁদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকা 'পার্থেনন', 'এন্‌কোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' ইত্যাদি পত্রিকার মধ্য দিয়েও তাঁদের রাজনৈতিক ও ইতিহাস-সাধনার ক্রমবিবর্তিত রূপটির স্পষ্টোজ্জ্বল পরিচয় মেলে। ১৮৩০ সালে 'পার্থেনন' পত্রিকার প্রকাশ প্রসংগে জন বুল লিখেছিলেন,—"This publication was avowedly the production of Hindus and such its appearence has been the rapidity with which the native mind has progressed of late years that the writers of Parthenon belong to that clan."

য়ুরোপীয় প্রগতিশীল চিন্তানায়কদের প্রভাবে ও ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দুকলেজের শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয়দের মধ্যে যুক্তিবাদ-তীক্ষ্ণ বস্তুবাদের যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী দেখা দিয়েছিল, তার মর্মকথা ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অনুভূতি। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব তাদের প্রগতিবাদী সংগ্রামচেতনার মধ্যে ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে য়ুরোপে

১৩ "The Young Bengal was a completely isolated force in society in the late twenties and early thirties. This isolation created a unique cohesion among them and urged them into social extremism."

—Aspects of Social Histroy : P. Sinha p. 95.

জাতীয়তাবাদের যে সংগ্রামী-চেতনা গণতান্ত্রিক ঐক্যানুভূতির মধ্যে অর্থনৈতিক সমানুপাতিকতা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিল—নব্যসমাজশক্তির হোতা নব্যবঙ্গীয়েরাও অনুরূপ স্বাধীনতার কামনা জানিয়েছিলেন। অবশ্য য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির উপনিবেশ স্থাপন নীতিকে ইয়ংবেঙ্গলেরা সমর্থন জানাতে পারেননি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ থেকে তাঁরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্ররূপটিকে প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে ইয়ংবেঙ্গলেরা রাজনৈতিক মনোভাবনার মধ্যে যে স্বাধীনতার বীজমন্ত্রকে লালিত করেছিল—তারই প্রকাশ দেখা গেল ১৮৩৩ এ টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ-সভায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ দানের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মনোভাবনাব বলিষ্ঠ প্রকাশ তার মধ্যে আছে। এর মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সুস্থিবীকৃত মূল্যাবধারণার অভাব এবং চার্টাব আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলিব কঠোব সমালোচনা হয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গলের আপাত ধ্বংসমুখর আচরণের মধ্যেও গঠনমূলক চিত্তপ্রকর্ষ বর্তমান ছিল—যার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রচেতনার মূল আদর্শ। দেশ-কালেব পরিবেশ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সংগে তাঁরা অর্থনৈতিক সাম্য বিধানে প্রয়াসী হয়ে বাস্তব চেতনালব্ধ সমাজহিতৈষণার মধ্য দিয়ে স্থির ও অপ্রকম্প বুদ্ধিবাদকেই জয়ী করেছেন। এই ক্রমোন্মুখ রাজনৈতিক-চেতনা যখন সমাজদেহকে ক্রমশঃ অধিকার করতে চাইছিল—সেই শক্তিকে অবদমিত করে আক্রমণাত্মক ভংগীতে 'রিফর্মার' পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন: 'Outdoing the wildest flights to which ultra-radicalism has ever soared in this land'. বাঙালীর এই জাতীয়তাবোধ উন্মেষেব পশ্চাতে কার্যকর হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার সক্রিয়তা এবং হিন্দুকলেজের শিক্ষিত শ্রেণীসম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধনমুক্তিব রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টাকারেই জেগে উঠেছিল। নব্য হিন্দু সংস্কারকদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল পৌত্তলিকতাব বিলোপসাধন এবং মনুষ্য প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির উৎসাদন ঘটিয়ে নৈতিক আদর্শের প্রতিস্থাপন। এই জাতীয় সংস্কারপন্থী মন নিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'এন্‌কোয়ারার' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রচার কবেন। হিন্দুধর্মের রীতিনীতির এতে বিরোধিতা করা হত বলে শেষপর্যন্ত কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন। 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' ও 'পারথিয়ন' নামক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও

বক্তৃতা শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। এই সামাজিক প্রতিবেশ একটি বিশেষ নাট্য-সম্ভাবনার শিল্পরূপও সেদিন পেয়েছিল। কৃষ্ণমোহন তাঁর 'The Persecuted' ইংরেজি নাটকে তৎকালীন হিন্দুসমাজের একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ১৮৩১ এর ১২ই নভেম্বর তিনি এটি হিন্দু যুবকদের উৎসর্গ করে লেখেন: 'The Author's purpose has been to compute its excellence by measuring the effects it will produce upon the minds of the rising generation The inconsistencies and the blackness of the influencial members of the Hindu community have been depicted before their eyes' কৃষ্ণমোহন গোড়া হিন্দুসমাজের ভণ্ডামী ও দুর্নীতি অনাবৃত করে নব্যবঙ্গের স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ মনোভাবের চিত্রই এখানে নাট্যাকারে অঙ্কিত করেছেন। রচনাটি Dramatic scenes কিংবা নাট্যধর্মী চিত্রের সমষ্টি। প্রাচীন ও নবীনের মতবাদ ও আদর্শগত দ্বন্দ্বই এখানে মূল নাট্যদ্বন্দ্ব। 'সমাচারদর্পণ' (৩রা ডিসেম্বর, ১৮৩১) পুস্তকখানি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত কৃষ্ণমোহন 'খৃষ্টযানী' কখনও পছন্দ করেননি। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন ভারতীয় এবং 'The Persecuted' নাটকে তাঁর বিদ্রোহী মনের মূর্ত প্রকাশ। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ ইংরেজি শাসনের এই কায়েমী কালের মধ্যে বাংলার গ্রাম-জীবনের ঐতিহ্য, শিক্ষা দীক্ষা বিপর্যস্ত হয়ে মানুষের জীবনে ও সমাজে স্থবিরতার রক্ষণশীলতাই একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট নব্য জমিদার শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলাসিতার অনুসরণ করে ইংরেজনবিশে পরিণত হয়েছে। প্রগতিবাদ ও রক্ষণশীলতার সেই দ্বন্দ্বমুখর মুহূর্তে কৃষ্ণমোহন রচনা করলেন এই নাটক। নাটকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। নাটকের পাঁচটি অঙ্কের দৃশ্যসংখ্যা এইরূপ—১ম অঙ্ক: ৩, ২য়: ৪, ৩য়: ৩, ৪র্থ: ২, ৫ম—৩। নাট্যোক্ত চরিত্র—কামদেব, দেবনাথ, রামলোচন, লালচাঁদ, মহাদেব, তর্কালঙ্কার-বিদ্যাবাগীশ, বাণীলাল, শ্যামনাথ, ইন্দ্রনাথ, ভৈরব, চন্দ্রকুমার ইত্যাদি। এতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা উদ্দেশ্য হলেও স্ত্রী চরিত্র বর্জিত হয়েছে এবং প্রেমমূলক কোন ঘটনা নেই। নব্য ইংরেজি শিক্ষার ফলে বিজাতীয় রীতিনীতি ও আচরণ কিরূপ প্রসার লাভ করে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরু-পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত প্রাচীন হিন্দুসমাজের গোঁড়ামী এবং ভণ্ডামির চিত্র

পারম্পর্যের মধ্য দিয়েই নাটকটি গ্রন্থিত। শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে দু'টি দলই নিজেদের কুসংস্কারমুক্ত (liberated from the shackles of Prejudice) বলে মনে করেছে। কিন্তু বাণীলাল ইত্যাদি চরমপন্থীর দল নব্য শিক্ষাদর্শে যাকে সত্য বলে মনে করতো—সেই অন্ধ সমাজের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তৎপর। অন্যদিকে বৈরব প্রভৃতি চরিত্র পর্যায় সমাজের বিদ্বেষ আশঙ্কা করে বিদ্রোহের পক্ষপাতী নন। আবার প্রাচীন সমাজের মধ্যে কামদেব প্রভৃতি চরিত্র বাইরে ভণ্ডামি বজায় রেখেই সর্বদা কুকর্মে রত। কিন্তু ধর্মভীরু মহাদেব মুখোপাধ্যায় অজ্ঞানতায় মোহাচ্ছন্ন ও মূর্খ পণ্ডিতের বশীভূত হয়েও অজ্ঞান-মোহাচ্ছন্ন নন। সংগতিসম্পন্ন সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেও মহাদেবের পুত্র বাণীলাল তোষাখানার নিভৃত কক্ষে বন্ধুদের নিয়ে যখন মদ্য মাংস খানাপিনা করছেন--তখন দরজার ছিদ্রপথে তা দেখে গৃহের হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য 'Oh, unbecoming of the holy character of the family' বলে চীৎকার করেছেন এবং নবাযুবকের প্রতিনিধি বাণীলালের কণ্ঠেও সমান দৃঢ়তার সংগেই ধ্বনিত হয়েছে—'I expected this and am prepared for it' রাস্তায় ভ্রমণরত তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ এই দুই গুরু পুরোহিতের ভণ্ডামি, ধূর্ততা এবং অর্থগৃধ্নুতার পরিচয়ও দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মহাদেবের বৈঠকখানায় পুরাতন ভৃত্যের স্বগতোক্তি থেকে জানা গেল যে, মহাদেব দুঃসহ দুঃখে শয্যালীন। আবার ঐ দৃশ্যেই সমাজচ্যুতির দুঃখ ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করবার জন্য মহাদেব পুত্রকে কাতরভাবে অনুনয় করেছেন। কিন্তু বাণীলাল প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী নয় একদিকে সত্যনিষ্ঠা আর একদিকে পিতার প্রতি সত্য কর্তব্য (A father Versus truth) অবশেষে সব কিছু পরিত্যাগ করবার দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাই—'Truth prevents us from yielding to a father's cries and a mother's solicitations'

দ্বিতীয় দৃশ্যে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশের পুনরায় সাক্ষাৎকার। সুরাপানাদি শাস্ত্রানুমোদিত বলে সুখসম্ভোগে বাধা ছিল না। কিন্তু বাণীলাল পথের কণ্টক-স্বরূপ হওয়ায় লালচাঁদ নামে এক ধূর্ত ভণ্ড মাতাল সংবাদপত্র সম্পাদকের সাহায্য গ্রহণ করল। মহাদেব ও তৎপুত্রের কুৎসা রটনা করে সভা করে

মহাদেবকে একঘরে করল এবং বাণীলালকে গৃহ থেকে বার করবার জন্যে তার ওপর আদেশ জারী করল এবং তর্কালঙ্কার লালচাঁদকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল : 'We admire your holy ardour for religion.'

৩য় অঙ্কে লালচাঁদের বাড়ীতে কামদেব প্রভৃতি গোড়া হিন্দুর দল ও পরে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ লালচাঁদের সংগে পরামর্শ করতে এলো। মন্ত্রণায় স্থির হল যে, মহাদেবের কাছ থেকে লিখিয়ে নিতে হবে যে, সে পুত্র বাণীলালকে গোমাংস ভক্ষণের অপরাধে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মহাদেবের স্বাক্ষরের জন্যে স্বীকারপত্রের খসড়া নিয়ে তর্কালঙ্কার প্রস্থান করলেন। সকলে চলে গেলে লালচাঁদ ভৃত্যকে ডেকে নিদ্রার পূর্বে মদ্যপান করল—'Lallchand is not the only one whose preparation for going to bed is Brandy. He is but a specimen of a community.' [১৮৫৪-র 'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত টেকচাঁদের 'জাতি মারিবার যন্ত্রণা' (৪র্থ সং) ও জাতিরক্ষার্থ সভা (৫ম সংখ্যা) শীর্ষক দুটি ব্যঙ্গচিত্র মদ্যপানের পরিচায়ক] তৃতীয় অঙ্কের পরবর্তী দুটি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত।

চতুর্থ অঙ্কে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। কেবল প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রকুমার এসে বন্ধুবর্গকে সংবাদ দিল যে, তর্কালঙ্কার উৎকোচ নিয়ে প্রস্থান করলেও পরে জোর করে নিতান্ত অনিচ্ছুক ও উৎপীড়িত মহাদেবকে দিয়ে স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। বাণীলাল এতে আন্তরিক দুঃখিত হয়ে বলল,—'Bear in mind my friend, when I have lost my father, my mother, my brothers, my sisters, for this monster superstition. I will not enjoy a whole day happily until the baneful religion is down.'

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবনাথ তার পুত্র দীননাথকে স্কুলে পাঠাতে চায়—কিন্তু স্কুলে নাকি হিন্দুকে খৃষ্টান করা হয়—বালক কিছুতেই যাবে না। দেখানো হয়েছে যে, গোড়া হিন্দুরূপে দেবনাথ পুত্রকে পাঠাবে না এরূপ ভণ্ডামী করে প্রতিজ্ঞা করেছিল—তথাপি ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রতিপাদ্য ভৈরব প্রভৃতি শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের সংগে বাণীলালের চরমপন্থী দলের মতভেদ থাকলেও হিন্দুধর্মের কুসংস্কার-মুক্তির স্বার্থে অবশেষে তারা মিলিত হল। হিন্দুকলেজের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদপ্রভাকর’ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। আলোচ্য নাটকের অন্যতম চরিত্র পত্রিকা-সম্পাদক লালচাঁদ এঁদের প্রতিনিধি।[১৪]

নাটক হিসেবে সার্থক রসোত্তীর্ণ নাটক না হলেও এ নাটকের মধ্য দিয়ে একটি বিশিষ্ট সমাজমন ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝতে হবে। সামাজিক সমস্যাকে অবলম্বন করে নাট্যরূপ দেবার প্রয়াসে কৃষ্ণমোহন এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা পেতে পারেন। তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের মনে এ নাটক যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল—তার তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা, কপটতা, ব্রাহ্মণের শঠতা, তরুণ সমাজের ক্রোধ, হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ প্রতিভূদের অর্থলিপ্সু মনের প্রতিরূপের নিপুণ চিত্রাঙ্কন করেছেন কৃষ্ণমোহন। অসহায় সমাজের দুর্গতির বিরুদ্ধে তরুণ মন বিদ্রোহী হয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তর্কালঙ্কার প্রদত্ত সমাজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসহায় যন্ত্রণা নিয়ে বাণীলালের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—“The recollection is painful, but we must bear them··· · Bear in minds my friends when I have lost my father, mother, brothers, my sisters for this monster superstition, I will not enjoy a whole day happily until this baneful religion is down,” একটি গভীর প্রত্যয় ও বলিষ্ঠতার মধ্যে এ নাটকে কৃষ্ণমোহনের বিদ্রোহী মনেরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। নাটকটি উনিশ শতকের নাট্য প্রস্তুতির সেই সামাজিক যুগসন্ধিক্ষণের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই দেশীয় মিশনারী সম্প্রদায় পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকাগুলি রাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বাঙালীর মনকে প্রশ্ন-মনস্ক করে তুলেছিল। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—“রামমোহনের

---

১৪ অবশ্য ১৮৩৮-এর পরে উগ্র রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হবার পরে ঈশ্বর গুপ্ত কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে সংযত উল্লেখ করেছেন। যে ‘পার্সিকিউটেড্’ নাটক প্রসংগে তিনি তীব্র কটূক্তি করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ তিনি লিখেছিলেন: “বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহকরত: ইহার সৌভাগ্য বর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।”

মৃত্যুর পর (১৮৩৩) এবং ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) মধ্যবর্তীকালের মধ্যে বাংলা-দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বাঙালীর চিত্ততলে নব আকাঙ্ক্ষার বাণী জাগ্রত হইতেছিল।"[১৫] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজশাসনের প্রতি যে বিদ্বেষ ধ্বনিত হয়েছিল—তৎকালীন বাঙালীর মনে সে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিও জেগেছিল। সেকালীন সাময়িকপত্রে চিত্রিত সমাজচিত্রে সেই অগ্নিজ্বালার স্বাক্ষর রয়েছে। ডিরোজিওর নিজের দল পুরাতন সংস্কারকে জর্জরিত করে নবজীবনের জয়ধ্বনিতে যে গঠনমূলক চিত্তপ্রকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন তার মৌল ক্রিয়াকর্ম ও ভাবাদর্শকে স্বীকার করে নিতেই হয়। জর্জ টম্পসনের নির্দেশে এঁদেরই নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ আন্দোলনমূলক রাজনৈতিক আচরণের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বাস্তববোধের ভিত্তিতে যাবতীয় মানবিক ব্যাপারকে তাঁরা সামাজিক মানদণ্ডে তৌল করতে চেয়েছেন। রামমোহনপন্থী ও ডিরোজিও-অনুসারীদের মধ্যবর্তী স্তরে রাধাকান্ত দেব-বাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে 'ধর্মসভা'র দল রামমোহন কিংবা ইয়ংবেঙ্গলের বিরুদ্ধাচরণ করে সনাতনী প্রাক্তনকেই বরণ করলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজজীবনের নব-নান্দীপাঠ সুরু হল। বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার, বৈদিক সাহিত্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ তৎকালীন বাঙালীসমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার যে বৃত্তি জাগ্রত করেছিলেন—তার মধ্যে বৈষ্ণবীয় দ্বৈতভাবমিশ্র ভক্তি সাধনার পরিচয় আছে। বিদগ্ধ সমালোচকের মতে—'দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারেই সৎ অসৎ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করিয়া গিয়াছেন।... দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংগে এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দর্শনলাভ করিয়া ধ্যানে তাঁহার সহিত বিহার করা।' আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানাত্মক 'প্রত্যভিজ্ঞায়' দেবেন্দ্রনাথ উনিশ শতকেরই[১৬] ভাববলয়ে সন্নিহিত। যুক্তিবাদী আত্ম বিবেকের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির দিশারী।

১৫ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলাসাহিত্য পৃঃ ১৬৪

১৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী

আবার বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তের মনঃপ্রকৃতি ছিল বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী তাত্ত্বিকের। চিদাত্মক জগৎ-প্রত্যয়কে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। অধ্যাত্মরহস্যকে ভৌমবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে জগদ্ব্যাপারকে যেমন তিনি বিশুদ্ধ বস্তু প্রতীতিরূপে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ঐহিক জীবনকে সর্বতোভাবে তারই বৃত্তপথে চালিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মনের পটভূমিতে বাঙালীমনের সামাজিক স্বরূপের সজীব প্রতীকত্বের পরিচয় মেলে। উনিশ শতকের যে যুগাদর্শে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব লালিত, তার মধ্য-দিয়ে কর্মযোগের সংগে মানবপ্রেমের সংশ্লেষণ ঘটেছে—যা নানাভাবে সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রাক্-উনিশ শতক ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজমনের প্রস্তুতির যে রূপরেখা দেওয়া গেল—তারই পটভূমিতে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে পরবর্তী অধ্যায়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যাবে এবং নাট্য সাহিত্যের সংগে প্রত্যক্ষরূপে সম্পর্কান্বিত সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার বিশিষ্ট কয়েকটি ধারার পূর্ণতর বিশ্লেষণ করা যাবে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম ও খৃষ্টানধর্মের পারস্পরিক বিবদমান রূপের মধ্য দিয়েও নবযুগের প্রধান বাণী যুক্তিবাদ গড়ে উঠেছিল।

প্রথম পর্ব ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটকের প্রথম পরিচর্যায় কাল ঃ সমাজ-মানসের ধারা

বাঙালীর জাতীয় জীবনেব মধ্যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। প্রাক্-উনিশ শতকীয় সমাজরূপের মধ্যে একজাতীয় স্থৈতিক (static) রূপ লক্ষ্য করা গেছে—যেখানে ব্যক্তিচেতনা সমাজচেতনার সংগে বিমিশ্রিত ছিল। অবশ্য সেখানে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ নেই বলে এমন সাধারণীকৃত ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, ব্যক্তিস্বার্থের সংগে সমাজস্বার্থের বিরোধ অসম্ভব। এই ব্যক্তিবাদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলা নাট্যচিন্তার মধ্যে ক্রমশঃ গোচরীভূত হয়েছে। এই ব্যক্তিবাদ হল —'an attitude of mind which leads member of the community to draw apart from his fellow creatures and to leave society at large to itself' , সমাজতত্ত্বে এই ব্যক্তিত্ব বস্তুনিষ্ঠ এবং সামাজিক সকল জটিল সম্পর্কের মধ্যে নিত্যনতুন প্রাণ-সঞ্চারী বস্তু। সমাজ আর ব্যক্তি মিলেই নতুন সৃজনধর্মী মূল্যবোধের প্রগতি-পরিণামকে সম্ভাবিত করে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পরিধিতে ভাববিনিময় দ্রুত সংঘটিত হয় বলে তাদের চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত-ভাবে জাতিসংশ্লেষ ঘটায়। ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিক চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি জানালেও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মৌলিক চিন্তার স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে কিংবা সক্রিয় স্থিতিপন্থার মূলেও স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন নিহিত থাকতে পারে। অপরের সমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে সামাজিক-আর্থিক কিংবা সাংস্কৃতিক বিষয়ের ব্যক্তিগত মূল্যমানও পরিধি বিস্তার করতে পারে। বাঙালীর নিজস্ব যে একটি সংস্কৃতি বা বলিষ্ঠ একটি জাতীয় ধর্ম আছে—সামাজিক বিধানের ব্যবহারিক শক্তি কিংবা সমাজের সমষ্টিগত রূপের দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত। উনিশ শতকের বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ও এই সামাজিক বিধানের সমষ্টিগত রূপের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং জন-মনোরঞ্জনের নগদ বিদায় দিয়ে বাঙালীর আধিমানসিক সংশ্লেষ ঘটিয়েছে। ভক্তি, করুণা, আবেগ প্রভৃতি ভাবতরল মানসিকতাকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটকের আদিরূপ যাত্রায় একজাতীয় নৈতিক ঐতিহ্যের মানদণ্ড গড়ে উঠেছিল।

নাট্যাভিনয়ের সূচনার অর্থ হল আধুনিক নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয়ের সূচনা। সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে অভিনয় হল আদিমতম কলা। আজও আমাদের দেশের ওরাঁওদের নৃত্যগীতাদিসহ সংঘবদ্ধ উৎসব যাত্রাকে 'যাত্রা' বলে। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের সূচনা হিসেবে যাত্রার পর্যালোচনা করে তার মধ্যে সমাজের সমষ্টিগত রূপের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। যাত্রা ছাড়াও বীরগাথা, বৈতালিক ও স্তুতিপাঠকদের গান, মনসা-চণ্ডী, শিবঠাকুরের গান ইত্যাদিও অভিনয়ের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্বে বাংলা নাটক এমন এক আদিম স্তরের মধ্যে ছিল যে, তার মধ্য দিয়ে শিল্প ও সাহিত্যগত কোন বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র মহিমা পায়নি। তথাপি বাঙালীর সমাজমনের আনুপূর্বিকতা ও সমগ্রতা বিচারে বাংলা নাটকের প্রথম পরিচর্যার কাল বিশ্লেষিত হতে পারে। ১৮৫৭ সালের পূর্বে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা নাটকের যথার্থ সুরু হয়নি। তথাপি আদিযুগের নাট্যধারার আদিম ও অপরিণত সেই রূপের মধ্যেও ইতিহাসের কালসীমার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

২

নাট্যবিষয়ে বাঙালীর চেতনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রবণতা পাশ্চাত্য নাট্যোপস্থাপনার সংস্পর্শে এসেই উদ্বোধিত হয়েছিল। রুশদেশীয় পরিব্রাজক হেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৮) ডোমতলা লেনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটারে ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রথমবার তাঁর 'The Disguise' নাটকের অভিনয় করান। অভিনয়-সক্ষম নাট্যরচনার এই প্রয়াসই ঐতিহাসিক কালানুক্রমে প্রথম নাট্যরচনার সূত্রপাত। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই রুশদেশীয় নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিটি বাঙলা দেশে আসিয়া প্রথম ইউরোপীয় ধরণের রঙ্গমঞ্চে বাঙালীর সাহায্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে এই বাংলাদেশে ইউরোপীয় ধরণের রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার সংগে সংগে ইউরোপীয় 'থিয়েটারী' ঢঙের নাট্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল।' লেবেদেফ তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের নির্দেশে চালিত হয়ে যে দু'খানি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, সেই স্থূল ধরনের আদিরসাত্মক প্রহসনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের সাধারণ দর্শকের স্থূল রুচি ও সমাজমনের পরিচয় মেলে। তাঁর তীক্ষ্ণধী বুদ্ধি যথার্থই অনুধাবন

করেছিল যে, জীবনের উপরিতলের পরিহাসতরল সফেন বর্ণনাই তৎকালীন বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় হবে। কাজেই এ রুচি বিশুদ্ধ বা উন্নত রুচি নয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় খেঁউড়ের যুগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের বাঙালীর রুচি সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে, "খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর, যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধাবন করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই।" রেভাঃ লঙ সাহেবের পুস্তিকার (১৮১৮-৫৫) বাঙালীমানসের আদিরস-প্রিয়তার পক্ষে কতকগুলি আখ্যানের নামোল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে স্থূল রুচির যে বৈশিষ্ট্য প্রকটিত—তা যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের বিকৃত রুচি ও সমাজমানসিকতার প্রলম্বিত অনিবার্য প্রতিফলন। লেবেদেফ তাঁর এদেশে নাট্যাভিনয় প্রযাসে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ের ইংরেজ মালিকদের বিরুদ্ধতার প্রসঙ্গে তিনি Memorandum এ যে কাহিনী বিবৃত করেছেন তার মধ্যেও তৎকালীন সমাজমানসিকতার স্বরূপ প্রতিফলিত: 'অনুগ্রহ পাইলে আমি লোভী ও কুখ্যাত ব্যবসাদার ও নীচস্বভাব কর্মচারীদের কবল হইতে রক্ষা পাই। এই কর্মচারীদের মিথ্যাচার ও কুৎসিত আচরণ অন্যদেশের মানুষ ও দেবতাদের নিকট সমভাবে ঘৃণার্হ।'[১] লেবেদেফের এই বক্তব্যের পটভূমি বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যবর্তী যুগের কথা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখন সবেমাত্র ঘোষিত হয়েছে। লেবেদেফ যে উন্নত ধরনের নাটক রচনা করেননি তা বলা বাহুল্য। তথাপি এ নাটক রচনার পশ্চাতে যে সামাজিক তাৎপর্যের দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন—তাঁর নিজেরই ভাষায় সে তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে: 'এ পর্যন্ত কোন রুশীয় হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, মুসলমান ও ইউরোপীয় শাসনের ফলে এ দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এখানকার ভাষা ও অন্যান্য অনেক কিছুই এক মিশ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার ফলে এ দেশের

১ দেশ-সাহিত্যসংখ্যা (১৩৬২)

আখ্যানসমূহ তাহাদের মৌলিক রূপ হইতে এতো দূরে সরিয়া আসিয়াছে যে, এখন একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণই এই সকল রচনা শোধন ও সংগ্রহ করিতে পারিবেন।[২] নাট্যরচনাকালে লেবেদেফ প্রত্যেকটি কথা যাতে বাঙালীর চিত্ত স্পর্শ করে, তার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন—'Mr. Lebedoff still has the presumption but with the greatest respect to invite the Asiatic inhabitants only, at and in vicinity of Calcutta to attend another representation of his play written in the Bengalie and Hindusthanie languages, wherein for the expressed purpose of enlivening the scene will be introduced some select Bengalie songs, adapted to, and accompanied by European instruments : and since he has enlarged the performance to three complete acts and taken particular pains to instruct all the actors and actresses in their assigned parts, he humbly confides that increased amusement will be now afforded to every auditor."

অভিনয় ব্যাপারে লেবেদেফ একই নাটকের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ভাষায় উপস্থিত করেন। নাটকের উৎকর্ষ অপেক্ষা নাট্যশালার জনপ্রিয়তা বিষয়ে তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তৎকালীন বাঙালী দর্শকের স্থূল শিল্পরুচির বৈশিষ্ট্যটুকু সঠিকরূপে ধরতে পেরেই তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কোন কোন অংশ নাটকের সংগীতে ব্যবহার করেন।[৩] তৎকালীন যাত্রার বঙ্গরসিকতার দিকটি গ্রহণ করলেও বাঙালী চিত্তের করুণ ও ভক্তিরসের বিমিশ্র চেতনার বৈশিষ্ট্যকে তিনি সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতার ইংরেজ সমাজও লালবাজারের প্লে হাউস, ক্যালকাটা থিয়েটার,

---

২ জোরনসভের নিকট লিখিত লেবেদেফের পত্রের অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেশ, ২৩শে বৈশাখ ১৩৬২

৩ "ঊনবিংশ শতকের একেবারে আরম্ভে কলকাতার আশেপাশে অর্থাৎ চন্দননগর, খিদিরপুর, দমদম প্রভৃতি শহরের ইয়োরোপীয়রাও সখের কনসার্ট ও থিয়েটারের দল তৈরী করে নিজেদের চিত্তবিনোদনের যে সুব্যবস্থা করেছিলেন, তার খবর আমরা পাই তখনকার দিনের সামাজিক ইতিহাস থেকে।"

—বাঙালীজীবনে বিলাতী-সংস্কৃতির প্রভাব : শান্তিদেব ঘোষ, দেশ, আষাঢ় ১৩৭৬

মিসেস ব্রীষ্টোর থিয়েটার প্রভৃতির মাধ্যমে যে স্থূল প্রহসনের রঙ্গরসে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

কোন কোন সমালোচক লেবেদেফের নাট্যশালার সংগে উনিশ শতকীয় পরবর্তীকালের নাট্যশালার কোন ধারাবাহিক সম্পর্ককে স্বীকার করেননি। লেবেদেফের নাট্যশালায় বিজাতীয়তা ও ক্ষণস্থায়িত্বই এই অস্বীকৃতির কারণ। কিন্তু একথা ঠিক যে লেবেদেফের নাট্যশালায় যার সূত্রপাত—উনিশ শতকীয় নাট্যশালায় তারই পরিণতি। সমস্ত দেশেই নাটকের ইতিহাস ও নাট্যশালার ইতিহাস পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রকৃতপ্রস্তাবে উনিশ শতকীয় মধ্যভাগ বাংলা নাটকের প্রথম যুগ, বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও প্রথম যুগ। কিন্তু লেবেদেফের নাট্যশালাকে অস্বীকার করতে চাওয়া মানে অনৈতিহাসিকতার অপরাধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার নাটকে প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জনের জন্য যে যাত্রাগানের বিস্তৃতি তা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সুদূর প্রসারী। আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস শুধুমাত্র উনিশ শতকেই সীমাবদ্ধ নয়—কিংবা বিংশ শতকেই ব্যাপ্ত নয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপকরণ কিংবা প্রাণধর্ম আরও প্রাচীন। এই ভ্রমাত্মক দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্যেই লেবেদেফের ঘটনাটি হয়তো একটু অতি প্রাধান্য পেয়েছে। তথাপি লেবেদেফ অষ্টাদশ শতকের বাঙালী মানস-সমীক্ষার একটি অন্যতম উপাদান।

৩

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার প্রস্তুতি পর্বের নাট্যাভিনয়ের পর দীর্ঘকাল বাংলা নাটক ও মঞ্চাভিনয়ের উল্লেখযোগ্য তথ্যের পরিচয় মেলে না। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ও তাঁর হিন্দু থিয়েটার বিষয়ে যে বিবরণ মেলে, তা থেকে প্রধানতঃ ইংরেজি নাটকের আংশিক বা সম্পূর্ণ বিষয় অবহিত হওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর নিজ বাড়ীতে বাংলা নাটকের অভিনয় প্রচেষ্টাবিষয়ক তথ্যের পরিচয় মেলে। এই সময়ে পুরাতন যাত্রারই অনুবর্তন চলেছিল। বর্ধমান সম্মিলনীর সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা (.৩১৪—৬৪) গ্রন্থটিতে অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছিলেন: 'যাত্রা অভিনয় প্রসংগে দুটি শতাব্দীর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—১৬শ ও ১৯শ। যাত্রার

বীজপত্তন হয়েছিল ১৬শ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে। অঙ্কুর দেখা দিল ঊনবিংশ শতকে। গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মহাপ্রভুর অভিনয় লীলার সাক্ষ্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণনাই যে যাত্রাগানের প্রাথমিক রূপ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।' কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালীয়দমন যাত্রা জনপ্রিয় হওয়ায় এর অনুকরণে চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতির প্রচলন হয়। কৃষ্ণলীলাত্মক হয়ে কবিগানের প্রভাবে কৃষ্ণযাত্রায় রুচিবিকৃতি এসেছিল। কৃষ্ণভক্তি, অদৃষ্টবাদ কিংবা আদি বা করুণ রসের প্রবাহ যাত্রাভিনয়ে দীর্ঘদিন বাঙালীর রুচিকে পরিচালিত করেছিল। 'নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপা' এইপ্রকার যাত্রার প্রথম গৌরব সম্পাদন করেন শিশুরাম। তৎপরে শ্রীদাম, সুবল ও পরমানন্দ যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গোবিন্দ অধিকারী, কীর্তনের দলকে যাত্রায় পরিণত করেন—যাত্রার পাশাপাশি যে 'সখের যাত্রা'র আবির্ভাব ঘটে, তার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রচারিত হয়। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রসংগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন,—'নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে।'[৪]

উনিশ শতকের প্রথমভাগে পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম দাস, সুবল দাস অধিকারী যাত্রার আসরে রাগসংগীতেই শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতেন। আখড়াই গানের ক্ল্যাসিক রীতিকেই তারা গ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে যাত্রাদল গঠন করেন প্রচলিত যাত্রাদল থেকে তাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল—তিনি প্রথম স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগে বিভিন্ন সখের যাত্রাদলগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের সংগে থিয়েটারী ধরনের সংলাপ প্রযুক্ত হয়ে অভিনবত্ব আনল।

---

৪ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব—'একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছে। বাড়ির মেঝোবাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে শুনতে বসেছেন, মালিনী ও বিদ্যে 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ, করলে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান করে মুঠো মুঠো প্যালা পাচ্ছে, —বছর ষোল বয়সের দু'টো ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচছে। মজলিসে রূপোর গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি চলছে—বাড়ীর টিকটিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ভোঁ। যাত্রায় ক্রমে মিলনের যন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়ল।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা)

ভরতচন্দ্রের মৃত্যুর পর যে যুগসন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছিল—যথার্থ সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ সৃষ্টির অবকাশ ঐতিহাসিক কারণেই সে যুগে সম্ভব ছিল না। পাঁচালী, তরজা, হাফ আখড়াই, যাত্রাগানের যে প্লাবন দেখা দিল—যুগসঞ্চিত গ্লানির অপরিমিত আশ্রয় স্থল হয়ে উঠল তা। কিন্তু সমাজ জীবনে এই নিম্নগা রুচির প্লাবনে অচিরেই পাশ্চাত্য রুচি ও শিক্ষার সংস্পর্শ প্রবল সংঘাত ঘনিয়ে তুলল। ১৮৪৮ সালের ২৮শে জুন 'সংবাদপ্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত যাত্রাকে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোকের রুচির মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখে তীব্রকণ্ঠে তার নিন্দা করেছেন। তথাপি বাংলাদেশের 'যাত্রা' নামীয় স্বদেশের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যপুষ্ট জনপ্রিয় ধারাটির মূল্য কম নয়। জাতীয় ঐতিহ্য, সমাজ পরম্পরাগত রসরুচির বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কালপর্যায়ের অনুশীলনেই সহায়তা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে কৃষ্ণযাত্রা, চৈতন্য যাত্রা ও চণ্ডীযাত্রাকে কেন্দ্র করে যাত্রার যে রীতিবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তার মধ্যে সমাজরূপের আধিমানসিক বৈশিষ্ট্য উনিশ শতকের মধ্য ভাগে আধুনিক নাট্য-ধারায় সম্মিলিত হয়েছিল। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ভাবধারা নিয়ে গঠিত কৃষ্ণযাত্রা সুতীক্ষ্ণরূপে কাহিনীভিত্তিক নয়। তৎকালীন বাঙালী মানসের অন্যতম উপাদান গীতিরসপ্রিয়তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সরলরৈখিক রূপায়ণে কৃষ্ণযাত্রা বৈচিত্র্যহীন। ধর্মভাবের উপস্থাপনায় কৃষ্ণযাত্রার আত্যন্তিক প্রবণতা লক্ষিত হলেও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবর্তনজাত কিছু পরিবর্তন এই ধারায় লক্ষ্য করা যায়। পরমানন্দ অধিকারী প্রথানুগত বৈষ্ণব ভক্তিরসের পরিবর্তে নাট্য গুণ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যকেই এই পর্যায়ের যাত্রা ধারায় সঞ্চারিত করে দিলেন। উনিশ শতকের সুরুর দিকে 'সখের যাত্রাদলের' যে পরিচয় লাভ করি—তার মধ্যে লক্ষণীয়রূপেই নাটকীয় উপাদানের বিস্তার ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় এই যাত্রাভিনয় প্রসংগে মন্তব্য করেছিলেন—"বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।" তৎকালীন সমাজের বাঙালী 'বাবু' সম্প্রদায়ের দ্বারা এই যাত্রার ঐতিহ্য লালিত হয়েছিল। তৎকালীন এই শ্রেণীর 'বাঙালী' সমাজের প্রতিরূপের বিশেষত্ব প্রসংগে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন: 'মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙালী এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরেজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাজী ও গলাবাজিতে সুনিপুণ ও কার্যকলাপে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ'। বাংলা-

দেশের ষষ্ঠ ও শেষ রাজধানী কলকাতা। গৌড়-রাজমহল-নবদ্বীপ-ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের গৌরব অতিক্রম করে তবেই এ-কালের নতুন রাজধানী কলকাতায় আসা যায়। মোগলদের ভোগবিলাস ও ইংরেজদের বাহ্যাড়ম্বর বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরীণ রূপের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতোখানি প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল সমাজের বাবু সম্প্রদায়ের শ্রেণীরূপের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোগল পাঠান হদ্দ হওয়ার পরে বাবুদের অভ্যুদয়। নবাবের আমল অস্তমিত হল। হুতোমের ভাষায়—'বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল।' সমাজ শ্রেণীরূপের মধ্যে 'কঞ্চিতে বংশলোচনের' জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিল। তাই দেওয়ান গোমস্তা, দালাল, মুৎসুদ্দী, তালুকদার প্রভৃতি হঠাৎ লক্ষ্মীর আশীর্বাদে স্ফীত হলেন। এই শ্রেণীর নবধা বাবুর লক্ষণ নির্ধারিত হয়:

'ঘুড়ি ঘুড়ি জমদান
আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান।
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'

এই বাবুদের দ্বারা 'যাত্রা' পরিচালিত হত। উনিশ শতকে ভারতচন্দ্রোত্তর যুগে যাত্রার মূল্যমানের মধ্যে যে অবনতি আমরা লক্ষ্য করি—তার জন্যেই যাত্রা জনরুচির অনুমোদন হারিয়েছিল। বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় যাত্রার প্রতি আকর্ষণও হ্রাসপ্রাপ্ত হল। সখের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ মানুষের সার্বজনীন বিনোদনের প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ জনমনে সে নাট্যরসের চাহিদা ছিল। জনমনের সুলভ অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাত্রার প্রতি আকর্ষণ তথাপি সহজাত সংস্কারের মতোই লালিত হয়েছিল। কাজেই সমাজরূপের পরিপ্রেক্ষিতে জনমনের আনুকূল্যকে উপাদানরূপে গ্রহণ করে তার মধ্যেও সার্বজনীন প্রবেশাধিকারকে সম্ভবপর করে তোলার দিকে বাংলা নাট্য পরিচর্যার আদি-কালের একটি বিশিষ্ট রোঁক লক্ষিত হল। যুগগত প্রয়োজনের সংগে সম্পৃক্ত হয়েই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বিত অভিনব সংগীত-সংগতে সমৃদ্ধ 'গীতা-ভিনয়ের' বিশিষ্ট শ্রেণীটির উদ্ভব। নাট্য চেতনায় তাই এই গীতাভিনয়ের পশ্চাতেও বাঙালীর সমাজমনের সজ্ঞান মিশ্র সাধনার বৈশিষ্ট্য দ্যোতিত এবং বাঙালীর রস সংস্কারের পর্যালোচনায় এর যুগগত মূল্যও আছে। যুগের এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গোল্লেখ করেই জনৈক সমালোচক এ প্রসংগে বলেছেন,

'রসের দিক দিয়া গীতাভিনয়ে প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসংগে গৃহীত হইয়াছে।' বাস্তবঘনিষ্ঠ জীবন পরিধির সংগে সংযোগে গীতাভিনয়েরও সুস্পষ্ট বিবর্তনজাত একটি রূপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। য়ুরোপীয় নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য আর স্বদেশীয় গীতিধর্মের সংমিশ্রিত রূপ এই গীতাভিনয় পরবর্তীকালে মনোমোহন বসুর মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকে সচেতনভাবে ভক্তিরস অনুসৃত হলেও য়ুরোপীয় নাটকের চেয়ে যাত্রার প্যাটার্ণই বড় হয়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির দ্বারা এই গীতাভিনয়ের সম্প্রসারিত রূপ দান করে-ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ প্রসংগের বিস্তৃত আলোচনা করবো। প্রাগাধুনিক যুগের বাঙালীর নাট্যরসপিপাসু মন আপন অন্তরের প্রবণতা অনুসারে রস আহরণ করেছে এই যাত্রা থেকেই। পাশ্চাত্য থিয়েটারের প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা নাটক জনমন ও সমাজমনের আনুকূল্যেই অনিবার্গ রস-পরিণতি লাভ করেছিল। এ-বিষয়ে ১৯২৩ সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, 'Yatras, rope-dancing, jugglery, artistic dancing with high class music, in the midst of gay splendour and rich luxuriance formed a bumper programme to the Indians and Europeans alike. A fusion of idcas and thoughts was thus possible and the subsequent Europeanisation of Bengali Drama became a settled fact. The change from Yatras to theatre was by no means sudden and abrupt.'

উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে য়ুরোপীয় রীতির নাট্যাভিনয় যখন সমাজে সূচিত হল—শিক্ষিত রুচিতে সংগীতবহুল যাত্রাভিনয়ের প্রতি অনীহা তখন সমাজ ও নাগরিক রসরুচির লক্ষণীয় পরিবর্তনকেই প্রমাণিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলাকেন্দ্রিক পৌরাণিক বিষয়ই গীতাভিনয়ের প্রতিপাদ্য ছিল। বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অভিনবত্ব সংগীতের ক্ষেত্রে সংগতকেও ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ করে তুলেছিল গীতাভিনয়ে। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় যাত্রার প্রতি আকর্ষণও হ্রাস পেয়েছিল। নাট্যচেতনায় এই গীতাভিনয় জনমনের আনুকূল্যকে উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিল এবং তার মধ্যে সার্বজনীন প্রবেশা-ধিকারের সমাজাভিপ্রায়ও লক্ষিত হয়েছিল। নাট্যচেতনার সমাজ-সমীক্ষায়

এই গীতাভিনয় এক সজ্ঞান মিশ্রসাধনার সৃষ্টি করেছিল। এ-বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীনযাত্রার ভক্তি, নূতন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসংগে গৃহীত হইয়াছে।" বাঙালীর সামাজিক অধিমানস এবং রসসংস্কারের পর্যালোচনায় গীতাভিনয়ের এই প্রাথমিক ধারারও যুগগত বিশেষ মূল্য আছে। পরবর্তীকালে বাস্তবঘনিষ্ঠ সমাজ ও জীবন পরিধির সংগে সংযোগে গীতাভিনয়েরও সুস্পষ্ট বিবর্তনজাত একটি রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। এ-বিষয়ে পরে আলোচ্য।

৪
ইংরেজি নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের প্রতি আনুগত্য

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে প্রাচীন যাত্রাপদ্ধতির মধ্যে নবযুগের চাহিদা ও সচেতনতা একত্রিত হল। এই মিশ্রমানসিকতা যাত্রার মধ্যেও অভিনবত্ব এনেছিল এবং এর মূলে সক্রিয় ছিল জনসাধারণের আন্তর-ধর্মে 'সাহিত্য-সামাজিকগণের চাহিদা।' অনেক সমালোচক তাই অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বের যাত্রাগানকে 'প্রাচীন যাত্রারীতির অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে স্বীকার করেন না। অষ্টাদশ শতকেই মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় ব্যবস্থায় ইংরেজি রঙ্গালয় ও ইংরেজি নাটকের প্রতি একটা আনুগত্যের ভাব লক্ষিত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে আদর্শ ছিল—'নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়দের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক।' এ ক্ষেত্রে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির প্রয়াস লক্ষণীয়। ১৭৫৬ সালের ১৬ই জুন সিরাজদ্দৌলার বাহিনী' কলকাতার চীৎপুর অঞ্চল আক্রমণ করে প্রথম রঙ্গালয় গৃহ Old Play House অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজাধিকারের পর সেই যুগের প্রথম নাট্যশালার পাদপ্রদীপের আলো নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে ভগ্নবিধ্বস্ত এই রঙ্গালয়টি প্রসংগেই ইংরেজ কোম্পানী ডাইরেক্টররা মন্তব্য করেছিলেন, 'We are told that the Building formerly made use of a Theatre may with a little expense be converted into a Church,' প্রথম রঙ্গালয় বিলুপ্তির পর প্রায় দীর্ঘ বিশ বছর কলকাতা রঙ্গমঞ্চ শূন্য। জর্জ উইলিয়ামসন্ নামীয় একজন নিলামাধ্যক্ষ ১৭৭৫ সালে The New Play House বা Calcutta Theatre নামক দ্বিতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন; দৃশ্যপট-পোশাক

পরিচ্ছদ কিংবা মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে ক্যালকাটা থিয়েটারের পরিচালকবর্গ প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে কিংবা অন্য কারণে ক্যালকাটা থিয়েটারে হাল্‌কা প্রহসনের অভিনয়ই বেশী হত।[৫] প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর সাঁসুচি থিয়েটারের ইংরেজি নাটকাভিনয় দেখে উৎসাহিত হয়ে বাঙালীর থিয়েটার 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপন করলেন। এখানে শেক্‌সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের কিয়দংশ, উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' এবং 'Nothing Superfluous' নামক প্রহসন অভিনীত হয়েছিল। প্রসন্নকুমারের প্রযাসে স্থাপিত হিন্দু থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরেও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি নাট্যাভিনযের প্রবণতা লক্ষিত হল এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় মেলে। ডেভিড হেযার একাডেমির ছাত্রগণ অভিনীত 'মাচেণ্ট অব্‌ ভেনিস', ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর থিয়েটারে 'ওথেলো', 'চতুর্থ হেনরী, পার্কারের 'আমাটোর' এবং প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার 'জুলিয়াস সিজার যথেষ্ট সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়েছিল। বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করে অজস্র সাধুবাদ পেযেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (২১শে আগষ্ট, ১৮৪৮) তাঁর অভিনয সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "এতদ্দেশীয় নর্তকবাবু বৈষ্ণবচাদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গী ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দিক হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও সাহসও বদ্ধমূল হইযাছে।" তাঁর আশাতীত সার্থক অভিনয়ের সপ্রশংস অনুমোদন জানিযে 'বেঙ্গল হরকরা' (১৯শে আগষ্ট ১৮৪৮) পত্রিকাও অনুকূল মন্তব্য করেছিল। বলা হয়েছিল: 'All expectations were, of course, centred in the young aspirant for dramatic fame, who has gallantly flung down the gauntlet to the rest of the members of the native community.'

৫ "Theatrical talents must have been at a very low ebb indeed, when such a bill of fare as the following was the best that could be given in the way of amusement at Calcutta Theatre :—'On wednesday next, 1795, will be performed the farce of Neck or Nothing, and the musical entertainment of the Waterman ; with a view of Westministef Bridge and a representation of the Rowing match……' (The Good Old Days of the John Company)

দ্বিতীয় পর্ব ঃ প্রথম অধ্যায়

বাংলা সামাজিক নাটকের প্রাণ-সন্ধান কাল (১৮৫০—১৮৫৬)

প্রকৃত বাংলা নাটক সৃষ্টির পূর্বে নাট্যপ্রস্তুতিরও একটি কাল ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উনিশ শতকের বিভিন্ন চিন্তানায়ক মনীষীবৃন্দের মননের আলোকে একটি সামগ্রিক আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্যষ্টিভাব জাগরণ পর্ব সৃষ্টি করেছিল। জনমনোরঞ্জনের নগদবিদায় পর্ব শেষ হয়ে ধীরে ধীরে নাটকের ভরাপালেও উনিশ শতকের হাওয়া লাগল — ভক্তি, করুণা, আবেগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একজাতীয় নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে। উপরি-উক্ত কালপর্যায়ের (১৮৫০—৫৬) মধ্যে রচিত বাংলা নাটকের ধারায় বাঙালীর যে বিশিষ্ট মানসিকতা ও সামাজিক চেতনার স্বরূপবৈচিত্র্য ধরা পড়েছে তা কৌতূহলজনক। জনরুচিই এই নাটকগুলির মূলধন হয়েছিল বলে এই যুগের বাংলা নাটকে স্থায়ী কোন শিল্পাদর্শের পরিচয় মেলেনি। তাছাড়া এই নাট্যোপভোগের যাঁরা ছিলেন সামাজিক— তাঁদের মানসিক পরিমণ্ডল উচ্চতর শিল্পকলার গভীরতর সৌন্দর্যগত মূল্যের প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিল। কিন্তু শিল্পমূল্যের বিচারে ব্যর্থ হলেও এই নাটক-গুলির অন্তর্নিহিত সামাজিক মূল্য বাঙালীর মনপ্রকৃতি বিচারের একটি বিশিষ্ট মাধ্যম। উল্লিখিত কালসীমার বাংলা নাটকের সমসাময়িক ত্রিধারার নাট্য-প্রয়াস লক্ষিত হয়—(১) ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদধারা, (২) নাটকে পৌরাণিক অনুকৃতি ও (৩) সমসাময়িক সমস্যাকে অবলম্বন করে প্রহসন। এই ত্রিধারার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সামাজিক নাটকের প্রাণ-সন্ধান-কাল ব্যাখ্যাত হতে পারে। নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন ও তার মধ্য দিয়ে বাঙালীর নব্যসমাজ গঠনের প্রয়াস কিভাবে দানা বাঁধছিল এ-যুগের প্রহসন নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক ধারাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলার সমাজজীবনের নানা উপাদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণমূলক পরিচয় আমরা যথাস্থানে উপস্থাপিত করবো। এবারে এই ত্রয়ী নাট্যধারার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২

নাটকের আভাস-যুগ ও ইংরেজী নাট্যানুবাদ

প্রাক্-মধুসূদন পর্বে 'নাটকের আভাস' যুগের নাট্যকারদের অনুবাদের প্রয়াসকে বাংলা নাটকের অভ্যুদয়রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনয় পিপাসা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছিল। ইংরেজি নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্র, তারাচরণ ও হরচন্দ্র ঘোষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৫১ সালে রচিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'কীর্তিবিলাস নাটকের নাট্যচিন্তায় অ্যারিষ্টটল, সেনেকা ও শেকসপীয়রের উল্লেখ করে বাংলা নাটককে গতানুগতিকতার গণ্ডিমুক্ত করে নাট্যবিষয়ক ধারণাকে উন্মুক্ত করতে চাইল। সংস্কৃত নাট্যানুগ সুখান্তক রীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিষয়ে অর্থাৎ 'ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময় তাকে যে 'দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই' এইরূপ ধারণাকে তিনি ভ্রান্তিমাত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ দেশীয় নাটকে যথার্থ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি না হবার পশ্চাতে মনোজীবনের যে ভূমিকা এবং সমাজজীবনের যা তাৎপর্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র সমালোচনা মূলক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তারও মর্মে দ্ঘাটন করেছেন—"উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরা বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সর্বদাই অভিলাষী।"

'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকে তারাচরণ শিকদার 'বিজ্ঞাপন' অংশে প্রচলিত নাট্যরীতির যে সমালোচনা করেছিলেন, বাংলা নাটকের বিকাশোপলব্ধির ক্ষেত্রে এবং যুগ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

(১) 'আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলব রঙ্গমঞ্চে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাহ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামী করিয়া থাকে।

(২) 'এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে। ...সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই।

তারাচরণ সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক-উপকরণকে সচেতনভাবেই অগ্রাহ্য

করেছেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক বিভাজন রীতিকেই 'ইঙ্গরাজী' ভাষায় 'এক্ট' বলতে চেয়েছেন এবং 'সিন' শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তুলনাক্রমে য়ুরোপীয় নাট্যকলায় প্রদর্শিত 'সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি' বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেছেন। নাট্যকারের এই জাতীয় সচেতন চিন্তাশীলতা এই পর্বের বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রবণতাকে সূচিত করে। বাংলা নাটকের আঙ্গিক সমুন্নতির সংগে নাট্যাচরণের লক্ষণীয় বৈচিত্র্য প্রণিধানযোগ্য।

১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। নাট্যকার সুস্পষ্টতই এবং সচেতনভাবে শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' আনুপূর্বিক অনুবাদ করতে চেয়েছেন। এর পেছনে কোন্ চেতনা প্রচ্ছন্ন ছিল? তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,—'এতদ্দেশীয় বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ' এবং 'কাব্যের আখ্যানের মর্মমাত্র—গ্রহণপূর্বক তদনুরূপ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করতে চেয়েছেন। হরচন্দ্র তাঁর 'কৌরববিয়োগ' নাটকে মহাভারতীয় বৃত্তান্তকে 'গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য ছন্দে' নাটকীয় প্রণালীতে বিন্যস্ত করেছেন। 'এতদ্দেশীয় সকল সার্বভৌমীয় গদ্য-পদ্য প্রবন্ধে রচিত তাঁর আর একখানি নাটক 'চারুমুখচিত্তহরা'য় 'কথিতকোমল সরল বাক্যে রচনা করিয়া সর্বসাধারণের কৌতূহলাস্পদ এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী' করা হয়েছে। 'রজতগিরিনন্দিনী নাটক' নামীয় অপর একখানা নাটকে নাট্যপারিপাট্যের প্রতি সর্বসাধারণের আগ্রহ জন্মানো এবং সাধারণ নাট্যশালার প্রসারের সংগে সংগে নাট্যসৌন্দর্যকে 'অন্তঃপট' থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলা নাটককে তিনি 'অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য' করে তুলে নাট্যচেতনাকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।

৩

নাটকে সংস্কৃত অনুবাদ ও পৌরাণিক অনুসৃতির ধারা

ইংরেজী-নাট্যানুবাদ প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল বিশিষ্ট বিদগ্ধ পরিমণ্ডলীর মধ্যে। স্বদেশীয় রীতি ও প্রকৃতির সংগে সম্পূর্ণত সম্পৃক্ত হতে না পারলে বিজাতীয় শিল্প সর্বৈবরূপে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। স্বদেশীয় প্রবণতার উৎসমুখে তাকে প্রত্যাবর্তন করতেই হয়। এও একটি বিশিষ্ট সামাজিক সূত্র। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজী নাটকাভিনয়ের সংগে সংগে

দেশীয় ভাষায় অভিনয়েরও একটি সংলক্ষ্য ভূমিকার প্রয়াস চলছিল। ১৮৩৩ সালে স্থাপিত নবীনচন্দ্র বসুর বাটীর নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচবার বাংলা নাটক অভিনীত হত। এ ছাড়াও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ 'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী (১৮২২), 'হাস্যার্ণব' (১৮২২), 'কৌতুকসর্বস্ব' (১৮৩৮), 'রত্নাবলী' (১৮৪৮) প্রভৃতি নাটকেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যগুণের পরিচয় না মিললেও তা বাঙালী নাট্যরস পিপাসুদের ইংরেজি নাটকাভিনয়ের মোহমুক্তির স্মারক। 'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে স্বদেশীয় সংস্কৃত নাট্যানুবাদের যে প্রবণতা লক্ষিত হয়েছিল তা জাতির সমস্ত সংস্কার নিয়ে গঠিত বৃহত্তর মনোভূমিতে আবেদন পৌঁছে দিতে পেরেছিল বলেই তা প্রাণস্পর্শী হতে পেরেছিল।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে আমাদের মানসজগৎ বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা, দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক জীবনচর্চা, রাজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর মানস-আকাশে যে বিপুল ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃতি দেখা দিয়েছিল—তার মধ্য দিয়ে প্রাচীন সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবোধ দেখা দিল। এই সময়কার বাংলা নাট্য-প্রয়াসের মধ্যেও এই পৌরাণিক অনুস্মৃতি ও জীবনাদর্শের একটি সুনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চব্যবস্থা বা অভিনয়রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতির আনুগত্য দেখা গেলেও নাট্য নির্বাচনের প্রবণতা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও পুরাণাশ্রয়ী নাটকাভিনয়ের দিকেই সম্প্রসারিত। নাট্যকলার এই আনুগত্যকে ও সমাজাভিপ্রায়কে উদ্দেশ্য করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্র মন্তব্য করেছিলেন: "কালগতিকে এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরাজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা কোন নাটকের প্রতি নাই··· ইয়ংবেঙ্গল বাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের বাঙ্গালীর কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রসঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজিতেই আছে··· বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার রসমাধুর্য আস্বাদে আশ্চর্য হইবেন।" ১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে নাট্য-আঙ্গিক ও ভাবচেতনার

ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের অনুবর্তনে এবং স্বদেশী ভাষা ও নাট্যকলার প্রতি যে প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল—তার মধ্যে নন্দকুমার রায়ের অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বাঙালী নাট্যরসিকদের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'শীতবসন্ত' ও 'বিজয়বসন্ত' নামক আখ্যানে য়ুরোপীয় রীতির ট্র্যাজেডি রচনায় নিরত হলেও সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণ করেছেন। 'ভদ্রার্জুন' নাট্যরচনায় তারাচরণ শিকদার পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ বোধচেতনা জাগ্রত হয়। রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক জনচিত্তকে অধিকার করেছিল। রামনারায়ণ তাঁর অনূদিত সংস্কৃত নাট্যগুলির অভিনেতব্য রূপ দিতে গিয়ে ভাষার মৌলিক রূপ ও চরিত্রচিত্রণে যে লক্ষণীয় পরিবর্তনকে সংসাধিত করেছেন তার মধ্যে সমসাময়িক বাঙালীর সমাজাভিপ্রায়, রুচি ও অভিজ্ঞতার অন্তরূপ্য ছিল। কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতীমাধব', 'সাবিত্রীসত্যবান' প্রভৃতি নাট্যানুবাদের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দিয়ে ক্ল্যাসিকপন্থী মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'বিক্রমোর্বশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হওয়ার পর 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা (৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) যে মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্যেও বাঙালী সমাজের পৌরাণিক অনুস্মৃতির ভাষ্যপাঠ করা চলে—"এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীডার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণ গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি।" এই পৌরাণিক অনুস্মৃতি জনমনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এমনভাবে লালিত হয়েছে যে, বাঙালী জাতির অন্তর্নিহিত নাট্যচাহিদার দ্বারা এগুলি প্রত্যক্ষত প্রভাবিত।[1] নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেই জনগণের সংযোগ সবচেয়ে বেশী। উনিশ শতকের এই সময়কালের মধ্যে বাংলা নাটকের যে দর্শকসমাজ—তাঁদের মনের সকল রসের মধ্যে সর্বাতিশায়ী আধিপত্য ছিল ধর্মরসের। তাই পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রেও এই ধর্মরসের প্রভাব অমোঘ ছিল।

---

১ "যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু, তাহার নৃত্যগীত প্রাধান্য, তাহার চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং স্থূলতা, থাকিয়া থাকিয়া পাগল-পাগলিনী, বিবেক, নিয়তি প্রভৃতির আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব……ইহার সকলের সহিতই নাট্যপিপাসু বৃহত্তর জনমনের একটা নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে।" —বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক বিচিত্র কোলাহল (১৮৫০—১৮৫৬)

বৃটিশ বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মৌলিক রূপান্তরের সংগে সংগেই সমাজের বিভিন্ন কর্ষক, ধারক ও শ্রেণীরূপেব মধ্যে 'নবসংস্কৃতির পত্তন ঘটেছিল। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক রূপকে ব্যবহারিক রাজনীতি-বিজ্ঞানের পবিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর ধ্বংসশীল রূপ এবং গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতার প্রতিক্রিযাশীল দিকটি আবিষ্কৃত হয। আবার অপর দিকে বৈশ্যতন্ত্রের বাণিজ্যিক স্বার্থানুকূল্যে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিমূল রচিত হয়েছিল। প্রাক্-বৃটিশ যুগের সামগ্রিক সমাজসংস্থায় ব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ এবং পরিবার-অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারম্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিযে সমাজের সুনির্দিষ্ট বিধান নিয়ন্ত্রিত হত। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদের সামাজিক বিধিবিধানের সংগে সংগতি স্থাপন করে ব্যক্তির মানসপরিমণ্ডল গড়ে উঠত। আবার গোষ্ঠী সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্থনৈতিক জীবনকে অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল। এই নিরাপত্তাহীনতার কারণেই পরিবেশকে জয় করবার সংগ্রামের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা গেছে। কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাহীন এবং গতিশীল সৃষ্টিধর্মী গুণবর্জিত তৎকালীন সমাজরূপের প্রাথমিক পর্যায়ে পরাভবচেতনা এবং আত্মগ্লানিতে অপহত চেতনার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিচ্ছিন্ন, শক্তিহীন, ধ্বংসমুখীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-প্রতিরূপের মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সুরক্ষিত সংহতিও ছিল না। কাজেই এ-যুগের সামাজিক পরিবেষ্টনীতে সমাজে দুর্নীতি ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই কুসংস্কার বা সামাজিক ব্যভিচার-গুলি হল কতকগুলি মৃত প্রত্যয়। এগুলি জাতি-গোষ্ঠী-ব্যক্তিগত বা চিন্তাগত হযে আচরণে ও অভ্যাসে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য প্রভাবাগত বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রিক শাসন কিংবা ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে গতিশক্তি-বিশ্লিষ্ট স্বৈরতন্ত্র আমাদের সনাতন পারিবারিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি করেছে তা থেকে অনিবার্যভাবে কতকগুলি সামাজিক আন্দোলন জন্ম নিয়েছে।

আবার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন এসেছে—বাঙালীর সংগে তার আত্মিক যোগাযোগও কমই লক্ষ্য করা গেছে। এ-যুগে সমাজই ছিল মর্মস্থান—রাষ্ট্রীয়সাধনা তখনও আসেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেখানেই দেশের মর্মস্থান সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্য য়ুরোপে পলিটিক্স এতো গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য এতোকাল আমরা রাষ্ট্রীয় সাধনার জন্য প্রাণপণ করি নাই—কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।'

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই সামাজিক শ্রেণীরূপের সচলতা বাড়তে থাকে। রামমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধনিক অভিজাত গোষ্ঠীর সামাজিক সচলতা অপেক্ষা পরবর্তী ডিরোজীয়ানদের সচলতা অনেক বেশী ছিল। উপার্জিত ধনের সংগে বিদ্যাবত্তাও সামাজিক মর্যাদার নবতর মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজচিন্তাও এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছিল। অক্ষয় দত্ত ব্রাহ্মসমাজকে 'বেদশৃঙ্খল' থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বা অপৌরুষেয়তার সমাপ্তি ঘোষিত হল। অক্ষয়কুমার দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,—'বেকন, বেকন ভারতবর্ষে একটি বেকনের প্রয়োজন হইয়াছিল।' বেকন সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে Idols অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। এই জাতীয় ভ্রান্ত প্রত্যয়গুলি থেকে সামাজিকগণের মুক্তি অবশ্যই কাম্য। নবযুগের বিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যার মাধ্যমে এই সামাজিক কুপ্রথাগুলির উৎসাদনের প্রয়াস লক্ষিত হল। বাংলার সমাজের দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তার অন্ত ঘটিয়ে 'ইয়ংবেঙ্গল' সমাজ কিভাবে তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছিলেন তার কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পাশাপাশি তখন আরও কয়েকটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ছিল। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বা শক্তিভেদে পার্থক্য নিঃসন্দেহে ছিল এবং সেই পার্থক্যের মধ্যেই গোষ্ঠীগত শ্রেণীরূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর ব্যাপকতার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি বিশ্লেষিত হতে পারে—(১) বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক সামাজিক

৫

গোষ্ঠীর শক্তি হ্রাস। (২) বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংকীর্ণতার ভাঙন (৩) বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন (৪) অন্তর্মুখী গঠনের দিক দিয়ে বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর পরিবর্তন। বাংলাদেশের সমাজে এই বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠীর আধুনিক রীতি অনুযায়ী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। ইয়ংবেঙ্গল গ্রুপের সামাজিক নির্বাচন পদ্ধতির মানদণ্ড ছিল অর্থনৈতিক মানদণ্ড। বিত্তের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক কাঠামোর যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—তার সংগে মিশ্রিত হয়েছিল শিক্ষাগত বিশেষ সামাজিক মানদণ্ড।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে রামমোহন-অনুসারী-গোষ্ঠীর মধ্যে আবার কতগুলি উপ-এলিট গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সামাজিক প্রাণপ্রতিষ্ঠার মানদণ্ডে বিত্ত ও বুদ্ধিকৌলীন্য যে কতোখানি প্রেরণার উৎস—য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের বিশ্লেষণ তা স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে। আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমাজজীবনের ভিত গঠন করেছিলেন জমিদার শ্রেণী। নব্য ধনতন্ত্রের এই সামাজিক আদর্শ রামমোহনের মৃত্যুর পরেই অবসিত হয়েছিল। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্যেও যুক্তিসিদ্ধ একটা পদ্ধতি আছে। এর পূর্বে আমাদের সামাজিকদের মধ্যে সেই প্রগতিদর্শনবিষয়ক স্পষ্ট ও বিশ্লেষণাত্মক কোন ধারণা অনুপস্থিত ছিল। প্রসংগত য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের বিচার-করলে দেখা যায় যে, সেখানেও মানবমন আধ্যাত্মিকতার দৈবীবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র হয়নি। প্রাচীন ক্লাসিক্যাল যুগের অচল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত দৈবীবৃত্ত সেখানে মানসিক স্থবিরতারই পরিচয়বহ। বিজ্ঞানের সংগে মানুষের জ্ঞানান্বেষণের পন্থাকে মিলিত করবার সাধনাই করেছিলেন এই সকল এনসাইক্লোপিডিষ্টেরা। আমাদের দেশে রামমোহন এবং তাঁর অনুসারী গোষ্ঠী মধ্যযুগীয় চিন্তার জড়ত্ব ত্যাগে প্রচারমুখী ও আধুনিকতার ধারক। সমাজতত্ত্বকে বলিষ্ঠ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করে সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলন প্রচারের মধ্য দিয়ে ইহমুখীন মানবতন্ত্রের নব ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। নব-সংস্কৃতি বিধায়কেরা সকলেই সে যুগের অচল সামাজিক আচরণগুলির বিরুদ্ধতা করেছিলেন। দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে তখন রাষ্ট্রীয় বোধশক্তির সংকীর্ণতা ছিল—এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এই উপলব্ধি নিশ্চিতভাবেই তাদের হয়েছিল যে, ইংরেজ-আচরিত

বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতিই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হবে। এই ব্যবহারিক জ্ঞান একদিকে যেমন ভূস্বামী ও বণিক শ্রেণীকে ইংরেজদের কাছে টেনেছে—তেমনি আর এক দিকে দেশীয় জনসাধারণের কাছ থেকে তারা দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। খেতাবমোহ, পূজাপার্বন কিংবা খানাপিনায এই সম্প্রদাযের মধ্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। এইসব অনুকরণ প্রয়াসীরা ইংরেজদের আদর্শকেই সম্মুখবর্তী করে রেখেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা গিযাছিল। তাহারা পারসী ও অল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনধর্মে আস্থাবিহীন হইযা ভোগসুখেই দিন কাটাইত।' এই শ্রেণীরূপ থেকেই সামাজিক ব্যভিচার কিরূপে সৃষ্টি হযেছিল—তার আলোচনা আমরা পরে করবো। ইংরেজদের সামাজিক আচরণ অনুকরণেব মধ্য দিয়ে তাঁরা পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক ক্রিযা প্রকরণকে অস্বীকার করে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাচরণের পরিচয দিতে পাবেননি। এই নেতিধর্মী জীবনাচরণ ব্যক্তিক জীবনে নিদারুণ বিপর্যয ও সামাজিক প্রতিক্রিযার সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধিজীবী চিন্তানায়কেরা পুরাতন সমাজেব অস্বীকৃত ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহকরূপে গ্রহণ করেছেন। বামমোহন রাযের বুদ্ধিগত বিদ্রোহ থেকে সুরু কবে আলোচ্য পবে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই বুদ্ধিগত বিদ্রোহের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার পরিচয মেলে।

সামাজিক জীবনাচরণ ও শিক্ষাব্যবস্থা

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা দেখা দিলে এ দেশে প্রাচ্য কি প্রতীচ্য কোন্ ধারার শিক্ষা উপযোগী তা নিযে দ্বন্দ্ব দেখা দিযেছিল।[২] ১৮১৩ সালের পর বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ শিক্ষাখাতের জন্য যে ব্যয কবেন, ১৮৩৫ সালের পর থেকেই

২ "ভারতীয় জনসাধাবণের বৃহত্তব জীবনের সহিত অথবা সামগ্রিকভাবে ভাবতীয সামাজিক ও জীবনাচরণের স্বাভাবিক ধারার সহিত, এই ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ও সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ...... ইহার ফলে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত জাতিভেদ দেখা দেয়।" বঙ্কিম মানস: আরবিন্দ পোদ্দার পৃ: ২৯

শুধুমাত্র য়ুরোপীয় শিক্ষার জন্যেই ব্যয়িত হবে—এরূপ নির্ধারিত হল। ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষাপন্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সৃষ্ট হল এবং হিন্দুকলেজের যুবসম্প্রদায় মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টম্সনকে সংগে নিয়ে ভারতে আসেন এবং তাঁর নেতৃত্বে নব্য বঙ্গীয় যুবসমাজের চিত্তমুক্তির বিষয়টিও স্মরণীয়।

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলাদেশের সমাজসংস্কার আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। রামমোহনের সহ-মরণ নিবারণ আন্দোলনের পরে এটি আর একটি বিশিষ্ট আন্দোলন। ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজের একটি সভায় স্ত্রী শিক্ষার অধিবক্তা বেথুনের নামে প্রতিষ্ঠিত হল 'বেথুন সোসাইটি'। হিন্দুকলেজের ছাত্রসম্প্রদায়, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং বিদ্যাসাগর এই বালিকা বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই আন্তরিক আনুকূল্য দান করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে সরকার বিদ্যালয়টির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ সালে শিক্ষা-অধিকর্তার বার্ষিক বিবরণীতে বিদ্যালয়টি প্রসংগে আলোচিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র আয়োজনে রত হন এবং বামাবোধিনী সভার মাধ্যমে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করে স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে প্রয়াসী হন। বামাবোধিনী পত্রিকার উৎকৃষ্ট রচনাগুলি উমেশচন্দ্র কর্তৃক সংকলিত হয়ে খণ্ড খণ্ড আকারে 'বামাবচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয় এবং স্ত্রীলোকদের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়—'আমাদিগের পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি বক্তব্য যে, লেখিকাদের অধিকাংশ আমাদের পরিচিত, অবশিষ্ট সকলের লেখা বিশ্বাসযোগ্য যথোচিত প্রমাণ ভিন্ন গৃহীত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত ও কোন কোন 'কামিনীর কবিতা টিপ্পনীসহ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'কোন কোন কামিনীর কবিতা' প্রকাশের পর দশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত শিক্ষা-অধিকর্তার বার্ষিক বিবরণীতেও তাঁদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চার ব্যক্তিক প্রয়োজনকে ব্যাপকতর এবং যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়াস লক্ষিত হয়। সমাজ রূপের মধ্যে একদিকে নারীজাতির প্রতি অনাচার অবিচারের দিক যেমন লক্ষিত হয়—অন্যদিকে তেমনি নারীজাতির পক্ষে প্রগতিশীল ভাবনাও

ঘোষিত হতে লাগল।[৩] ১৮৫৪ সালে বাংলার ছোটলাট এফ. জে. হ্যালিডে বাংলায় শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী হলে বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করেন এবং ১৮৫৭ সালের সুরুতে হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উদ্যোগী হলে বিদ্যাসাগর তাঁর পরামর্শদাতা নিযুক্ত হয়ে 'মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠাকে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোগ করেছিলেন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের নানাজাতীয় অন্যায়-অবিচার-ব্যভিচার ও কুসংস্কারগুলি বাংলার সমাজজীবনে মাতৃমূর্তির মালিন্যের মধ্য দিয়েই প্রকট হযে উঠেছিল। 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক কুপ্রথার উৎসাদন ও অগ্রগতির আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। স্ত্রী শিক্ষা শুধুমাত্র সাময়িক পত্রের বাদানুবাদের উপাদান বা সামগ্রীমাত্র ছিল না। সংরক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী রাধাকান্ত দেব পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে যে মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখিত হযেছে—'সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে না পাঠাইযা গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের শিখানই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবন

এই সময়কার সামাজিক আচরণের মধ্যের নানা অন্তর্বিরোধ রাজনৈতিক জীবনাচরণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বুদ্ধিগত ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের আদর্শবহরূপে ইংরেজদের আচার-আচরণ আনুগত্য ও অনুমোদনের সংগেই স্বীকৃত হযেছিল। কেরী, মার্সম্যান, ডেভিড হেয়ারের নিঃস্বার্থপরতা, ডিরোজিও-রিচার্ডসনের শিক্ষা এবং বেন্টিঙ্কের সংস্কারের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ শুভানুমোদিত একটি দিকই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বৃটিশ বণিকতন্ত্রের আঘাতে ভারতবর্ষীয় শিল্পবাণিজ্য বিধ্বস্ত হওযায় এবং ভারতবর্ষ কাঁচামাল সরবরাহের[৪] বিশিষ্ট উপনিবেশে পরিবর্তিত হওযাতে নবশিক্ষিত নবসমাজে

৩ পরবর্তীকালে ১৮৬৯ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবলাবান্ধব' কিংবা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৬৮) নারী জাতির দুরবস্থা এবং উন্নতি কল্পে আলোচনা করেছেন। 'বীরনারী' নাটকের মধ্য দিয়েও তিনি সমাজে নারীর স্বাভাবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছিলেন।

৪ নিখিল ভারতীয় নীতিতে ইংরেজের যোগান ও চাহিদার সংগে সর্বভারতীয় ব্যবসায় ও

কিংবা নতুন ভূস্বামীদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগের পরিবর্তে কোম্পানীর অধীনে চাকুরীতেই অধিকতর প্রবণতা দেখা গেল। এ দিক দিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতার সংগে বৃটিশ বৈশ্যতন্ত্রের ঐক্যসূত্রই পক্ষান্তরে দৃঢ় হয়েছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের উচ্চ সরকারী পদ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিতকরণের নীতি পরবর্তীকালে ১৮৩৩-এর সনদে দূরীভূত হয়েছিল। ১৮৪৩ সাল থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে ভারতীয় নিয়োগ এবং উচ্চপদে নিয়োগ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হয়। এ জাতীয় নিয়োগের পশ্চাতেও ব্যয় সংকোচমূলক অর্থনৈতিক চেতনার নীতি কার্যকর ছিল। তথাপি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে অনুরক্তির বিস্তারে স্বদেশীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতন বিষয়েও শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা দেখা দিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হল। কিন্তু স্বদেশে শিল্প বিপ্লব ও স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রসারের যুগে (laissez faire) এ দেশ থেকে কাঁচা মাল রপ্তানী-করণে অগ্রণী হয়ে এলো ইংলণ্ড থেকে নব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। এ দেশীয় লোকের ক্রয় ক্ষমতা ও মালের চাহিদার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকরণে ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ শক্তিকে সক্রিয় রাখার জন্যেই ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়েছিল বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স (১৮৩৪); ইংরেজ অর্থনীতির বনিয়াদ এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

১৮৩৩ সালের নতুন চার্টার অ্যাক্টে সুদূর প্রসারী কয়েকটি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কোম্পানীকে ইংলণ্ডরাজের পক্ষে শাসন-পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং নীতিগতভাবে সমগ্র ভারতের প্রভুত্ব স্বীকৃত হল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক চরিত্ররূপের সংগে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের

শিল্পরূপ মিশ্রিত হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এ-দেশ থেকে যথাসাধ্য কাঁচামাল রপ্তানী, সম্ভব হলে এ-দেশ থেকে শিল্পদ্রব্য একেবারে না পাঠানো এবং ইংলণ্ড থেকে শিল্পজাত দ্রব্য অধিকতর পরিমাণে এদেশে পাঠানো। ফলে বাংলা হয়ে উঠল ইংরেজদের কাঁচামাল ক্রয় কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে ইংরেজ বণিকযুগে বাংলার রপ্তানীকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছিলেন :

(ক) প্রথম পর্যায়ে কাঁচামালের তুলনায় তৈরী মাল অধিক—ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব-পূর্ব যুগ

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে তৈরী মালের তুলনায় কাঁচামাল অধিক—ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব যুগ

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে কাঁচামাল রপ্তানী—ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগ। (পৃ. ৯১)

স্বরূপ বৈশিষ্ট্যও একটি সংলক্ষ্য দিক হয়ে দেখা দিল। এর থেকেই ১৮৪৯ সালে প্রবর্তিত 'কালা আইনের' মধ্যে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ জাত্যভিমানের সংঘাত লক্ষ্য করা গেল। রামগোপাল ঘোষ এই আইনের পক্ষে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় সোচ্চার হয়েছিলেন।[৫] ১৮৪২ সালে লণ্ডনের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান কর্মী জর্জ টম্‌সন-এর নেতৃত্বে তরুণ বাঙালী সমাজে রাজনীতি বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ জেগে উঠল। বাঙালীর দীর্ঘকালের অন্তর-রুদ্ধ বিক্ষোভকে তিনি ধূমায়িত করে তুললেন। তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করে তৎকালীন সমাজাভিপ্রায়ে সেই ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "তরুণ বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন এবং স্বসমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাসনিষ্ঠ আত্মবোধ জাগরণে এই ভারতপ্রেমিক বিদেশী ব্যক্তিটি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।[৬] মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিবেশের মধ্যে নব্য ইংরেজি শিক্ষাদর্শের দ্রুত প্রসার ও রাজনৈতিক চেতনার প্রতিক্রিয়া একজাতীয় বিশিষ্ট আধিমানসিকতার বৃত্ত গঠন করল। নীলকর ইংরেজদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হল। সামাজিক কুপ্রথা নিরোধ ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সমাজদেহে কোলাহলের সৃষ্টি করল। আবার সমাজদেহে সেই ঘোরতর আন্দোলনমুখরতার মধ্যে আরও কিছু পরবর্তীকালে (১৮৫৭) তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মফঃস্বলে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের সীমা বর্ধিত করে দেশীয় বিচারকদের হাতে শ্বেতাঙ্গ বিচারের ভার অর্পণ করেন। শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় এই সকল কারণে আন্দোলনের যে সূচী গ্রহণ করেছিলেন—তারই প্রতিবাদে বাঙালী সমাজ থেকেও ঐ বছরেই বিলেতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছিল। এ আবেদনের ফলশ্রুতি নেতিধর্মী হলেও এর মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজের জাগরণের দিকটিই সূচিত হয়। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে (১৮৪৮-

৫ তিনি বলেছিলেন : "On the contrary, will not the generous and the noble sons of Britain feel ashamed of their countrymen in India, who are anxious to perpetuate an invidious distinction, and preserve their exalted position at the expense of their native fellow subjects?"

৬ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য (১ম সংস্করণ) পৃ. ১৫৯

-৫৬) বাংলার সমাজজীবনে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত প্রসার। ১৮৫৩-তে তিনি রেলওয়ে-মিনিট রচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে রেল-তার-ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্তর্বাণিজ্য ও পারস্পরিক যোগা-যোগের বিস্তৃতি থেকে ডালহৌসীর কাল অর্থনৈতিক প্রসারণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। চাকুরী-জীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সেই প্রবল সামাজিক সচলতার পর্বে মধ্যবিত্তের অধিকাংশ স্তরে আর্থিক উন্নতির দিকটি লক্ষিত হয়। তবে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ তখনও জাগ্রত হবার অবকাশ পায়নি।[৭] তথাপি ক্রমবর্ধমান বাংলার সমাজের সচলতা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক অধিকার, সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক সুবিধা আদায়ের আন্দোলন প্রত্যক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসমৃদ্ধির সহায়তা করলেও পরোক্ষে সামাজিক ক্রিয়ার ব্যাপক তাৎপর্য সৃষ্টি করে গণজীবনের মধ্যেও সেই সৃষ্টিধর্মী প্রভাবকে নানাভাবে অনুভব করেছিল। সামাজিক কুপ্রথা উৎসাদিত করবার প্রেরণার মূলে রাজনৈতিক আদর্শের ক্রমোন্মুখ ব্যাপকতায় যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে রূপদান করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় সভার উৎপত্তি ও রাজনৈতিক আচরণের বিকাশ

দেশের জনসাধারণ যখন সমগ্রভাবে নিজ অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন—তখন নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা স্বাদেশিকতা ও অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হবার উদ্দেশ্যে নানা রাজ-নৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় সভা গড়ে তুলতে চাইলেন। 'পার-সিভিয়ারেন্স সোসাইটি', 'সর্বশুভকরী সভা' (১৮৫০)-র কথা স্মরণ করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সামঞ্জস্যীকরণ এবং রাজকার্যে ভারত-বর্ষীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণের সপক্ষেই এই রাজনৈতিক সংস্থাগুলির কর্মধারা

---

৭ 'The criticism that constructive policy they had none, and seldom, if ever, they laid down any programme of systematic action for the political advancement of the country.'

History of Bengal—Ed. by N. K. Sinha p. 171

নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।[৮] এই রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলির মোটামুটি পরিচয় নেওয়া যেতে পারে:

(১) সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি (১৮৫৪)
(২) বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৪-৫৫)
(৩) দেশ হিতৈষিণী সভা (১৮৫১)
(৪) বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন্ বা ভারতবর্ষীয় সভা (১৮৫১)
(৫) বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০)

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি

কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে এবং দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৮৫৪ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সর্বতোমুখী উন্নতিসাধনের জন্যেই এই সমিতি সক্রিয় ছিল। এই সভা ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, বহুবিবাহ রোধ ইত্যাদি ব্যাপারে সমিতি তৎপর হয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালে এই সমিতির মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত আইনের পরিপূরক হিসেবে এই সমিতি কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব সমন্বিত একখানি প্রতিবেদন প্রেরিত হয়েছিল।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

সাহিত্যানুশীলনের মাধ্যমে সমাজসেবা ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার সংগে বাংলা নাটকের সৌখীন রঙ্গমঞ্চের একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষিত হয়। ১৮৫৬ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার নেতৃত্বে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ সালের ১১ই এপ্রিল এই রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্মোচনের সংগে সংগে কলকাতার নব্যশিক্ষিত ধনীদের বাড়ীতে বিভিন্ন নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আশুতোষ দেবের বাড়িতে, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতে,

---

৮ যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে—'তত্ত্ববোধিনী সভা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের রাজনৈতিক সভাসমিতিগুলিও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদির আলোচনায় অবকাশ ও বল পাইল।' —বাংলার নব্যসংস্কৃতি পৃ. ৩৮

সিংহ পরিবারের বেলগাছিয়ার নাট্যশালায়, জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায়, সখের থিয়েটারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।[৯] বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেও কয়েকটি নাটক আড়ম্বরে অভিনীত হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক অভিপ্রায়ের বিশিষ্ট পরিচয়ও এই সভা দিয়েছিল। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে ব্যবস্থাপক সভায় স্মারকলিপি প্রেরণ করে এই সভা বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনকে সহায়তা করেছিলেন। কলকাতার তৎকালীন সামাজিক জীবনাচরণকে শুদ্ধ ও সংযত করার জন্যেও এই সভার ভূমিকা, অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন বা দেশহিতৈষিণী সভা

রাজনৈতিক অনুভাবনার বিস্তারে ও জাতির আনুপূর্বিক কল্যাণের আশায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির প্রয়াসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫১ সালে।

এই রাষ্ট্রিক সভার নামকরণে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক জাতীয় শক্তির প্রতিভূ 'ন্যাশনাল' পরিভাষাটি সংযুক্ত হয়েছিল। জাগ্রত মৈত্রীভাবনার বিকশিত রূপ এই রাষ্ট্রীয় সমিতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা

১৮৪৯ সালে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবহার-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আইনসচিব বেথুন কলকাতা গেজেটে কতকগুলি আইনের খসড়া প্রকাশ করেছিলেন। মেকলের আইনের পরিপূরক হিসেবেই এগুলি রচিত হয়েছিল। 'Black Acts' নামক পুস্তিকা রচনা করে উক্ত খসড়াগুলিকে আইনে পরিণত করার সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। ব্ল্যাক অ্যাক্টের

৯ কলকাতার ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের নিজস্ব পরিবেশেই নাটক অভিনীত হয়েছে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের রাজকীয় গাম্ভীর্যে অভিনয়ের চেয়ে আড়ম্বরটাই বড় হয়ে উঠত। বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে—সাতুবাবুর বাড়ি 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সময় সাতুবাবুর দৌহিত্র শকুন্তলা-রূপী শরচ্চন্দ্র ঘোষ বিশ হাজার টাকার অলংকারে ভূষিত হয়ে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বেণীসংহার' নাটকে ভানুমতীর ভূমিকায় লক্ষাধিক টাকার পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সমর্থনের মধ্য দিয়েই ভারতবাসীর সংঘবদ্ধ দাবীর সূতিকাগৃহ রূপে 'ভারতবর্ষীয় সভার' আবির্ভাব। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর নতুন সনন্দ পাবার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শাখা স্থাপন করে দেশশাসনে ও জাতির উন্নতির কারণে এক প্রস্তাবও পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতবাসী ইংরেজদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহযোগিতা লাভ করেনি। এই মোহভংগের মধ্য দিয়েই জাতীয়তা বোধ পরবর্তীকালে পূর্ণতার অভিমুখীন হতে থাকে। 'ভারতবর্ষীয় সভার' সভাপতি রাধাকান্ত দেববাহাদুর বিচারপতি পীকক সাহেবের খসড়াটিকে 'শুভ্র আইন' বলে অভিহিত করে তার প্রযোগ বিষযেও উল্লেখ করেছিলেন। 'ভারতবর্ষীয সভা' রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে আনুগত্যের নীতিকেই স্বীকৃতি জানিযে নবোদ্ভূত জাতীযতাবোধকে সামাজিক কল্যাণেব ভূমিকায় প্রযোগ করেছিলেন। সমালোচকেব উক্তি উদ্ধৃত ক'রে দেখানো চলে যে, এ ভূমিকা বিস্তৃতার্থবোধক—"Attempts were made to extend the activities of the Association beyond the geographical limits of Bengal. The middle-classes too had begun to take share in political activities through public bodies which were no longer the monopoly of the land-owning aristocracy."[১০] ভারতবাসীর মধ্যে পশ্চিমের জাতীযতাবাদ ও ক্রমবর্ধমান সংহতির ভিত্তিতেই তাঁরা জাতিগঠনে উৎসুক হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে একতাবদ্ধ হযে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভে ভারতবাসী নিশ্চিত সফল হবে—এই আশাতেই তারা ইংরেজ রাজত্বের আনুগত্যের আস্থাশীল স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহকেও তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরিত আবেদনপত্রে ভারতবর্ষে চিরস্থাযী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে প্রস্তাব উল্লেখিত হযেছিল, তাতে শ্রেণীস্বার্থের নামে ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রযোজন দেখা দিযেছিল। ফলে ভারতবর্ষীয সভায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা শ্রেণীস্বার্থের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট

১০ Political Ideas (1833-1905): History of Pengal—Ed. by N. K. Sinha P. 170-71

লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[১১] উনিশ শতকের সত্তর দশকের দিকে ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক চেতনা যখন নতুন ভাবরূপ ও আয়তন গ্রহণ করছিল—'ভারতবর্ষীয় সভা' তখন তার গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল। কারণ—"The objects and programme of the Association were found wanting and nationalist Indians began to look elsewhere for organisation and leadership."[১২]

১১ "It established local branches and tried to rouse the interest of the masses in political questions."

—Glimpses of Bengal in the 19th Century. R.C. Majumder P. 86

১২ Indian Awakening and Bengal (2nd Ed.)—Dr. N.S. Bose P. 214

দ্বিতীয় পর্ব ঃ তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক আন্দোলন-কেন্দ্রিক নাট্যপ্রহসন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা নাট্যসাহিত্যে পরিবর্তনশীল বাংলার সমাজ-সম্পর্কের চেতনা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। কারণ এই সময়কার অধিকাংশ নাট্যপ্রহসন সমকালীন সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সংস্কার আন্দোলনের রসে সিঞ্চিত। এগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে যে, ব্যক্তিক জীবনগত সংকটের চেয়ে সমাজজীবনের সামগ্রিক সংকটই এগুলির মধ্য দিয়ে উদাহৃত। সংকটের অন্তর্নিহিত রূপ কি বা সত্তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন—একান্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সমস্যাই যে এর অবলম্বনীয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কিংবা প্রগতিপন্থী পাশ্চাত্যভাবনানুসারী হিন্দুসমাজ উভয় শ্রেণীই সেদিনের সমাজ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্ণিত সামাজিক অনাচার কিংবা উচ্ছৃঙ্খলার প্রকাশকেও এই সময়কার নাট্যপ্রহসনে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন এ-বিষয়ে বলেছেন: "ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল সমাজ সংস্কারে দেখা দিয় ছিল। পূর্ব হইতেই যাত্রা-পালায়, কবিতায় ও নক্‌শায় সমাজ বা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়াছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামী, মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, মাতালের লাঞ্ছনা, ধনীর লাম্পট্য, কুট্টনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা ইহাই ছিল সাধারণ যাত্রার, সঙের এবং নক্‌শা-চিত্রের প্রধান বিষয়। বাংলা নাটকের আবির্ভাবের সময় কোন না কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে হইয়াছিল নাটকে এইভাবে সপরিণাম সমাজচিত্র দেখাইতে পারিলে সাধারণের চেতনা সহজে ফুটিতে পারে।" সাহিত্যক্ষেত্রে জাতীয় মনের প্রতিফলনকে বিশিষ্ট মূল্য দিতেই হয়। আলোচ্য পর্বের বাংলা নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যেও বিশেষ করে বাংলা প্রহসন নাট্যের মধ্যে আমরা এই জাতীয় প্রতিফলনের সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক ব্যাপক ভূমিকার পরিচয় পাই। উগ্র প্রচার-পরায়ণতা তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত প্রহসনের প্রাণমূলে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কাজ

করছে। এই প্রহসনগুলির সামাজিক মূল্য নির্ণয়ের পূর্বে প্রহসনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য প্রসংগে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

২

'প্রহসন' পরিভাষাটি ইংরেজি 'ফ্যার্স' শব্দের সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। মেলোড্রামার স্বরূপবৈশিষ্ট্যকে যদি ট্র্যাজেডির সুলভ-সংস্করণ বলে চিহ্নিত করা যায়, তবে 'ফার্স'-কে উচ্চ কমেডির লঘু-স্তরাশ্রয়ী শিল্প বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর বৈশিষ্ট্য হল 'staffed with low humour and extravagant wit'; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ডে এর প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যসাহিত্যের অগ্রবর্তী চিন্তানায়ক মোলিয়্যার যিনি বুর্বো ফ্রান্সের সামাজিক ইতিহাসের নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটি চিরায়ত দিক্-চিহ্নকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি 'কমেডি'কে 'defauts dés hommés-এর ভাবোদ্যোতকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন: 'It was more difficult to write comedies than tragedy'; best comedy হতে গেলেও তার মধ্যে ট্র্যাজেডি ভাব-সংবেদনকে অন্তর্নিহিত করে দিতে হয়। ফার্স হল অতি গুরুত্বপূর্ণ এই কমেডিরই নিম্নভূমি-অংশ। নাট্যতত্ত্ববিদ্ নিকলের নির্দেশ এ-বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে: As in the realm of tragic drama, so here a a distinction is to be made between the more literary efforts in the field of high comedy and those in less dignified genres intended for popular consumption. পরিভাষাটির নিম্ন কমেডির সংগে অর্থলগ্ন এই রূপটি স্বীকার করেও এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা'য় একে বলা হয়েছে: 'a form of comedy in dramatic art, the object of which is to excite laughter by ridiculous situations and incidents.' এই অর্থেই লঘুরসের যে কোন নাট্য-প্রযাসকে 'প্রহসন'রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা এলো। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী ভূখণ্ডে ফার্সের স্বর্ণযুগ স্বীকৃত হয়েছিল এবং একে বলা হয়েছিল—'in fact the ancestor of french

comedy in its most successful and characteristic form and by choice and treatment of incident the vices and follies of every-day life and occassionally political life were burlesqued and caricatured and its object was good natured fun' ; বাংলাদেশেও দর্শকদের মধ্যে যখন স্থূল বিকৃতি দেখা দিল তখন লঘু নাটক ও প্রহসনের প্রতি আসক্তি স্পষ্টগোচর হল। তিন অঙ্কে রচিত প্রহসন নাটক পঞ্চাঙ্কের কুলীন নাটক থেকে স্বতন্ত্র করে বিচার করবার রীতি এলো। এ থেকেই কয়েকটি স্বরূপ লক্ষণ প্রহসনের অঙ্গীভূত হল :

১. সূক্ষ্ম চাতুর্যের সংগে ঘটনা সৃষ্টির প্রবণতা
২. চরিত্র ও সংলাপমুখ্যতা
৩. চাতুর্যপূর্ণ নাট্য সিচুয়েশন সৃষ্টির গুরুত্ব
৪. হাস্যরস উদ্রেক

ফরাসী সাহিত্যে মোলিয়্যারের ফার্স ই বিশিষ্ট ভাবাদর্শের দ্যোতক হয়ে সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করেছিল। কমিক উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের গভীরাশ্রয়ী রূপকে স্পর্শ করিতে পেরেছিলেন। জীবনের যতরকম ত্রুটি-বিচ্যুটি ও লঘু স্তরের নানা বিষয়ের সংগে উচ্চতর জীবনোপাদানের মালা-বন্ধন করেছিলেন।[১৩] বাংলা প্রহসনের বিচার ক্ষেত্রেও মোলিয়্যারের এই ভূমিকা বিচারের প্রয়োজন আছে। কেননা বাংলা প্রহসনে প্রত্যক্ষত মোলিয়্যারের প্রভাব ছাড়াও তাঁর প্রভাবিত ইংরেজী কমেডি বা ফার্সের প্রভাব আছে। ১৮২২ ও ১৮২৮ সালে যথাক্রমে সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণব' ও 'কৌতুকসর্বস্ব নাটকের পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিয়মিত নাট্য রচনা সুরু হয় আরও পরে ১৮৫২ সালে। কাজেই সংস্কৃত প্রহসনের এই অনুবাদ প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীর ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। বাংলা প্রহসন সংস্কৃত প্রহসনের হুবহু ধারায় গড়ে উঠেছে। তথাপি প্রাক্-মধুসূদন পর্বে বাংলা প্রহসনে সংস্কৃত প্রকরণ-প্রহসনেরই সাহায্য লক্ষিত হয়। তাই বাংলা প্রহসনের ধারা সন্ধান করতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের আদি উৎসের কিঞ্চিৎ

১৩ Lancaster তাঁর 'A History of French Dramatic Literature' গ্রন্থে বলেছেন,—"He included in materials for comedy religion, zeal for truth, love of learning and love of correct expression."

পরিচয় নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দশরূপককার ধনঞ্জয় দশ প্রকারের নাট্য রূপকের নাম করেছেন—নাটক, প্রবচন, ভান, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথী, অর্ঘ, ঈহামৃগ। সংস্কৃত যুগের পণ্ডিত মনীষীরা ছিলেন সূক্ষ্মতর পন্থানুসারী। তাই তাঁরা প্রহসনকে ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন,—শুদ্ধ, বিকৃত বা সংকীর্ণ ও উভয়ের মিশ্রণজাত। সংস্কৃত প্রহসনে নির্ধারিত সাহিত্যিক সীমার সংগে লক্ষণীয় দূরত্ব তখনই স্পষ্ট হয়ে পড়ল—এখন তার সীমাতিচারী অতিরঞ্জন নৈরাশ্যকর স্থূলরুচি ও প্রথাসুলভ কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্যেই একান্ত নির্ভর হয়ে পড়ল। এই সময়ের সৈরন্ধ্রিক, সাগর কৌমুদী, রসার্ণব সুধাকরের 'আনন্দ কোষ', বৎসরাজের 'হাস্যচূড়ামণি' প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ ও চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ বোধ বা উজ্জ্বল বর্ণ সামর্থ্য ছিল না। এ গুলি প্রসংগে বলা হয়েছে,—'but composed with the later specimen of the prahasanas, it reveals features of style and treatment which render a date earlier than twelfth century very probable. (History of Sanskrit Literature —Dasgupta).

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যুক্ত বেণীর ধারা বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট পদচিহ্ন আছে বাংলা প্রহসন নাটকে। বাংলা প্রহসন নাটক নানা পথ পরিক্রমার পর য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের প্রথম সাহিত্যিক নাট্যরূপ পেয়েছিল মধুসূদনের প্রহসন নাটকে। তৎপূর্বে সংস্কৃত প্রহসন নাট্যের প্রচলন ছিল ও তার সংগে ছিল সমাজ জীবনের নানা আদর্শ সংঘাতের প্রতিফলন। সংস্কৃত প্রহসন কিংবা প্রকরণে প্রতিনিধিত্বমূলক কোন সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ ছিল না। স্থূল এবং মোটামুটি রেখায় ব্যঙ্গার্থক অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে সমাজের চিত্র উদ্ঘাটনই ছিল সেখানে উদ্দিষ্ট।

বাংলা প্রহসনকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি—বিদ্রূপাত্মক প্রহসন ও বিশুদ্ধ প্রহসন। প্রথমটা কৌতুকাশ্রিত হয়েও বলিষ্ঠ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে গঠনমূলক দ্বিতীয় অর্থের ইংগিতময়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবু' প্রসংগে প্রিয়নাথ সেন যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের পরিচায়ন-সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে—'সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষে বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোন কুপ্রথা বা

কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া, তাহার হাস্যজনক বিদ্রূপাত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য। বিশুদ্ধ প্রহসন 'কৌতুক মুখ্য'। রসের ব্যাখ্যা প্রসংগে ভরত বলেছিলেন,—'নানাভাব অভিনয় ব্যঞ্জিতান্ বাগ্-অঙ্গো-সত্ত্বোপেতান্ স্থায়ী ভাবান্ আস্বাদায়িত্ব সুমনসঃ প্রেক্ষকারঃ।' প্রথম নাট্যযুগে লেবেদেফ সামাজিক মনোজীবনের লঘুরস প্রিয়তাকেই আবিষ্কার করেছিলেন। 'বাগ্-অঙ্গো-সত্ত্বোপেতান্' কোন গুরুরসাত্মক নাট্যভাবনা তৎকালীন বাঙালীর আয়ত্তের অতীত ছিল। প্রহসন-নাটকে জনমনোরঞ্জনের এই অনিবার্য চাহিদা অমূলক নয়। কেননা—'the social historical concentrating of contradictions in life necessarily demands a dramatic embodiment.'

বাংলা প্রহসনের বিদেশী রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয়ের যুগের এই চাহিদা ছিল 'হঠাৎ বড়লোকদের' স্থূল রুচির কাছে। এ-বিষয়ে সীটনকার সাহেবের 'Selections of Calcutta gazetter' ও কেরী সাহেবের 'Good old days of Hon ble John Company'-তে উল্লেখ আছে। শিক্ষা-দীক্ষা এই হঠাৎ বড়লোকদের ছিল না। ছিল কেবল দালালীর কাঁচা পয়সা, অস্তগামী বিকৃত নদীয়া কালচারের ঐতিহ্য, হাল্কা রঙ্গরসরসিকতা ও তামাসা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা নাটক ধনী বাঙালীর বৈঠকখানা ও সখের নাট্যশালার যুগ অতিক্রম করতে পারেনি। ১৮৫৬-৫৭ সালের বাংলার সামাজিক-জীবনের একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও সম্ভাবিত হল। বস্তুতঃ ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিকজীবনের যুগান্তরের মধ্যে আধুনিক বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সূচিত হল। একদিকে বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের সাংস্কৃতিক উত্তরায়ণ ও অন্যদিকে 'হঠাৎ বাবু'দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ—সংবাতাতুর সমাজজীবনের সংগে নাটকের প্রত্যক্ষ সংযোগের যুগ সূচিত হল। নাট্য-ক্ষেত্রে এই যুগের সামাজিক সমস্যার প্রকাশ-প্রবণতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির Co-relation বা অন্যোন্য সম্পর্কের মতোই দেখা দিল। সমাজমূলক আন্দোলনকে এই যুগের প্রহসন নাট্যে গ্রহণ করা হল। এই কৌতুক নাট্যগুলিতে জীবনের খণ্ডিত সত্য ও নানা সমাজ ব্যাধিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রথম যুগের বাংলা নাটকের পদচিহ্নে 'নাটক' অপেক্ষা 'প্রহসন'ই

অধিকতর প্রাণময় ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এ ছিল যুগেরই প্রয়োজন —কেননা, 'a revolution begins with satire, ridicule and decline of prestige of privileged social stratum'; জীবনাভিপ্রায় কিংবা মানসরহস্য উদ্ঘাটনের সূক্ষ্মতা এগুলির মধ্যে ছিল না। একটা বিশিষ্ট যুগ ও জাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বরূপ পরিচয়ের উপলব্ধির ক্ষেত্রে দু'টি বোধের দ্বারা আমাদের চেতনাকে পরীক্ষিত করে নিতে হয়। একটি হল আত্মবোধ এবং অপরটি হল আত্মপ্রকাশ। উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালী চরিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণে এই উপাদান দু টিও মূল্যবহ হয়ে উঠেছিল। রেনেসাঁসের যুগে ঐহিকতাই ছিল নব্যবঙ্গের চেতনার মূল কথা। সর্বৈশ্বর্যময় জীবনের চিন্তাই তখন একান্তভাবে ধ্যেয়। অর্থাৎ সমাজমনের মধ্যে মানবতার মূল্য নির্ণায়ক একটা প্রবল বোধ, জীবন সম্বন্ধে একটা উচ্ছলিত আকাঙ্ক্ষা সমাজ সংস্কারের গভীরে বিপ্লবাত্মক চিন্তারূপে ছড়িয়ে পড়েছে। যুগের অন্তরে প্রবাহিত মানব বোধের মহতী উপলব্ধি এ যুগের নাটকে জীবনেরই পূর্ণ মর্যাদায় কখনও প্রসন্নদীপ্ত, কখনও বা তির্যক তাৎপর্যে ব্যঙ্গবিদ্ধ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে আমরা বাংলার শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বর্ণযুগ বলতে পারি। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এই নতুন শ্রেণীর বিকাশ, বিস্তার ও রুচি-পরিবর্তন যুগান্তর আনলো।

৩

সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে আবির্ভূত হলেন বিদ্যাসাগর। ধর্মসমন্বয়ের মূলে আত্মস্থ থাকবার কারণে রামমোহনের আন্দোলন প্রথম যুগের উচ্চমধ্যবিত্তের সীমানাতেই আবদ্ধ ছিল। ইয়ং বেঙ্গল দল সংঘবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলেও প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম ভূমিকা তাঁরাই তৈরী করতে চেয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধের প্রেরণায় বুদ্ধিই সেখানে সদাজাগ্রত প্রহরী। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক সমাজ সংস্কারের মূল প্রেরণা হৃদয়জ। হিন্দু নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিংবা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সমাজের স্থায়ী কল্যাণের পথরেখা খুঁজে পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের তীব্রতার সংগে সংগে বাংলা নাট্য-আন্দোলনেও ব্যাপকতা এলো।[২]

বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর সমর্থনকারীদের সহায়তায় এর মধ্য দিয়ে যেমন সৃজনশীল নব্যসমাজ সৃষ্টিতে মুখর হয়েছিলেন—তেমনি অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণের বিরোধিতায় যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে গোটা সমাজমনই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল।[৩] ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উক্ত আইনের প্রতিলিপি আইনসভায় পঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারি সিলেক্‌ট কমিটিতে প্রেরিত পাণ্ডুলিপির রিপোর্ট সিলেক্‌ট কমিটি ৩১শে মে পেশ করেন; ১৯শে জুলাই আইনের পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হবার পর ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ১৫ নং ধারায় বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল। উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে বিধবা-বিবাহ বৃহত্তম সাফল্য। আইন করেই ক্ষান্ত থাকেননি—পুরোপুরি হিন্দুনিয়মে বর্ধমানের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতীর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। এই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে—"বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হবার ফলে

২ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১০ই মে, ১৮৫৯) পত্রিকায় রামদাস সেনের একটি স্বগত-ভাষণ স্মরণ করা যেতে পারে:

'আহা কি আহ্লাদ।
নিত্য নিত্য শুন্তে পাই অভিনয় নাম।
অভিনয়ে পূর্ণ হল কলিকাতা ধাম॥
হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ।
দুখের হইল অস্ত সুখ বারোমাস॥
দিন ২ বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান।
দিন ২ বৃদ্ধি হইল বাংলার মান॥
হায় কি সুখের দিন হইল উদয়।
এ দেশে প্রচার হইল নাট্য অভিনয়॥

৩ আবেদনপত্রবিষয়ক বিশেষ তথ্য 'পরিশিষ্ট' (১) দ্রষ্টব্য।

সিপাহীকুল এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আভাস দেখা যায়, তা ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অন্যতম ইন্ধন যুগিয়েছিল।"[৪]

অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, বিদ্যাসাগরের পূর্বেও এ বিষয়ক কিছু কিছু রচনা ও আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৭ সালেই ভারতীয় ল' কমিশনের সেক্রেটারী গ্রাণ্ট সাহেব হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ে ইংরেজ আইনজ্ঞদের মতামত চেয়ে তাঁদের প্রতিকূল মতামতে সন্তুষ্ট না হলেও ল' কমিশনের প্রচেষ্টার ফলে তৎকালীন সমাজে এ-বিষয়ে কিছু আন্দোলন ও আলোচনা হয়েছিল। এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন ১৮৪২ সালে ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র 'The Bengal spectator'—'পরাশর সংহিতা'-র এ বিষয়ক বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি তুলে তাঁরা হিন্দু বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম আবির্ভাব : "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ-বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে, এ দেশে বিধবা-বিবাহের বিধি প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবা-বিবাহ যদি কর্তব্যকর্ম না হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা তখনই ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই কর্তব্য কর্ম। অতএব বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক।" 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'তেই আরও এক মাস পরে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে দু'টি প্রবন্ধই পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যেই মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের অবলম্বনে হিন্দু বিধবাদের স্বপক্ষে প্রমাণাদি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পরাশরের প্রমাণ ধরেই বিদ্যাসাগর বিধবার পত্যন্তর গ্রহণকে

৪ পরিচয় (ডিসেম্বর ১৯৭০) পৃ. ৩৮৪

ধর্মীয় ও সামাজিক উভয়ত দিক দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করে বিধবা-বিবাহের সন্তানকে 'পুনর্ভব' নয়—বৈধ পুত্ররূপেই স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। পিতার সম্পত্তিতে তার অধিকারও তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[৫] কলিযুগে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলে কোন স্মৃতিতেই স্পষ্ট কিংবা প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ নেই। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বা উদ্বাহতত্ত্ব, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা কিংবা আদিত্য পুরাণের উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর দেখালেন যে, তার মধ্যে বিধবাদের পুনর্বিবাহের কোন প্রসংগ নেই এবং পরাশর স্মৃতির বিধানকেই তিনি গ্রহণীয় বলে মনে করেছেন। ব্যাসসংহিতায় স্মৃতিবিধানকেই শাস্ত্রমতে কলিযুগে গ্রহণীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রোতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

পরাশর স্মৃতির বিধান-অনুযায়ী বিদ্যাসাগর কলিযুগে বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রবিহিত বলে নির্বিবাদে সিদ্ধ করলেন। শুধুমাত্র শাস্ত্রসম্মত নয়—বিধবা-বিবাহ যে শিষ্টাচারসংগত তারও শাস্ত্রবিহিত ব্যাখ্যা করেছেন বিদ্যাসাগর। 'বশিষ্টসংহিতা'য় উল্লিখিত আছে,—'লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্॥' শাস্ত্রবিহিত ধর্মের বিধান যেখানে অনুপস্থিত—লোকাচার কিংবা শিষ্টাচারই সেখানে প্রমাণরূপে স্বীকৃত। অতএব বিধবা-বিবাহ যখন পরাশর-শাস্ত্রোক্ত বিধান—তখন লোকাচার বা শিষ্টাচারের প্রসংগ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু পুস্তিকা প্রকাশের সংগে সংগেই বোঝা গেল যে, স্মৃতি-শাস্ত্র-সংহিতা-বাহিত যুক্তি-বুদ্ধি নয়—বাংলার সমাজজীবনকে পরিচালনা করছে লোকাচার। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল। কারণ বাংলার সমাজজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট বৈধব্য-জীবনের সংস্কারকে এতো সহজে উন্মূলীত করা যেতে পারে না। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর

৫ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও এ-বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে :

"Subject to certain well-defined limitations Kautilya recognises a widow's rights to property and remarraige. His rules regarding these rights require a close scrutiny. Upon a careful analysis, it will appear that Kautilya's attitude towards the Vexed question of the widow's status in society is not far removed from the Orthodox view."

—Kautilya on Love & Morals : Dr. P. C. Chunder P. 72

কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে আবেদন পত্র সরকারের কাছে জমা পড়েছিল—তাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ের সর্ববিধ বাধা অপসারণের জন্যে আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এই আন্দোলন বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের এক প্রভাবশালী অংশ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিল। সামাজিক বিচিত্র কোলাহলে মুখর তৎকালীন বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় ৫০,০০০ স্বাক্ষর যুক্ত ২০ টি আবেদন পত্র জমা পড়েছিল। শতকরা দশ ভাগের বেশী সমর্থন না পেলেও তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রভাবকে তাঁর আন্দোলনের পক্ষেই পরিচালনা করেছিলেন। আইন পাশ হবার পরে বিবাহযোগ্য তরুণ-তরুণীদের প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছেন, বর-বধূকে উপহার দিয়েছেন, বিবাহের খরচ নির্বাহ করেছেন, টাকা-পয়সা নিয়ে বিধবা-বিবাহ করবার পর নববিবাহিতা বধূকে বিদ্যাসাগরের জিম্মায় রেখে পলায়ন করলে তার দায়িত্বও বিদ্যাসাগরকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। বিধবা-বিবাহ তাঁকে নৈরাশ্য ও ঋণের দায়ে জড়িয়ে ফেলছিল। বন্ধু ও সমর্থকেরা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পত্রে বিদ্যাসাগর-মানসের হতাশার পরিচয় মেলে,—"আমি ক্রমাগত কয়েকদিন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম কেবল তোমার নিকট হইতে নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরান্মুখ হইয়াছেন।"[৬] বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হবার পরে সাধারণ বাঙালী চরিত্রের এই অধৈর্য ও প্রতিজ্ঞাহীনতার প্রসংগেই ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন:

'সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়॥

৬ জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

মিছামিছি অনুষ্ঠান, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা॥'

শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কিংবা অভিজাত-তন্ত্রের অনেক সমাজ-প্রধান বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা করে[৭] এই বৈপ্লবিক সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন।[৮] বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে তিনি যুক্তি সিদ্ধান্ত মতে ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। সবিস্তারে এবং নানা প্রমাণ দিয়ে তিনি এতে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেশের রক্ষণশীল পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিকূল আচরণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এই ভেবেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন,— 'আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্ম শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এ দেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।' যা হোক্ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ পুস্তিকা সমাজ দেহে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক) সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেছিলেন: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায়

৭ রূপচাঁদ পক্ষী নবযুগের সংস্কারপন্থীদের ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন:

"(কেহ) দিলেন বিধবার বিয়ে, (কেহ) ব্রাহ্মমত দিলে চালিয়ে।
(হল) স্বাধীন ইয়ং বাবুভেয়ে, বেদব্যাস কি বলকে পায়॥
কহে কবি খগমণি, স্বাধীন রমণী ইদানী ঘরভাঙানী।
দেশচলানী, ভাতারকে বাঁদর নাচায়।"

৮ এই জাতীয় পুস্তিকার একটি তালিকা দিয়েছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে (পৃ. ১৮৯)

(১) আঁটপুর-দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপক শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ রচিত এবং উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত 'বিধবা-বিবাহের নিষেধক প্রচার' (২) কাশীপুরবাসী শশিজীবন তর্করত্ন ও জানকীজীবন ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী' (৩) কালিদাস মৈত্র বিরচিত 'পৌনর্ভব-খণ্ডনম্' (৪) সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের মতানুসারে রামচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত 'বিধবোদ্বাহবাধক:' (৫) মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সংকলিত 'বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ' (৬) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ভ্রমসূচক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর (৭) ধর্মমর্মসভার 'বিধবা-বিবাহ-বাদ' প্রথম খণ্ড (৮) রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাসদগণ বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর' (৯) পীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত নহে' (১০) বিধবা-বিবাহ-নিষেধ বিষয়িনী ব্যবস্থা (ধর্মসভার প্রত্যুত্তর)

প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে… কুসংস্কার পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের গণাক্রান্ত পণ্ডিতদিগকে পারিতোষিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগর প্রণীত পূর্বোক্ত পুস্তকের নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন…স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে।" নলডাঙ্গার রাজপরিবারের প্রধান ব্যক্তির বিধবা-বিবাহ দানের প্রচেষ্টায় 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' যে মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিরোধী সমাজপ্রতিরূপের প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়:

'যখন ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই অবশ্যই উহা হিন্দুধর্ম অনুযায়ী বিধিসিদ্ধ কর্ম… অতএব সাধু সমাজের প্রধান লোকের আচার-ব্যবহারের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সভার অভিমত হিন্দুধর্মের অনুসারে চলা হইবেক, ইহা বলা যাইতে পারে না। এজন্য আমার প্রার্থনা এই—আপনারা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক, দুইটি ফর্দ প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করুন। এক ফর্দে যে সকল কর্ম সভার অভিমত হিন্দুধর্মের অনুযায়ী সে সমুদায়ের, অপর ফর্দে যে সকল কর্ম অভিমত হিন্দু ধর্মানুযায়ী নহে, সে সমুদায়ের সবিশেষ নির্দেশ থাকিবেক।" নলডাঙ্গার রাজার নিমন্ত্রণ রহিতকরণে সভা মর্মাহত হয়েছিলেন। কেননা নিমন্ত্রণ পত্রের সংঙ্গে একটি বিশেষ চিরকূট' প্রেরিত হয়েছিল—'যদি আপনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে আপনার আসিবার আবশ্যকতা নাই।' এই মর্মের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হবার পরে নিমন্ত্রণ রহিতকরণে বিধবা-বিবাহের পক্ষেই প্রকারান্তরে সহযোগিতা করা হল বলে ধর্মরক্ষিণীসভা বেশ উষ্মার সংগেই প্রচার করেছিলেন—'যদি আপনারা এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদিগকেও ধিক্ এবং ধর্ম সংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য নির্দেশ বাক্যকেও ধিক্।' জনমেজয় ঘটক মহামহোপাধ্যায় বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে ধর্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছেন দাবী করাতে এই বিরোধী ধর্মরক্ষিণীসভা কঠোর ও বিরূপ মন্তব্য করে অপ্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন—"পণ্ডিত মহোপাধ্যায়গণ কিরূপ মহোপাধ্যায় ও কিরূপ ধর্মশাস্ত্রবেত্তা এই অনুমোদন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়

প্রদান করিতেছে।" কাশ্যপবচন উদ্ধৃত করে বিদ্যারত্নমহাশয় তাঁর 'ব্রজবিলাস' নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগরেরই অনুকূলে মত দিয়েছিলেন :

'সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়া কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা য চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা॥
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥'

বিদ্যাসাগর অনুসৃত এই সর্বতোভাবে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বক্তব্যে অনাস্থা ও ব্যঙ্গ প্রকাশিত হযেছে এইভাবে—'সুতরাং বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থার সহিত খুড়ো মহাশয়ের মীমাংসার আব কোন অংশে অণুমাত্র প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না!' এইভাবে 'বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি' প্রমাণের জন্যে নানা বক্তব্য নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে, রঙ্গব্যঙ্গাশ্রয়ী নানা প্রকাশমাধ্যম-এর সহায়ক হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর এ সমস্ত সামাজিক বিরোধিতার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক) সম্পাদকীয় মন্তব্য এ-বিষয়ে বলেছিলেন: "এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগেব মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।" কলকাতা ধর্মসভাও বিদ্যাসাগরের মতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন। আবার কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রবলভাবে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়ে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত একটি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পরে 'সংবাদ প্রভাকরে' ঘোষিত একটি প্রতিবেদনে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে বিধবা-বিবাহ ইচ্ছুককে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিতে পর্যন্ত অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাদের প্রচার চালিযেই গেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বেঁচে থাকো বাবা বিদ্যাসাগর', 'একাদশী উপোসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিল তালা' কিংবা 'দিদি, ফিরেছে কপাল' প্রভৃতি গান খুবই প্রচলিত হয়েছিল। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রিকায় কবিতাকারে বাদানুবাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রক্ষণশীল সমাজ স্বরূপের দিকটি প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের চরিত্র

স্বরূপের মধ্যে বহিরঙ্গ আচার-আচরণের দিকটি যতখানি সমুৎকর্ষত্ব লাভ করেছিল—জাতীয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত সদগুণাত্মক বৃত্তিগুলিকে ঠিক সমানুপাতিকভাবে বিকশিত করতে পারেননি। শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাই বিধবা-বিবাহের সংস্কারকর্মের সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। এ-বিষয়েও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশেষ মন্তব্য করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন : "এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলপ্রদায়িনী হইয়া উঠে নাই।…অকিঞ্চিৎকর আচার-ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণেব অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না।' হিন্দু বিধবাদের বিবাহের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে যথার্থ পাশ্চাত্য মতাদর্শকে দেশহিতৈষিতার মানদণ্ডে প্রযুক্ত করবার বিষযটিকে একটি আকর্ষণীয সংলাপময ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল 'মাসিক পত্রিকা'য (১২ই ফেব্রুযারী, ১৮৫৬) ইংরেজ মহিলার মতাদর্শে হিন্দুদের বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রগতিশীল ধারণা ও রক্ষণশীল প্রাচ্য মতাদর্শের টানাপোড়েনে বিষযটি আস্বাদ্য :

হিন্দুদিগের বিধবা-বিবাহের কথা শুনিয়া ইংরাজদের বিবীরা যাহা বলে।

যে দিবস ব্রজনাথবাবুর বিবাহের কথা লইযা মাষ্টার হাকিমেতে ও বীরহরি মুখোপাধ্যায়েতে কথাবার্তা হইযাছিল, তাহার পরদিবস মুখোপাধ্যায় মহাশযকে কর্ম উপলক্ষে হাকিম সাহেবের বাড়ীতে যাইতে হয়। সে সময় হাকিম সাহেব বাড়ী ছিলেন না। এই জন্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হাকিম সাহেবের বিবীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইল। তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের বিধবা-বিবাহ লইয়া যে কথাবার্তা হয, তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

"বিবীহাকিম। কাল রাত্রে কর্তার ঠাই শুনিলাম ব্রজনাথের বিবাহ হবে, তাহা শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি, ব্রজনাথ বড় ভদ্রলোক, পরমেশ্বর করেন যেন তিনি বিবাহ করে সুখী হন।

বীরহরি। মেম সাহেব, আমারও বড় ইচ্ছা ব্রজনাথ যেন বিবাহ করে। সে বিবাহ করিলে, এক বড় ভদ্র ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা পায়। কিন্তু ইংরাজী লেখাপড়া

করিয়া ইংরাজদিগের মত ব্রজনাথের বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সে বলছে আমি বিধবা-বিবাহ করিব, সম্বন্ধও স্থিব কবিয়াছে। ইহা দেখে শুনে আমি আশ্চর্য হইয়াছি, বিবাহ হইলে কি করিব বলা যায না।

বিবী হাকিম। ব্রজনাথ যেন বিধবা মেয়ে বিবাহ করিলেন, তাহাতে দোষ কি! আমাব মাযের দুইবাব বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম বিবাহে এক পুত্র, এক কন্যা হয। তাহারা উভযেই বর্ত্তমান। চিন দেশে ভাই সওদাগরী কর্ম করেন। বোন একজন জমিদারেব ছেলে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে আছেন, এ দেশে কখনও আইসেন নাই। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহে আমি হই।

বীরহরি। আপনাদিগেব শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহেব বিধি আছে, এইজন্যে আপনাদিগেব মধ্যে বিবাহ হয। আমাদিগের শাস্ত্রে বিধব-বিবাহেব বিধি নাই, এই নিমিত্তে আমাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ হয না।

বিবীহাকিম। আপনাদিগেব শাস্ত্র তবে মিথ্যা বলিতে হইবেক।

বীবহবি। আমাদিগেব শাস্ত্র কেমন কবে মিথ্যা বলিব। পরমেশ্বর আপনাদিগকে এক শাস্ত্র দিয়াছেন, আমাদিগকে এক শাস্ত্র দিয়াছেন, মুসলমান-দিগকে আর এক শাস্ত্র দিয়াছেন। যে যাহাব আপনার শাস্ত্র মতে চলা উচিত। স্বর্গেব তো এক দরজা নয, অনেক দবজা। আপনারা এক দবজা দিযা স্বর্গে গমন কবেন, আমবা এক দরজা দিয়া যাই, মুসলমানেরা আর এক দরজা দিযা যায।

বিবী হাকিম। না, বাবু স্বর্গে এক বই দবজা নাই। সে দবজা দিযা কেবল ধার্মিকেবা স্বর্গে গমন করেন, সেখানে আর কেহ যাইতে পাবে না। আমবা যে পর্যন্ত বেঁচে থাকি, জাতটাত লইয়া ধূমধাম করি, মবিলে জাতটাত কিছুই থাকে না। যেমন ইংবাজ, তেমনি কাফবি, তেমনি ব্রাহ্মণ, তেমনি শূদ্র, মবিলে পব ইহাদিগেব মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না, সকলি সমান হয। ধর্ম এ জাত থেকে কি ও জাত থেকে হয না। জাত থাকুক বা না থাকুক, যিনি অনভিমানী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয ও পবোপকাবী, তিনিই স্বর্গ প্রাপ্ত হন আমি যে কথা বলিলাম সে সুযুক্তির কথা। আপনি বলুন দেখি হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ কেন নিষেধ হইল।

বীরহবি। আমরা বলি বিবাহ হইলে স্ত্রী-পুরুষেব মধ্যে যে সম্পর্ক হয, তাহা যে কেবল এ জন্মের জন্যে হইল তাহা নয, সম্পর্কটা পরকালেও থাকে।

এখানে যেমন স্ত্রী-স্বামী একত্রে বাস করে, মৃত্যুর পরেও তাহারা সেইরূপ একত্রে বাস করিবে। এই নিমিত্তে আমরা বলি, বিধবা মেয়ে বিবাহ করিলে তাহার পরকাল নষ্ট হয়, কারণ সে সময়ে সে দুই স্বামী প্রাপ্ত হয়, একজন মেয়ে দুই স্বামী লইয়া কেমন করে ঘর করবে, তাহা তো হয় না।

বিবী হাকিম। আপনি যে কথা বলিলেন তাহা কখনই সত্য নয়। স্বামী যদি ভালোমানুষ ভদ্রলোক হয়, পরকালে তাহাকে পত্নীতে পাইলে হানি নাই। কিন্তু সকল স্বামী ভালমানুষ ভদ্রলোক নয়, কেহ কেহ বজ্জাৎ 'দুষ্ট হয়, প্রত্যহ রাতে নেশা করে স্ত্রীকে মারধর করে, কখন ২ নেশার জোরে পত্নীকে মেরে ফেলে। আবার পরকালে এমন স্বামী লইয়া পত্নী কি করবে, ইহকালে যে দুঃখে ভুগিয়াছিল, আবার পরকালে সেই দুঃখ ভুগিবে। এ কেন হবে, পত্নীর অপরাধ কি? না, না, তাহা কখনও হবে না। তাহা হইলে পরমেশ্বর অবিচারক হইবেন। কিন্তু পরমেশ্বর অবিচারক নন, তিনি কখনও অনপরাধী অবলা নারীকে মিছামিছি দোষী বলিয়া দুঃখ দিবেন না, ইহা আমি বেস জানি। আরো আপনার কথাক্রমে যদি এ জন্মে সতীন হয়, আবার পরকালেও সতীন হয়। আমাদিগের মধ্যে সতীন হয় না, আপনাদিগের মধ্যে সতীন হইয়া থাকে। সতীনের জ্বালা কি তাহা আমি বেস বুঝিতে পারি। ইহকালে সতীনের জ্বালা ভুগিয়া আবার পরকালে সে জ্বালা ভুগিতে হইলে স্ত্রীলোকের দুঃখের সীমা নাই বলিতে হইবেক। না, না, বাবু, আপনার কথা কখনই সত্য নয়। ইহকালে বিবাহ হইলে যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়, তাহা পরকালে থাকে না, তাহার কারণ,—সেখানে আমরা এ দেহ লইয়া যাইনে। যেখানে এ দেহ নাই, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেরও প্রভেদ নাই, সুতরাং এমন স্থানে বিবাহ দেওয়া-থোওয়া হয় না। এইজন্যে ইহকালে স্ত্রী লোকের দুই-তিনবার বিবাহ হইলে তাহার পরকালের ক্ষতি হয় না।"

যুক্তি-বুদ্ধির সংগে উদার-হৃদয় ও সংস্কার বিমুক্ত মনন নিয়েই বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের সংগে সম্পর্কিত সমাজমনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে ব্যভিচার দোষ, ভ্রূণ হত্যা ও সামাজিক নৈতিক পাপ যে বাড়বে এই দূরদৃষ্টি নিয়েই বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে নেমেছিলেন।

৪

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা নাট্য-সাহিত্যেও বেশ কয়েকখানি নাট্য প্রহসন রচিত হয়েছিল। নাটকাভিনয় নিঃসন্দেহে শ্রুতি ও দৃষ্টির বস্তু এবং মূলত চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম। এই শ্রেণীর নাটকগুলির ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে এ কথা প্রযোজ্য—তথাপি এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে জাতির আধিমানসিক সংযোগ—বিশেষ পটভূমির সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বিচিত্র সামাজিক কোলাহলের পটভূমিতে বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে নাটকগুলি রচিত হয়েছিল এবারে আমরা তার পরিচয় দেবো।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়ে বিধবা-বিবাহবিষয়ক উত্তপ্ত সামাজিক প্রশ্নের এক কারুণ্য-মণ্ডিত ট্র্যাজিক মহিমা প্রকাশ করেছে। এই নাটকে অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যা প্রসন্নর দ্বিতীয় বার আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমগ্র নাটকে এ-বিষয়টি আবহ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকখানির কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও ট্র্যাজিক রস পরিণাম কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনার জীবনের করুণ অধ্যায়। অল্প বয়সী বিধবাকে বিবাহ না দিয়ে তার জীবনের উষ্ণ উত্তাপকে অস্বীকার করতে চেয়ে কীর্তিরামের সমগ্র পরিবারের মধ্যে যে শোককরুণ পরিণতি নেমে এসেছিল, নাট্যকার তা-ই বিশ্লেষণ করেছেন এবং যুগোচিত একটি সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে প্রকারান্তরে আপন মত জ্ঞাপন করেছেন। প্রসন্নর বাসর ঘরের একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে বরের মুখে একটি নিধুবাবুর টপ্পা সংযোজিত হয়েছে এবং বিধবা-বিবাহের আশাবাদী মনোভাব সুলোচনার বৈধব্যজীবনের মধ্যে বিপরীত পটভূমির কাজ করেছে:

> 'এখন রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ
> কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান।
> অরুণ উদয় হবে সুকমল প্রকাশিবে
> কুমুদ মুদ্রিত হবে শশী যাবে নিজস্থান॥'

কিন্তু কেন্দ্রীয় নায়িকা সুলোচনার বৈধব্য জীবনে 'অরুণ-উদয় হয়নি। সুলোচনা বাংলা সাহিত্যে রোহিনী, কুন্দনন্দিনী কিংবা বিনোদিনীর

অগ্রবর্তিনী নায়িকা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিধবার প্রেমকে অভিশপ্ত ও মৃত্যুর মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে চিত্রিত করেছেন।[৯] কিন্তু উভযের ক্ষেত্রেই বৈধব্য পরিণতির চেয়ে ব্যক্তিগত চরিত্রের দায়িত্ব অধিকতর সক্রিয়। নিজ চরিত্রই রোহিনীর ট্র্যাজিক পরিণামকে আসন্ন করে তুলেছিল আর কুন্দ চরিত্রের নিষ্ক্রিয় অসহনীয় বিবর্ণতা তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নগেন্দ্রের কাছে এমন সহানুভূতিকরুণ হযে দেখা দিয়েছিল যে, সামাজিক আচারাপেক্ষা একান্ত মানবিক হৃদয়গত প্রশ্নই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে।

'বিধবাবিবাহ নাটকের' সুলোচনাও আপন চরিত্রের আচরিত কার্যকারণ যোগেই ট্র্যাজিক পরিণামকে আসন্ন করে তুলেছে এবং তার আত্মহত্যার মধ্য দিযে মন্মথর মধ্যে মানবিক হৃদযগত প্রশ্ন তার সমগ্র চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে—সামাজিক আচারগত প্রশ্ন গৌণ হযে পড়েছে। কৃত পাপ স্মরণে সে উন্মাদ হযে গেছে। সমগ্র কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয নেওযা যাক্। বালবিধবা সুলোচনা পিতৃগৃহেই বাস করছে। বিবাহিত জীবনের কোন পূর্বসংস্কার বা স্মৃতি আজ তার মনে নেই। যৌবনের প্রাণবন্যায় যখন তার দেহমন কল্লোলিত—ঠিক সেই সময়েই সমাজে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল। নাটকখানির অন্যতম বিধবা চরিত্র প্রসন্নর বিবাহের নিমন্ত্রণ বার্তা পেয়ে 'সত্যভামা' নাম্নী এক নারী চরিত্রের প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল :

"সত্যভামা। ওমা সে কি গো! কোথা যাব মা! রাঁড়ের বে'র ব্যবস্থা বেরয়েছে বলে কি সত্য সত্যি বে কত্তে হয় ?

রসবতী। মা সুদু কি ব্যবস্থা বেরয়েছে? রাঁড়ের বের আবার আইন হয়েছে।

সত্যভামা। বে হবে তার আবার আইন কি বাছা?

রসবতী। তা শোন নাই মা? এই যেমন কোম্পানির লোকে ষাঁড়

---

৯ 'সাম্য' গ্রন্থে 'বিধবা-বিবাহ' প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

"বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাদের ইচ্ছামতো বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব পতিকে আন্তরিক ভালোবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সতিগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।"

ধরে আর গাড়ীতে যোতে, তেমনি নাকি আর দিনকতক বই রাঁড ধরবে আব বে দেবে।

সত্যভামা। তোরা বাছা কেবল রঙ্গ নিয়ে আছিস। প্রসন্নের বের কথা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে। এ মেয়ে কেমন করে বে করবে, এ কি লজ্জার কথা। এ যে ঘোর কলিকাল পড়ল—

ও মা ও মা কোথা যাবো লাজে মরে যাই।
মোহিনীর হবে না কি নূতন জামাই ॥
কেমনে এমন বিয়ে করিবে প্রসন্নি।
ধন্য বটে মেয়ে তারে ধন্য বলে গণি ॥
কেমনে নূতন বরে বরিবেক মেয়ে।
সত্য সত্য হল তবে বিধবার বিয়ে ॥
ঘুচিল কি সকলের কলঙ্কের ভয়।
ধর্ম কর্ম হল লোপ অধর্মের জয় ॥
আমরা কুলীন ঘরে জন্মিয়াছি বটে।
তবু ত এমন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে ॥
ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে।
গঙ্গা জলে ধোয়া মেযে আছে কার ঘরে ॥"

বিধবা-বিবাহেব ভয়ংকর পরিণাম চিন্তা করে সত্যভামা বিস্ময়াবিষ্ট হযেছে এবং এই মনোভাব বিরোধী সমাজ-প্রতিনিধিদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে :

'হাতে ছেলে কাঁকে ছেলে শুধাবে যখন।
ওমা ওমা কোথা তুমি করহ গমন ॥
কি করে প্রবোধ দিবে কি বলিবে তারে।
বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে ॥'

প্রসন্নর বিধবা-বিবাহ বিষযে সুলোচনার আকাঙ্ক্ষা-বুভুক্ষু মনের প্রতিক্রিযার সংগে সামাজিক প্রশ্নের যে স্বরূপ উমেশচন্দ্র তাঁর 'বিধবা-বিবাহ নাটকে তুলে ধরেছেন—তা-ও লক্ষণীয় : "রাঁড়ের বে কি সর্বত্র চলবে ? এই একটা বে' হচ্ছে, দেখিস দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্তা বলবেন, ওর বাড়িতে ভাত খাওয়া যাবে না, আর এক কর্তা বলবেন—এ বে'র পুরুত, বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত। ভাই, এ সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা একবার ভুলেও

ভাবেন না যে, বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধর্মপথে আছে, তাদের ক্লেশটাও ত ভাবতে হয়, তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বলো দেখি?'[১০]

রক্ষণশীল কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনা শেষ পর্যন্ত পড়শী শপতিনী রসবতীব মধ্যস্থতায় রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথর প্রতি আসক্ত হল। গোপনে মিলিত হবার আনন্দে বহুদিন বাদে চুল বেঁধে, প্রসাধন করে, টিপ পরে সে নবসজ্জায় সাজল। মূল নাটকের এই অংশ থেকে কিছুটা বিস্তৃত উদাহরণ গ্রহণ করলে সমাজ-সংস্কাব ও বালবিধবার অবাধ্য হৃদযাকাঙ্ক্ষার উষ্ণ উত্তাপ-সমুখ দ্বন্দ্বেব পবিচয পাবো:

"সুখময়ী। মা দেখতে পেলে এখুনি গাল দিযে ভূত ছাড়া করবে। একে ত ও পাড়ার রাঁড়ের বে হযেছে শুনে কদিন আপনা আপনি কত বক্‌তেছেন তাতে তোর চুল বাঁধা টিপ পড়া দেখলে কাকেও আস্ত রাখবেন না। কাল রেতে শুযে শুযে শুনতে পাচ্ছিলুম কর্তা বলতেছিলেন, বিধবার বেব ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু দেশাচার-বিরুদ্ধ, শুনতে লজ্জা কবে ভাবতে লজ্জা কবে, এ কর্ম কি ভদ্রলোক করবে?

সুলোচনা। অমন দেশাচারের মুখে আগুন। শুনতে লজ্জা করে ভাবতে লজ্জা করে, এ সব কথা বলা সহজ বটে কিন্তু যারা যন্ত্রনা সয় তারাই জানে এ দেশে বিধবাবিবাহ হওযা কত পাপেব ভোগ। দাসীবৃত্তি করে কাল কাটানো ভাল, দিনান্তে অর্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণধারণ করা ভাল এ দেশে বিধবাবিবাহ হওযা ভাল নয। ভেবে দেখ দেখি আমাদের বেঁচে থাকবার ফল কি? পোড়া দেশের লোক এদিকে শাস্ত্র দেখান, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বই গতি নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি ভুলেও ভাবে না। কথায় কথায় ধর্ম দেখায, ধর্ম যে কিসে থাকে, তা দেখে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে। তা ভাই যে যা বলুক, আমাদের তো কিছু বলবার যো নাই, কথায় বলে বেঁধে মাবে সয় ভাল। আমাদেরও তাই হয়েছে।"

গোপন প্রণযের ফলে সুলোচনা গর্ভবতী হল এবং নিজের শারীরিক অবস্থা সম্যক বুঝতে পেরে লোক লজ্জায় বিষ পান করল।

---

১০ বিধবারমণীর এই ক্লেশ প্রসংগে বিধবাবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'বিধবাবঙ্গবালা'র মন্তব্য করা হয়েছে:

এই চরম অবস্থায় তার রক্ষণশীল পিতা কীর্তিরাম প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়লে মাতা পদ্মাবতী সমাজরূপের আপোষকেই স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন,—'আমরা মেয়ে মানুষ শাস্ত্রের কিছু বুঝিনে, কিন্তু এ বেশ বুঝতে পারতেছি, যে ও পাড়ার প্রসন্নের মতো যদি মেয়েটার বে হত, তা হলে তো আর এ দায় ঘটত না।' বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত দেখিয়ে বলেছিলেন,—'হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। বিদ্যাসাগরের এই সামাজিক বক্তব্যই কীর্তিরামের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে:

"পদ্মাবতী স্ত্রীলোক হইয়া যাহা বলিল, এখন নিতান্ত সংগত বোধ হইতেছে। বিধবাদিগের বিবাহ হইলে তাহারাও এই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহাদিগের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনেরও তাহাদিগের জন্য বিপদগ্রস্ত হতে হয় না।"

মৃত্যুপথগামিনী বিধবা-কন্যার অন্তিমকালে কীর্তিরাম বিধবা-বিবাহকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন:

"এখন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবা বিবাহের কর্তব্যতা প্রমাণ হইল। হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে এ বিপদ কদাচ ঘটিত না, কিন্তু 'নির্বাণদীপে কিম্ তৈল দানং' এক্ষণে আর কি উপায় আছে। হা! আমি বিধবা বিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছি।"

পরিবর্তিত ও অনুশোচনাদগ্ধ কীর্তিরামের এই স্বীকৃতি মূলত বিধবা-বিবাহের অনুকূলেই প্রচার কার্য নির্বাহ করেছে। তৎকালীন সমাজ-মনের মধ্যে এই বিষয়ক জিজ্ঞাসার অনুকূল ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল নানাভাবে। সুলোচনার মতো বহু বিধবাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হবার পর উল্লসিতা হয়েছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (২১ শে আগষ্ট, ১৮৫৬) পত্রিকায় 'শ্রীবিন্দু দেবী' নাম্নী

'ইচ্ছা করে সখি মোরে দেখাইতে নখে চিড়ে
বুকের ভিতরে মোর হতেছে কেমন।
গরলে-অনলে যেন করিতেছে রণ॥
কর দেখি বিবেচনা, দিবে এবে কি সান্ত্বনা
কি বলে বুঝাবে এই উদাস হৃদয়ে।
এ ছাড় সংসারে আর থাকিব কি লয়ে॥"

জনৈকা মহিলার প্রেরিত একটি পত্রের মর্মার্থকে সমগোত্রীয়া সুলোচনার প্রসংগে সাধারণীকরণ হিসেবে স্মরণ করা চলে :

'আপনারদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবা-বিবাহ চলিত হইবেক বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে, আমার শরীরে স্বামীসুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিম যে বাঁচিয়া থাকিব এ মত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণ ত্যাগ করিব, কারণ যদি আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শত ২ স্বামীহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব, যদিচ কাল বিলম্বে এই নিয়ম চলিবেক তথাপি তাহাতে আমার পক্ষে বিফল হইবে। কারণ,

'নির্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং।
বয়োগতে কিং ব নতাভিলাষ : পয়োগতে কি খলু সেতু বন্ধ ॥'

১৮৫৭ সালের ২১শে মে তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় ঘোষিত হয়েছিল, 'নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগের ফলে বহু হিন্দু যুবক দেশীয় পাড়ায় অস্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় আশুতোষ দের বাড়ীতে 'শকুন্তলা' এবং তাহার সিংহবাবুদের বাড়ীতে 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু যুবক শীঘ্রই 'বিধবোদ্বাহ ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবেন।' কিন্তু ঘোষিত হলেও শেষ পর্যন্ত 'বিধবোদ্বাহ' নাটকের পরিবর্তে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে এ নাটকের অভিনয় বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৯ সালের ২৩শে এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর দলের যুবকদের উৎসাহে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয় হল। মেট্রোপলিটন থিয়েটারে উমেশ মিত্রের এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। ১৮৫৯ সালের ২৭শে এপ্রিল 'বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় এই নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। সহৃদয় সামাজিকের মনে এই নাট্যাভিনয় কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "অভিনয় রাত্রি আটটায় আরম্ভ হয় ও তিনটা পর্যন্ত চলে। ইহাতে প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এরূপ একটি নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দু

নারীরা যে চিরবৈধব্য ভোগ করে তাহার কুফল এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যথার্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।" মঞ্চাভিনয়ের সার্থকতার মধ্য দিয়েই যথার্থ নাটকের সাফল্য প্রমাণিত হয়। সমাজরূপের বিধবা-বিবাহবিষয়ক বিতর্কিত বিষয়ই নয় —মঞ্চ সাফল্যের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক যে চরম স্বীকৃতি পেয়েছিল—তার প্রমাণ ঐ বছরেরই ৭ই মে তারিখে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের পুনরাভিনয়ে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় (১৭ই মে, ১৮৫৯) এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল—'বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই নাট্যাভিনয় দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।[১১] প্রকৃতপক্ষে এ নাটকে বিশিষ্ট সামাজিক দুর্নীতি ও সমস্যার মর্মমূলে নাট্যকার তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টির সমীক্ষা চালিয়েছিলেন।

শিমুয়েল পীবরকস রচিত 'বিধবা বিবহ নাটক (১৮৬০) যড়ঙ্গ। বাস্তবের একান্ত নগ্নরূপ নাটকখানির মধ্যে উদাহৃত হয়েছে। ভদ্রঘরের বিধবা কন্যা মনোমোহিনী পিতার ব্যভিচার পরায়ণতায় এবং প্রতিবেশী পরিবারের দুর্নীতি দর্শনে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্বে দাসীর মধ্যস্থতায় নঙ্গরা নামক এক নীচশ্রেণীর দুশ্চরিত্রের প্রলোভনে ভুলে সে গহণাপত্র চুরি করেছিল। এই লজ্জায় তার পিতামাতাকেও শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। বাস্তব কোন পরিপ্রেক্ষিত নাটকখানির মধ্যে লক্ষিত না হলেও সমসাময়িক সমাজ স্বরূপের কিছু উল্লেখ এ নাটকে আছে—"যখন এই বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ হতেছিল প্রায় সেই সময়ে দুষ্ট নিমকহারাম সিপাইগণ যাহারা এত বছর অবধি সন্তান-সন্ততির ন্যায় রাজ্যেতে প্রতিফলিত হইল একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠল।... এখন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবানচন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।"

বিধবা-বিবাহবিষয়ক আর একখানি নাটক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিত্তচাপল্য (১৮৮৭)। বালবিধবা চপলা এ নাটকের নায়িকা।

[১১] 'The pioneer and father of the widow marriage movement, Pandit Ishwara Chandra Vidyasagar came more than once and tender-hearted as he is, was moved to floods of tears"
—The Life and Teaching of Keshab Ch. Sen—P. C Majumdar

পিতৃগৃহে বাস করে বিধবার নীতিধর্ম ও পালনীয় আচারবিধি সে মেনে চলতে চেষ্টা করলেও পারে না। চারু নামক একটি যুবকের প্রতি তার মানসিক আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে। জীবনের মর্মরসের প্রতি অফুরন্ত কামনা ও আকর্ষণ তাকে সদা-পীড়িত করে রাখে। জীবনের উষ্ণ আকর্ষণে তার হৃদয় মর্মরিত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত চারু ও চপলা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হল। বিধবা-বিবাহ সমাজের লোকের কতোখানি সহানুভূতি উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিল—নাটকখানি তার প্রমাণবহ। কিন্তু নাটকটিতে বৈধব্যজীবনের দুঃখ-ময় সমস্যা ও সামাজিক তাৎপর্যের গুরুতর বিশ্লেষণ অপেক্ষা চারু ও চপলার প্রেমের চাপল্য স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে অনুসৃত হয়েছে। ফলে সমস্যাপ্রধান ঘনীভূত ভাবগাম্ভীর্য অনেকটাই তরলীকৃত হয়ে পড়েছে। স্ত্রী চরিত্রগুলির সংলাপের গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা দোষের মধ্য দিয়ে তৎকালীন অন্তঃপুর রমণীদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সমাজচিত্র হিসেবে এ অংশগুলির সংযোজনও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬) নাটকটিতেও বিধবা-বিবাহবিষয়ক আন্দোলনের প্রবাহ স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। এ নাটকের সংলাপ রীতির মধ্যে এ দেশীয় স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক বাক্‌রীতি অনুসৃত হয়নি। তথাপি বহিরঙ্গ এই ত্রুটি সত্ত্বেও এর অন্তরঙ্গ সমাজ প্রসঙ্গের মূল্যায়নকে স্বীকৃতি জানিয়েই 'সম্বাদভাস্করের সম্পাদকীয় (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) মন্তব্য করেছিলেন: "এতদ্দেশীয় বনিতারা কি কথায় কথায় কবিতা করিতে পারেন। নাপ্তিনীরা কি বিদ্যাভাস করিয়াছে কথায় ২ কবিতায় উত্তর করিতে পারে? ভদ্রজাতীয় পুরুষেরা কি বাক্যালাপকালীন স্ত্রীভাষা অর্থাৎ মেয়েলী ভাষা বলেন? বিধবোদ্বাহ নাটকের কোন ২ স্থলে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার হইয়াছে যদিও এ দোষ সামান্য দোষ বটে তত্রাচ সর্বাঙ্গ সুন্দরী চারঙ্গীদিগের গালভালে বিন্দুমাত্র স্থিতি থাকিলে যেমন সুধাসিন্ধু বদনকেও ইন্দু বলা যায় না এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থও সেইরূপ হইয়াছে।"

অজ্ঞাতনামার 'বিধবা বিষম বিপদ' (১৮৫৬) নাটক সম্বন্ধেও সম্বাদভাস্কর বলেছিলেন—'কয়েকদিবস গত হইল 'বিধবা বিষম বিপদ' নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি তাহাও বিধবাবিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছে।'

হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দলভঞ্জন' (১৮৬১) নাটকে বিধবা-বিবাহ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে গ্রাম্য দলাদলির সামাজিক অনিষ্টের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দেশের কুপ্রথার স্পষ্ট প্রকটন বিষয়ে নাট্যকারের মত— 'যখন তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহা ব্যক্ত করায় কোন হানি হইতে পারে না'। বিধবাবিষয়ক আরও কয়েকখানি প্রহসন-নাট্যের নাম উল্লেখযোগ্য—রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা-মনোরঞ্জন', বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবাপরিণয়োৎসব', যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিলাস' উল্লেখযোগ্য। রাধারমণ কর প্রণীত 'সবোজা' নামক ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য নাটকে বাঙালী সংসারের বিধবা ননদের বর্ণবিদ্বেষের স্পষ্টোজ্জ্বল চিত্র আছে। 'জনৈকা ভদ্র মহিলা প্রণীত' ত্রাস্ত 'সন্তাপিনী নাটক' ও দ্বিপত্নীকত্বের দোষ এবং বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতাই প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজ-প্রথা বহির্ভূত ও ধর্মের চক্ষে নিন্দাযোগ্য নয় যে বিবাহ—তাকে অভিনন্দনযোগ্য বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধবা-বিবাহ প্রসংগটিকে লক্ষ্য করে রচিত হলেও 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকখানির মধ্যে বাঙালী পরিবারের বিধবা জীবন সংক্রান্ত নানা দিক নিয়েই গিরিশচন্দ্র আলোচনা করেছেন। এ নাটকে তিনজন বিধবাকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অনেক বিধবা স্বেচ্ছায় অন্তরের অবরুদ্ধ বাসনায় কুলের বাহিরে বেরিয়ে আসে। পাষণ্ড নরপশুরা যৌন-কাম চেতনা চরিতার্থ করেই যখন তাদের পরিত্যাগ করে—তখন তাদের কেউ বা অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে, কেউ বা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবন্মৃত অবস্থায় কাটায়। বিধবা-বিবাহের মধ্য দিয়ে হিন্দু নারীর অন্তরে বিগত ও বর্তমান স্বামীর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের মানসিক আন্দোলন উপস্থিত হয়। নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সমর্থক বলে গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনের শান্তি, সমাজ জীবনের সুপ্রজনন নীতি ইত্যাদি ব্যাহত হয় বলেই মনে করেছেন। এই মনোভংগী থেকেই 'শাস্তি কি শান্তি'র কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। বাঙালী সমাজের ত্রিবিধ সমস্যাময় জীবন নাটকটির বিষয়বস্তু। প্রসন্নকুমার কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি। তাঁর বিধবা পুত্রবধূ বিধবার আচরণীয় নীতি-নিয়ম ও নিষ্ঠার সংযত ও দ্বন্দ্বহীন ভাবমূর্তি হিসেবে নির্মলা আদর্শ স্থানীয়া। প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতার অকালে মৃত্যু হলে

কন্যা ভুবনমোহিনীও বিপথগামিনী হল। প্রকাশের সংগে অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে ভুবনমোহিনী গর্ভিনী হয়ে গর্ভপাত ঘটাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। এদিকে বিবাহের রাত্রেই প্রসন্নের কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদাও বিধবা হল। জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনীর বিপথগামিতায় প্রসন্নকুমারের চৈতন্যোদয় হল। প্রমদার বিবাহ ব্যাপারে ভুবনমোহিনীর সংগে কথা বলতে এসে নির্জনে প্রকাশকে তাঁর বিধবাকন্যার সংগে আলাপরত দেখে তিনি বিস্ময়ের সংগেই নিজের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করলেন এবং বললেন,—'আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম জানো? প্রমদার আবার বে দেবো কিনা? —আমি উত্তর পেয়েছি, চল্লুম।' সমগ্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্যে বিবর্তিত হতে হতে বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে এবার প্রসন্নকুমার সমাজের বিরুদ্ধে এমন কি বিধাতার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাতে অভিলাষী হলেন। ভুবন ও প্রকাশের একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে প্রসন্নকুমারের উপস্থিতি ও মানস পরিবর্তন নাট্য কাহিনীর সমস্ত স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মূলত ভুবন ও প্রকাশের আচরণের সংঘাতে প্রসন্নকুমারের মনে প্রতিফলিত প্রক্রিয়াই স্ত্রী পার্বতীর কাছ থেকে বিধবাকন্যার পুনরায় বিবাহের সম্মতি চেয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙালীর সমাজ ও শিক্ষার আদর্শে স্বদেশীয় সমাজের উপর পুরুষের বিরাগ যতই আসুক না কেন—রক্ষণশীলা নারীর চিত্তলোকে সে বিক্ষেপ অনেকটাই নিস্তরঙ্গ। স্বামী প্রসন্নকুমারের কাছে বিধবাকন্যা প্রমদার পুনর্বিবাহ দেওয়া প্রসংগে স্ত্রী পার্বতীর মতামত এই জাতীয় সামাজিক মনোভাবেরই অনুকূল:

"তুমি ভালো করে বুঝে দেখ,—যা শাস্ত্রসংগত নয়, যা লোকাচার-বিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন করতে চাচ্ছ? শুনেছি, এতে দ্বিচারিণী হয়। আমরা আপনার পেটের মেয়েকে কেমন করে দ্বিচারিণী করব?"

উত্তরে প্রসন্নকুমার বলেছেন, "বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হতে ত্রাণ কর। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতিহত্যা দেখো—স্বয়ং বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করো,—তা হলে বুঝবে, কি যন্ত্রণা।" (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যম)

কিন্তু বিধবা প্রমদার বিবাহ দিয়েও তাকে সুখী করতে পারলেন না প্রসন্নকুমার। প্রতিক্রিয়াশীল অথচ সুবিধাপন্থী সমাজস্বরূপ বিধবার মধুময় দাম্পত্য জীবনের সমস্ত আশাকে আকাশ কুসুমে পরিণত করল। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ

গর্ভাঙ্কে হরমণি উক্তি করেছে,—"যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্য বিবাহ করে।" এই উক্তিই প্রমদার নববিবাহিত স্বামী ঘেঁচীর সংলাপে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে পুনর্বিবাহিতা প্রমদার দাম্পত্য জীবনের যথার্থ ট্র্যাজিক রূপকে তুলে ধরেছে :

"ঘেঁচী। তোমার স্বামী! তাই বের দিন পর-পুরুষ বলে শিউরে উঠেছিলে! মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে? টাকা পেয়েছিলুম, তোমায় নিয়েছিলুম। টাকা চাই- যোগাড় কর। বাপের কাছ থেকে পাব আর বাগানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো...... বাপের কাছে না যাও, বাগানে যেতে হবে—আমি টেনে তোমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবো।

প্রমদা। আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি—বাপের বাড়ি যাচ্ছি।

ঘেঁচী। টাকা আনতে পারো ফিরে এসো, আর বাগানে যেতে চাও—বহুৎ আচ্ছা, নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছা চলে যেও।"

পিতার ইচ্ছায় বিধবা প্রমদা ঘেঁচীর সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও অন্তরের পূর্বতন স্বামীর স্মৃতি ও সংস্কার মনস্তত্ত্বগত দিক দিয়েও প্রমদার আচরণকে স্বাভাবিক হতে দেয়নি। তাছাড়া অর্থের বিনিময়ে এ বিধবাবিবাহ বলে বিবাহের শান্তি ও পূর্ণতা এ ক্ষেত্রে আসেনি। কিন্তু পিত্রালয়ে ফিরে গেলেও সমাজ তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। হিন্দু ঘরের বধূ আর সে নয়—সে খৃষ্টান। পিত্রালয়ে তার উপস্থিতি সমূহ বিপদ ডেকে আনবে—তার ভাইকে কেউ কন্যাদান করবে না, বাড়ির দাসীরা পর্যন্ত বিদায় নেবে। প্রমদার উক্তির মধ্যে দিয়ে কঠোর সমাজের সেই মর্মান্তিক রূপ ফুটে উঠেছে :

"যদি দাসীদের একটা ঘরে শুই,—আলাদা খাই, আলাদা থাকি, তা হলেও কি জাত যাবে? হ্যাঁ, মা, তাহলে আমি দাঁড়াবো কোথায়?" (৩য় অঙ্ক। ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

পিত্রালয়ে থেকে পিতাকে বিপন্ন করতে না চেয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলে স্বামী তাকে বিতাড়িত করল। রাস্তায় বেরিয়ে মরতে চাইলেও সমাজ-নির্যাতিতা আর এক নারী প্রমদাকে আশ্রয় দিল। প্রমদার অপমৃত্যুর আশঙ্কা করে প্রসন্নকুমারের স্ত্রী পার্বতী বিকৃত-মস্তিষ্কা হলেন। নব-আইনের সামাজিক মতেই প্রমদাকে বিবাহ দিয়েছিলেন—কিন্তু ঘেঁচী সে বিবাহকে বিনা দ্বিধায় লাম্পট্য আখ্যা দিল,—"ঐ বটকৃষ্ণ আর শুভঙ্কর একটা ছুড়ি এনে মালা বদল

করে দিয়েছে—তাই বুঝি ধরা পড়েছি? আমিও তোমার যেমন জামাই, প্রকাশবাবুও তেমনি তোমার জামাই। তবে মাঝে এই বে-দেওয়া hypocrisy টা নাই।" বিধাতা কর্তৃক নির্যাতিত এবং সমাজকর্তৃক অপমানিত প্রসন্নকুমার শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করতে না পেরে ভুবনকে হত্যা করে নিজে পড়ে গিয়ে রক্তবমন করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সমসাময়িক বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যার নিন্দাই এখানে গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের শিল্প-রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি সর্বতোভাবে সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেননি। কলকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট অঞ্চলমাত্রেই তাঁর বৈচিত্র্যহীন অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল বলে তাঁর এই শ্রেণীর সামাজিক নাটক ব্যাপক রস-তাৎপর্য পায়নি। সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কোন মৌলিক চিন্তা তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করেনি—সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সমসাময়িক সমাজ নায়কদের চিন্তাধারাকেই তিনি অনুসরণ করেছেন মাত্র। তথাপি আলোচ্য নাটকখানির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত অনস্বীকার্য নয়। বিধবা চরিত্র অঙ্কনে বিশেষত নির্মলার চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্র হৃদয় চালিত শিল্পরূপের চেয়ে শাস্ত্রশাসিত নীতিরূপকেই অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। 'শান্তি কি শান্তির মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'মায়াবসান' নাটকের কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতৃবধূ অন্নপূর্ণাও নিষ্কাম সেবা ও মৃত স্বামীর সেবা-অবলম্বী ভাবজীবনের প্রতিরূপে পরিণত হয়েছে। নিষ্কাম ধর্ম প্রচারণার উদ্দেশ্য বাহিত হয়ে এই সামাজিক নাটকখানির মধ্যে সমস্যামূলক নাট্য-বৈশিষ্ট্য দানা বাঁধেনি। 'শান্তি কি শান্তি'র মধ্যেও এই জাতীয় বক্তব্য প্রকট। এ-বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন,—"নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর জীবনের ভিতর দিয়াই বৈধব্যজীবনের শান্তি আসিতে পারে, বিধবার পুনর্বিবাহের ভিতর দিয়াও নহে, কিংবা তাহার অসংযমের ভিতর দিয়াও নহে। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র এই নাটকের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিজস্ব এই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।"[১২]

রসরাজ অমৃতলাল বসু ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর দুই অঙ্কের প্রহসন 'বাবু' নাটকে ইংরেজী কেতাদুরস্ত তথাকথিত দেশহিতৈষী বাবুদের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের মত্ততা, বিধবা-বিবাহ বিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গকে

১ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন: পৃ. ১৫০

মাত্রাতিরিক্ত বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম সংস্কারক কন্দর্পকান্তকে সং সাজাবার জন্যে নাট্যকার তার চাপকানে জুতার কালি পর্যন্ত বুরুশ করে দিয়েছেন। কন্দর্পের বাড়ীর রাস্তায় স্বাধীন মহিলাগণ কর্তৃক গীত গানের মধ্যেও নাট্যকারের প্রতিপাদ্য তির্যক দৃষ্টির পরিচয় আছে :

'পতি ম'লে হাতের বালা খুল্‌বে না লো খুল্‌বো না।
বিচ্ছেদ আগুন প্রাণে আর ত
জ্বালব না লো জ্বালব না॥
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পবে দোসরা পতি,
টানলে প্রাণ তার পানে সই,
কেন চলবে না লো চলবে না॥'
(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে চরম বিদ্রূপ করা হয়েছে কন্দর্পকান্তির বৃদ্ধা আজিমাকে পুনর্বিবাহ দেবার ঐকান্তিক চেষ্টায় :

"কন্দর্প। আজিমা, অ রে রোজ রোজ, তোমার কতই বিরহ অইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাজবা না। ত্যাহত কত দিন না অইল তুমি ইলশা মাছের ঝোল মুহে দাও নাই, তোমার যে কি ক্যালেশ অইচে, বুজতি পারছ না, সৈভ্যা অইলেই বোজবা।' (৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

কতিপয় 'সভ্যমহিলার সংগীতের মধ্য দিয়েও বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বিতর্কিত প্রসংগটি ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে :

"বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি ওই রে।
স্বাধীনা ভগিনী মোরা, প্রেমরসে প্রাণ মোরা,
আ'র যেন বর্ণচোরা, বীরদাপে আয় তোরা,
উদ্ধারিব ওবে রে,
ছাঁড়ি বুড়ি বঙ্গে আর বাঁড়ী নাহি রবে রে।
উড়াব উন্নতি-ধ্বজা কত মজা পাব রে॥"

কথা :

"ঠানদি তোমায় সাজাব লো কনে।
আমি যতনে, যত এয়োগণে।

বেণী বাঁধিব ওলো রূপুলি চুলে,
থবে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে ॥"

সমাজে 'বিধবা-বিবাহদানে' যাঁরা পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন করেন—তাঁরাই আপন কন্যাকে দীর্ঘদিন অনূঢ়া রাখতে পশ্চাৎপদ নন। আনুপূর্বিক দৃঢ়বদ্ধ একটি কাহিনীর পরিবর্তে 'বাবু' নাটকে অসংলগ্ন ও কিছু বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অমৃতলালের জ্বালাময়ী আক্রমণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বিধবা-বিবাহকে 'ঠানদিদির' বিবাহের প্রতীক ধরে রঙ্গের প্রলেপে অমৃতলাল ব্যঙ্গের প্রদাহ সৃষ্টি করেছেন। অমৃতলালের নিজস্ব মনোদর্পণে শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলতারই জয় ঘোষিত হয়েছে:

'ছি ছি ছি হবো না আর ঘরের বার।
কুলবালা কুলে রবো মুখে আগুন সভ্যতার॥

সহৃদয় সামাজিকদের মনে 'বাবু' নাটকের অভিনয়ও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করে অভিনীত নাটকখানির প্রভাব সমাজে কতোখানি সুদূর প্রসারী হয়েছিল তা প্রমাণ করা চলে। 'অনুসন্ধান পত্রিকা' (১৫ই ফাল্গুন ১৩০০) মন্তব্য করেছিলেন: "বসুজ মহাশয়ের ওস্তাদী হাত 'বাবু' চিত্রে প্রস্ফুটিত। · · দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়, ছবি নয়—যেন জীবন্ত সত্য দেখিতেছি বলিয়াই বোধ হয়।" 'বাবু' প্রহসনের মর্মবাণী সমাজে কতোখানি প্রচারিত হয়েছিল—'ষ্টার' থিয়েটারে 'বাবু' নাটকে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ অভিনন্দন তা প্রমাণ করে। 'Indian Daily News -এ প্রসঙ্গে লেখেন: 'The farcical play 'Baboo' the best of its kind that has appeared on the Bengali stage occupied the board of the Star The.tre, and drew a full house.'

অমৃতলালের 'তরুবালা নাটক প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে। এটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক। 'তরুবালা' নাটকের মূল কাহিনীর সংগে সংলগ্ন বেণী-শান্তার উপকাহিনীটিকে রক্ষণশীল অমৃতলাল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করেছেন। বিধবা শান্তার মধ্য দিয়ে অমৃতলাল বিধবা-বিবাহ বিষয়ক নিজস্ব মতবাদকেই প্রকাশ করেছেন। এই প্রসংগের মধ্য দিয়ে হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের নীতি-নির্দিষ্ট একটি দিকও উদ্ঘাটিত হয়েছে। অমৃতলালের মতে শান্তা আদর্শ স্থানীয়া বিধবা। কৃচ্ছ্রতার তাপে যৌবনকে শুষ্ক করে সে

ভাবশরীরিণী। বিধবার সেই সংযম ও চরিত্রবত্তার কাছে পুরুষের সমস্ত লাম্পট্য মাথা নত করে। বিধবা-বিবাহ যে কতোখানি অযৌক্তিক তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে বেণী ও শান্তার উপকাহিনীর মাধ্যমে। তারই কিয়দংশ :

"বেণী। যথার্থ বলছি, তোমায় না পেলে বাঁচব না, তবে দিন দিন একটু একটু করে মরা কেন? যদি তুমি আমার হ'তে স্বীকার না কর, তবে তোমার সামনে এখনি মরব,—বল আমার হবে, না হয় এই দেখ ছুরি, এখনই তোমার সামনে বুকে ব'সিয়ে দিই।

শান্ত। তা যদি পাবো, তাহলে ভগ্নীকে কুকথা বলবার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে।

বেণী। বল—আমি মরি।

শান্ত। বুঝতে পেরেছ—যা করেছ, তাতে তোমার মরাই ভালো। ……আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ তা আমি বেশ বুঝতে পারি। সহ-মরণ প্রথা নাই, নইলে যেদিন পতি মরলো, সেই দিনই হাসতে হাসতে চিতায় গে উঠতে পারতুম। এখনও প্রাণ সেই পতির পায়ে, শূন্য দেহখানা লয়ে আছি, এব কোন সুখের চিন্তা নাই, আব তুমি এই দেহের জন্য নরকে যেতে রাজী, তোমার সাধ্য কি যে তুমি মর।

বেণী। শান্ত, শান্ত,! তুমি আমায বিশ্বাস করছো না?

শান্ত। …সন্ন্যাসী বলে আমি তোমার কাছে বিশ্বাস করে এসেছিলাম, কিন্তু এখন থেকে যথার্থ মহাপুরুষ হলেও তাকে প্রণাম করতে যেতে আমার মনে অবিশ্বাস হবে।

বেণী। …মাপ কর, কিন্তু প্রাণ খুলে বলছি, তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

শান্ত। …আমাকে তো অনেকদিন বিধবাবিবাহের কথা বুঝিয়েছ, কি উত্তর পেয়েছ, মনে নাই?…তাঁব নাম করা ভিন্ন শরীরের সংগে আমার মনের কোন সম্পর্ক নাই।

বেণী। শান্ত, শান্ত,! তোমার মত সতী আমি দেখিনে। আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি, লম্পট নয়—এবার আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলছি, তোমার মত স্ত্রী হলে আমি আর, এক মানুষ হতেম, সংসারে একটা আদর্শ হতেম।" (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

বিধবা শান্তার মুখে প্রযুক্ত এই সংলাপ স্পষ্টতই অমৃতলালের বিধবা-বিবাহ বিরোধী নিজস্ব মতবাদ। এই মতবাদের কোন শিল্পসংগত অনিবার্য সংযোগ নাট্য মধ্যে নেই—বক্তব্য কাহিনীর সংগে অন্তর্নিবিষ্ট নয়। তথাপি 'তরুবালা' নাটকের সামাজিক বক্তব্য বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই অভিনয় দর্শনে প্রত্যক্ষ্যভাবে তৎকালীন অনেক বিকারগ্রস্ত শিক্ষিতের চৈতন্যোদয় ও সুমতি হয়েছিল। অমৃতলালের সামাজিক বক্তব্য দর্শকসমাজে কিভাবে গৃহীত হয়েছিল—তার প্রমাণ পাই ৭ই জানুয়ারী ১৮৯১ সালের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যে:

'It has often been discussed that Bengali Theatres produce a demoralising effect on the mind of the audience, and bring degradation on society, and that sooner such institutions are done away with, the better. I quite disagree with this argument. The examples set forth by the promoters of such theatres, in producing plays connected with the social condition of the country, representing a true and real picture of young Bengal in their everyday occurrence in life are far more and productive of good results in ameliorating their condition than by mere laying down precepts. The production of the play 'Tarubala' by Amrito Lall Bose, which was put on the boards of the star Theatre on Saturday night before a large audience, was a fair sample of it. · The true position of widowhood, in a Hindu home was well defined and the character well sustained'. নাটকখানিতে কৌতুকরসের প্রাবল্যের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সামাজিক তথাকথিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়েছে।

অমৃতলালের আর একখানি নাটক 'খাস দখল'—এ নাটকে পত্নীত্যাগী কাব্যামোদী মোহিতকে ও বিধবা-বিবাহের সমর্থকদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে। উকিল লোকেশের স্ত্রী মোক্ষদা সুশিক্ষিতা, কাব্যময়জীবিতা এবং প্রেমপিপাসিতা মহিলা। লোকেশের বন্ধুস্থানীয় কবিবর মোহিত ও 'কবিতাময়ী' মোক্ষদার একজন বিশিষ্ট গুণগ্রাহী। একদিন লোকেশ কোর্ট থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলে

তিনজন ডাক্তার এবং একজন কবিরাজের রাজকীয় সমবায় চিকিৎসা পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পরে চেঞ্জে যান। লোকেশের অনুপস্থিতে মোহিত নিযমিত মোক্ষদার কাছে আসতে থাকে। এই সময় হঠাৎ বাঘের হাতে লোকেশের মৃত্যু সংবাদ পৌছলে মোহিত মহান প্রেমের বশবর্তী হয়ে বিধবা-বিবাহে উৎসুক হয়ে মোক্ষদাকে বিবাহ করতে চাইলেন। মোক্ষদাও মৃত পতি লোকেশের আত্মার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত মোহিতকে দ্বিতীয় স্বামী-রূপে গ্রহণ করতে চাইলেন। পরলোকগত স্বামীকে উদ্দেশ্য করে মোক্ষদা নিবেদন করলেন: "O my Lokes! Dear-dearest darling husband that was! তোমার ভারত, যে ভারতকে তুমি তোমার মক্কেলের চেয়েও ভালোবাসতে, যে ভারতের উন্নতির জন্য, যে বঙ্গের বিধবা ভগ্নীদিগের জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভগ্নীপতি অন্বেষণ করে বেড়াতে, সেই বঙ্গের উদ্ধারের জন্যই—আর তোমার হে প্রিয়তম ভূতপূর্ব স্বামী! তোমার মুখ রক্ষা করবার জন্যই তুমি আবার পতি পরিগ্রহ করতে যাচ্ছি।"

এদিকে বিধবা-বিবাহ সভায মনোমোহন উভয়কে বিবাহ সংক্রান্ত শপথ পাঠ করবার জন্য রেজিষ্ট্রারের জন্য অপেক্ষামান সেই সময়ে লোকেশ এসে উপস্থিত। লোকেশকে ফিরে পাবার পর মোক্ষদার সমস্ত চিত্তবিভ্রম দরীভূত হল। নাট্যকার বিধবা-বিবাহের স্বরূপ বিষয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—তার কিয়দংশ বর্ণিত হল:

"সুরেশ। যিনি বলেন যে, আমি আবার বিবাহ না কল্লে, আমার মৃত স্বামীর আত্মা ভযানক কষ্ট পাবে, তাঁকে কি আর বুঝান যায়?

নিতাই। আর পরলোকে থেকে স্ত্রী ইজ্ দি আবার একজনকে বিয়ে কচ্চে দেখতে পেলে আত্মা বুঝি ইজ্ দি ধেই ধেই ড্যানসিং, তার ওপর বর কিনা দ্যাট্ ইজ্ দি ভ্যাগাবণ্ড্ মোহিত!

সুরেশ। তা আমাদের বউ-ঠাকরুণের ত আর টাকার অভাব নেই।

নিতাই। …ঐখানেই ইজ্ দি সমাজ সংস্কার! ঐখানেই ইজ্ দি বিধবা-বিয়ে। Not is the বিধবা-বিয়ে, বাট্ বিয়ে is the iron chest!

ঠাকুরদা। নিতাই কে তোরে পাগল বলে!" (তৃতীয় অঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য)

কিন্তু শুধুমাত্র রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ স্বভাব সিদ্ধি সার্থকতাতেই অমৃতলাল তাঁর

বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি—বিধবা-বিবাহের যারা সমর্থক এবং একান্তভাবেই উগ্র-উদ্যোগী, নিজেদের সংসারে বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হতে দেখে তাঁদের মানসপ্রতিক্রিয়ার স্বরূপকেও তিনি কঠিন শ্লেষে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছেন। তৎকালীন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের অন্তর্লীন স্বরূপ অমৃতলাল নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

'লোকেশ। সে কি—সে কি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ করতে যাচ্ছিল নাকি? আমার বাড়িতে আজ কি বিবাহ সভা? আমার স্ত্রীর বিবাহ?

ঠাকুরদা। ভায়া, দেখে নাও—দেখে নাও, বেঁচে থাকলেই দেখতে হয়। বাপের বিয়ে অনেকেই অনেককে দেখায়, কিন্তু আপনার স্ত্রীর বিবাহ চক্ষে দেখা বড় যে সে পুণ্যের কর্ম নয়।"

'খাসদখল' নাটকখানি সমসাময়িককালে প্রচুর জনসংবর্ধনা লাভ করেছিল। এ নাটকের গানগুলির মধ্য দিয়েও সামাজিক বক্তব্যই বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের যথার্থ স্বরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

তৎকালীন সামাজিক একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে রক্ষণশীল এবং প্রগতি পন্থী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রভূত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছিল এবং আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের আলোচ্য বাংলা নাট্য ধারাতেও এই সামাজিক প্রশ্নটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব পুরোপুরি নাটকাকারে লিখিত না হয়েও নাট্যসংলাপ রীতিতে প্রচারিত হয়েও সমাজ বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল। প্রসংগক্রমে তার ও দু' একটি বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচ্য প্রসংগের পরিপূরক হিসেবে তা ব্যাখ্যাত হতে পারে। 'বিধবাবান্ধব' নামীয় সংলাপ রীতিতে রচিত একটি আখ্যায়িকায় নকুলচন্দ্র চক্রবর্তী এই বিষয়ের একটি নাট্যকল্প রূপ দান করেছিলেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রকাশক নিবেদন করেছিলেন : "সমাজের বিধবাবান্ধব তাহারাই, যাহারা বিধবাজীবন গঠনে বেষ্টিত, বিধবার কর্মশক্তি যদি সমাজের অন্তঃপুর কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করা যায়, তবে হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতির আশা হয়। জন্মদুঃখিনী বিধবাগণ যাহাতে সৎশিক্ষা ও দেশকাল পাত্রানুসারে যথাসাধ্য স্বধর্ম রক্ষা করিয়া, সমাজের জন্য বিবিধ প্রকারে গঠিত হইতে পারে, মামা-ভাগিনীর অতি

সহজ ঘরানা কথাবার্তায় তাহাই 'বিধবাবান্ধব' নামে প্রকাশিত হইল।" গ্রন্থটির মধ্যে বৈধব্যতত্ত্ব, বৈধব্য ধর্মের সার কথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য, বিধবার শিক্ষা, বিধবার সার্থক জীবন ইত্যাদি দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বৈধব্য প্রথা দেশাচার, না মনগড়া মত, না কি শাস্ত্রে বিহিত বিধান এই সমাজ প্রশ্নে জিজ্ঞাসু হয়ে গ্রন্থটির মুখ্য নারী চরিত্র বিধু তার মাতুলকে প্রশ্ন করছে :

'বিধু। এ সব শাস্ত্রকারদের ব্যবস্থা, না হাতে গড়া মত—এ সম্বন্ধে আমায় একটু বুঝিয়ে বল্লে, আমার অনেকটা সন্দেহ দূর হয়।

মাতুল। মা, এ সব কথা বুঝতে হলে কেবল শাস্ত্র মানলে চলবে না, সময়ানুরূপ যুক্তিও মানতে হবে; শাস্ত্রকারগণ তখনকার সময় মতে অনেক স্থলে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে মনুষ্যের হাবভাব মেজাজ বদলে গেল। (সম্ভবত কলির প্রবন্ধে) আর বৈঠক-দরবার করে, সেই ব্যবস্থা সময়ানুসারে কঠোর শাসনে বন্ধ করে দিলেন ··· আজকাল সেই পরিবর্তনের সময়ে পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রকারগণের সেই পুরাতন কথা তুলে বিধবা-বিবাহের জন্য বৈঠক-দরবার-তর্ক-বিতর্ক করে সত্যযুগ আনতে চাইলেন। এই পুরাতন রক্ত-মাংসের ভূঁইতে চাষ-আবাদ করতেই অনেকদিন কেটে যায়, তারপর ফলের প্রত্যাশা; যাক্ সে সব কথা তোমার ভাববার নয়, সমাজের কর্তার তা নিয়ে লড়াই করে যায় জয় হয়, সে পক্ষেই তোমরা। (পৃ. ৪-৬)

শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ নিষেধ' পুস্তিকায় এই জাতীয় প্রশ্নোত্তর-জাতীয় দ্বন্দ্বমানসিকতার পরিচয় আছে এবং চরিত্র পরি-কল্পনার মধ্য দিয়ে এক নাট্যরূপেও উপস্থাপিত করা চলে।

এইভাবেই লক্ষ্য করা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিধবা-বিবাহবিষয়ক প্রশ্নেও বাংল নাটকের একটি সংলক্ষ্য ভূমিকা ছিল।

বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গবিধবা' (১২৮২ সাল) রূপক নাটকটি বহরমপুর নাট্যাভিনয় সমাজ দ্বারা প্রকাশিত। 'অধর্মের' সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যারম্ভ :

"কি ছাড় নাশিতে
বিধবা সতীত্ব—দহিতে তাদের প্রাণে

বিষম বৈধব্য অগ্নি করি প্রজ্বলিত।
কে আছে তাদের রক্ষিবারে এ জগতে ?
যুঝুক আমার সনে, যে থাকে সে আসি।"

দেখি—শঠতা, স্বার্থপরতা, রতি, কাম এরা সব কোথায় গেল? শেষ পর্যন্ত রতি, কাম, শঠতা ইত্যাদিকে মর্ত্য পৃথিবীতে পাঠান হল। পৃথিবীতে এসে 'কাম' বলল :

'কা। শুনেছি বঙ্গকামিনীরা বড় সতী। পতির বিয়োগে অন্য পতি গ্রহণ করে না। আজ তাদের সতীত্ব রত্ন হরণ করব।' (পৃ. ৫)

আবার 'অধর্ম' শঠতা ও স্বার্থপরতাকে নির্দেশ করল :

'প্রাচীন যে শাস্ত্র তাহা করি লণ্ডভণ্ড
সৃজিবে তাহার স্থানে নব নব বিধি—
নব মত—যাতে বঙ্গ যায় রসাতলে।
আর দেখ প্রবেশিবে বঙ্গ নারী হৃদে,
প্রতি তন্ত্রে থাকিবে তোমরা। সুকৌশলে যাবে।
বিচিত্র মোহিনী জাল বিস্তারিয়া
বধিবে জীবনে।

হিমালয়ের পটভূমিতে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সুরুতে যোগাসনে ধর্ম আসীন এমন সময় এক বিধবার প্রবেশ :

"পৃথিবী! তুমি কি-স্বার্থপর! প্রকৃতি! লোকে তোমায় দেবী বলে, সে মিথ্যা কথা—সে কেবল শূন্য বাক্য। আমার হৃদয়ের শান্তি চলে গেছে, আমার হৃদয়ের শোক চলে গেছে, আমার আশা ভরসা সকলই চলে গেছে, আমি অকুল সাগরে ভাসছি। বিধবার ক্লেশ মোচনের জন্যে অধর্মের বিরুদ্ধাচারী হয়ে 'ধর্ম' এগিয়ে এলো। বলল, "কি যাতনা, কি কষ্ট! আমার ভারত-কন্যা বঙ্গবিধবার ক্লেশ।" সব শেষে দেবকন্যাদের উক্তির মধ্য দিয়ে বঙ্গবিধবাদের দুঃখের প্রতি সমবেদনা জানান হয়েছে :

"উঠরে দুখিনী, বিধবা কামিনী
প্রভাত যামিনী।
অবসান দুখ, হল তব ধনী,
চিরদিন তরে দেখ, উদে দিনমণি।

ঐ দেখ কত, বঙ্গ-কুল-নারী
বসন-ভূষণ অঙ্গে পরিহরি
নাবিক বিহনে, যেন কাষ্ঠ তরী
ভীষণ সংসার—সুগভীর বারি
দেখিয়ে ভয়েতে, কাঁপে থর থরি
ভাসিছে টলিছে, ডুবিছে সুন্দরী
দুলিছে গলায়, সতীত্বের হার।
বঙ্গের বিধবা অবলা কামিনী
হেরিলে তাদের মুখ সরোজিনী
মুহূর্তের তরে গলিবে তখনি
অসুর হৃদয় পাষাণ তিনি।”

৫

বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ও বাংলা নাটক

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে সমাজের বিচিত্রমুখী আন্দোলন যে ত্বরান্বিত হয়েছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই সময়কার সমাজ-প্রগতির মূলীভূত লক্ষণের ভাষ্যপাঠ করলে সমাজস্বরূপের এ দিকটিও হয়তো স্পষ্ট হয় যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরেও সাধারণ জনসমাজের মনেও সামাজিক কুপ্রথাজনিত বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতিক্রিয়া সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। জনমতের সমর্থন না পেলে সমাজ সমস্যার মূলোচ্ছেদের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হত। শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষানির্ভর নীতি দিয়েই এ পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। এই জাতীয় একটি বিশিষ্ট সামাজিক ‘ইনস্টিটিউশন’ বহুবিবাহ—কুলীনের বহুবিবাহের দোষত্রুটি সম্পর্কে সমাজ ইতিমধ্যেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,—‘বল্লালের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া ইহা সমাজের একটি অংশকে কি প্রকার বিষক্ষতে পরিণত করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে কাহারও বাকী ছিল না।’[১৩] পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সচেতনতার সংগে

১৩ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—পৃ. ৩৯

৮

সুদীর্ঘকালের লালিত অন্ধ কুসংস্কারের বিষক্রিয়ার ফল যুগপৎ সমন্বিত হয়েছিল বলেই সমাজসংস্কারমূলক কর্মসাধনার অন্তঃপ্রকৃতিতে এতো সুতীব্র শক্তি সঞ্চিত হতে পেরেছিল। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা নিরোধবিষয়ক সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হলেও এর মূলে পাশ্চাত্যশিক্ষিত সমাজাশ্রয়ী মনন ব্যতিরিক্ত প্রাচ্য সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসাধনার শক্তিকেও কার্যকর হতে দেখি। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণদের মধ্যে একদা বহুপ্রচলিত কৌলীন্য-প্রথা থেকে সমাজে 'অধিবেদন প্রথা' প্রচলিত হয়েছিল। পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই একাধিক বিবাহ প্রথায় এই নীতিকেই 'অধিবেদন প্রথা' আখ্যাত করা হত। কুলজীশাস্ত্র ও লোকশ্রুতি অনুসারে বাংলাদেশের রাজা আদিশূর[১৪] আচারবান ব্রাহ্মণের অভাব দূরীকরণের জন্যে কান্যকুব্জ কিংবা কোলাঞ্চ থেকে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী পঞ্চগোত্রভুক্ত যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে আনান —তাঁরা স্থানীয় কন্যা বিবাহান্তর এ দেশেই থেকে যান। এঁদের মোট ৫৬জন পুত্র সন্তান জন্মালে রাজা তাঁদের ৫৬টি পৃথক পৃথক গ্রাম দান করেন। এ থেকেই ব্রাহ্মণদের ৫৬ গাঁইয়ের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে স্থানীয় সাতশ ব্রাহ্মণ পরিবার আচারে-আচরণে অনভিজ্ঞতা হেতু সমাজে 'সপ্তশতী' নামে হীনপ্রভ হয়ে পড়লেন এবং পঞ্চব্রাহ্মণের পঞ্চগোত্রের বহির্ভূত করা হল এঁদের। সংস্কারবর্জিত এই ব্রাত্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঞ্চগোত্রজাত ব্রাহ্মণদের সামাজিক আদান-প্রদান চলিত ছিল না। নবম শতাব্দীতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঞীমালা সৃষ্টি করে ক্ষিতিশূর লোকান্তরিত হন। অবনীশূর এবং ধরণীশূর পর পর রাঢ়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন—তাঁদের সময় দ্বিজগণের সামাজিক সত্তার কোন পরিবর্তন হয়নি। ধবাশূরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণগণকে গুণানুসারে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন, শ্রোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা

১৪ "মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়সূচী' ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার 'ন্যায়কণিকা'য় বাচস্পতি আদিশূর নামক সমসাময়িক নরপতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'নিজভুজবীর্যমাস্থায় শূরানাদিশূরো জয়তি।' উল্লিখিত আদিশূরে সম্ভবতঃ তদানীন্তন পাল সম্রাটের সামন্তরূপে মিথিলা—বরেন্দ্রী অঞ্চলের কোন অংশ শাসন করিতেন। তাঁহার অজ্ঞাত কোন কৃতকর্মের ফলে কুলপঞ্জিকায় কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি বিষয়ক কাহিনীর সহিত তাঁহার নাম জড়িত হইতে পারে।"

—'আদিশূরের কাহিনী : ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, বিশ্বভারতী পত্রিকা—কার্তিক-পৌষ—১৩৭১

হল। ধরাশূরের কুলবিধি বংশানুক্রমিক হবার কথা নয়। কিন্তু কিছুকাল পরে লক্ষ্য করা গেল, কুলীন সন্তানেরা পিতার মর্যাদার পরিচয় ছাড়া নিজেদের স্বতন্ত্র কোন পরিচয় দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত অবনীশূর ব্রাহ্মণগণকে 'কুলাচল' ও 'স্বচ্ছোত্রীয় এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে ভাগ করলেন। এর পরেই শূরবংশের অধঃপতন সুরু হয়। ব্রাহ্মণদের বহুশাসন গ্রাম তাঁদের অধিকারের বহির্ভূত হয়। সেনশক্তির অভ্যুদয়ের পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। পঞ্চগোত্রীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের শীল-সদাচারও ইতিমধ্যে ভ্রষ্ট হতে সুরু করে। বিজয় সেন ছিলেন বৈদিকাচারে বিশ্বাসী—তাঁরই একান্ত আনুকূল্যে বৈদিক মত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকটিও সম্ভাবিত হল। তন্ত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে বল্লাল সেন সমাজের পথবিন্যাস করতে চাইলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভংগীর এই বিভিন্নতার জন্যেই তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রমুখ বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। অজ্ঞাতনামা দু জন তান্ত্রিক 'কুলার্ণবতন্ত্র' এবং 'কুলচূড়ামণি' রচনা করে এ কথাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, কুলই হল সমাজের একেবারে আদ্যাশক্তি। এই কুলধর্ম ভোগ ও যোগের সমন্বয়ে বিশিষ্টার্থক।

কুলার্ণবতন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে :

> যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
> ভোগ যোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্বাধিকং প্রিয়ে॥

(কুলার্ণবতন্ত্র ২/২৩)

যিনি যথোচিতভাবে সমস্ত কুলধর্ম পালন করবেন, সকল পার্থিব শক্তি তাঁর চোখে মহাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা দেবে। সম্মানলাভার্থে ও সম্মান-রক্ষার্থে সমস্ত প্রজা সৎপথে চলবে এই অভিলাষে বল্লাল সেন শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে নবগুণ বিশিষ্ট কৌলীন্য মর্যাদা সৃষ্টি করলেন :

> আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
> নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এর মধ্যে যাঁরা ছয়টি গুণবৈশিষ্ট্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন—তাঁরা সিদ্ধ শ্রোত্রীয় এবং অবশিষ্টরা কষ্টশ্রোত্রীয় হয়েছিলেন। সমাজে বৈশ্যদের মধ্যে যাঁরা ধার্মিক ও গুণবান এবং কায়স্থদের মধ্যে যাঁরা শ্রোত্রীয়দের

পরিচারক সন্তান—বল্লাল সেন তাঁদেরও কুলীন উপাধি দিতে মনস্থ করেছিলেন। কুলবিশুদ্ধি ও শ্রেণীবিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্যে বল্লাল সেন এই নিয়ম প্রচলিত করলেন যে, কুলীনেরা কুলীনের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। শ্রোত্রীয়ের কন্যা গৃহীতা হলেও তা দোষের হবে না। কিন্তু শ্রোত্রীয়ের কাছে কন্যাদান করা হলে কুলীন ব্রাহ্মণ কুলভ্রষ্ট হয়ে 'বংশজ' নামীয় নিম্নপর্যায়ে নেমে যাবেন।[১৫] আবার কুলীনেরা গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করলেও তাঁরা 'অরয়ঃ কুলনাশকাঃ' রূপে দৃষ্ট হবেন। বল্লাল সেন এই সমস্ত মর্যাদাকে পুরুষানুক্রমিক করেননি। তিনি নিয়ম করেছিলেন যে, প্রতি ছত্রিশ বছর ব্যবধানে একবার করে কৌলীন্যের নির্ধারণ হবে এবং তাতে গুণ ও কর্মদৃষ্টে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন নির্বাচিত হবে। সুতরাং সমাজে কুলমর্যাদা লাভার্থে সকলেই ধার্মিক হতে সচেষ্ট হলেন। বল্লাল সেন যখন দেখলেন—সম্মানিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অনাচার প্রবেশমান—ঠিক সেই সময়কার সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করেই ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, ব্রাহ্মণসমাজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি ব্রাহ্মণসমাজে কুলমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন :

> তচ্ছ্রুত্বা চ কথঞ্চিদেব নৃপতিং ততে নিবৃত্তা দ্বিজাঃ।
> রাজা চাপি তথাকরোৎ কুলবিধিং গ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ॥
> (এড়ু মিশ্র : সপ্তশতী বিবরণ)

এবং 'ভীতোঽভূন্নৃপতিস্ততো দ্বিজ গণান্ সন্তোষ্য সেরাদিভিঃ।
স্থানান্যুত্তমাধমমধ্যমতয়া ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান॥'

তৎপূর্বে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে 'কুলাচল' ও 'অচ্ছোত্রীয়' এই দুটি বিভাগ ছিল। বল্লাল সেন দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভব কুলাচলগণকে বেছে ৮টি গাঞিকে মুখ্য কুলীন—'বন্দ্যো মুখৈটী ভট্টশ্চ গাঙ্গোলী পূতিবেব চ। কাঞ্জি ঘোষ স্তথা কুন্দ এতে চাটৌ মহাকুলাঃ' এবং বাকী ১৪টি গাঞিকে গৌণকুলীন

১৫ "কন্যাদান প্রদানাভ্যাং স্বধর্ম পরিবর্ত্ততঃ।
অন্যান্য সমধর্মী চ ভবিতা রাজসম্মতঃ॥
অংশমেব বৃহদ্ধর্মঃ কুলীন স্তেন সংবৃতঃ।
কর্ত্তব্যামিতি নিশ্চিত্যা নৃপ বল্লাল সেনকঃ॥ (কুলরাম)

করলেন। এই বাইশটি গাঞির যাঁরা গুণসম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই কেবল বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেন।[১৬]

বল্লাল সেন কথিত নবধা লক্ষণ বিষয়ে হরি মিশ্রের বহু পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র কুল লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন:

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিঃ তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্॥
কুলানুক্রমতো জুষ্টঃ স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিতঃ।
ধর্মশ্রুতিস্মৃত্যাদিতঃ স এবাচার ঈরিতঃ॥
গুরৌ জ্যেষ্ঠে কুলাচার্যে নম্রতা প্রিয়ভাষণম্।
সর্বত্র মধুরং চারু ধ্রুবং স বিনয়ো মতঃ॥
পুণ্যৌঘ গুণ দোষাদি সদসৎসু বিচারণম্।
ধর্মশাস্ত্রেষু পাণ্ডিত্যং সা বিদ্যাসমুদাহৃতা॥
দূরদেশগতা কীর্তিস্তপোযোগাদিসম্ভবা।
কুলজ্ঞ প্রমুখৈর্গীতা সা প্রতিষ্ঠা নিগদ্যতে॥
শ্রদ্ধয়াপুষ্করে তীর্থে গঙ্গাক্ষেত্রগয়াদিকে।
বিসয়শ্চক্ষুবাদেশ্চ বিজ্ঞেয়ং তীর্থদর্শনম্॥
ধর্মজ্ঞানে সদোদ্যোগে ধর্মতদ্গত মানসঃ।
ধর্মে যো দৃঢবিশ্বাসো নিষ্ঠাসাপ্যভিধীয়তে॥
তুল্যায় তুল্যপর্য্যায কন্যাদান প্রদানতঃ।
উভয়োস্তুল্যধর্মত্বং সাবৃত্তিঃ পরিকল্পিতা॥
ইন্দ্রিযা দেরুপযনৈরজস্রতত্ত্বচিন্তনম্।
পূজনং কুলদেবস্য তপস্তৎ পরিকীর্তিতম্॥
পরোপকৃত্যৈ যস্ত্যাগঃ পূজানুগ্রহকাম্যয়া।
সৎপাত্রেভশ্চ দাতব্যস্তদ্দানমিহ কথ্যতে॥
এতন্নবসমাযুক্তঃ কুলীনো রাজ সম্মতঃ॥ (কুলরাম)

এই কৌলীন্যপ্রথা বল্লাল সেন কর্তৃক আদৌ সৃষ্ট হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সংশয়-

১৬ বল্লাল সেনের সময় যে সমস্ত ব্যক্তি কৌলীন্য লাভ করেছিলেন, বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থে তাঁদের লিপিবদ্ধ নামের তালিকা 'পরিশিষ্ট' ২-তে সন্নিবেশিত হল।

মূলক মতধারণা পোষণ করেছেন : "খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসনসমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসন গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্যপ্রথা বল্লাল সেন কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।"[১৭] যাই হোক্ এ সন্দেহ বিচারসহ নয়। 'অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শংকর' উপাধিধারী বল্লাল সেন বাংলার কুলজী গ্রন্থে নিঃসন্দেহে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বৈদিক মতাবলম্বী এবং স্মার্ত নীতিতে বিশ্বাসী বল্লালীয় তত্ত্ব বাংলাদেশের সমাজজীবনে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস পেলেও তার সংগে নিম্নস্তরের জনসাধারণের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। যদিও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্তব্যের আওতায় জীবনচর্যার তুচ্ছ ও মহৎ নানা দিকের ধর্মীয় ও সমাজগত আচার-আচরণকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তথাপি লোকেতিহাসের মূল্যায়নের ধারায় বল্লাল সেনের প্রচলিত বর্ণবিন্যাস ও সামাজিক স্তর-বিভাজনের প্রক্রিয়াটি সর্বৈবরূপেই ইতিহাসানুমোদিত। এ-বিষয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন : "কুলজী গ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছুমাত্র মূল্যও থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেনবর্মন আমলে পালযুগ-গঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। এই গড়ার মূলে কোন সমন্বয় বা স্বাঙ্গীকরণের আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বর্ণ বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে সমাজ বিভিন্ন স্তরে স্তরে বিভক্ত, প্রত্যেকটি স্তর সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমিত, এক স্তরের সংগে অন্য স্তরের মিলন ও আদান-প্রদানের বাধা প্রায় দুর্লংঘ্য, অনতিক্রম্য···সমাজের এই স্তরভেদ এবং স্তরে স্তরে আদান-প্রদানের বিভিন্ন বিধিনিষেধ নবগঠিত

১৭ "কুলপঞ্জীর কিংবদন্তী অনুসারে সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন (আ ১১৫৮-৭৯খ্রীঃ) কর্তৃক বাংলার সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সেন আমলের কোন গ্রন্থ বা তাম্রশাসনাদিতে কৌলীন্য প্রবর্তনবিষয়ক কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্যে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই।"

—'আদিশূরের কাহিনী'—দীনেশচন্দ্র সরকার, বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্তিক-পৌষ ১৩৭১

বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে নাই কে বলিবে?' ১৮ বর্ণভেদবুদ্ধি ও শ্রেণী-ভেদবুদ্ধি জড়িত হয়ে এই দুর্বলতা সৃষ্টি করেছিল। এক দিকে আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং অপরদিকে তন্ত্রধর্মে অনুষ্ঠিত বিকৃতি সমাজে যৌনাতিশয্যের ব্যাধি এনেছিল। বহুবিবাহ প্রথার মধ্যেও এর ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। সেনরাজাদের সর্বতোমুখী আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ কৌলীন্যমর্যাদার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে কতোখানি ব্যাপকভাবে পরিচালিত করতো, তারই পরিচয় দিয়ে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর 'আত্মজীবন-চরিতে' উল্লেখ করেছেন: "আমাদের প্রচলিত কুলীনের নিয়ম যদিও নিতান্ত ভ্রমমূলক, তথাপি তাহার উদ্ভাবন বোধ হয় মঙ্গলকামনায় হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন থাকিতে বর্তমান কুলীনদের ব্যবহার দর্শনে স্বদেশীয় রাজা অবশ্যই ইহার সন্বিধান করিতেন।...বঙ্গবাসিগণ বহুকাল হইতে আপনাদের হিতাহিত চিন্তাকরণে অক্ষম হইয়াছে, এবং রাজাজ্ঞাও ব্যবহার ধর্ম বোধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেনরাজাদের আদেশ ও তাহার পোষক। ব্যবহার শ্রুতি-স্মৃতি অপেক্ষাও মান্য হইযা রহিযাছে। পূর্বকালীন লোক কৌলীন্য মর্যাদাকে সাংসারিক সম্মানের প্রধান বলিয়া বোধ করিতেন।"

লক্ষণ সেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে শ্রোত্রীয়দিগের দ্বিতীযবার নির্বাচন করে কৌলীন্য মর্যাদা দানের সময হল। এই নির্বাচনেব ফলে বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাদড় গাঁই কুলীনেরা পতিত হয়ে 'সিদ্ধশ্রোত্রীয়' হলেন। রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি কুলীন পতিত হযে 'বংশজ' নামে খ্যাত হলেন। এবার নিবাচনক্রমে যাদের পূর্বাপেক্ষা ন্যূন মর্যাদা হল অথবা বাঞ্ছিত উন্নতি লাভে যাঁরা বঞ্চিত হলেন—তাঁরা গোলযোগ উপস্থিত করতে সুরু করলেন। লক্ষ্মণ সেন নির্বাচন প্রথা তুলে দিযে কৌলীন্য মর্যাদাকে বংশানু-ক্রমিক করলেন। পুত্রকন্যাদের বিবাহের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ দ্বারা এই মর্যাদারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে বলে তিনি ঘোষণা করলেন। এই নবপ্রবর্তিত নিযমে নির্বাচনের গোলযোগ মিটল বটে—কিন্তু প্রকারান্তরে দীর্ঘফলপ্রসূ কিছু সামাজিক কুপ্রথা প্রশ্রয় পেলো। শ্রোত্রীয়গণ বহু ব্যয় করে কুলীনে কন্যাদান করে সামাজিক ও কৌলিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। জীবিকা নির্বাহকল্পে কেউ কেউ বিবাহকেই একমাত্র ব্যবসায় করে তুলল। এই

১৮ বাঙালার ইতিহাস (সংক্ষেপিত সংস্করণ) পৃ. ২৭২

প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে : "যে যে মহৎ গুণে প্রথম কৌলীন্য মর্যাদা লাভ হইত, কুলীন পুত্রেরা সে সমস্ত গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল বিবাহ বিষয়ে কুলরক্ষা করতঃ সম্পূর্ণ কুলগৌরব ভোগ করিতে লাগিলেন। কষ্টশ্রোত্রীয়ের সন্তান সহস্র গুণবান হইয়াও নিকৃষ্টই থাকিলেন। তাহাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না। বিবাহ বিষয়ে এইরূপ বৈষম্য হেতু ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন হইল। কষ্টশ্রোত্রীয ও বংশজদিগের বিবাহ না হওয়ায় বংশলোপ হইতে লাগল। ফলতঃ যে সদুদ্দেশ্যে বল্লাল কৌলীন্য মর্যাদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট হইয়া সেই মর্যাদা অসংখ্য অনিষ্টের কারণ হইয়াছিল।"[১৯]

বল্লাল সেনের কয়েকশ' বছর পরে দেবীবর ঘটক কর্তৃক নব্যরীতিতে ব্রাহ্মণ-শ্রেণী পুনর্বিন্যস্ত হলেন। কালক্রমে বল্লাল কর্তৃক নির্দেশিত কৌলীন্যের নবধা লক্ষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে শুধুমাত্র 'বৈবাহিক আদান-প্রদান' গুণটিই বর্তমান থাকে। দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণ সম্প্রদাযের দোষ অনুসারে তাঁদের নতুন রীতিতে 'মেলবন্ধনে' বিন্যস্ত করলেন। কুলবিশুদ্ধিকে বজায় রাখবার জন্যে তিনি বিবাহরীতিকেও সংকুচিত করে এনেছিলেন। পূর্বের 'সর্বদ্বারী বিবাহ' রীতির উদারতা হ্রাসপ্রাপ্ত হল—'ঘটক-কারিকা' বিবাহ-নির্ধারণের নিয়ন্ত্রী শক্তি হওয়ায় বৈবাহিক আদান-প্রদান সংকুচিত হয়ে পড়ল। কুলবিধি রক্ষার্থেই বিশেষ কুলীনপাত্রে একাধিক কন্যাদান অনিবার্য হযে দেখা দিল। কুলীনদের পারস্পরিক মেলবন্ধনের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেবার ফলে উভযের মধ্যে আদান-প্রদানজনিত স্বাভাবিক পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হযে এলো। কালক্রমে কুলপ্রথা ব্রাহ্মণ সমাজে বিভীষিকার কারণ হযে দেখা দিল। পাল্‌টি ঘর না পেলে কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত থাকতে হত। নারীসমাজের দুর্নীতি প্রচণ্ডভাবে দেখা দিল। অপদার্থ কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহুবিবাহকেই উপার্জনের সুলভতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করলেন। এ-বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসে বিবৃত হযেছে—"Plurality of wives had, however, become a regular practice with the Kulins in Bengal. It was a period of truimphant Kulinism, which produced some shocking evils. Those who claim high lineage virtually sold it by marrying good many wives from the families having lower social status in return for

[১৯] বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস : দুর্গাচন্দ্র সান্যাল পৃ. ৩৭

dowery in case of marriage quite regardless of age or considerations of marital adjustment.........The non-monoganeous Kulins did not actually live with their wives but only paid occasional visits at long intervals to the houses of their wives, where these unfortunate women had to stay and the attraction of such visits of Kulin sons-in-law were in most cases pecuniary profits."[২০]

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় নানা আচার-আচরণ বিষয়ে লোকের মনে যেরূপ নানা অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তেমনি এই কৌলীন্য ও বহু-বিবাহ ব্যাপারে সমাজে জনমত কতোখানি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পরিচয় হিসেবে 'সমাচার-দর্পণের' (১৮৩১, ১২ই ফেব্রুয়ারী) কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

"কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রীয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতু অর্থব্যয় ছাড়া সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহ হওয়া ভার কতশত যোত্রহীন শ্রোত্রীয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এই ক্ষণেও অনেকে ৩০/৪০/৫০ বা ততোধিক বয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবড় নাম ঘুচে কিনা বলা যায় না।"

নবগুণ বিশিষ্ট কৌলীন্যের লক্ষণ এঁদের মধ্যে কিছুই ছিল না। এঁদের চরিত্র স্বভাবকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের এই বহুবিবাহ ও কৌলীন্য কেন্দ্রিক স্বরূপের নগ্নতাই ভাষাচিত্রে বিধৃত হয়েছে :

"এইক্ষণে যে ২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জ্জিত এবং তাঁহারদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন ২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন ২ কুলীন জামাতা আপন ২ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন ২ পত্নী সহ শয়ন থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ

২০ Survey of India's social life and Economic condition in the 18th Century—K. K. Dutta.

রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধানপূর্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। কোন ২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটী হইতে স্ব ২ পত্নীকে আপন ২ গৃহে আনয়নপূর্বক ঐ ঐ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনার মজা মারিয়াছেন।" কৌলীন্য প্রথার এই ব্যাপক কুফল বিষয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাও মন্তব্য করেছেন: 'এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতিলোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন।' কৌলীন্যপ্রথার এই সর্বাত্মক বিধ্বংসী রূপকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন:

'কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
... ...
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার॥'

কৌলীন্যপ্রথার এই অত্যাচার মানবিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্ত্রীজাতির মানসিক অবস্থাকেও পর্যুদস্ত করেছিল। স্ত্রীজাতির পক্ষ থেকে ১৮৩৫ সালের ১৫ই মার্চ 'চুচুড়াবাসী স্ত্রীগণ' লেখেন:

'১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যায়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যায়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালিত হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সংগে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন।

৩। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সংগে আমারদের কখন কিছু জানাশুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়াকপালিয়ারদের সংগে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ

দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতেই বিক্রয় করা হইতেছে।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহারদের সংগে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্যা তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।'

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ৪৬ ভাগ, ১৩৪৬)

পাশ্চাত্য দেশেও এই 'কৌলীন্য' প্রথার প্রচলন বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এ-বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে : "Of course this practice was not something peculiar to the age or the clime, and in England itself the crime was painfully on the increase in the mid-nineteenth century, as testified to by judges on the bench, earnest writers in the public journals as well as by the records of the criminal courts. But here, in Bengal, the practice had assumed alarming proportions in the late eighteenth and the early nineteenth centuries becausc of the system of 'Kulin' polygamy which was recognised institution in the Bengali society of those days"[২১]

আমাদের সমাজব্যবস্থায় বহু পরিব্যাপ্ত এই বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশীয় কুরীতি উৎসাদনার্থ কুলীনদের সম্বোধন করে যুক্তি ও বুদ্ধি গ্রাহ্য পদ্ধতিতে আবেগাত্মক বিবৃতি দিযে বলা হয়েছে,—"হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপূর্বক আপনারদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্মের আস্বাদ বশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। যদি বলেন বল্লাল সেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লাল সেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমণীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্তি হইয়া ঈশ্বরাহৃত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয়ঃ

২১ Reform and Regeneration in Bengal —Dr. A Mukherjee P. 214

বোধ হইতে পারে?" 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় (১৭৬৪ শক ভাদ্র) প্রকাশিত 'অধিবেদন' পর্যায়ে বহুবিবাহের কুনীতিকে রাজদণ্ড দ্বারা নিবারিত করবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সামাজিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রযোজনরূপে দেখা দিলে সে-বিষয়ে আমাদের নিরপেক্ষ থাকলে চলবে না। গভর্ণমেণ্টকেও এ-বিষয়ে ভাবিত করে তোলার যথার্থ পথ নির্দেশ করে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও (৩৯ সংখ্যা, ৩০শে শ্রাবণ, ১২৭৮) সরস যুক্তি দেখিয়েছিলেন—"সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ ...এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন, শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০্ করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। অর্থসম্বন্ধ আছে শ্রবণমাত্র এ আবেদন গবর্ণমেণ্টের হৃদয়-গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।" 'সোমপ্রকাশ-এর সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী ছিল উদার—গবর্ণমেণ্ট প্রযুক্ত গুরুতর করভার যখনই জনগণ ও সমাজের কল্যাণের সামগ্রিক রূপকে পিষ্ট করেছে—'সোমপ্রকাশ' তখনই প্রতিবাদমুখর হয়েছে। কিন্তু বহুবিবাহরোধে 'কর-নির্ধারণ' প্রস্তাবটিকে অগত্যাকৃত কণ্টক দ্বারা কণ্টক শোধন সদৃশরূপে গ্রহণ করেছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি যিনি বহুবিবাহের সমর্থনে 'চিরসিদ্ধান্ত' দিয়েছিলেন—তিনিও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন: "এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্র সম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এ-পর্যন্ত প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, অপমানকর ও লজ্জাকর। ...এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চার প্রভাবে বা যে কারণে হোক্ ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে।' 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র পক্ষ থেকে বহুবিবাহনিরোধক আইন প্রণয়ন অভিলাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র আবেদন জানান। ১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরও ভারত সরকারের কাছে এই সর্তে আবেদন জানান। এই সকল আবেদনের পূর্বে বহুবিবাহ বিষয়ে বহু সামাজিক প্রতিক্রিয়াই মানস প্রস্তুতির ভূমিকা নিয়েছিল। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে' উল্লেখ করা হয়েছে: "পিতৃকুল বহুবিবাহ করিয়া প্রতিপালন হইতেছেন। মাতৃকুল বর্তমান কৌলীন্য দ্বারা জীবননির্বাহ করিতেছেন। অভিভাবক মহাশয় আমাকে বহুবিবাহ

করাইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। আমিও সন্তানগণকে বহুবিবাহ করাইলেই একপ্রকার জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারি। কিন্তু এই পাপপ্রথা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের অনিষ্টকর বলিয়াই আমি কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তকে ও সংগীতাদিতে ইহার সবিস্তর দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধনের প্রার্থনা করি।" রাসবিহারী প্রণীত কৌলীন্যবিষয়ক পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করে বিদ্যাসাগর তা অনুবাদ করে তাঁর নিজের ইংরেজি অনুবাদের সংগে মুদ্রিত করেছিলেন। রাসবিহারীর বহুবিবাহবিষয়ক গানও এককালে প্রচুর জন সমাদর ও সামাজিক মূল্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিল:[২২]

১. (কুলীন তনয়াদিগের উক্তি)

'(হায়) কি বিপদসাগর মোদের বিদ্যাসাগর কাতর হল।
হারে নিদারুণ বিধি আর বা কি বাকী র'ল।
লর্ড মেও উৎসাহী ছিল, (তারে) অকালে কালে হরিল,
কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণ পেলো,
(মোদের) কপালেই সকল হল।'

২. (তদানীন্তন ছোট লাট ক্যাম্পবেল সাহেবকে সম্বোধন করে কুলীন কন্যাদের বেদনা বিষয়ে)

'কেম্বল! কেন তোমার হল এমন উল্‌টো মত।
এ ভারত রসাতলের পথ······
নূতন নিয়ম তোমার সকল নূতন মত,
নাহি মান কার কথা, বল নূতন নূতন কথা,
হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ;
আসল পথে নাইক তোমার কিছুই মত,
(দেখ) বিদ্যাসাগর বিচার করে,
রাসবিহারী ঘুরে মরে
আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ?'

'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকায় এই জাতীয় গানগুলি প্রকাশিত হলে তা বহুল প্রচলিত হয় এবং তা লোকসংগীতের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই গানগুলির

২২ এই বিষয়ক আরও সংগীত 'পরিশিষ্ট' ৩-এ সংযোজিত হয়েছে।

অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গোক্তি ক্রমশঃ সামাজিক ব্যক্তিবর্গের মনে পরিবর্তন আনতে লাগল :

'দিলেম যৌবন রতন, কাকের মতন,
বুড়ো মামার গলে তুলে।
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে,
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে।'

রাসবিহারী মুখোপাধ্যাযের চেষ্টাতেই নামমাত্র কুলীন সৎপাত্র পেলেও কন্যা প্রদত্ত হতে লাগল। ইতিপূর্বে শ্রোত্রীয় ও বংশজরা কিঞ্চিৎ উন্নত অবস্থায় উপনীত হলেই বহুবিবাহকারী প্রধান কুলীনপাত্রে বিবাহ দান করে কন্যার ভবিষ্যৎ ট্র্যাজিক পরিণামকেই ডেকে আনতেন। নিজে কুলীন ও বহুবিবাহকারী হযে এই 'বহুদোষাকর অধিবেদন প্রথা'র পরিণতিকে আপন মর্মে উপলব্ধি করেই আত্মার শক্তিকে তিনি তাঁর আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন। বহুবিবাহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন, যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল ক্ষমতা ছিল না—সেইহেতু অর্থকৃচ্ছ্রতার সমাধানের জন্যে বহুবিবাহ একটি পথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক কদাচার ও অসুবিধে থেকে মেলভঙ্গ করে কুলীন সমাজকে পুনরুদ্ধার করবার যে প্রয়াস রাসবিহারী করেছিলেন—বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সেজন্য তাঁর নাম চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সমসাময়িক সামাজিকদের এই বিপুল স্বীকৃতি তারই পরিচায়ক : "সর্বাঙ্গবিকারপূর্ণ বর্তমান হিন্দুসমাজের কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থে যিনি সচেষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। রাসবিহারীবাবু যদি কুলীনদিগের মেলভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক অসুবিধা ও কদাচার হইতে কুলীন সমাজকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন।[২৩]

১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রোধ করবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন পত্র পেশ করার পর চব্বিশজন ব্যক্তির একটি ডেপুটেশন এবং বর্ধমানের মহারাজার পক্ষ থেকেও বিবাহবিরোধী একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "I have taken a deep interest in the question since

২৩ ভারত সংস্কারক পত্রিকা : ১২৮৩ সাল, ১২ সংখ্যা

it was first seriously agitated by our late lamented friend, Babu enactment. Vidyasager, thereupon saw the Maharaja of petitions on the subject had been presented to the legislative council, Sir John Grant promised very shortly to introduce a Bill for the abolition of Hindu Polygamy.' ১৮৬৬ সালের বাংলা সরকার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক বহুবিবাহ প্রথার বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।[২৪] এই কমিটিতে হবহাউস, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র, রমানাথঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সামাজিক মতামতের কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল—হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারে প্রচলিত স্বাধীনতায় সরকারের হস্তক্ষেপ না করে একটা 'Declaratory Law' পাশ করাতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এইভাবে বহুবিবাহবিষয়ক একটি ব্যাপক সমাজাভিপ্রায় যখন ক্রমোন্মুখ তখন ১৮৭০ সালের ১০ই আগষ্ট বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কুলীনমহিলা ও কুলীন তনয়াদের যন্ত্রণার বাস্তব চিত্রচয়ন করে বিদ্যাসাগর সেখানে বলেছিলেন : "স্বামিগৃহবাস, স্বামীসহবাস, স্বামীদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীন কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর। এ দেশের ভঙ্গ কুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া-ধর্ম, চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত। তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। —কোন অতি-প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকলস্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানে যাই।" রাজশাসন দ্বারা এই প্রথার উচ্ছেদকরণে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হয়েও গভর্ণমেণ্টের দ্বারা সামাজিক এই নৃশংস প্রথার নিয়ন্ত্রণের তিনি বিরোধী ছিলেন না—'বস্তুতঃ রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোন হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।…আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে,ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক

২৪ 'পরিশিষ্ট' ৪-তে এই রিপোর্টের পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত হয়েছে।

হইত না, আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম।" অথচ বহুবিবাহ প্রপীড়িত বাংলার সামাজিক জীবনের ভয়াবহ পরিণাম থেকে মুক্তি সেদিন একান্তই দরকার ছিল। বহুবিবাহের একটি বিস্ময়কর খতিয়ান উল্লেখিত হয়েছে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে—

"হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীর বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন মহাশয় ১৬২টি বিবাহ করিযাছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে যিনি সংখ্যায় অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সেরূপ দুই মহাত্মার প্রত্যেকের গৃহিণীর সংখ্যা ১০......এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মহাশয় গড়ে ১১টির অধিক বিবাহ করিযাছিলেন। আর যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক কৌলীন্য রক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৫৫ বছর তখন তিনি কুড়ি গণ্ডা বিবাহ করিয়া অক্ষয় কীর্তি সঞ্চয় করিযাছিলেন........বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের যে দু'খানি তালিকা সংগ্রহ করিযাছিলেন, তাহাতে যে বিচিত্র বিবরণ বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই।.........এই তালিকাভুক্ত ১৭৭ খানি গ্রাম.....ঐ সকল গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়দিগের মোট সংখ্যা ৬৫২; ইঁহারা সর্বসমেত ৩৫৮৮টি বঙ্গবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বরিশাল জেলার কলসকাটী গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে সময়ে উল্লিখিত তালিকা প্রস্তুত হইযাছিল, সেই সময় তিনি ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১০৭টি মাত্র প্রাণীর স্বামিত্বে বৃত হইযাছিলেন।" কৌলীন্যপ্রথা এই পরিচয় তালিকা-মাত্র সার নয—বৈবাহিক সম্পর্ক আর্থিক ও সামাজিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে পর্যালোচিত হলে এর মধ্যে সামাজিক অহিতের সন্ধান মিলবে। কৌলীন্য বা সিদ্ধশ্রোত্রিযতা রক্ষার্থ কিংবা মানোন্নয়ন করণার্থ কন্যাকে কুলীনে সমর্পণ আবশ্যিক সামাজিক বিধান হয়ে দাঁড়াল। কুলীন শ্রেণী প্রায়শঃ যেহেতু ধনবান নন—ফলে অনিবার্যভাবে দরিদ্রপুত্র রাজজামাতা ও দরিদ্র দুহিতা রাজরানী হতে লাগলেন। এই অসম-বিবাহ তুল্যাবস্থাপন্ন না হওয়াতে বৈবাহিক সম্পর্ক সামঞ্জস্যের মধ্যে বিধৃত না হয়ে আশ্রয়-আশ্রিত ও অনুগ্রাহক-অনুগৃহীত সম্পর্কের মধ্যে আশ্রয় পেলো। ফলতঃ দাম্পত্য সম্পর্কের সুখ সম্ভাবনাও

প্রশ্নাতীত হয়ে রইল না। অথচ উনিশ শতকের সপ্তম দশকেও কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতা বিদ্যাসাগর সংগৃহীত বহুবিবাহ তালিকা থেকেই প্রমাণিত হয়।[২৫] 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসাগর পাঁচজন প্রতিবাদীর মত ও মন্তব্যের পুনর্মূল্যায়ন করেন। রাজকুমার ন্যায়রত্নের প্রতিবাদ পুস্তিকাটির নাম 'প্রেরিত তেঁতুল'; পুস্তিকাটির বিচিত্র নামকরণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—"যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া 'প্রেরিত তেঁতুল নামে গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হইল।"[২৬]

বহুবিবাহপ্রথা কৌলীন্য প্রথাশ্রয়ী হয়ে সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করেছিল একথা ঠিক—আবার অন্য দিক দিয়ে কৌলীন্য প্রথার সংগে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিতভাবেও সমাজে বহুবিবাহেব প্রচলন ঘটেছিল। কুলীন সমাজে বহুবিবাহকারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ছিল—পত্নীদিগের ভরণ পোষণের কোন দায়িত্ব তাঁদেব ছিল না। কিন্তু কুলীনেতর সমাজের বহুপত্নীক স্বামীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হত। মেলবন্ধনের বাইরে কুলীনেতর সমাজের বহুবিবাহ প্রথায় সামাজিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটি বড় কথা ছিল না—এই শ্রেণীর বহুবিবাহ ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন ছিল। ইচ্ছাধীন বহুবিবাহ আজও আদিবাসী সমাজে প্রচলিত। এই শ্রেণীর বহুবিবাহের উদ্ভব প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন: "প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নানাকারণেই বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সেই সকল সমাজের মধ্যেই বহুবিবাহ-প্রথা সামাজিক প্রয়োজনেই একদিন উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিদের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার কাজেই নিয়োজিত হয়।"[২৭] কৌলীন্যপ্রথায় এই ভোগলালসার ও অনাচারের ঘৃণ্য প্রকৃতি বহুবিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজে সমস্যারূপ সৃষ্টি করল। কুলীন কন্যার সেই অন্তর্বেদনার ট্র্যাজিক রূপকে কবিরা তুলে ধরেছেন:

২৫ পরিশিষ্ট (৫)-তে তালিকাটি প্রদত্ত হল।

২৬ পরিশিষ্ট (৬)-তে পুস্তিকাটি উদ্ধৃত হল।

২৭ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন পৃঃ ৬৯

ক. "হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য আশ্রিত !
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস পালিত ।"

খ. "যে জন স্বকৃতভঙ্গ ভূমিতে না পড়ে অঙ্গ
শতেক দু'শত যার নারী ।
যেখানে যেখানে যায়, জামাই আদরে খায়
মুদ্রা লইবারে বাড়ে জারি ॥
দু'চারি বৎসর পরে যদি পতি পায় ঘরে—
তাহে হয় এরূপ ঘটন ।
টাকা দেহ এই বুলি প্রায় হয় চুলোচুলি
দ্বন্দ্বে হয় রজনী বঞ্চন ॥
ইথে কি সতীত্ব থাকে জাতিকুল কেবা রাখে
বিবাহ সে সংস্কার মাত্র ॥"

ধীরে ধীরে সমাজের এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি হতে লাগল। সমাজের স্বার্থেই বহুবিবাহ প্রথাকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকার সেই বক্তব্যের মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল: "আমাদের দেশের কন্যার বাজার দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহাতেই বোধ হয় কন্যা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহার দুইটা কারণ এই যে, আমাদের দেশে কন্যার ভাগ সমান হয় না, আমাদের দেশের পুরুষরা কন্যা নষ্ট করিয়া থাকেন; এক পুরুষে দুইটি বিবাহ করিলেই তিনি একজন পুরুষকে বঞ্চিত করিবেন। কারণ পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হউক, বহুবিবাহ উঠিয়া যাউক, কন্যার মূল্য একেবারে কমিয়া যাইবে। কারণ কন্যা ঘরে মজুত কিংবা রপ্তানী করিবার বস্তু নয়। অনেকে বলেন, সামাজিক কোন উন্নতির নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লওয়া কর্তব্য নয়। তাঁহারা বোধ হয় হিন্দু রাজা হইলে সাহায্য লইতে আপত্তি করিতেন না।" ইতিপূর্বেও অমৃতবাজার পত্রিকা এডুকেশন গেজেটের উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন: "এডুকেশন গেজেট বলেছিলেন, আইন দ্বারা বহুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয় প্রথা নিবারণে অনেক দোষ আছে। যতই দোষ থাক, যদি হিন্দু ধর্মরক্ষিণীসভা ভ্রমবশতঃ রাজসন্নিধানে আবেদন করেন, আমরা ইহার বিরুদ্ধে

প্রবল প্রতিবাদ করিব ও পাঠকদের ইহার প্রতিকূলে মত প্রদান করিতে অনুরোধ করিব।" (১৮৭১, ২৩শে জুন) ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুনের সংখ্যাতেও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের মতামতকে আমরা সমর্থন করি। ......বহুবিবাহ দিন দিন বৃদ্ধি হয়ে সমাজকে পাপে কলুষিত করলেও তাকে উঠিয়ে দেবার জন্য আমরা রাজব্যবস্থার প্রার্থী হতাম না। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে রাজা, বিশেষতঃ বিদেশী রাজার হস্তক্ষেপ রাজনীতি বিরুদ্ধ।"

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিরোধ করণে রাজবিধির সহায়তা চেয়েও পাননি। এক্ষেত্রে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উপেক্ষার কথা উল্লেখ না করলে এ আন্দোলনের ইতিহাসের যথাযথ তাৎপর্য অপূর্ণ থেকে যায়। শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজের চৈতন্যোদয়ের জন্য জনমনের নিরুদ্যম অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর অনেক মন্তব্যই করেছিলেন। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, আমাদের শাস্ত্রাদি বহু-বিরোধী মন্তব্যে এমনভাবেই ভারাক্রান্ত যে, শুধুমাত্র তাকে আশ্রয় করে কোন বৃহত্তর সামাজিক প্রগতিসাধন সম্ভব নয়। কালানুবোধে অর্থনৈতিক কারণেই এ প্রথা একদিন বিলুপ্ত হবে—এই সামাজিক তাৎপর্যে বিশ্বাসী হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রণীত কুলীন ব্রাহ্মণদের তালিকার তথ্যনিষ্ঠার সত্যতাতেও বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসী ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বঙ্কিম-চন্দ্র পূর্বের প্রতিক্রিয়াপূর্ণ অংশ পরিহার করে উল্লেখ করেন: "অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা সমাজ সংস্কার বা সমাজ বিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে।"

কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বহুবিবাহ প্রথা এইভাবেই সমাজে বিশিষ্ট আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

৬

কৌলীন্য ও বহুবিবাহকেন্দ্রিক সমাজসংস্কার বাংলাসাহিত্যের নাট্য-শাখাকেও প্রভাবিত করেছে। সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও মনোভাবের রূপদান

করে নাটক প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে পারে। বাংলা নাটকও আলোচ্য সামাজিক সংস্কারের আশ্রয়ে শিল্পরূপ পেয়ে জনমত জাগরণ ও নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী হয়েছিল। কৌলীন্যপ্রথার নিন্দা করেই তখন অধিকাংশ সমাজসংস্কারমূলক নাটক রচিত হয়েছিল। বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রদানের তাত্ত্বিক ও সমাজপর্যালোচনাক্ষম একটি আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। এই কৌলীন্যতত্ত্ব বিষয়েও বল্লাল সেনের জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি নাটক রচিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'বল্লাল সেন নাটক' প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩২১ সালে। নাটকখানি মূলতঃ বল্লাল সেনের ইতিহাস-অবলম্বী। আনন্দভট্টের 'বল্লাল চরিতম্' গ্রন্থকেই তিনি তাঁর নাটকের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। তবে নাটকের সৌকর্যার্থে ঘটনাবলীর সম্যক পরিস্ফূর্তির জন্যে দু'একটি কাল্পনিক চিত্রেরও আশ্রয় নিয়েছেন। নাটকখানি মূলতঃ জীবনীমূলক ও তথ্যভূয়িষ্ঠ হলেও নাট্যগুণ, চারিত্রিক দ্বন্দ্বের পরিচয় নাটকখানির মধ্যে আছে। বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রদানের যে ইতিহাস আমরা পাই—আলোচ্য নাটকে বঙ্গাধিপ বল্লালের মুখ দিয়ে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। পশুপতি নামক জনৈক রাজসখার সঙ্গে রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য সভায় আলোচনারত। 'মহারাজ বল্লাল সেনের জয় হোক্' বলতে বলতে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই নাটকীয় মুহূর্তের একটি বিস্তৃত অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল :

"রাজা। আসুন, আসুন, আজ আমার সুপ্রভাত। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য—আপনাদের পাদস্পর্শে আমার ভবন পবিত্র হল।

পশু। দেখলেন মহারাজ! সকলেই ফলারে গিয়েছিলেন।

রাজা। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলি। আজ এই প্রকাশ্য রাজসভায় আপনাদিগকে কৌলীন্যমর্যাদায় বিভূষিত করবার জন্যে আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করেছি। যাঁরা এক প্রহর মধ্যে এসেছেন তাঁরা শ্রোত্রিয়; আর যাঁরা আড়াই প্রহরের মধ্যে সভাস্থ হয়েছেন, তাঁরা অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বংশজ; যাঁরা দেড় প্রহরের মধ্যে সভায় সমাগত হয়েছেন তাঁদিগকে মুখ্য কুলীন নির্ধারিত করলাম। আমার মতে—যাঁদের নিত্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে—যত বেশী সময় ব্যয় হয়েছে, তাঁরা তত অধিক তপোনিষ্ঠ এবং সদাচারী এবং

তাঁরাই নবলক্ষণ-সংযুক্ত। আরও আজ হতে আপনাদের কুল—কন্যাগত নিরূপিত হল। ইহাতে বোধ হয় আপনাদের কোন আপত্তি নাই ?

পশু। আর যাঁরা মোটেই এ সভায় উপস্থিত হন নাই, তারা আজ হতে 'সুকুলীন' হল। কেমন মহারাজ! তাই নয়? কেননা তাদের জপ-তপ আর শেষই হল না—তাই আসতেও পারলেন না,—আর সেইজন্যেই তারা ততোধিক তপোনিষ্ঠ।

রাজা। বয়স্য চুপ করো!

ব্রা-গণ। মহারাজের দত্ত সম্মানে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হলেম।

রাজা। আর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ! আপনারাই না কানোজীয় ব্রাহ্মণ সন্তান? আপনাদেরই না পূর্বপুরুষের মন্ত্রপূত সলিলে শুষ্ক গজারি বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়েছিল। সে ত আর বেশিদিনের কথা নয়। এক শতাব্দী পূর্বে মহারাজ আদিশূর আপনাদেরই পিতামহগণকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত বঙ্গে আনয়ন করেন;—ব্রাহ্মণগণ, সে আর কতোদিনের কথা!—এই অল্পদিনে আপনাদের সমাজের এমন কি অধঃপতন হয়েছে যে, আপনাদের মধ্যে কুলপ্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজন। ধিক্ আপনাদিগকে!

ব্রা-গণ। মহারাজ! আমরা কৌলীন্য-মর্যাদার ভিখারী নই,—আমরা তা চাই না—আমরা বিদায় হই, আপনার মঙ্গল হ'ক।

(প্রস্থান)

রাজা। মন্ত্রী, বুঝেছেন! এঁরা সুবর্ণ-বণিকদের পক্ষপাতী, তাই আমার প্রস্তাবিত সম্মানে উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন।

মন্ত্রী। মহারাজ—যেতে দিন। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বিষয় কি করবেন?

রাজা। আমার মনে আছে আদিদেব! রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসভায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আহ্বান করলে পাছে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হন, সেজন্য তাঁদিগকে আজকের সভায় নিমন্ত্রণ করবার আপনি আদেশ পান নাই। তাঁদের এবং আমার সমাজের যথাযোগ্য মর্যাদা আমি পরে প্রদান করবো।

মন্ত্রী। আর ক্ষত্রিয়বর্ণ—কায়স্থদিগের—

রাজা। তাঁদের কেহই আজকের সভায় উপস্থিত নাই। আর তাঁদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তবুও আমি তাঁদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্রকে কৌলীন্য

দান করলেম ; এবং দত্ত, সেন, সিংহ, পালিত, কর, গুহ ও দাস প্রভৃতিকে মধ্যমশ্রেণীর কায়স্থ বলে নিরূপিত করলেম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ৭২ ঘর কায়স্থ—কায়স্থদিগের মধ্যে অপ্রধান। তাঁদের কুল পুত্রগত নির্ধারিত হল।

মন্ত্রী। আর বৈশ্যদিগের ?

রাজা। বৈশ্যেরা একেই তো অহঙ্কারী—ধনগর্বিত ; তাদের মধ্যে কুলপ্রথা প্রবর্তিত করলে তাদের 'সামলানো' দায় হবে। তাদের বিষয়ে আমি কিছুই করবো না। (ব্রাহ্মণদিগের প্রতি) ব্রাহ্মণগণ। আজ আপনারা আসুন, আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি সভাভঙ্গ করি (প্রণামকরণ।)"

(—তৃতীয় অঙ্ক: প্রথম গর্ভাঙ্ক পৃ. ৭৯-৮১)

কিন্তু বল্লাল সেন নির্দিষ্ট কৌলীন্য প্রথা পরবর্তী-সামাজিক প্যাটার্ণ রচনার ক্ষেত্রে কতোখানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে—সে সম্বন্ধেও নাট্যকার সচেতন। নিজে নেপথ্যে থেকে দুটি কায়স্থ যুবকের পারস্পরিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার সংলাপ-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সেই সামাজিক তাৎপর্যের দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই জাতীয় একটি অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

"কিশোর। রাজা ত বামুনদের কৌলিন্যমর্যাদা প্রদান করলেন ;—আর করলেন কিনা কন্যাগত কুল,—এতে করে ভবিষ্যতে কি হবে তা জান ?

শ্যাম। কি হবে ?

কিশোর। মেয়ে ত কুলীনেই সম্প্রদান করতে হবে ;—প্রথম প্রথম তত কিছু বোঝা যাবে না ;—কিছুকাল পরে যখন কুলীনকুমার দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে —তখন হয় তো এক গৃহস্থের চার পাঁচ কন্যাকেই এক বৃদ্ধ কুলীনের করে সম্প্রদান করতে হবে ;—আর যদি ঐ কন্যাদের অবিবাহিতা মাসী থাকে, তাকেও হয়তো বাধ্য হয়েই তার হাতে তুলে দিতে হবে ; এখন বুঝলে, সম্পর্কটা কিরূপ হয়ে দাঁড়াল !

শ্যাম। তাতে আর হয়েছে কি ?

কিশোর। এই বলি শোন না, হয়তো সেই কুলীন পুত্রই আরও এমন গোটা পঞ্চাশেক বিয়ে করে রেখেছেন। এতো বিয়ে করেছেন যে, তাঁর মনেই নাই যে, অমুকের বাড়িতে তিনি নিজে বিয়ে করেছেন—কি পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন। এখন বোঝ ভায়া, এতগুলি স্ত্রীর তিনি কি করে ধর্মরক্ষা করেন, একে তো বৃদ্ধ।

শ্যাম। ধর্মই তাঁদের ধর্মরক্ষা করবেন—আর যাঁদের ধর্ম—তারাই তা রক্ষা করবেন।

কিশোর। তাই বলছিলাম ভায়া, 'খাল কেটে কুমীর এনো না।' বামুনরা ঘাড় পেতে কৌলীন্য গ্রহণ করেছেন,—পরে এর ফল ভুগবেন তাঁরাই। প্রমাণ ক'রে—গায়ের জোবে ক্ষত্রিয় হতে গেলে—পরে আমাদেরই ভুগতে হবে। সত্য—চিরকালই সত্য। যাহা সত্য—ধ্রুব, তা রোধ করবার ক্ষমতা কারো নাই। আমরা শূদ্র ভাবাপন্ন,—তা হলেমই বা। এতেও ত আমাদের মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট আছে। বিশেষ এটা তুমি জেনে রেখো যে, জাতির মধ্যে শতকরা ৫০জন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দানী লোকসকল বিদ্যমান—সে জাতি কখনই নিকৃষ্ট শূদ্রজাতি হতেই পারে না।" (৩য় অঙ্ক: ৩য় গর্ভাঙ্ক পৃ, ৯৭—৯৯)

জীবনাশ্রয়ী মৌলিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রতিভা সুস্পষ্ট সমাজচেতনাকেই অনুসরণ করেছে। সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিচয়বাহী 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকখানি যুগ ও কালের পটভূমিতে একটি দিককেই জাগ্রত বুদ্ধি ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছে। রমেশচন্দ্র দত্ত রামনারায়ণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন—ভাবসর্বস্বতা থেকে মুক্ত সমালোচকের নির্মোহ যুক্তিজাগর মনের বিশ্লেষণ হয়তো সেখানে অনুপস্থিত।[২৮] তবে বাংলা সমাজসমালোচনামূলক নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি 'কুলীনকুলসর্বস্ব'উচ্চতর সামাজিক বোধ বা Social realism-এর সংগে সম্পৃক্ত। তৎকালীন যুগের অন্তরে প্রবাহিত ছিল জীবনসম্বন্ধীয় একটা উচ্ছলিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল মানবতাবোধের মহতী উপলব্ধিত। সামাজিক কু-প্রথাকে উৎসাদিত করে জীবনেরই বৃত্তে পূর্ণ মর্যাদায় প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। যুগের অন্তরে প্রবাহিত এই উপলব্ধির বিপ্লবকে রামনারায়ণও আপন লেখনীমুখে সঞ্চালিত করেছেন। একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাব এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী কুসংস্কারের অন্ধ বিষক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমম্বিত হয়েছিল বলেই সাধারণভাবে উনিশ শতকের বাঙালীর সমাজসংস্কারমূলক কর্মসাধনার মধ্যে এই শক্তি সঞ্চারিত হতে পেরেছিল। এই শতকের কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার উপর এই

[২৮] "Kulinkulsarvaswa Natak written by Ramnarayan Tarkaratna in 1854 may be considered as the first dramatic work in the Bengali Language." —Bengali Literature

দুই দিক দিয়েই প্রত্যাঘাত লক্ষিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ-ভট্টাচার্য বলেন : "একদিকের আঘাতের তাড়নায় রামনারায়ণ তাঁহার কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকের রূপ দিয়েছিলেন, আর একদিকের আঘাতের ফলে সেদিন ইহার অভিনয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে আন্তরিক অভিনন্দিত হইয়াছে। এই জন্যই পরবর্তী বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে ইহা সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" সমাজসংস্কারমূলক নক্শা নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্বের' মধ্যে তিনি কৌলীন্যপ্রথার কুফলকে হাস্যপরিহাস ও লঘুভাবের উদ্বেলতার মধ্য দিয়ে নবতর পন্থায় রূপায়িত করেছেন। নাট্যশিল্প হিসেবে সম্পূর্ণত ত্রুটিমুক্ত না হলেও 'কুলীনকুলসর্বস্বে' চিত্রিত সামাজিক অভিপ্রায়টির বিশিষ্ট গুরুত্ব আছে। লঘু হাস্যরসাশ্রয়ী দিকটিকে অতিক্রম করে একটি গঠনমূলক দিকও স্পষ্টতঃ এই নাট্যচিত্রের প্রাণধর্মকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছে। নাটকটির 'বিজ্ঞাপন' অংশে নাট্যকার যা উল্লেখ করেছেন—তার মধ্য দিয়ে তাঁর সচেতন সমাজাভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য প্রকটিত হয়েছে : "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে,তদ্বিষযে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম। তন্নিমিত্ত 'পতিব্রতোপখ্যানে, প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে। পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্তবাবু কালীচরণ চতুর্ধরীন মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম এই যে, বল্লাল সেনীয় কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় 'কুলীনকামিনীগণের' এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত কুলীনকুলসর্বস্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাহাকে তিনি ৫০৲ পারিতোষিক দিবেন। পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম ; তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০৲ আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন। ...আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।" রামনারায়ণ তাঁর এই প্রহসন-খানিকে ষড়ঙ্কসম্পন্ন নাটকরূপেই প্রচারিত করতে চেয়েছেন। বন্দ্য ঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিটি কন্যাই অবিবাহিত। অথচ তাদের পর্যায়ক্রমিক বয়স হল বত্রিশ, ছাব্বিশ, চোদ্দ ও আটবছর। কুলপালকের অবস্থা স্বচ্ছল—তথাপি এই জাতীয় অঘটনের হেতু কি ? কেনন৷

উপযুক্ত কুলীনপাত্র মিলছে না। এটা তাঁর দিবারাত্রির প্রবল শিরঃপীড়ার কারণ —সমাজেও এ কারণে তিনি নিন্দাভাজন। অবশেষে অনৃতাচার্য এবং শুভাচার্য নামক দুই ধূর্ত ও কপট ঘটকের আনুকূল্যে চারটি কন্যাকেই একটি ষাট বৎসর বয়স্ক স্থবিরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল। বরের আরও পরিচয়—সে মূর্খ, কানা সর্বাঙ্গে দাদের দাগ ও সমস্ত মুখে বসন্তের চিহ্ন। কিন্তু, ঘটকের মতে সে সর্বোপরি কুলীন এবং 'বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।' এই পরিবেশেই চরিত্রগুলি এ নাটকে অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের বক্তব্য গভীর শ্রদ্ধায় চরিত্র-চিত্রণেও মানবরসকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কুলপালকের পারিবারিক সংকটের সামগ্রিক চিত্রণে নাট্যকার চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তান্বিত মনের সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৃতীয় অঙ্কে ব্রাহ্মণীর আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে :

'আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥
চিরকাল যত সাধ ছিল মোর মনে।
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে॥'

ব্রাহ্মণীর এতো আনন্দ কিসের? যথার্থ কুলীন বরে চার কন্যাকে সম্প্রদান করে জন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ নাশ করা। এই চারকন্যার নাম যথাক্রমে জাহ্নবী শাম্ভবী, কামিনী ও কিশোরী। বৃদ্ধ, অকাট মূর্খ—তবু 'কুলীন পাত্র ঠিক করে উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণী মেয়েদের সম্বোধন করে বললেন :

'জাহ্নবী সাম্ভবী আর কামিনী কিশোরী।
এস এস কন্যাগণ সবে ত্বরা করি॥'

এই আকস্মিক আহ্বান শুনে কন্যাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে—তারই বর্ণনা আমরা নিম্নোদ্ধৃত নাট্যাংশে পাই :

"জাহ্নবী। যাই।
সাম্ভবী। কেন মা?
কামিনী। ওমা, এই যে আমি এইচি, কি মা?
ব্রাহ্মণী। ওগো, শুন্সে শুন্সে।

(জাহ্নবী, সাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। ওমা, কি?

সান্তবী। ওমা, কেন ডাকলি ?

কামিনী। ওমা, কেন বাবা ডাকচেন ?

ব্রাহ্মণী। [পরমাহ্লাদে]

এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল, তোদের বুঝি বিবাহের ফুল ॥

জাহ্নবী। ওমা কি বল্লি ?

শান্তবী। ওমা, বুজদে পাল্যেম না।

কামিনী। ওমা, কি বল্ না মা, আবার বল্, বল্ বল্।

ব্রাহ্মণী। ওলো তোদের 'বে' হবে গো, বে হবে।"

এই কথা শুনবার পর তিনকন্যার বয়সের অনুপাতে তিনরকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। জাহ্নবীর ক্ষেত্রে ভাবটা সবিষাদ :

"জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট ॥"

সান্তবীর রূপ আশ্চর্যান্বিতার :

"বল্লাল-বিহিত কুল অকূল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মেলে ॥"

কামিনীর বয়স আরও অল্প—কাজেই সে সোৎসুকা। কিন্তু সে-ও তার মনের দুঃখ নিবেদন করেছে :

"বিফল বিফলে যায় যৌবন বহিয়ে।
কতো পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে ॥
লাজ আসে এ কথা কহিতে তোর কাছে।
কান্ত বিনা কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে ॥"

অনাস্বাদিত যৌবনের বেদনা চরিত্রটিকে করুণার্দ্র করে তুলেছে। তিন কন্যার বয়স অনুযায়ী জীবন-সম্বন্ধীয় দৃষ্টির অনুরাগ বা বিরাগ এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। হৃদয়ের অন্তস্তলকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সমাজের প্রাণহীন ধর্ম ও নীরস আনুগত্য। চতুর্থ কন্যা কিশোরীর স্বপ্নমুগ্ধ শিশুজগতে বিবাহ সমন্ধীয় কোন ধারণারই উদ্ভব হয়নি এখন পর্যন্ত। এই জাতীয় শিশুর জগৎকেও কৌলীন্যের খাতিরে বৃদ্ধের স্থবির জগতের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে মিলিয়ে দেওয়া হবে। তথাকথিত সামাজিক

রীতিকে এই ভাবমূলক বিপরীত চিত্রটির মধ্য দিয়েও রামনারায়ণ ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রগুলি সমুন্নত ভাববৈশিষ্ট্যের দ্যোতক হয়তো হয়নি—কিন্তু একটি উচ্চসংস্পর্শ মানবানুভূতি চরিত্রগুলিকে রসার্দ্র করে তাদেব মধ্যে সামাজিক তাৎপর্যকে উপলব্ধিগম্য করে তুলেছে। কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফলোৎপত্তিকে তীক্ষ্ণভাবে দেখিয়ে দেবার কারণেই নাট্যকার কুলপালকের চার কন্যার চরিত্র চিত্রণ দীর্ঘতর করেছেন—তুলনায় স্বল্পরেখ অন্যান্য চরিত্রে সমুন্নতি বা বিবর্তন আসেনি। কুলপালক, অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, বিবাহবাতুল প্রভৃতি লক্ষণীয় চরিত্রগুলি তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে আপন আপন নামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেই প্রকাশ করেছে। নাট্যকারের সুনিপুণ ব্যঙ্গনিপুণতা ও কুশলী বুদ্ধিমত্তার প্রতীকের মধ্য দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে সমাজের গতি-প্রকৃতিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে। কুলপালক যে যথার্থই কুলপালক তা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের জ্ঞানগর্ভ উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়: "কুলপা। আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি। কুলকুণ্ডলিনী কবে আমায় কুলে আনিবেন, কবে কুলরক্ষা করিবেন?"

প্রতীক রূপের দ্যোতক হিসেবে চরিত্রগুলি নাট্যকারের সমাজমুখীন বাস্তব-দৃষ্টি ও জাগ্রত বিবেকের স্মারক। ধর্মশীলের চরিত্রে ধর্মশীলতার প্রমাণে রঙ্গের প্রলেপে এই জাতীয় ব্যঙ্গের প্রদাহ আছে: 'যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতি, তদা দাতাপ্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃ-পিতামহ।' অধর্মরুচি চরিত্রটিও তার নামের সামাজিক তাৎপর্য প্রকাশে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট: 'বে কর্তে কি আলিস্যি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম—চল্যেম্ আর কি!'

নারী চরিত্র-চিত্রণে এ নাটকে নাট্যকারের সিদ্ধি সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে। সরলরৈখিক কাহিনীর মধ্যেও এক্ষেত্রে নাট্যকারের আত্যন্তিক লক্ষ্য কৌলীন্যপ্রথার বিষময় পরিণতি প্রদর্শন করানো। এই লক্ষ্যের আনুকূল্যে নাট্যকার 'বিবাহব্যবসায়ী' কুলীনদের নিন্দা তাঁদের স্ত্রীদের মুখ দিয়েই ব্যক্ত করেছেন। তাদের মুক্ত মনের পারস্পরিক কথানিবেদনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অপ্রত্যক্ষভাবে নিজের মনের সমস্ত জ্বালা ও অভিযোগকেই প্রকাশ করেছেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে নারীদের পতিনিন্দাজ্ঞাপক কয়েকটি ছড়া নীচে চয়ন

করা হল, ছড়াগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথাজনিত সামাজিক ট্র্যাজিক পরিণতি প্রকাশিত হয়েছে :

১. "সুলোচনা। কি জানিবি ওলো ধনি এ বর মাথার মণি
মোর পতি দেখে বুক ফাটে।
বয়স খতালে পর নাতি ভেবে এসে জ্বর,
কালশোভা হয়ে রাত কাটে॥

২. চন্দ্রমুখী। পতির রমণীগণ, কিছু কম এক পণ,
তবু বিয়া করি পেলে চাকি।
যৌবন বিফলে যায়, বারেক না দেখি তায়,
জীয়ন্তে মরার কি বা বাকী॥

৩. যশোদা। কি কব বরের কথা, মনে হলে মর্মব্যথা
এই হেতু কহিতে পারিনে।
তার বয়সের সম পাহাড়-পর্বত কম,
আছে কিনা ভুবন ভিতরে।"

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র ফুলকুমারী। কুলীনকন্যার বঞ্চিত ও রিক্ত জীবনকে নানা পরিস্থিতি, প্রতিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। কুলপালকের কন্যাদের ক্ষেত্রে যেমন কুলীন কন্যাদের বিলম্বিত বিবাহের বিড়ম্বনা চিত্রিত হয়েছে—তেমনি ফুলকুমারীর মধ্য দিয়ে বিবাহিতা-কুলীনকন্যার বঞ্চিত জীবনের নিদারুণ পরিচয় সমুপস্থিত। ফুলকুমারীর মধ্যে দিয়ে বিবাহিতা কুলীন কন্যাদের প্রতিনিধিত্বকে নাট্যকার প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। কাহিনীর এই অংশের খানিকটা পরিচয় উপস্থাপিত হচ্ছে। বিবাহ করে ফুলকুমারীর কুলীন স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ। হঠাৎ একদিন ঘাটে কাপড় কাচতে কাচতে সংবাদ পেলো কুলীন স্বামী ফিরেছে। ফুলকুমারীর মানসিক প্রতিক্রিয়া তখন—'সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে, পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে।' বঞ্চনাকেই জীবনের একমাত্র পাওনা বলে অভিযোগহীন স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষণিকের অতিথি স্বামীকে অভিনন্দিত করার জন্যে তার মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু বিরূপ অদৃষ্ট সেখানেও তাকে বঞ্চিত করল। দীর্ঘকালের পর প্রত্যাগত জামাতাকে সকলেই যখন সমাদরে ব্যস্ত—তখন জামাতা সদম্ভে ঘোষণা করল—'ব্যাভার না

পাইলে তিনি পা ধুইবেন না।' ফুলকুমারীর মনে প্রাথমিক আঘাত লাগল—স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ নয়, অর্থ প্রয়োজনেই এই আগমন। জননী খাড়ু বাঁধা দিয়ে যে সামান্য অর্থ জামাতার হাতে তুলে দিলেন—তাতে তার মনস্তুষ্টি হল না। জননীর বহুকষ্টের প্রয়াসে যে আহারের আয়োজন হল—তাতেও জামাতার আচার-আচরণে অশ্রদ্ধা ও বিরক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল—'ইহা খায়, উহা ফেলে নবাবী করিয়া।' রাত্রে শয়নগৃহে ঢুকেই স্ত্রীর কাছে অর্থ দাবী করলে[২৯] ফুলকুমারী তার কাটনা-কাটা বহুকষ্ট-সঞ্চিত কিছু অর্থ এনে তার হাতে দিলেও স্বামী দেবতার পরিতুষ্টিতে সক্ষমা সে হল না। পায়ে ধরে অক্ষমতার কথা জানালেও স্বামী সেই রাত্রেই আবার তাকে ত্যাগ করল। কুলীন কন্যার মনের করুণ পরিস্থিতিকে নাট্যকার তীব্র অন্তর্বেদনার সংগেই চিত্রিত করেছেন :

"অমৃতে উঠিল বিষ, কপালেরি দোষ।
যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর ॥
দর্পচূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর।
মম সম অভাগিনী আছে কোন্ দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি-বিধি হরে নিল শেষে ॥"

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে বহুবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত কন্যাবিক্রয় প্রথাকেও নিন্দিত করা হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ব্যতিরিক্ত সকল শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের মধ্যে তখন এই রীতির কিঞ্চিদধিক প্রচলন ছিল। তবে এটি একটি বিশেষ কুপ্রথামাত্র—বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। কন্যাবাণিজ্যিকেরা পাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদির কোনই মূল্য স্বীকার করতো না—অভিমত পণ প্রাপ্ত হলেই জরা-জীর্ণ, বিবর্ণ-বিরূপ পাত্রেও কন্যা সমর্পণ করতে দ্বিধা করতেন না।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মধ্য দিয়ে এইভাবেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের

২৯ "বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটিঘাটি।
জাতির যেমন হোক্ কুলে বড় আঁটি ॥
দু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥"

বাংলার সমাজজীবনের এই বিশিষ্ট দিকটি ফুটে উঠেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার (৩য় পর্ব, ১৭৭৬ মাঘ, ৩৫ খণ্ড) গ্রন্থ সমালোচনায় এই নাটকখানির বিশিষ্ট সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল: "আমরা স্বয়ং উপঢৌকনস্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকটে প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি·········উক্ত গ্রন্থের পাঠাবধি তাহার গুণবর্ণনেও আমাদিগের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু মহোদয় ব্যক্তিরা, উপকৃত ব্যক্তিকৃত-উপকারের প্রতি প্রশংসাবাদ অপেক্ষায়, পক্ষপাতবিহীন ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় অধিক শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন, এই কারণ এবং সহৃদয় আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধবশতঃ, কেবল স্বাভিমত তদ্‌গুণ বর্ণন না করিয়া 'কুলীনকুলসর্বস্ব' পাঠ-সময় তদ্‌গুণ বিষয়ে আমাদিগের মনে যে যে স্থানে যে যে ভাব উদিত হইযাছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। বল্লাল সেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্য কল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক রচনা সর্বদাই করিতেন।" এ নাটকে শুধুমাত্র হাস্যরসের অবতারণাই মুখ্য কথা নয—কুলীনকুলের দুঃখদুর্দশার ছবিমাত্র নয়, কৌলীন্য ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচণ্ড অসংগতি রয়েছে—অত্যন্ত নিগূঢ় বাস্তবঘনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে কৌতুকমাধ্যমে তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের বিচিত্র ধারার মধ্যে লোকরঞ্জনের একটি দিকও ছিল। তাঁর বিচার অনুযায়ী কৌলীন্যপ্রথার যেখানে তিনি মূঢ়তা দেখেছেন, সেখানেই সমালোচনা করেছেন। রাম-নারায়ণের মধ্যে একটা গ্রহণশীল ব্যাপক মন সদা-উপস্থিত ছিল বলেই সমাজের কোন সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকতে তিনি চাননি—তিনি 'full of fun, full of life & full of love'; রামনারায়ণের এই সকৌতুক তির্যক মনোভংগীর ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেছেন: "কুলীনকুলসর্বস্বের তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন—'কু'-তে লীন অর্থাৎ কুক্রিয়াসক্ত। আর অনুকম্পা করিবেন কাহাকে, দুঃখবোধ করিবেন কাহার জন্য? কুলীন যে অনুকম্পা চায় না, তাহার দৃষ্টি যে দূষিত। গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত—বল্লালী প্রথার সহিত তাহার সমাজের কোন সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাহার অধীন ছিলেন না। তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল, বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় নাই।"

কৌলীন্যবিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশেষ সামাজিক বিষয়বস্তুর প্রকটনে তা সংবর্ধনা লাভ করেছিল। 'বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক নিম্নোক্ত মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন: 'গুণজ্ঞ সর্বসাধারণ ব্যক্তিকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা রায়চৌধুরীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করেন। আমরা অনেক অনেক ভূম্যধিকারীর ধনের ব্যয় দেখিতেছি, তাঁহারা যে অর্থ রঙ্গরসে ব্যয় করেন, তাহার চতুর্থাংশের একাংশ যদ্যপি এই সকল দেশোপকার বিষয়ে ব্যয় করেন, তবে কি সুখের বিষয় হয় বলা যায় না।' তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও নাট্যান্দোলনের ধারা অনুসরণ করলে 'কুলীন-কুলসর্বস্বে'র বহুবার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিপুল জনসংবর্ধনার প্রমাণ-পরিচয় লাভ করা যায়। কলকাতা ও মফঃস্বলের বহু বিত্তবান নাট্যামোদীর গৃহে এই নাটক অভিনীত হয়ে সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে—নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে ১৮৫৮সালে চুঁচুড়াতে নরোত্তম পালের বাড়িতে, ১৮৫৮সালের ২২শে মার্চ বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়ীতে এই নাটকের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। স্থানীয় কুলীনবর্গ এই নাটকাভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় যে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন—তার সাক্ষ্য ১৮৫৮ সালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার ১৫ই জুলাইয়ের সংখ্যায় মেলে: "The acting of the Koolin-Koolsharbosow Natack at chinsurah has, it appears given, great offence to the Koolins of the locality"

সমসাময়িক কালে কায়স্থ জাতির কৌলীন্য দোষ দেখিয়ে রচিত হয়েছিল অম্বিকাচরণ বসুর 'কুলীন কায়স্থ নাটক' (১৮৬১); শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের পূর্বোল্লেখিত কন্যাশুল্ক গ্রহণের উপর রচিত বিশিষ্ট দু'খানি নাটক নফরচন্দ্র পালের 'কন্যাবিক্রয় নাটক' (১৮৬০) এবং জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রচিত 'আসুরোদ্বাহ নাটক' (১৮৬৯), শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া'।

১৮৬৬ সালে রামনারায়ণের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'বহুবিবাহ প্রভৃতি

কুপ্রথাবিষয়ক নব-নাটক' প্রকাশিত হয়। ১২৭৩ সালের ২২শে পৌষ (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে তাঁর পৌত্রগণ রামনারায়ণের 'নবনাটক' অভিনয় করেন। কুলীন-কুলসর্বস্বের মতো এই নাটকখানিরও একটু ইতিহাস আছে। ১২৭২ সালের শেষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্ররা একটি নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা কোন নতুন সামাজিক নাটক অভিনয় করবার অভিপ্রায় করেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ পারিতোষিক ঘোষণা করে বহুবিবাহের দোষোদ্ঘাটন করে তৎসম্বন্ধে একখানি নাটক রচনার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। রামনারায়ণই 'নবনাটক' রচনা করে এই পারিতোষিক লাভ করেন। এই নাটকখানি প্লটহীন না হলেও—প্লটের পরিকল্পনা নাটকীয়তার স্পর্শরহিত। কাহিনীটি এইরূপ—গ্রাম্য জমিদার গবেশবাবু। তিনি বিলাসিতা-প্রিয়, নিষ্কর্মা এবং চাটুকার পরিবৃত 'মূর্খের স্বর্গের' বাসিন্দা। খেয়ালবশতঃ তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। বিবাহ করবার অল্প কিছুকালের মধ্যেই তিনি যখন এই কার্যের বিষময় ফল উপলব্ধি করলেন—তখন অনুতাপের আর সীমা রইল না। তিনি স্ত্রৈণ না হলেও দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তিনি ভয় করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর ঈর্ষায় প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী ও পুত্রকে নির্যাতন করে ও তুকতাক্ ঔষধ খাইয়ে হত্যার কাহিনীর পশ্চাতে দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজস্বরূপের সংঘর্ষ ও মনস্তত্ত্বের সমুৎকর্ষত্ব লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রলেখা বুদ্ধিমতী হলেও শিক্ষা ও সংস্কার তার মধ্যে নেই। চন্দ্রলেখার মধ্যে নারীজীবনের সকল কামনা-বাসনার উষ্ণতাই বর্তমান—কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী গবেশবাবুর দ্বিতীয়া তরুণী ভার্যার বাসনা চরিতার্থ করবার কোন ক্ষমতা নেই। চন্দ্রলেখার আচরণে এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের আনুপূর্বিকতা রক্ষিত হয়েছে।

রামনারায়ণের 'উভয় সংকট' (১৮৬৯) নাটকখানির মধ্যেও বহুবিবাহের দোষোদ্ঘাটন হয়েছে। দুই স্ত্রী নিয়ে এক ব্যক্তি একই সংসারে বাস করেছেন। স্বামী সেবায় দুই স্ত্রীর প্রতিযোগিতামূলক নিরন্তর প্রয়াসে স্বামী বেচারীর প্রাণান্ত। এই উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে মানসিক দ্বিধাদীর্ণ অশান্তিকর অবস্থা নাটকখানিতে ফুটেছে।

'কুলীনকুলসর্বস্বের' অনুকরণে প্রত্যক্ষভাবেই রচিত তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' ১ম ভাগে (১৮৫৮) র বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয়েছে: 'বর্তমান

কালে, বাঙ্গলাদেশে যে সকল কদাচার ও কুপ্রথা চলিতেছে, বিশেষতঃ বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে সকল অত্যাচার চলিতেছে, নাট্যচ্ছলে সেই সমস্ত প্রকাশিত করাই এই সপত্নী নাটকের মূলোদ্দেশ্য।' উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগে নাটকখানি রচিত হয়েছিল। প্লটের মধ্যে নাটকীয় সংহতি না থাকলেও কেন্দ্রীয় ঘটনাসূত্রের প্রভাব পূর্বাপর পরিব্যাপ্ত। রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুর চিত্র-চিত্রণে নাট্যকার বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'কাদম্বিনী নাটকে'ও (১৮৬১) দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার নির্বাহের জ্বালা চিত্রিত হয়েছে।

'কস্মিন হিন্দু মহিলা প্রণীত বহুবিবাহের দোষ নির্দেশক একাঙ্ক 'বল্লালী খাত নাটক' (১৮৬৮) এবং ১৮৭২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অনূঢ়া যুবতী নাটক' উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুরের হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীন মহাশয়ের কৌতূহলার্থে শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি রচিত পঞ্চাঙ্ক নকশা-নাট্য 'কলিকৌতুক' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে ; নাটকটির প্রথম দিকে পরীক্ষিতের কাহিনী, বুদ্ধের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিদ্রোহ, কামদেবের সর্বময় প্রভাব ইত্যাদি প্রসংগ থাকলেও চতুর্থ অঙ্ক থেকেই আদিশূরের কাহিনী, বল্লালের জীবনবৃত্তান্ত, কৌলীন্যপ্রথা প্রচারের নামে ব্যভিচারিতা ইত্যাদি সামাজিক বিষয়বস্তুর আলোচনা আছে।'

মনোমোহন বসুর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'প্রণয়-পরীক্ষা নাটক'-এ (১৮৬৯) বহুবিবাহ প্রথার দোষ প্রদর্শন করা হয়েছে।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য রচিত 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' নাটকটি কলকাতা থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে নাট্যকার একটি সামাজিক কুপ্রথার উৎসাদনে বলিষ্ঠভাবেই সোচ্চার : "বঙ্গকুলচূড়ামণি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্বক এত দিবস পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া বল্লাল সেন প্রচলিত বঙ্গোন্নতি অবনতিকারিণী যে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ স্রোত নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াও প্রতিহত করিতে পারেন নাই, আমি অদ্য সেই প্রবল প্রবাহ মুখে বালিবন্ধ দিতে উদ্যত হইয়াছি।" সত্তর-পঁচাত্তর বয়সের বৃদ্ধ সুরেশের স্ত্রী যখন মৃত্যুশয্যায়—তখন থেকেই তিনি ছেলে-নাতি-নাতনী থাকা সত্ত্বেও বিবাহ

উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। স্ত্রী বিয়োগের পর বৃদ্ধ কর্তা বন্ধুদের নিকট তাঁর মনোবাসনা সালঙ্কারে নিবেদন করলেন:

"কর্তা। তা হউক। কুল দেখে কতো বেটা আসবে। আমি ফুলের মুখুটি। নৈকষ্য কুলীন-ঠাকুর—বলরাম ঠাকুরের সন্তান। তোমাদের, তোমার বাবাদের, বিয়ে দিয়ে কত টাকা আবার উল্টে পেয়েছি, কত বামুনের ৫০০, টাকা পোণ দিয়ে মেয়ে পায় না, আমার দুয়োরে গড়াগড়ি।' (পৃ. ৫)

জনৈক বন্ধু বৃদ্ধ পিতার বিবাহ বাসনা বিষয়ে পুত্রদের জ্ঞাত করলে পুত্রেরা বিরক্ত হয়, কন্যা তীব্র কটূক্তি করে। বিবাহ নিষেধ করলে 'কর্তা অপঘাতে ফাঁসী লাগিয়ে মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাইহোক্ পুত্রেরা শেষ পর্যন্ত বিবাহ সংঘটনে কোন বাধা দিলেন না। সোনারপুর থেকে একটি সম্বন্ধ প্রস্তাব এলে কর্তা অধীর হয়ে উঠলেন:

'কর্তা। কন্যাটির রূপ গুণ কহিয়া ঘটক।
খুলে দাও দেখি মোর মনের ফটক'॥

এদিকে মেয়ের বাড়ীতে সুরেশবাবুর বড় ঘরের সংবাদে সকলে বাজী পুড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বিবাহ আসরে বৃদ্ধ বর দেখে সবাই তামাসা করে। বাসর ঘরে মেয়েরা কিলচড় দিয়ে বরকে রসিকতা দিয়ে বরণ করতে গেলে বৃদ্ধ মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন। পরিশেষে নাটকের সমাপ্তিতে জনৈক গ্রাম্য কবির মুখ দিয়ে কৌলীন্য তত্ত্বের সামাজিক অসার ও ক্ষতিকর প্রতিফল বিষয়ে নাট্যকার নান্দীপাঠ করেছেন:

"বঙ্গবাসি! এখনও দেখ হে চাহিয়ে।
কত বঙ্গনারী মরে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
শৈশবে স্থবির পতি, বৈধব্য যৌবনে।
অবলা রমণী বল সহিবে কেমনে॥
একাহে আতপ-অন্নে অঙ্গ শুষ্ক হবে।
বল্লালী কৌলীন্য কি তখন স্বর্গ দেবে?"

বৃদ্ধের এই অসম-বিবাহোন্মাদনা ও কৌলীন্যের বিষময় পরিণতিই তখনকার সমাজে স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। 'নবরমণীনাটক' অর্থাৎ নাগর ও নাগরী প্রণয় প্রসঙ্গ বর্ণনাসূচক কাব্য—শ্রীরামপুর নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিরচিত। (কলিকাতা, ১২৬৮) উপেন্দ্র নগরের রাজা

মহেন্দ্র—পাটরাণী মুঞ্জরিণী—তাদের কন্যা রমণী। বিবাহ প্রস্তাব কারণে কুলাচার্য ঘটকেরা মগধ, গয়া, গান্ধার, উড়িষ্যা, বিহার, হরিদ্বার, কাঞ্চী-কামাখ্যা-কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গ অযোধ্যা কর্ণাট হয়ে ভূপালে নগরের অভ্যন্তরে কামিনী নামক এক রমণীর সংগে মিলিত হল।—

"সেই উপেন্দ্রের পতি,মহেন্দ্র সে মহামতি, ধনপতি ভাণ্ডারী যাহার। যার ধন বিতরণে, নিত্য ব্যয় দুঃখীজনে, রাজগুণ অসীম অপার॥ রমণী নামেতে কন্যা, মেদিনীর মধ্যে ধন্যা, রূপেতে গুণেতে সে সুন্দরী। বিভা দিবে নৃপবরে, সুন্দর বিদ্বান বরে, হেন বরে সুসন্ধান করি।"

তখন কুলাচার্যের সংগে কামিনীব কথোপকথন :

"ঘটকগণের প্রতি কহিছে সুন্দরী। ভবদীযগণে আমি আবেদন করি। ধনবান পুত্রে রাজা দিবে কন্যাদান। কিম্বা করিবেক দান দেখে কুলবান॥ কুলবান তারে কহি যার নবগুণ। এ গুণ ব্যতীত যাহে সে কুলে আগুন॥ শাস্ত্রে এই শ্রুত আছি কুলের লক্ষণ। বিশেষ কুপাত্রে নাহি করিবে গ্রহণ॥ শুনিযা সে কথা কহে যতেক ঘটক। ভাল কথা জিজ্ঞাসিয়া লাগালে চটক॥ শুন শুন সবিশেষ বলি গো তোমায। ধনবান পুত্র নাহি সে ভূপতি চায়॥ রূপ বিদ্যা কুলবান যদি হয বর। এবম্ভূত অলঙ্কৃত সেই যে প্রবর॥ এ কথা সুধালে সুধা করি বরিষণ। প্রকাশিযা কহ তুমি কিসের কারণ॥ কামিনী কহিল অতি মধুর বচনে। কুলের সৌবভ নাই যত আছে ধনে॥ পৃথিবী ব্যাপারে ধন সুহৃদতিশয। যাহা হতে ধর্ম কর্ম শাস্ত্রেতে নিশ্চয়॥ ধনেতে গোহত্যা পাপ খণ্ডে আমি জানি। দরিদ্রের নাহি খণ্ডে যদ্যপি সে মানী। সরস্বতী পুত্র সবে জানে না সে বিনা। যে সন্তাপ নিবারণে ধবেছেন বীণা॥ এক্ষণে যেমন বৃদ্ধি ধনের গৌরব। পুনঃ কি হইবে আর কুলের সৌরভ॥ আছে বোনপো-রা মোর ভুবনমোহন। রূপের কি কব কথা ভুবনমোহন॥ তার রূপ গুণ কুল দেখে সর্বক্ষণ। সম্বন্ধ নির্বন্ধ হেতু আসে কত জন॥' (পৃ. ৯)

১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১২ই আষাঢ় ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কুলীন বামন' নাটকটিতেও রামনারাযণের অনুরূপ কাহিনীর উপসংহার আমরা লক্ষ্য করি। বিজ্ঞাপনেও এই প্রসংগের উল্লেখ পাই : "সুশিক্ষিত এবং স্বধর্মে আস্থাবান হিন্দু সন্তানগণ দ্বারা এই সকল সংস্কার সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বল্লাল সেন সৃষ্ট কৌলীন্য প্রথার সহিত বর্তমান

কৌলীন্য প্রথার কোন সাদৃশ্য নাই। তাঁহার কুলীনত্ব ব্যক্তিগত ছিল, বংশগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন অবধিই কুলীন সমাজের অধঃপতনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখন তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে। এই গ্রন্থে তাহার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে; কিছুই অতিরঞ্জিত হয় নাই।" গ্রন্থকার নিজেও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশসম্ভূত নব্য শিক্ষিত যুবক বলে বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যেও অভিজ্ঞতার পরিচয় নিহিত আছে। কুলীন কন্যাদিগের একটি গান দিয়ে নাটকটির পটোন্মোচন হয়েছে:

"কুলীন বাড়ীর কুলীন মেয়ে, আমরা সবে ভাই।
বাপ্ ভাইযেরা সাচ্চা কুলীন—অকুলে কুলাই,
আমরা কুললক্ষ্মী তাই॥
জন্মে সিন্দুর পরব নাকো, আর সাধ নাই,
(কেবল) প্রজাপতির পাখা দেখে চক্ষু মেলে চাই,
আমরা কূল ধুইযা খাই।
কত্তাদের তো বিয়ে ব্যবসা, হিসেব কিতেব নাই,
(কা'রো) পোয়া ডজন—অর্ধ ডজন-পূরো ডজন চাই,
ওটা নিদেন পক্ষে চাই।"

রামদাস মুখুজ্যে জনৈক প্রাচীন ধনী ও বহুবিবাহকারী কুলীন তাঁর শিক্ষিত পুত্র নগেনের স্ত্রী বর্তমান সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহে উদ্যোগী হলেন কৌলীন্যাগ্রহে। এর বিরোধিতা করলেন শিক্ষিত গ্রাম্য জমিদার উপেন রায়—'ধিক তোমাদের কৌলীন্যপ্রথাকে! ধিক্ তোমাদের প্রবৃত্তিকে! যাক্ নগেনের মাথাটা খেওনা ইহাই আমার অনুরোধ।' কৌলীন্যকে উৎসাদিত করতে চেযে নব্যশিক্ষিত যুবকের প্রতিনিধি নগেন ঘটককে ব্যঙ্গ করে বলেছে: "আজ কুলীনকুলচূড়ামণিদের যশঃ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত। বিশেষ আপনারা আজ যে বৃহৎ 'বৃষোৎসর্গ' সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন তা'তে সর্বত্রই ধন্য ধন্য রব উঠল বলে।" আবার রামদাস মুখুজ্যের এক পাল মেয়ের 'দান সাগর বিয়ে' নিয়ে দু'জন শিক্ষিত ভদ্রলোক কুলীনের 'আচারোবিনয়ো বিদ্যা' ইত্যাদি নবধা লক্ষণকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন:

'অলসতা পেটুকতা আইবুড়ো মেয়ে গৃহে রক্ষণং,
বহুবিয়ে দন্তথত্ বিছে শ্বশুরগৃহে তিষ্ঠনং,

পিতাপুত্রে ভায়রা-ভাই সম্বন্ধের বন্ধনং,
বেশ্যাবৃত্তি মদ্যপানং নবধা কুললক্ষণং।'

রামদাস মুখুজ্যে কুলরক্ষার কারণে একান্ত হৃষ্টচিত্তে গিন্নিকে আনন্দিত মনের বার্তা নিবেদন করতে গেলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন,—'বহুবিবাহকারী কুলীনের মাগ আর রক্ষিতা বেশ্যা অনেকটা একরূপ। তখনই জেনে এসেছি যে বহুবিয়েকারী কুলীনের স্ত্রীকে—স্বামী মৃতই হোক্ বা জীবিতই থাক্—চিরজীবনই বৈধব্য ভোগ কত্তে হবে।' উপেনের চরিত্র পরিচয়ের মধ্য দিয়েও ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠরূপে পূজ্য হয়েছেন—কিন্তু কুপ্রথার সহায়তাকারক মূর্খ ঘটক-গুলির উপর অনাস্থা ও ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিতেও কৌলীন্য প্রভাব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যই নগেনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে :

"হিন্দুসমাজ, অধঃপতিত কুলীনসমাজ, একবার জাগ। দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, আপন পরিজনের মঙ্গলের জন্য বলি, একবার জাগ। হায় বঙ্গবাসী, তোমরা আজ স্বদেশের উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছ, কিন্তু দেশের বক্ষের উপর, তোমাদের চক্ষের উপর, এই যে সব পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে, তার কি কোন প্রতীকার করবে না? কুল-নারীগণের এক এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবিন্দুতে এক একটি জ্বলন্ত নরক বঙ্গবাসীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—সে নরক হতে তোমাদের কিছুতেই উদ্ধার নাই...... আর্য সন্তান, আর্যের কাজ কর। একবার এই পৈশাচিক অভিনয় দেশ হতে বিদূরিত কর—দেশের কল্যাণ সাধন কর।" (পৃ. ৫৯)

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে; কৌলীন্যপ্রথা যে কি পরিমাণে জীবন-যৌবন-নাশী এবং এর ফলশ্রুতি যে কতোখানি ট্র্যাজিক তা প্রমাণ করেও শেষ পর্যন্ত নাট্যকার সুখান্তক পরিণতি বজায় রেখে কৌলীন্যমুক্ত সমাজাভিমুখীন মনের পরিচয় দিয়েছেন। জয়রাম মুখোপাধ্যায় জনৈক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ-নায়ক দীননাথ তাঁরই আশ্রয়ে ও অন্নে পালিত এবং দীননাথ জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কমলিনীর প্রতি প্রণয়াসক্ত—কমলিনীও দীননাথের প্রতি আসক্ত। বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে কমলিনীকে পাত্রস্থ করবার পরিকল্পনায় জয়রামের স্ত্রী হৈমবতী বাধা দিতে গেলে জয়রাম স্ত্রীলোককে সর্ববিষয়ে মনোনিবেশ করতে বারণ করেন। কমলিনীর প্রতি দীননাথের আকর্ষণকে নির্মূল করবার মানসে

দীননাথকে কলকাতায় দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। ঘটনাক্রমে দীননাথের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। ফটিকচন্দ্র নামক ভূম্যধিকারীর লালসা কমলিনীকে গ্রাস করে তার সতীত্বকে নাশ করবার চেষ্টায় তাকে ষড়যন্ত্র করে বাড়ী থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু কমলিনী আত্মসম্মান বজায় রেখেই পালিয়ে এসে ভৈরবী মন্দিরের সেবিকার কাছে আশ্রয় পেল। দীননাথকে আশ্রয় দিল তারই সখা তারানাথ। এদিকে ফটিকচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে জয়রাম কিংবা জয়রামের স্ত্রী উভয়েই জানলেন যে, ফটিক ব্যর্থ প্রেমাস্পদ হয়ে কমলিনীকে হত্যা করেছে। যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত ফটিকচন্দ্রের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। বিকৃত মস্তিষ্ক দীননাথের সংগে শেষ পর্যন্ত কমলিনীর সাক্ষাৎকার ঘটে। সেবা দিয়ে কমলিনী দীননাথকে সুস্থ করে তুলতে চায়। মানসিক চাপে জয়রামেরও পরিবর্তন হল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করলেন:

"জয়। কৌলীন্যের সংগে আমাদিগের ধর্মের কি সংস্রব আছে বলুন দেখি? বরং দেশাচার-বশবর্তী হয়ে, সেই অভিমানের অনুরোধে, অনেক সময় আমাদিগকে ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করতে হচ্ছে। মহাশয়, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ বা ঠেকে শেখে, আমি নির্বোধ! তাই ঠেকে শিখলাম।" (পৃ. ১১৩)

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' প্রকাশিত হয়। কতকগুলি অতিরঞ্জিত সামাজিক চিত্র ও উদ্ভটত্বের বিপুল সমাবেশ সত্ত্বেও এ প্রহসনের মূল্য কমেনি। অবশ্য এই অতিরঞ্জন দোষ প্রহসন হিসেবে 'জামাইবারিক' এর ত্রুটি নয়। সমাজের একটি করুণ বাস্তব সমস্যা অবলম্বনে প্রহসনটি রচিত। পূর্বে কুলীন জামাইরা অবজ্ঞেয় হয়েও বেকার অবস্থায় শ্বশুরের অন্নে লালিত হত। প্রহসনখানির প্রথমার্ধে এই সমাজসমস্যাকে যুগপৎ হাসি ও অশ্রুজলে সিক্ত করে নাট্যকার করুণ রূপের আধার করে তুলেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে সপত্নী-ঈর্ষা কলহ পীড়িত দ্বিপত্নীক স্বামীর সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। প্রথমোক্ত সমস্যাটিকেই নাট্যকার সাধারণ্যে তুলে ধরেছেন,—"কৌলীন্যানুবোধে যাঁহারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।" বিশুদ্ধ মতবাদের সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও নাটকীয় কাহিনীর প্রবহমানতায়-স্বাধীনতা ও শিল্পরূপের পরিচয় আছে। পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীর সপত্নী কলহের যে চিত্র নাট্যকার উদ্ঘাটিত

করেছেন—তার মধ্য দিয়ে বহুবিবাহ-পীড়িত সমাজের সমস্যা-দীর্ণ রূপটির রূঢ়তা ফুটে উঠেছে।

কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার সমর্থন-জ্ঞাপক একটি নাটকেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চরিত্রের কুলীন' ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গীতি-সন্নিবেশিত এই গ্রন্থখানির মধ্যে বর্ণনাধর্মিতা, ঔপন্যাসিক নিহিত উপাদান, নানা ব্যাখ্যাত্মক মতামতের সংগে নাট্যধর্মী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। 'গানের ভাব অনুসারে গল্পের ছন্দে মিল' রাখবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজন রীতিও লক্ষিত হয়। শ্রীচরণ-গঙ্গোপাধ্যায় স্বগ্রামবাসী জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক দ্বিজের কন্যাদায়ে দুঃখিত হয়ে আপনার একমাত্র পুত্র পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক শ্রীচরণের সংগে বিবাহ দিয়ে কুলভঙ্গ করেছিলেন। কুলভঙ্গের খবর শ্রবণান্তর বহু কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে শ্রীচরণের ১৩টি বিবাহ হয়। কৌলীন্যের আত্মপক্ষ সমর্থনের আত্যন্তিক প্রযাস গ্রন্থখানিতে লক্ষিত হয়—"প্রণয়িনীগণের মনে কোন কষ্ট দিলে পাছে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি সর্বক্ষণ তাঁহাদের চিত্তবিনোদনে যত্নবান" এবং "চৌদ্দটি স্ত্রীকে তিনি তুল্যাংশে বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন।" আবার 'ক্রিয়া উপলক্ষে সীমন্তিনীগণ যখন সকলেই শ্বশুরালয়ে উপস্থিতা হন, তখন গঙ্গোপাধ্যায় অবসর মতে মধ্যে মধ্যে তারা ঘেরা চন্দ্রের ন্যায স্ত্রীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্ঞানচর্চা ও শাস্ত্রীয় কথায সকলকে সন্তুষ্টা করেন।' উপযুক্ত স্বামী-সহবাসে সকলেই সুপবিত্রা এবং বহুগুণসম্পন্না।

উনিশ শতকের শেষার্ধের এই জটিল সামাজিক কুপ্রথাটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ইংরেজী শিক্ষাদর্শের প্রভাব ও অর্থনৈতিক কারণে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হতে লাগল।

৭

বাল্যবিবাহ-কেন্দ্রিক সমস্যামূলক নাট্য প্রহসন

১৭৭২ শকের ভাদ্র সংখ্যার 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় আমাদের সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত 'অশেষ দোষাকর' কুপ্রথাগুলির উৎসাদনের নিমিত্ত

একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল: "কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে, কৌলীন্য-ব্যবস্থা, বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষ দোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে।" দেশাচারাদি বিষয়ে এতদ্দেশীয় সামাজিক মানুষের আন্তরিক প্রবল অনুরাগ কতোখানি মূলীভূত এবং সেই ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মোচন করা যে কতোখানি কষ্টসাধ্য সে-বিষয়ে সর্বশুভকরী পত্রিকা সচেতন ছিলেন। তথাপি পত্রিকায় পুরাবৃত্ত, ভূগোল বৃত্তান্ত ও পদার্থবিষয়ক প্রস্তাবাদিও ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত করে লোকের জ্ঞানচক্ষুর প্রসারতা ও উন্মীলন ঘটিযে কুসংস্কার দূরীকৃত করতে চেযেছিলেন এবং তাঁদের 'অত্যুন্নত এবং অত্যন্ত গুরু' কর্তব্য বিষযে যত্নবান হযে আংশিক সিদ্ধি ও কাম্য বলে মনে করেছিলেন। এই জাতীয় একটি বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ। বৈদিক যুগের প্রচলিত প্রথা সত্ত্বেও স্মৃতিকারদেব আমলে মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ক্রমহ্রাসমান হতে হতে প্রায় পুতুল খেলার বয়সে এসে নেমেছিল। স্মৃতিকারেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন—নগ্নিকা, গৌরী অর্থাৎ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা, রোহিনী বা নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা, কন্যা অর্থাৎ দশ বৎসর বযস্কা এবং রজস্বলা অর্থাৎ দশ বৎসরের উর্ধ্বে।[৩০] কোন কোন স্মৃতিকার নগ্নিকা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কেউ বা আবার 'জাত মাত্রা তু দাতব্যা কন্যকা সদৃশে বরে' বলে মত দিযেছিলেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 'কুলসম্বন্ধের' অর্থই ছিল এই যে, বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মালে দু এক মাসের মধ্যে সমশ্রেণীর কোন শিশু বালকের সহিত তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে রাখা হত। যদি বিবাহেব পূর্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হত, তবে কন্যা 'অন্যপূর্বা' নামে অভিহিতা হতেন। তৎপরে আর তার কুলীন বরের সংগে বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকতো না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বলেছিলেন: "আমার

৩০ অষ্ট বর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাচ রোহিনী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্দ্ধং রজস্বলা॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্‌॥

দুই পিসী এইরূপে অন্যপূর্বা হইয়া মৌলিক বরের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। এই প্রথানুসারে আমার পিতার ছয় কি সাত বছর বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববর্তী চাঙ্গরিপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশযের একমাস বযস্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।" (পৃ. ১৫)

'সবশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে রচযিতাব নাম চিহ্নিত না থাকলেও এটি যে বিদ্যাসাগবের রচিত তা বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ কিংবা যুক্তির পারম্পর্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয। তাছাড়া বিদ্যাসাগব-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থে এ-বিষযে উল্লেখ করেছেন: 'হিন্দুকলেজের সিনিযর ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইযা সর্বশুভকরী নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদ পত্রেব অধ্যক্ষ বাবু বাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ করিযা অগ্রজকে বলেন যে, "আমাদের এই নতুন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বযং লিখিযা দিন। প্রথম কাগজে আপনাব বচনা প্রকাশ পাইলে কাগজের গৌবব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্বক কাগজ দেখিবে।" ইহাদের অনুবোধেব বশবর্তী হইযা, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা বচনা কবিযাছিলেন।' (পৃ. ৮১) বিবাহবন্ধনকে শাস্ত্রপাশমুক্ত যান্ত্রিকতা উত্তীর্ণ কল্যাণমযতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেযেছেন। এই প্রবন্ধে ব্যক্ত বিদ্যাসাগবের মতামতের মধ্যে নরনাবীর বিবাহ-কেন্দ্রিক প্রাচীন স্মার্ত আচার-আচরণ নয—মানুষেব জীবন প্রতীতির নবকরণের মধ্য দিযে বিবাহের নতুন সামাজিক বৈধীকরণের প্রত্যাশী মনোভাবের পরিচয় মেলে। বাল্যবিবাহেব দোষ বিষযে তিনি বলেন,—"বাল্যকালে বিবাহ হওযাতে বিবাহেব সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের প্রণযে সংসার যাত্রা নির্বাহকরণ বিষযেও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নববিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও

প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্ত্বৎ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকার-মাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।" বাল্য প্রণয়ে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যেরও নিতান্ত অভাব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রসন্নতা না থাকলে সংসারধর্ম গ্রহণই নিরর্থক—কেননা শাস্ত্রকারগণের নির্দেশঃ "কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি। নাচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥" (মনু : ৯/৮৯)

অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী গুণ-কর্ম ও স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ কখনই হওয়া উচিত নয়। বাল্যবিবাহ যে শারীরিক ও মানসিক অপকার ও অবনতির মূল মুনি শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরী 'সুশ্রুতে' সে-বিষয়ে বলেছেন :

"উণ ষোড়শবর্ষায়াং—প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্ম দত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"
—সুশ্রুত শরীরস্থানে অঃ ১০॥

সমুদয় শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রম দেখলে মনে হয় যে, স্ত্রী পুরুষের বয়স যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ বছরের কম হলে গর্ভাধানের উপযুক্ত হয় না। মনু বিবাহে স্ত্রীর বয়স সম্বন্ধে বলেছেন :

"ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
উর্ধ্বং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥" মনু : ৯/১০

অর্থাৎ কন্যা রজস্বলা হয়ে তিন বছর যাবৎ পতির অন্বেষণ করতঃ আপনার সদৃশ পতিগ্রহণ করবে। প্রতিমাসে রজোদর্শন হলে তিন বছরে ছত্রিশবার রজস্বলা হযে পরে বিবাহ কর্তব্য এবং এর পূর্বে কিছুতেই নয়। স্বামী-স্ত্রী সমস্বভাব বিশিষ্ট না হলে সংসার শান্তিকর হতে পারে না—

'সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্॥' মনু। ৩/৬০

এই হল স্মৃতিশাসিত বিবাহ-রীতি। বাল্যবিবাহ সমাজজীবনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারায় পারিপার্শ্বিকতার চাপকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর

হতে পারেনি। কৌলীন্যপ্রথা সমাজে বাল্যবিবাহের জন্যে নিঃসন্দেহে বেশ কিছুটা দায়ী। কিন্তু এ ছাড়াও এই ব্যবস্থার সংগে নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও সম্পর্কিত ছিল। এ দেশের তুর্কী আক্রমণে হিন্দুর পারিবারিক জীবনে বিপর্যস্ত অবস্থায় যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছিল—তারই প্রভাবে শিশুকন্যাকে বিবাহ দিয়ে দায়মুক্ত হবার প্রবণতা দেখা দিল। আবার অপরদিকে ব্যাপক ধর্মান্তরণের ফলে হিন্দু সমাজে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব দেখা দিল এবং কন্যা বিক্রয় প্রথার উদ্ভব হল।[৩১] উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবনে শেষ পর্যন্ত বাল্যবিবাহ একটি বিশিষ্ট দেশাচারে পরিণত হয়েছিল এবং এই আশ্রয়ের অন্তরালে থেকেই এই বিবাহ-রীতি সমাজে আত্মরক্ষা করে চলেছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ-নিরোধবিষয়ক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ বিষয়ক সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। ঢাকা থেকে 'বাল্যবিবাহ' নামীয় একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি প্রচারমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। অবশ্য মনুর বিধান সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে বাল্যবিবাহ প্রথা অবলুপ্ত হয়েছিল। সামাজিক বুদ্ধিবাদ কিংবা অর্থনৈতিক নানা কারণ এর পশ্চাতে কার্যকর। পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রায়বাহাদুর হরবিলাস সারদা হিন্দু সমাজের সনাতনী আইনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য তিনি বাল্যবিবাহ নিরোধবিল (সারদা অ্যাক্ট) ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেন। ১৯২৯ সালের ১৯ শে নভেম্বর এই আইন পাশ হল।[৩২] তিনি বলেন—ঐ বিল যেন হিন্দুদের (যথা—সনাতনী হিন্দু, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী ও বৌদ্ধদের) প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং পনেরো বৎসরের কমে কোন বালকের এবং বারো বৎসরের কমে কোন বালিকার বিবাহ যেন অসিদ্ধ হয়। অবস্থা বিশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি অনুসারে এগারো বছরের বালিকার বিবাহের ব্যবস্থাও বিলে ছিল। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সারদা বলেছিলেন,—"১৯২১সালের সেন্সাসরিপোর্ট বা আদম সুমারী অনুসারে

৩১ পরিশিষ্ট (৭)-তে এ-বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ এই আইনের ধারা-সংবলিত বিবরণী পরিশিষ্ট (৮) -এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দেখা যায় যে, ঐ বৎসর সমগ্র ভারতে এক বৎসরের কম বয়সের ৬১২টি, পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ২০২৪টি, দশ বৎসরের কম বয়সের ৩৩২০২৪টি হিন্দু বিধবা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুর সামাজিক প্রথার ফলে ইহার বেশীর ভাগ বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ হইতে পারে না। পৃথিবীর সভ্য বা অসভ্য কোন দেশে এমন শোচনীয় অবস্থা বর্তমান নাই। সামাজিক প্রথার দ্বারা নিপীড়িতা এই সব অসহায়া বালিকাদিগের উদ্ধার করার জন্য আইনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সামাজিক রীতির উৎপত্তির কারণ ও আবশ্যকতা প্রাচীনকালে যাহাই থাকুক না কেন, বর্তমানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই, বরং ইহা ভযানক অনিষ্টকব হইযা উঠিয়াছে।" (হিন্দু সমাজের গডন : নির্মল বসু, পৃ. ১৭)

বাংলা নাটকেও এই বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যাটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নাটকে প্রতিফলিত এই সমস্যার সামাজিক প্রকৃতি বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা সামাজিক নাটকেব বিবর্তন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে আসিবাব সংগে সংগে সমাজে যে বুদ্ধিবাদ বা যুক্তিবাদেব প্রতিষ্ঠা হইযাছিল, তাহাব দ্বাবাই এই প্রথার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল, বাল্যবিবাহ বিষযক সে যুগের কযেকখানি নাটকেব মধ্য দিযা তাহাই প্রকাশ পাইযাছে।" (পৃ. ১৫২)

এবারে আমরা এই সমস্যাকেন্দ্রিক কয়েকখানি নাটকের বিস্তৃত আলোচনা করবো। শ্যামাচবণ শ্রীমানি রচিত 'বাল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০) এই সমস্যা-রূপাযণের একটি প্রতিনিধি স্থানীয নাটক। স্বযং নাট্যকার 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ কবেছেন : "এক্ষণে বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন অস্মদ্দেশে যে সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎও যদিস্যাৎ এই নাটকে কীর্তিত হইযা থাকে তাহা হইলে অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ বিবেচনায় পরম সন্তোষানুভব করিব।" সুধীব চরিত্রটিব মাধ্যমে নাট্যকাব এই উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাহীনের মুখ দিয়ে নাট্যকার বাল্যবিবাহের সুখ ব্যাখ্যা করেছেন :

"ছেলেবেলা বিয়ে হলে হয় বড় মজা।
শাশুড়ী তুলিয়া দেয খায় খাজা গজা॥
আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায ঝালে আর ঝোলে॥

কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ॥
ঠারে ঠারে কনেটির মুখপানে চায়।
আধো আধো হাসি দেখে নয়ন জুড়ায়॥
সহিতে না হয় কভু পাঠশালের ক্লেশ।
খায় দায় বেড়ায় বালিশে দিয়ে ঠেস॥
ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুলনারী।
রতিশাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি॥

ধনহীন নামক চরিত্রের মুখ দিয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন—"আহা! সে দিনের সূর্য শীঘ্র সমাগত হউক —হা ঈশ্বর। এই ভারতভূমির উপর করুণাবারি বর্ষণ করিয়া এই প্রজ্জ্বলিত অনলশিখাকে নির্বাণ কর; অবলা কুলবালাগণের গতি বিধান কর; কুসংস্কারেরকেশাকর্ষণ করিয়া পৃথিবী হইতে নির্বাসিত কর এবং দেশীয় বন্ধুগণের চক্ষুরুন্মীলন করিযা বাল্যোদ্বাহ নিবন্ধন দুঃসহ দুর্গতিকে দূর করতঃ এই দযাশূন্য দেশের শ্রীসাধন কর।"৩৩

রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'বাল্যবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয ১২৮১ বঙ্গাব্দে। এ নাটকে বাল্যবিবাহ সমস্যার বিষাদান্তক মর্মোদ্ঘাটন করতে চাইলেও মূল সমাজ সমস্যার স্বরূপ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এ-বিষয়ে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন: "বাঙালী যারা স্বামী ও শ্বাশুড়ী দ্বারা নিগৃহীতা বধূর প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি এতই প্রবল ছিল যে, তাহার আচরণের বিসদৃশতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সেই জন্যই ভূষণের সহিত বিবাহিতা বধূ

---

৩৩ নাটকখানিতে সূত্রধবের নির্দেশে 'নটীব গীত' গানখানিব মধ্যে মূল সমাজ সমস্যাব উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। সেদিক দিয়ে গানটি মূল নাটকের 'ভূমিকা'ব মর্যাদা পেতে পাবে:

"গেল হে গেল বঙ্গ, কি আর দেখিছ রঙ্গ,
দেহ হল ভঙ্গ সবাকাব।
না হতে যৌবনকাল, সত্বরেতে গ্রাসে কাল,
হায হায় কলি চমৎকার॥
তেজহীন বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মেতে নাহি প্রবৃত্তি
কীর্তি, বৃত্তি, সব ভ্রষ্ট করে॥"

সরমার অবৈধ প্রণয় তাঁহার কাছে অপরিমিত প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে।" সুতরাং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহের করুণ সমস্যা প্রাধান্য পায়নি—প্রণয়-বিষাদিনী মূর্তিই বড় হয়ে উঠেছে। নাটকের জয়গোপালবাবু তার মহেন্দ্র নামক পুত্রকে বাল্যবিবাহ দিয়েছিলেন। শঠ ও দুর্বিনীত মহেন্দ্র অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে স্ত্রী সরলার উপর শারীরিক ও মানসিক অকথ্য অত্যাচার সুরু করল। জয়গোপালেরই সম্পর্কে জ্ঞাতি ভূষণের প্রতি সরলা আসক্তা হয়ে পড়ল। শ্বাশুড়ী ও স্বামীর যুগপৎ অত্যাচার সরলাকে এই আকর্ষণে আরও আকৃষ্ট করল। সরলার নিদারুণ ট্র্যাজিক পরিণতি দর্শনে জয়গোপালবাবু মন্তব্য করেছেন: "সধবা স্ত্রীলোকের চরিত্রে দোষ ঘটে! পূর্বে আমি বিশ্বাস কর্তুম না। সরলা যে সকল কারণ দেখায়, যদি সমস্ত সত্য হয় তা হলে বাল্যবিবাহই ত এর মূলে! কেবল বাল্যবিবাহ কেন, কয়েকটি সামাজিক নিয়মও কারণ—যদি তাই হয়।" (পৃ. ২৩)

'কেনচিৎ সম্বন্ধ শত্রুণা প্রণীতম্ 'কুলীন বৈদিককুল-কৌলীন-করবালং ভূতং সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্ ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকখানি সংক্ষেপে 'সম্বন্ধ-সমাধি নাটক' নামে পরিচিত। নাম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংস্কৃত পদের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রকটিত:

'সজ্জন মানস তোষবিধানং ন চ নবনাটককাবকমানং।
যাচে কেবল সুখনিদানং ত্যক্তুং বৈদিকরীতি বিতানং॥'

নাটকখানি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত—'এই মালা কুলীন বৈদিক-কুলের চিরকলঙ্ক নিদান সম্বন্ধরূপ নীলকমলে সংকলিত ও সেই কুপ্রথা নিবারণের সদুপায়-সূত্রে গ্রথিত।' বাল্যবিবাহ সমস্যার প্রসংগ বিবৃত করে নাট্যকার স্বয়ং 'বিজ্ঞাপনে' ব্যক্ত করেছেন: "কুলীন বৈদিকদিগের সম্বন্ধ-প্রথা ও বাল্যবিবাহ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার অনিষ্টসমূহ

"ভূমিষ্ঠ হোলে কুমার বিবাহ সম্বন্ধ তার,
সর্বাগ্রে ত সার বুঝি করে।
কে কোথা শুনেছে বাপ, কচি ছেলে ছেলের বাপ
অঙ্গ কাঁপে বাপ দেখে শুনে।
কোথা হে জগৎপতি, করহ দেশের গতি,
অগতির গতি নিজগুণে।"

কুলীন বৈদিককুল-কৌলীন্য কারণ করবাল স্বরূপং

সম্বন্ধ সমাধি

নাটকম্।

কেনচিৎ সম্বন্ধ শত্রুণা প্রণীতম্।

সজ্জনমানসতোষবিধানং ন চ নবনাটককারকমানং।

যাচে কেবলমসুখনিদানং ত্যক্তুং বৈদিকরীতিবিতানং।

CALCUTTA.

PRINTED AT THE B. P. M's PRESS.

1867.

Price 1 One Rupee

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সন্দর্শন করিয়াও কেহ ইহা নিবারণ করিতেছেন না। নাটক লেখন ইদানীন্তন সময়ে কুপ্রথা পেষণের এক চমৎকার যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সেই যন্ত্রের সাহায্যে এই কুপ্রথা পেষণ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমি অম্লানবদনে স্বীকার করিতেছি যে, এই নাটক-যন্ত্র সুন্দররূপে নির্মিত হয় নাই। এজন্য ইহাতে কুপ্রথা পেষণকার্য সম্যকরূপে সম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সাধারণের মানস পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল এই কুপ্রথা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, এইমাত্র চেষ্টা।"

গরীব কুলীন আশুতোষ চক্রবর্তীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে আশুতোষ নবজাতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করবার জন্যে বেরুলেন। আশুতোষের স্ত্রী আবার কৌলীন্যের সমর্থক। মোহিনী নাম্নী আর একটি চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন: 'তুমি ভাই জান না; কুলীনের কত মান্য, সেই পরমেশ্বর-দত্ত মান্যটুকু কেন হারাবো?' মোহিনী প্রত্যুত্তরে যুক্তি দিয়ে বলে,—'ঐ হতভাগারা আপনারাই কুলীন মৌলিকের সৃষ্টি করেছে, পরমেশ্বর দত্ত বস্তুতে কি পক্ষপাত থাকে? তিনি সকলেরই পক্ষে সমান,—তাঁর কাছে কুলীন-মৌলিক নাই।' কিন্তু সেকালের রীতি 'জাতমাত্রেণ কন্যায়া বাগ্‌দানং কুললক্ষণং'; নাটকের সুরুতেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে:

"সূত্রধর। শুনেছি ওদের পেটে পেটে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। তা আশুতোষের কন্যারও কি সম্বন্ধ হয়েচে?

নটী। তোমার মতো ন্যাকা আর দুটি নাই, পেটে পেটে সম্বন্ধ কেমন করে হবে? মেয়ে হয় কি ছেলে হয় তার ঠিক কি!

সূত্র। কথায় বলে পেটে পেটে, সত্যিই কি পেটে পেটে; সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে, ওদের বিবাহের আর ভাবনা থাকে না।

ধন্য রে বৈদিক কুল, ধন্য তোর লীলা।
ভালোরে জিনেচো তুমি বল্লালের খেলা॥
এবার মরিয়া আমি বৈদিক হইব।
পেটে থেকে পড়ে আমি বিবাহ করিব॥
ধন্য কুল! ধন্য বলি তোর ক্ষমতায়।
বৈদিকেরা এড়ায়েছে বিবাহের দায়॥"

আশু তার মামা ন্যায়ভূষণের প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করতো। ন্যায়ভূষণ আশুর অজ্ঞাতসারেই তার শিশুকন্যার এক সম্বন্ধ স্থির করে রেখেছিল। কিন্তু আশুর তা মনঃপূত হয়নি। কেননা পাত্র খুবই দুঃস্থ:

"না খাইয়া প্রাণ গেলে কুলে কি করিবে বল।
কন্যার সম্বন্ধ শুনে মন উচাটন হল॥
কি আছে বিধির মনে, জানিব তাহা কেমনে।
এ কু-রীতি কতোদিনে উঠিয়া যাইবে বল॥"

কুলীনদের এই ঘৃণ্য সামাজিক রীতিব উপর অশ্রদ্ধ হয়ে উপাযান্তর না দেখে আশু সংস্কারকদলের প্রতিনিধি ন্যায়বত্নের মতানুবর্তী হলেন এবং কন্যাকে বড় করে অন্যত্র বিবাহ দিলেন। আশুর এই সময়কার মানসিক স্বগতোক্তিমূলক চিন্তাধারার বিস্তৃত পরিচয় নিলে তার মধ্য দিয়ে সমাজের কু-প্রথার বিরুদ্ধতাই প্রমাণিত হবে:

'জনম দিবস হৈতে সম্বন্ধ ঘটন।
দশমে দিলেন পিতা বিবাহ-বন্ধন॥
শৈশবে বিবাহপাশে আবদ্ধ হইযা।
নারিনু করিতে কিছু সংসারে আসিযা॥
জঠর চিন্তায গেল রজনী বাসর।
না পাইনু বিদ্যালাভে বিন্দু অবসর॥
গৃহস্থ আশ্রম সব আশ্রমের সার।
বিবাহ নির্বাহ বিধি দুয়ার তাহার॥
শৈশবে প্রবেশি সেই গৃহস্থ আশ্রম।
যাতনায় অভাগার গেল এ জনম॥
সন্তান হইলে বলে সুখী হয় জন।
না করিনু কভু হেন সুখ আস্বাদন॥
সন্তানে যদ্যপি দেয় এরূপ যন্ত্রণা।
কেন তবে করে লোক সন্তান কামনা॥
অভাগার ভাগ্যদোষ কেমনে বা বলি।
বৈদিকে কোথায় সুখ, অসুখ সকলি॥

জঘন্য বৈদিক রীতি! জঘন্য আচার!
করিতেছ ছারখার বৈদিক সংসার॥
তুমি না ছাড়িলে সখী হবে না বৈদিক।
এখন আছহ দেশে, তোরে ধিক্ ধিক্॥" (পৃ. ৪৪)

আশু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উপর তিক্ত-বিরক্ত হয়ে কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিলে কুলীন সমাজের গোঁড়ারা সমবেতভাবে আশুর বিরুদ্ধে দুর্গাচরণ চক্রবর্তীকে (যার সঙ্গে আশুর কন্যার প্রথমে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল) প্ররোচিত করে। কিন্তু মামলায় দুর্গাচরণ হেরে গেল। উচ্চতর আদালতে আপীল হলে সেখানেও নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকলো। বৈদিক কুলীন সমাজে শৈশব-বিবাহ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়লো। নাটকটি থেকে এরই পরিচায়ক কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

১. "স্বভাবে সম্বন্ধ আর যবন সমান।
সম্বন্ধ সমাধি তেঁই নামের বিধান॥
এই যে সম্বন্ধ প্রথা জঘন্য আচাব।
করেছে বৈদিক নামে কলঙ্ক প্রচাব"॥

২. "বাল্যকালে যে সময় জ্ঞানোদয় নাহি হয়,
বিবাহ কি জানে না যখন।
যখন জননী পাশ ছাড়িবারে পায় ত্রাস
ধূলাখেলা করিবারে মন॥
সে সময় পিতা মানী যুবতী কামিনী আমি
পরিণযে করেন বন্ধন।
বিবাহে কি সুখ তাহা, জানিতে না পারে আহা,
দুঃখে যায় প্রথম জীবন"॥

৩. "আপনি না পায খেতে কন্যার বিবাহ দিতে,
দিবানিশি মরে ভাবনায়॥
আকুল ভাবিয়া কুল, সদাই বৈদিক কুল,
কিসে কুল রহিবে বজায়।
বাঁচাতে কুলের কূল, নিজে হয় নিরমূল,
কুল তার দুকূল হারায়॥

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাল্যবিবাহ' নাটকটিতেও এই সমাজ সমস্যা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। ১৭৮১ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সমালোচিত হয়েছিল।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোকে উক্ত হয়েছে—'অজ্ঞাতপতি-মর্যাদামজ্ঞাতপতিসেবানম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্মশাসনম্।' (যে বালিকা পতি মর্যাদা পতি সেবা জানে না, এবং ধর্মশাসন অবগত নহে, পিতা এরূপ বালিকার বিবাহ দিবেন না।) বালিকাবিবাহের ক্ষেত্রে বয়সের নির্দিষ্টতার প্রসংগ নয়—বিশেষ তিনটি মানসিক পর্যায়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পতিমর্যাদা, পতিসেবার জ্ঞান ও ধর্মশাসনের জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত নয়। সমুন্নত প্রাচীন আর্যদের মধ্যেও যৌবন-বিবাহ, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ এবং স্বামী নির্বাচন এই তিনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠেও যৌবন বিবাহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন,—'সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে বাল্য ও যৌবন বিবাহ উভয়ই প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পরাশর কলির জন্য বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।' বিভিন্ন শারীরতত্ত্ব-বিদ্ বাল্যবিবাহের শারীরিক ক্ষতির দিক আলোচনা করেছেন। ১৮৭১ সালের 'জার্নাল অব মেডিসিন' নামক পত্রিকায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার লিখিত প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিকের উপর আলোকপাত করেছে। আমাদের সুশ্রুত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও এ-বিষয়ে বলেছেন:

"ঊন ষোড়শবর্ষায়াম্ প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থ. বিপদ্যতে
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাতত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

বাল্যবিবাহ স্ত্রীলোকের অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্তী এ-বিষয়ে বলেছিলেন—"It is a vicious native custom that, as a girl menstruates, she must be married. It is not in any civilised country, nor should it be done here." ১৮৮১ সালের ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে হার্ডি সাহেব যা লিখেছিলেন—তার তাৎপর্য উল্লেখ করে 'বাল্যবিবাহ' নামক পুস্তিকায়

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : "ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তালিকায় দেখা যায় যে, এ দেশে শিশুর জন্মসংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং তাহাদের মৃত্যুর সংখ্যাও ততোধিক। বেন্‌স সাহেব ১৮৮১ সালের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সেন্সাস রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এ দেশে যেমন অধিক পরিমাণ শিশুর জন্ম হয়, সেইরূপ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শিশুদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বেন্‌স সাহেব বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ 'increases the sufferings and danger, of child-birth in India'……বাল্যবিবাহের জন্য বংশ পরম্পরায় আমাদিগের শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে।"

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাল্যবিবাহবিষয়ক এই সামাজিক সমস্যা উনিশ শতকের শেষার্ধে আন্দোলনের সমীপবর্তী হয়েছিল এবং সরকার-অনুমোদিত 'কনসেন্ট্ বিল' আইনরূপে কার্যকর হয়েছিল। বাল্যবিবাহ-বিষয়ক সমস্যার সংগে প্রত্যক্ষত সংযুক্ত বলে আলোচ্য পরিচ্ছেদের কালসীমার সংগে যুক্ত না হলেও আমরা এখানেই তার আলোচনা করতে পারি। কনসেন্ট বিল বাল্যবিবাহকে নীতিগতভাবে অসমর্থন না করলেও বিবাহিতা কন্যার স্বামী গৃহে সহবাসের বয়সকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই বিলের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা-দেশে ধূমায়িত বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। এই আন্দোলনের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রথার নিয়মানুগত্য পবিত্রতা রক্ষায় প্রয়াস পেলেও ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কন্যা যেহেতু অল্প বয়সেই সমর্থা হয়ে পড়ে—সেইকারণে বিবাহকাল নির্ধারণে বা সহবাস কারণে আইনের সৃষ্টি হলে জাতিপাতের আশঙ্কা ছিল। ফুলমণি নাম্নী একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা বালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ১৮৯০ সালের শেষ ভাগ থেকেই বাল্যবিবাহনিরোধক আন্দোলন এবং সহবাস-সম্মতিবিষয়ক আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ লক্ষিত হয়েছিল।

যে বালিকার অপরিণতাবস্থা তার সংগে সহবাস করা যে পাপ—শাস্ত্রেও তা অতি গর্হিত বলে নিন্দিত হয়েছে এবং শাস্ত্রসংস্কারে তার জন্যে ইহলোক ও পরলোকে অতি-ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। উক্ত আন্দোলনের সময় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি স্বদেশবাসীর প্রতি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,—"আমরা অষ্টম বর্ষের পূর্বে নয় এমন বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, এ কথা সত্য। কিন্তু স্ত্রী ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার সহিত সহবাস করিবার আমরা বিরোধী।

আমরা বালকদিগের বাল্যবিবাহ সমর্থন করি না। বালিকা ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার সহিত সহবাস করা আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি এবং আমাদের এই বিশ্বাস যে উহা আমাদের অবনতির ভীষণ কারণ। আমরা জানি যে, হিন্দুসমাজ এই রীতিকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে না—সেইজন্যেই হিন্দুদিগের অবনতি।" (সম্মতির বয়স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা পৃ. ৩) সহবাস-সম্মতির বয়ঃক্রম দশ থেকে বারো বৎসর করা হল। তৎকালীন শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় সম্মতির বয়স-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণোপলক্ষে মান্যবর এণ্ড্রু স্কোবল সাহেব বলেছিলেন,—"এক পক্ষে আইন ও আচার অনুসারে বারো বৎসরের কাছাকাছি সময়কে সহবাসের গড় বয়স বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং আর এক পক্ষে শারীরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে ঐ সময়কে সর্বাপেক্ষা কম নিরাপদ বয়স বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ঐ বয়সটিকে সীমা করিলে সমাজের কোন অংশের কোন আস্থাযোগ্য সামাজিক রীতির বা ধর্মব্যবস্থার ব্যাঘাত করা হইবে না। কেহ কেহ এই বারো বৎসরকে বড় কম সীমা বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের এই কথাটির বুঝিতে হইবে যে, আইনের এই সংশোধনের দরুণ বালিকারা বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত আইন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিতা হইবে বটে, কিন্তু বারো বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদের সম্বন্ধেও বর্তমান আইনে পশুবৎ আচরণের প্রতিকারের যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।" তবে বক্তব্যের এই শেষাংশ বিষয়ে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল সাহেব তাঁর বক্তব্যে সামাজিক গতি-প্রকৃতিকে স্পষ্টতঃ অনুধাবন করে বলেছিলেন,—"আইনের এইরূপ পরিবর্তনে হিন্দুদের সামাজিক প্রণালীর এককালে বিপ্লব ঘটাইবে এইরূপ বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, হিন্দুর বিবাহ চুক্তিটি যে বয়সেই করা হউক না কেন উহাকে অতিশয় বাঁধাবাঁধি ও পবিত্র ভাবের চুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে। ঐ চুক্তি যে বিবাহের পরবর্তী কোন সময়ে রদ করা যাইতে পারে অথবা আদিম চুক্তিটি যে কেবল রীত্যনুযায়িক বাগ্‌দান ভিন্ন কিছুই নহে—এইরূপ আইন করিলে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পারিবারিক আচার ব্যবহারের প্রতি এতদূর হস্তক্ষেপ করা হইবে যে, আমি বা আমার সহযোগীরা তাহা করিতে কেহই প্রস্তুত নহি।"

এই নতুন বিধি প্রবর্তনের সংগে সংগেই সমাজে মহা আলোড়ন দেখা দিল। সমাজের সর্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট এই আন্দোলনের পরিচয় দিতে গিয়ে ১২৯৭ সালের 'চিত্রদর্শন' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন :

"...সহবাস সম্মতির আইন লইয়া দেশময় ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। কলিকাতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্মের জন্য, আইনের জন্যে কখনও যে এতো লোক একত্রিত হয় নাই ইহা সর্ববাদিসম্মত। ১৪ই ফাল্গুন বুধবার কলিকাতা গড়ের মাঠে মহালোকারণ্য......২ রা চৈত্র রবিবার আর একদিন গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন একা রমেশচন্দ্র। ...এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে ও কালীঘাটে যে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে ইংলিশম্যান, ষ্টেটসম্যান, ডেলি নিউজ প্রভৃতি পত্রসম্পাদকগণ সকলেই একান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা বিলের বিপক্ষে মত প্রদান করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিল এক্ষণে পাশ হইয়া গেলেও তাঁহাদের নাম হিন্দুগণ কখনই ভুলিতে পারিবেন না। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ হিন্দুদিগের ধর্মরক্ষা করিতে অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই ঘোরতর সামাজিক আন্দোলনে পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিল।[৩৪] স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেননি। ১২৯৭ সালের ২৯ শে আশ্বিন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যাযের কাছে লিখিত একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এ বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। 'সচিত্র শিশির' (২২শে কার্তিক ১৩৩১) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল :

'নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি আমার নিকট সুপরিচিত, এবং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।

৩৪ "But the age of Consent Bill raised a storm of controversy all over the country as it was viewed by many as foreign Government's interference in the socio-religious custom of the Hindu community. Besides being opposed by the orthodox section of the population, the issue was mixed up with the growing upsurge of militant nationalism against an oppressive alien rule" —The Indian Awakening and Bengal; Dr. N. S. Bose,

বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। যতদূর জানি, এ দেশীয়া বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড বড বিরল। সুতরাং এ-বিষয়ে কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য যে দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বালিকাদিগের স্বামীসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধজন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইন-মতে সম্মতিদানের বয়স দশ বৎসর ; দশ বৎসরের স্থানে বারো বৎসর হয়, ইহা আমার অভিমত নহে। কিন্তু বারো বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে।

বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি। কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। 'ঋতু-কালাভিগামী স্যাৎ' ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি, অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না দেখা যায়। রক্ষা করিলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গণ্ডগোল করা বৃথা।

আমার মতে, আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

ইতি তাং ২৯ আশ্বিন,

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজ এই বিলকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছিল এবং 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত জনমানসের সমর্থনে এর পক্ষে জনমত সংগঠনের ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ব্যতিরিক্ত শিক্ষিত সমাজের অনুস্তরে ব্রাহ্মরা খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

অবশ্য অপক্ষপাত দৃষ্টিভংগীর মধ্য দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' পত্রিকা এই বিলের বিপক্ষীয় শক্তিরও যথার্থ পরিমাপ করেছেন,—"It faithfully reports all protest meetings against the Bill. A particularly striking protest meeting was that organised by the graduates of Calcutta. The Mirror described the Star Theatre where the protest meeting was heldas being packed to its utter capacity."[৩৫] তদানীন্তন শিক্ষিত মানসের প্রতিনিধি স্থানীয় পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এ ক্ষেত্রে প্রথাগত ঐতিহ্য ও নীতির পরিপোষকতা করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক পরিচালিত তৎকালীন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় 'The Burning Question' নামীয় সম্পাদকীয়তে যথার্থ বিবাহযোগ্য বয়স বিষয়ে আলোচিত হয়েছিল। কাজেই দেখা গেল, সম্মতিবিষয়ক আইন তৎকালীন একটি পরস্পর বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রচিত। 'অনুসন্ধান পত্রিকা' (৩০ শে ফাল্গুন, ১২৯৭) এই বিমুখী সামাজিক টানের প্রতি ইংগিত করেই মন্তব্য করেছিলেন, "একদিকে যেমন বঙ্গবাসী, দৈনিক, বঙ্গনিবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, হিন্দুরঞ্জিকা, ঢাকাপ্রকাশ, টাইম্‌স, সুধাকর প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শী প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত শত শত পত্রিকা বিলের বিরোধী; আর অন্যদিকে দেখিলাম ব্রাহ্মিকা সখী 'সঞ্জীবনী' ও নিম ব্রাহ্ম 'সময়' প্রভৃতি হিন্দুর গৃহ শত্রু কএক জন বিল যাহাতে পাশ হয়, সেজন্য বিশেষ উদ্যোগী।" এই বিলটি কাউন্সিলে উপস্থাপিত হবার প্রাক্‌কালে বিদ্যাসাগর মূল্যবান অভিমত দিয়েছিলেন। আলোচ্য সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে অভিমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে তা উদ্ধৃত করা গেল :

"I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before that are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real. and more extensive protection than the Bill. At the sametime, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance

৩৫ Aspect of Social History : P. sinha P. 128

…From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child-wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras."

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী হরবিলাস সারদা বাল্যবিবাহ নিবারক ও বিবাহের ন্যূনতম নির্ধারক বিলটি আইনী-করণের জন্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। কিন্তু 'সম্মতির বয়স কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এটি স্থগিত ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে সম্মতিবিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হলে নাট্যকার অমৃতলাল বসু 'সম্মতিসংকট' নামক নাট্য প্রহসনটি রচনা করেন; ১৮৯১ সালের ২১শে মার্চ 'স্টার' থিয়েটারে এটি অভিনীত হযেছিল। অমৃতলাল নিজে ব্যক্তিগতভাবে বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন বলেই এই নাটকে সার্বভৌমের মুখ দিয়ে বাল্যবিবাহ সমর্থনমূলক অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। হরবিলাসের বাল্যবিবাহ নিবারক বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত না হওয়ার অমৃতলাল আনন্দিত হয়েছিলেন। 'দৈনিক বসুমতী' (২৯শে পৌষ ১৩৩৫)-তে প্রকাশিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামীয় একটি প্রবন্ধে অমৃতলালের এই জাতীয় মানসিকতার পরিচয় মেলে—"কলিকাদলনের ফলে সময়ে সময়ে সমাজে যে নানারূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না এবং তাহারই গোটা কতক বাছা বাছা নজীর দেখাইয়া নব্যতন্ত্রের উজিরগণ সংস্কারের পরিবর্তে সংহারের অস্ত্রলাভের জন্য আজ ইংরাজ শাসকের শরণাপন্ন হইয়াছেন।" 'সম্মতি সংকট' (১৮৯১) নাটকেও এই জাতীয় মানসিকতারই ব্যঙ্গবিদ্ধ প্রক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করি। সূচনায় কৈলাস পর্বতে মহাদেব-দুর্গা ও নারদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'হিন্দু সন্তানদের বিপদনিবারণের' ব্যগ্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আন্দোলনের মুখপাত্র হল ইংরেজী শিক্ষিত যুবক তিলক। সে প্রত্যহ 'মিরর' কাগজ পড়ে। তার

ব্যাজস্তুতিমূলক উক্তিতে পণ্ডিত প্রবর নিতাইচাঁদ সাধু খাঁ, গবেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীতে সম্মতিবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ বেশ উপভোগ্য। মানিকের স্ত্রী রাসমণির মুখ দিয়েও প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়: 'পূনর্বে হলে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলেব মা হলে শোবে! আবাব আইন করেছেন বারো বছর, তিলক জানে না ঐ যে আমার তেবো বছরে হযোছলো।' এদিকে রাজবিধিব প্রতিবাদে সার্বভৌম অনশন সুরু করলেন। সার্বভৌম হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু স্ত্রীর সতীত্বের মহিমা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। অল্প বয়সের সন্তান বুদ্ধিমান হয় না বলে ব্যাখ্যা করলে সার্বভৌম এমন অনেক মহাপুরুষের উল্লেখ করেন যাঁরা অল্প বযসেরই সন্তান। সার্বভৌমের মুখ দিযে অমৃতলাল নিজেহ বললেন: 'হিন্দুসন্তান সাবধান হও। বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের দ্বারে বাণ এনো না। ঐ যে গভাধানের বিধি হচ্ছে বড সর্বনাশ হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দু-কুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন বহিয়াছে—তা ছিন্ন হবে, সাবধান!' রঙ্গিনীর দীর্ঘসংগীতের মধ্যেও এই জাতীয় সামাজিক বক্তব্য নিহিত রয়েছে:

'ভাল ভাল আমি ওলো দিব না সম্মতি।
কভু না লইব শেষে বে-আইনী পাত॥
বযস বাবোব নীচে সম্মতি আইনে মিছে,
অলুক হৃদযে বিছে, ফিরুক সে পিছে পিছে,
পাছু ফিবে আমি কভু চাব না চাব না।
এগারোর বরাবর নেব না নেব না॥'

... .

"ওলো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি।
দেখবো কেমন আসে পাশে এগারোর পতি॥"

সম্মতি আইন পাশ হবার পর তা নিযে সামাজিক দলাদলি ও ব্যক্তিগত রোষ কি পরিমাণে সমাজজীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারই পরিচয পাই হরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০) নাটকে; নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট জমিদার। প্রতিবেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শত্রুতা সাধনের জন্যে বহুদিন ধরেই সুযোগ-সন্ধান করছিলেন। এমন সময় 'সম্মতি আইন' প্রবর্তিত হলে তিনি এই আইনের

সুযোগে প্রতিশোধ নিলেন। ভূপতির পুত্র বিবাহ করে সম্মতি আইন ভঙ্গ করেছে বলে তিনি আদালতে নালিশ করলেন। ব্রাহ্মসমাজের জনৈক আচার্যের সহযোগিতায় আইন ভঙ্গের অপরাধে শেষ পর্যন্ত ভূপতি এবং তার পুত্র উভয়েরই জেল হল। সম্ম'ত আইনের সুযোগে শত্রুতা সাধনের তির্যক দৃষ্টিভংগী নাটকে ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে।

হরিকুমার চৌধুরী রচিত সহবাসবিভ্রাট' বা 'দেবগণের দ্বিতীয়বার মর্ত্যে আগমন' প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। সুরুতেই বিষাদপূর্ণ বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়,—

'কি শুনিরে আজ পূরি বঙ্গদেশ,
এ, বিষাদ-ধ্বনি কেন রে হয়,
ইংরেজ শাসিত ভারত ভিতরে,
কেন সবে বলে হায় হায় হায় ?'

কৌতুকপূর্ণ নাট্যপরিস্থিতির মধ্যে স্বর্গধামে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উপস্থিতির মধ্যে নারদের উপস্থিতি ও মর্ত্যের বিস্ময়কর সমস্যা বিষয়ে আলোকপাত লক্ষ্য করা গেল—"সহবাস সম্মতি কি জানেন, এখনকার রাজা ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই এক নূতন আইন করিতেছেন যে, কি হিন্দু কি মুসলমান যে জাতীয় লোক তাহার দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবেন তিনি এই নূতন সৃষ্টিছাড়া আইনানুসারে কঠিনরূপে রাজদ্বারে দণ্ডিত হবেন, এই আইনে অনেকেই বিশেষরূপে সপক্ষতা করিতেছেন, কেবল হিন্দু ও মুসলমানে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই প্রতিবাদের নিমিত্ত 'এমারেল্ড থিয়েটারে' একটি সভার অধিবেশন হইবে, আর 'হিন্দুধর্মোৎসাহী' প্রভৃতি কি জানেন—যাঁহারা হিন্দুধর্মাবলম্বী, যাঁহারা হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করেন, যাঁহারা হিন্দুদিগের বংশাবলী, তাঁহাদিগকেই এই সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হ্যাণ্ডবিল ছাপান ও বিতরিত হইতেছে।" নারদের মুখে এ কথা শুনে ইন্দ্রের সংলাপ এইরূপে ব্যক্ত হয়েছে,—'এ অতি অন্যায় জবরদস্তি আইন, এ আইন পাশ হলে হিন্দুধর্ম তো লোপ পাইবেই অধিকন্তু একটা মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, এ যে হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত! নারদের মুখ দিয়ে নাট্যকার সহবাস-বিষয়ক সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসকেও প্রকাশ করেছেন:

"নারদ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, গর্ভাধান নিয়ে এত গোলযোগের

সহবাস-বিভ্রাট

বা

দেবগণের দ্বিতীয়বার মর্ত্ত্যে আগমন।

(সাময়িক মুষ্টিযোগ।)

শ্রীহরিকুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

সংবাদ হুজুক জোরে বহিছে যাই

কলিকাতা।

সন [illegible] সাল।

কারণ কি জানেন না? কে এক ব্যাটা 'হরি মাইতি' বলে লোক ছিল, সে নাকি তার দশ বছরের স্ত্রীর প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তাতে সেই বালিকাটি নাকি মারা যায়, গভর্ণমেণ্ট ফরিয়াদি হয়ে তাকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেন, অনেক মামলা মোকর্দমার পর লোকটার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়,—সে ত জাহাজে চড়ে কলা দেখালে আর এদিকে গভর্ণমেণ্ট সেই একটা ছুতো পেয়ে, একটার জন্য সমস্ত দেশটার বুকে শেল বসাবার জোগাড় করছেন।

বরুণ। সে লোকটা কে আর কি জাত?

নারদ। কে হরির খুড়া মাধাই দাস, জেতে উড়ে না কি একটা হবে।

বরুণ। যে জাতীয় লোক সেই জাতীয়দের পক্ষে এ আইন কতকটা সম্ভবপর। ভিন্ন জাতীয়দের বুকে এ পাথর চাপানটা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

বিষ্ণু। এ তো দেখতে পাচ্ছি গভর্ণমেণ্টের মন্দ খেয়াল নয়"।

এ জাতীয় সংলাপের পর কৌতুকে ও কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে দেবতারা 'কলিকাতা দর্শনে মর্ত্যে এলেন। ময়দানে মহ সভায় শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের প্রতি আশীর্বাদ করলেন—'অক্ষত শরীরে দীর্ঘায়ু হয়ে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখুন। শেষপর্যন্ত দেবতারা আবার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। নাটকের সমাপ্তিতে 'উচ্ছ্বাস নামীয় অধ্যায়ে সহবাস বিভ্রাটবিষয়ক একটি দীর্ঘ ত্রিপদীর মধ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রশ্নটির একটি সমাজ-সম্মত ইতিহাস বিবৃত করেছেন

'কলিতে বাজলো ডঙ্কা ব হবে নারী শঙ্কা,
মনন কোরেছেন যত ভায়াদের দল।
দশেতে গর্ভ হোলে, গভ্যার তারে বলে,
গর্ভাধান নিয়ে গেছে বড় গণ্ডগোল॥

হোয়েছে এক নব্যদল, নাম তার 'ইয়ং বেঙ্গল',
লেগেছে উঠে পড়ে এ কি রে বালাই।
দৈত্যদের ত কথা নাই, আপনা-আপনিই মাথা খাই
মাণিকতলায় তাদের বুঝি মাটী জুটে নাই॥

এতদিন এ সব ছিল না, বাঙ্গালী ছিল নিভ বনা,
এঁরা যে মাথা ঠেলেছেন এখন সামাল সামাল।

আকাশে কি বাজ নাই, ছাড়ো একটা বড় মশাই,
মাথা ঠ্যালাটা ঘুচে যাক্ সমাজের জঞ্জাল ॥
ধন্য "বঙ্গবাসী" এই তো স্বদেশবাসী ;
কেমন লিখেছে ছ্যাখ স্বদেশের তরে।
কোন দিকে চক্ষু নাই, রাজা-প্রজা জ্ঞান নাই,
লেখাতে উন্মত্ত সদা ছ্যাখ হে অন্তরে ॥
দেখ তার লেখার কায়দা, কোন দিকে নাইকো ফয়দা,
প্রকৃত হিন্দুর কাজ এই তো এখন ॥
আর এক সহযোগী, তিনি হন মহাযোগী,
সাধারণে নাম তার 'বঙ্গ নিবাসী'।
কেঁদেছো ধর্মের তরে, সুফল পাইবে পরে,
পূজিবে সবাই যাঁরা বঙ্গের নিবাসী ॥
ধন্য তুমি মিত্র মশাই, তোমার শত্রুর মুখে পড়ুক ছাই ;
প্রকৃত হিন্দুর কুলে তোমার জনম।
প্রকৃত বাঙ্গালী তুমি, তব জন্মে পুণ্য ভূমি ;
যারা তব নিন্দা করে তারা নবস্থ অধম ॥
আর এক মহামান্য, জজ 'গুরুদাস' ধন্য
পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জনম যাঁহার।
এঁদেরই সাহসবলে আজও সব মুখ তুলে ;
করিতেছে কান্নাকাটি আর হাহাকার ॥
ধন্য 'শশধর' শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রাণপণে আজ স্বধর্মের জন্য,
শাস্ত্ররাশি খুঁজে হোলে হে অস্থির।
এই তো হিন্দুর কাজ, পূজিবে হিন্দু সমাজ ;
তোমরাই এবে ধর্ম অবতার ॥
ঈশ্বর নিকটে এই, মনের প্রার্থনা ভাই ;
দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুন এঁরা সকলে।
আর আর যাঁরা, রূপ দেখে সব দিশেহারা ;
চিত্রগুপ্ত লিখুন খরচ তাঁদের সকলে।

আর কতো বা বলি　　　শুকইয়ে গ্যালো কণ্ঠনালী ;
মিছামিছি গলাবাজী কোরে ॥
হিন্দু সব থাকুক তাজা,　　　পটাপট বগল বাজা ;
নিজেদের ধর্মের তরে ॥"

—সহবাস-বিভ্রাট : হরিকুমার চৌধুরী, পৃ ৪৫-৪৬

গিরিশচন্দ্রের একখানি বিশিষ্ট পঞ্চরং 'পাঁচকনে' ১৮৯৬ সালের ৫ই জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। বহু অবিশ্বাস্য ঘটনা ও অসংলগ্ন চিত্র সন্নিবিষ্ট হলেও এতে সমসাময়িক সহবাস-সম্মতি আইন বিষয়েও উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করছি :

বনবিহারীর প্রবেশ ও গীত

"চোদ্দ পেরয়নি আগে দিই পা তিরিশে।
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি বল্‌না কিসে ?
আমি লেডি-ফার্ষ্ট রেট,
হয়েছি তাইতে ডেলিগেট্‌,
যেতে হবে মেল ট্রেণে—নইলে হবে লেট,
বক্তৃতা দিয়ে শুষে দেব' ক'সে হাড় পিষে ॥"

"বন। পিতা, কনসেণ্ট বিলের সময় আমার চোদ্দ পোরেনি, আপনার মুখে বলেছেন, আমি বালিকা—আমার বিবাহের উদ্যোগ করবেন না। সভা থেকে পুণা কংগ্রেসে যাবার জন্য আমায় ডেলিগেট্ ইলেক্ট করেছে। আমি সোসিয়্যাল রিফর্মেশনের জন্য যাচ্ছি, আপনি বাধা দিয়ে আমার আশায় নৈরাশ করবেন না'।"

বাল্যবিবাহের সংগে সম্পর্কিত সহবাস-সম্মতি আইন তৎকালীন সমাজ জীবনে এই গুরুত্ব পেয়েছিল এবং নাট্য সাহিত্যের আশ্রয়েও তা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল।

৮

অ-সম বিবাহ সমস্যা ও বাংলা নাটক

শাস্ত্র বাদ দিয়ে শারীর বিজ্ঞান-সম্মত মতে বিবাহের যোগ্যাযোগ্য বিচারের ক্ষেত্রে দেহের দিক দিয়ে সম্পূর্ণত সমর্থ পুরুষ বা স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধন বুঝিয়ে

থাকে। অবশ্য এই পারস্পরিক বয়স সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার আচারগত কিংবা শাস্ত্রীয় আনুগত্যের সুনির্দিষ্ট অনুসরণ কোন দেশেই সম্ভব নয়—তথাপি এই বিষয়ে একটি সাধারণ নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। কেননা তার ব্যতিক্রমে সামাজিক বৈসাদৃশ্য ও ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনে নানা প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। বিবাহের যৌন দৃষ্টিকোণগত একটি আবশ্যিক দিক যেমন রয়েছে—তেমনি এর আর্থিক ও মানসিক দিকের সংস্থান বিষয়টিও অনস্বীকার্য নয়। দৈহিক ও মানসিক সমপর্যায়ত্বের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে দম্পতির যৌন সংস্কারের সম্পূর্ণতা ঘটে। আবার এই সমপর্যায়ত্বকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমাজ-জীবনের অপরিহার্য সত্যের সংগে সামঞ্জস্যের স্বীকৃতি বজায় রাখতেই হয়। তবে স্ত্রীলোকের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব বহন করতে হয় বলে পুরুষের ক্ষেত্রে এই সমপর্যায়ত্বের মধ্যেও তর-তমের ব্যবধান কিছুটা থাকে। স্ত্রী-পক্ষেও স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ন্যূনতা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। অবশ্য বয়সের প্রশ্নে স্ত্রীজাতির যৌনানুভূতকেন্দ্রিক মনোগঠনের সক্ষমতা অপেক্ষাকৃত আগে আসে বলে সমবয়স কিংবা সমপর্যায় সমার্থক নয়। বাংলার সমাজ-জীবনে শারীর বিজ্ঞান-সম্মতভাবেই পুরুষের বয়সের সংগে পার্থক্য রেখেই শাস্ত্রে বিবাহদানের নির্দেশ প্রচলিত। আবার সামাজিক সংস্কার ও লোকজীবনের প্রচলিত ধারাকেও এই মূল বৈজ্ঞানিক ধারারই ব্যাখ্যারূপে কখনও বা গ্রহণ করা হয়েছে। অরক্ষণীয়ার ধর্মরক্ষা শুধু মাত্র প্রকৃতিগত সমস্যা এড়ানো এবং নীতিরক্ষার লৌকিক ব্যাখ্যারূপেও আমাদের দেশে সমর্থকালের প্রারম্ভে কিংবা তারও পূর্বে স্ত্রীলোকের বিবাহদানের রীতি প্রচলিত আছে; সাংস্কৃতিক ও আর্থিক সম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে পুরুষের বিবাহের ক্ষেত্রে তুলনায় বয়সের পার্থক্যরেখা একটু অধিক প্রশস্ত—'ত্রিশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকাম্। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বর (মনু)।' আধুনিক জীব বিজ্ঞানীরাও মনুর এই মতের সমর্থক। আধুনিক জীব বিজ্ঞানীদের মতে পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করলে পুত্র লাভের সম্ভাবনা অধিক—আবার পুত্র লাভই হিন্দু-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বলে মনুর নির্দেশের মধ্যেও ভারতীয় সমাজজীবনের মূলীভূত পরিচয় লাভ করা যায়।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহুবিধ পরিবর্তনের

কারণে পাত্র-পাত্রীর বয়সগত পার্থক্যমানও একরূপ থাকেনি। বহির্বঙ্গ দিক দিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা ধর্মীয় চাপ বয়েসের মানের বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী। আমাদের দেশের বিবাহবিষয়ক স্থাপিত দৃষ্টান্ত এই সকল সমস্যা-সমুখ প্রতিরূপ। বিবাহের ঊর্ধ্বতম সীমার নির্দেশ না থাকলেও মনুসংহিতায় রজস্বলা বালিকামাত্রকেই অবরক্ষণীয়া বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কন্যা পক্ষে সমাজবিধির দৃষ্টিভংগী আমাদের সমাজে কঠোর। অতিবৃদ্ধের দার পরিগ্রহের অভিলষিত পাত্রী বালিকা। মনুও বয়সের অযোগ্যতাজনিত প্রশ্নের মীমাংসা করেন না—অথচ তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন,—'ন চৈব নং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায কর্হিচিৎ।'

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবনের আলোচ্য কালে অর্থনৈতিক কারণ এবং কৌলীন্যপ্রথা দুই-ই এই অসমবিবাহের জন্যে দায়ী হয়েছিল। কৌলীন্যপ্রথা অসমবিবাহের দুর্নীতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। সংস্কৃতক প্রাপকালা ব্যক্তি কথার পিতার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একাধিক স্ত্রী বর্তমানেই বালিকা বিবাহ করেছেন শুধু ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থতার কারণে। কৌলীন্য প্রথাজনিত অসমবিবাহ প্রসংগে চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় 'সংবাদভাস্করে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেছেন, –'এক্ষণকার কুলচূড়ামণি যাঁহারা কৃষ্ণ বিষ্ণু প্রভৃতির সন্তান তাঁহাদের দম্পতির মধ্যে ন্যূনাধিক্য বয়সে বিবাহের বাধা নাই, সপ্তম বর্ষীয় বালকের সহিত অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধর এবং ত্রয়োদশ দিবসের কন্যার সহিত নবতিবর্ষীয় প্রাচীনের অনায়াসে বিবাহ হইতেছে।' এই বক্তব্যেরই সমর্থনসূচক দৃষ্টান্তের পরিচয় পাই আমরা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (বৈশাখ, ১২৯২) একটি সংখ্যায়—'বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহেও এইরূপ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে হয়। যৌন ও সাংস্কৃতিক স্বার্থচ্যুতির কারণে স্ত্রীসমাজের মন যেখানেই স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করেছে—সেখানেই ব্যাভিচার প্রবণতার সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'পতিব্রতো-পাখ্যানে' রামনারায়ণ তর্করত্ন এদিকে আলোকপাত করেছেন,—"এক্ষণকার দম্পতিদিগের বিভিন্ন মতি উপস্থিত হওয়াতে কি দুঃখের বিষয় না ঘটিতেছে, ইহাদিগের মনের অনৈক্যই সংসার সাগরের দুঃখ প্রবাহকে প্রবল করিতেছে।"

কৌলীন্যপ্রথার সংগে পণপ্রথা সংযুক্ত হয়ে অসমবিবাহকে আরও বিস্তৃতি লাভে সহায়তা করেছে। কন্যাদায় মুক্তির জন্যে বরপক্ষীয় পণের নির্ধারিত অঙ্ক মিটিয়ে পাত্রের যোগ্যতা বিচারের প্রশ্ন গৌণ হয়ে পড়ত। ফলে কন্যার পিতাকে বাধ্য হয়েই অসম বয়স্ক বৃদ্ধের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে হত। অল্প বয়সে সহজলভ্য বৃদ্ধপাত্রের সংগে জীবনের গ্রন্থি মিলিয়ে অসমবিবাহের ট্র্যাজিক করুণ পরিণতি ভোগ করতো। সামাজিক প্যাটার্ণ তাদের মানবীয় বৃত্তিগুলিকে স্থবির করে ফেলেছিল। তাই স্বামীর বয়সাধিক্যকেও দেবমর্যাদায় ভূষিত করতে হত—আর 'এদেশের কন্যামাত্রেরই পতির আদর্শ মৃত্যুঞ্জয় শিব, তাহার বয়সের আদি নাই—অন্ত নাই।' ধর্মভারাক্রান্ত মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের পতিনিন্দার বর্ণনায় কিংবা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' কিশোরী উমার বৃদ্ধপতির বর্ণনায় এই একই সুর ধ্বনিত। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলেও' অনুরূপ মানসিক ভাবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি :

> "পো এর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি।
> স্থবির হয়্যাছে তনু বরস বটে কি ॥
> রূপেগুণে সুন্দরী নাতিন ভাল আছে।
> এমন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে ॥"

বাংলার নারী সমাজের এই মর্মবেদনা গ্রামীণ লোকসাহিত্যের ধারার মধ্য দিয়েও লক্ষ্য করা যায় :

> "এমন বরে বিযে দিয়েছে,
> গোঁপ দাড়িটা পাকা।
> .. . .
> এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
> তামাক খেকো বুড়ো।"

উনিশ শতকীয় সামাজিক জীবনেও এই কুপ্রথাজনিত অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। অসমবিবাহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ স্বামী তরুণী স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ চরিতার্থতা ঘটাতে পারত না বলে তার চরিত্রে এক জাতীয় মানসিক দুর্বলতা এসে যেতো। এই দুর্বলতার সহাযতা নিয়ে অনেক সময় স্ত্রীরা স্বামীর কাছে অন্য দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে সে চাপ স্বেচ্ছাচারকেও প্রকাশ্যভাবে আশ্রয় করেছে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও এই সামাজিক সত্য আশ্রয় পেয়েছে :

১। ‘এক বরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাত'রের মাগ নিত্যি করেন গোসা ॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায় ॥
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায় ॥’

২. ‘দোজবরে ভাতারের মাগ।
চতুর্দশীর চোদ্দ শাক ॥’

উনিশ শতকের নাটকে, প্রহসনে, কবিতায় সর্বত্রই এই অসমবিবাহ বিষয়টিকে অবলম্বিত হতে দেখা যায়। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হেমন্ত রায়চৌধুরী প্রণীত ‘ত্রয়স্পর্শ বিবাহ’ পুস্তিকায় এই বিষয়বস্তুই একক বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে:

‘দন্তহীন হাসি হেসে, নেড়ে শুভ্র শিরে।
আদরে তোষেণ প্রিয়, প্রাণ প্রেয়সীরে···
বেঁচে থাক প্রাণপ্রিয়ে ফলাও সন্তান।
নরক হইতে মোরে, কর পরিত্রাণ ॥
ধিক্ ধিক্ বুড়ো বর, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
পুরুষে মাগীর দাস, ধিক্ শত ধিক্ ॥

উনিশ শতকের নাট্যপ্রহসনে এই অ-সমবিবাহ প্রসঙ্গের বিস্তার নিয়ে এইবার আলোচনা করা যাক্। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘কনের মা কাঁদে’ (১৮৬৩) প্রহসনে রায়গৃহিণী অযোগ্যবিবাহের মানসিক অসাম্য বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছে: ‘প্রাণনাথ, এ দেশের এই একটি অত্যন্ত মন্দ দেশাচার বলিতে হয়, যাহার সংগে যাবজ্জীবনের জন্য একত্রে ঘরকন্না করিতে হইবেক, তাহাদিগের উভয়ের মনস্থ হইয়া পরিণয় কার্য সম্পাদন হওয়া উচিত।’ ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধুর ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’; বৃদ্ধ বয়সে রাজীবলোচন বিপত্নীক হলেও বিত্তশালী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ বলে গ্রামের লোক তাঁকে অপদস্থ করতে চাইলেন। বিধবা কন্যা, দৌহিত্র ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার বিবাহেচ্ছু,—শেষ পর্যন্ত কিভাবে রাজীবলোচন পাড়ার ছেলেদের হাতে অপদস্ত হয়েছিলেন, নাটকে তারই পরিচয় আছে। প্রহসনখানি মূলতঃ কাহিনীকেন্দ্রিক। এর মধ্যে একদিকে দয়াহীন পিতার আশ্রিতা রামমণি ও গৌরমণির বৈধব্য ক্লেশ যেমন বেদনার সংগে চিত্রিত

হয়েছে, তেমনি অপরদিকে নবীনমন্ত মৃত্যুমুখযাত্রী রাজীবলোচনের বিবাহেচ্ছার উন্মত্ততাকে পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থন করে তদানীন্তন সমাজে পুরুষ ও নারীর বিবাহব্যবস্থার তারতম্যকে কোমল ভাবমিশ্র মধুর রসসিক্ত অথচ ব্যঙ্গ-কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

শেখ আজিমদ্দি প্রণীত 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) প্রহসনে দেখানো হয়েছে—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাই শুধু যে অর্থের লোভে অসম-বিবাহের অনুষ্ঠানে মত দিয়ে থাকেন তাই নয়—আত্মীয় স্বর্জনেরাও এতে সম্মতি দিয়ে থাকেন। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী বিপত্নীক এক বৃদ্ধ মৃত্যুকালে জল পাবার আশায় তার বেয়ানকে গহনার লোভ দেখিয়ে পাত্রীর সন্ধান করতে বলেন:

'একা শয্যা থাকি আমি নির্জন পুরীতে।
সময় হয়েছে, নাহি বিলম্ব মরিতে॥
কোন্ সময় মৃত্যু হয় বলিতে না পারি।
সে সময়ে কে দিবে বদনে তুলিয়ে বারি'॥

অলংকারের লোভে সেই বেয়ান মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সংগে সৌদামিনী নামে এক যোড়শীর বিবাহ দিলেন। বৃদ্ধ বহু সাধ্যসাধনা করেও সৌদামিনীর দেহস্পর্শ করতে পারলো না। কিছুদিন পরে, বৃদ্ধের মৃত্যু হলে সৌদামিনী এক ব্যবসায়ীর পুত্রের সংগে ভ্রষ্টা হল। ১৮৭৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ফেলুনারায়ণ শীল প্রণীত 'সাধের বিয়ে' প্রহসন-নাটকখানি প্রকাশিত হয়। ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের সংগে জনৈকা কিশোরীর বিবাহের প্রসংগ এতে বর্ণিত আছে। অযোগ্য বিবাহের ব্যঙ্গাত্মক বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও লেখকের উদ্দেশ্য ও প্রচারমুখীনতা এ নাটকে গৌণ হয়ে গেছে।

১৮৭৪ সালে অজ্ঞাতনামা রচিত 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা নাটকখানি জোড়াসাঁকো নব্যবঙ্গ নাট্যশালা থেকে প্রকাশিত হয়। মণিরামপুরের বৃদ্ধ জমিদার রাজীব গাঙ্গুলী তরুণী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করে নিতান্ত স্ত্রী-বশীভূত হয়ে পড়েন। প্রতিবেশী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিপরীত কথা বললে রাজীব মনুসংহিতা সাপেক্ষে প্রমাণ করে যে, তার বিবাহ করা অযৌক্তিক কিছু হয়নি। ইংরেজী পড়ে ছেলেরা সনাতন হিন্দুধর্মকে পদদলিত করছে এই যুক্তিতে তিনি

স্বগ্রামে স্কুল স্থাপনার্থে ব্যয়ের বিরোধী, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও তাঁর কাছে প্রত্যাশিত সাহায্য চেয়ে সর্বদাই বিমুখ হয়ে ফিরে যান—কিন্তু তরুণী স্ত্রীর জন্যে অকাতরে ব্যয়ে তিনি পশ্চাৎপদ নন। প্রতিবেশী রামকান্ত রাজীবকে জানায় যে, তার তরুণী স্ত্রী দুইজন যুবকের দ্বারা ভ্রষ্টা—তাদের নাম প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদ। প্রিয়নাথের অনুরোধে হেমাঙ্গিনী ধূমপান সুরু করে, আবার ব্র্যাণ্ডির প্রশংসা করলে সে ব্র্যাণ্ডি সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশ করে। রাজীব শয়নকালে তার প্রতি হেমাঙ্গিনীর প্রেমের যথার্থতা ও অকপটতা বিষয়ে প্রশ্ন করলে হেমাঙ্গিনী ক্রন্দনমুখরা হয়ে পিত্রালয়ে চলে যাবে বলে জানায়। রাজীব স্ত্রীর পাদস্পর্শ করে রতনচূড় দিতে প্রতিশ্রুত হলে হেমাঙ্গিনী স্বাভাবিকা হলেন। প্রজাদের তদারকে অর্থ আদায়ের জন্য যাবার সময় রাজীব রামকান্তের কাছ থেকে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে হেমাঙ্গিনী প্রিয়নাথকে নিয়ে আমোদে রাত্রি যাপন করবে। রামকান্ত রাজীবকে যাত্রা স্থগিত রাখতে বলে নিজ চক্ষে স্ত্রীর ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করবার ব্যবস্থাদি করে দেয়। রাজীব কনেষ্টবলদের পূর্ব থেকেই খবর দিয়ে নির্দিষ্ট দিনের ও মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ব্র্যাণ্ডি পান করে মাদকতাময় মুহূর্তে হেমাঙ্গিনী যখন প্রিয়নাথের অঙ্কশায়ী হয়ে রসালাপে মগ্না হল এবং কলকাতা গিয়ে উভয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করতে চাইল—তখনই নাটকীয়ভাবে দারোগা ভেতরে প্রবেশ করলে হেমাঙ্গিনী নানাভাবে তাদের গালাগালি দিতে সুরু করল। স্ত্রৈন রাজীব কাঁদতে কাদতে স্ত্রীর পদতলে মূর্চ্ছা গেল। নাটকটির শেষে কবিতাকারে একটি স্বস্তিবচন রয়েছে :

'সমানে সমানে বিনা প্রকৃত প্রণয়।
ধরাধামে কদাচন দৃষ্ট নাহি হয়॥

ধনী সনে ধনী জনে সদালাপে রয়।
নির্ধনের সনে কভু প্রেম নাহি হয়॥

সাধু চায় সাধু সঙ্গ গুণী গুণীজনে।
তস্করে তস্করে সখ্য বিবিধ বিধানে॥

তরুণী তরুণ সনে মনোল্লাসে রয়।
বৃদ্ধ সনে রসরঙ্গে মত্ত নাহি হয়॥

সমতার বিপরীত যথা দৃষ্ট হয়।
প্রকৃত প্রণয় নাহি জানিবে নিশ্চয়॥'

প্রহসনখানির মধ্যে রাজীবের উক্তি তৎকালীন অসমবিবাহকারীদের মনোভাবের দ্যোতক—"ব্রাহ্মণের রতি ইচ্ছা জাগলে সে যে কোন বর্ণের নারীকে বিবাহ করতে পারে, ব্রাহ্মণীর তো কথাই নেই। আর দেখ বিবাহ হচ্ছে তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। আমার হচ্ছে নৈমিত্তিক বিবাহ, কারণ আমি পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ করছি। দ্বিতীয়ত আমি হচ্ছি কুলীনের ছেলে, কাম্য বিবাহ আমারই তরে, আমি যটা ইচ্ছে তটা বিয়ে করতে পারি······তাতে কিছুমাত্র অধর্ম নেই।" আবার অপর দিকে হেমাঙ্গিনীর উক্তির মধ্য দিয়ে এর প্রত্যুত্তরকেও তৎকালীন সমাজের স্ত্রী-পক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় বক্তব্যরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে—পুরুষ যদি পরদার করে তাতে অধর্ম নেই, স্ত্রীলোকের বেলাই যত দোষ, স্ত্রীলোকের কি মন নাই, ইন্দ্রিয় নাই? জৈবিক বুভুক্ষার দাবীকে সংস্কারের হৃদয়হীনতা দিয়ে আবৃত করে রাখা যায় না। তাই অসমবিবাহ স্বাভাবিকভাবেই ব্যভিচারের জন্ম দিয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার রচিত 'রামের বিয়ে' প্রহসনটি ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রহসনখানির দৃষ্টিভংগী অসমবিবাহগত ও যৌনসমস্যা মিশ্র সাংস্কৃতিক সমস্যা। 'পিরিলী' নামে পরিচিত অন্ত্যজ ব্রাহ্মণশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে যে যোগ্য নয়—সেই সামাজিক সত্যও এই নাটকে প্রকাশিত। বৃদ্ধ রামতারণ মুখোপাধ্যায় বিবাহ-বাতিকগ্রস্ত। পতিতালয়ে যাবারও তার অভ্যাস ছিল। শেষ পর্যন্ত পাড়ার যুবকেরা কনে সেজে তাকে জব্দ করে এবং ছদ্মবেশী মামা-শ্বশুর গোলযোগ পাকিয়ে তোলেন—'পিরিলী' নামক নীচ ব্রাহ্মণ হয়েও রামতারণ কুলীনের মেয়েকে বিবাহ করতে এসেছে বলে প্রতারকরূপে পুলিশের দ্বারা ধরা পড়ে তিনমাস কারাবরণ করেন।

১৮৮০ সালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'অযোগ্য পরিণয়' নাটক প্রকাশিত হয়। অযোগ্য বিবাহের দুটি দিককে অবলম্বন করে নাটকখানি রচিত। একদিকে বৃদ্ধের তরুণী পাণিপীড়ন ও আর একদিকে যুবতীর শিশুবিবাহ ও তার পরিণতি নাটকখানিতে রূপায়িত হয়েছে। নাটকের এই সমাপ্তি বিষময় প্রথাকে উন্মূলিত করতে চেয়ে নাট্যকার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন: "এই দুটি কারণে আমাদের সমাজে কত অনিষ্টপাত হচ্ছে, তা বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। অতএব আপনারা কায়মনোযত্নে সমাজক্ষেত্র হতে এই বিষবৃক্ষ দুটি

উন্মূলিত করে স্বদেশের মঙ্গলসাধন করুন। আজ আপনাদের কাছে এই শেষ অনুরোধ।"

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ' (১৮৮২) নাটকটি স্ত্রীপক্ষের যৌন বঞ্চনা-প্রাপ্তি কেন্দ্র করে রচিত। কাহিনীটি এইরূপ—পদ্মনাথ গুণালঙ্কার একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বসন্ত বয়সে তরুণী হলেও যৌবন অপগত। কাজেই সেবাদাসীর প্রতি তিনি আসক্ত—তদ্ব্যতীত পতিতালয়েও গতায়াত ছিল। পদ্মনাথ নরেন নামক এক যুবককে প্রতিপালন করতেন। সেবাদাসী আপন কার্যসিদ্ধির কারণে নরেন ও বসন্তের কুৎসিত সম্বন্ধ রটনা করল। পদ্মনাথ নরেনকে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করলেন। বসন্ত মর্মাহত হয়ে মাতঙ্গিনীর কাছে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলে তা জ্ঞাত হয়ে পদ্মনাথ বসন্তকে ভর্ৎসনা করল। মুহূর্তের জন্য লাজলজ্জা ভুলে বসন্ত কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'না রুইলে কি চাষ হয়? দেখতে পাবে, যখন ফল ফলবে, তখন তোমার পোড়ার মুখ কোন্ চুলোয় লুকোবে?' পদ্মনাথ বুঝলেন সন্তানের মতো বসন্তের সংগে প্রেম সম্ভব নয়, মনের সংযোগসাধন সম্ভব নয়।

অসমবিবাহের কুফল-কেন্দ্রিক আর একটি নাটক শম্ভুনাথ বিশ্বাস রচিত 'ফচকে ছুঁড়ীর গুপ্ত কথা'; (১৮৮৩) এতে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার ব্যভিচার প্রবণতার ইংগিত করে অসমবিবাহের সামাজিক কুফল প্রকাশ করা হয়েছে।

রামকানাই দাস রচিত 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৮৪) নাটকে দেখা যায় একজন বাঙালীবাবু বৃদ্ধ বয়সে যুবতী বিবাহ করে দেহমন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীসেবায় নিযোজিত করে। স্ত্রীর মান রাখবার জন্য মা ও বিধবা বোনকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে। পত্নীব্রত বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত সওদাগরী অফিসের তহবিল তছরূপ করে সেই অর্থে স্ত্রীকে অলংকার গড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। প্রহসনখানি তৎকালীন আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে।

প্রফুল্লনলিনী দাসী প্রণীত 'ষষ্টি বাঁটা প্রহসন' সেকালীন দৃষ্টিকোণের হয়েও কিছুটা আধুনিক। এতে সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মেয়েদের পরাধীন জীবনের বেদনা যেমন প্রকাশিত—তেমনি সমসংস্কৃতি-সম্পন্ন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যে সুখের হতে পারে সেই বিশ্বাসের প্রতি অভ্রান্ত ইংগিত আছে।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'বুড়ো বাঁদর' (১৮৯০) নাটকেও অসমবিবাহের যৌন বঞ্চনার বিষময় প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। বাঁদরামির মধ্যে যেমন কুপ্রবণতা ও বুদ্ধিহীনতার সামানুপাতিকতা লক্ষ্য করা যায়—তেমনি বিবাহপ্রবণ বৃদ্ধের মধ্যেও অনুরূপ দ্বিবিধ দোষের উল্লেখ নাট্যকার করেছেন। অসমবিবাহের বিরুদ্ধে এখানে যে দৃষ্টিভংগীর পরিচয় আমরা পাই—সেখানে বৃদ্ধের কাম পরবশতা বা প্রবৃত্তির মূল্যবোধের দ্বারা রক্ষণশীল গোষ্ঠীকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

সমর্থার শিশু-স্বামী বা বালক-স্বামী বরণের দৃষ্টান্ত কৌলীন্যের পথবাহিত হয়েই আমাদের সমাজে উপস্থিত হয়েছিল। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের 'কামিনী' নাটকে (১৮৬৯)উদয়ের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে,—'শিবীরমাতার চুল পেকে গ্যাল, অবশ্যাষকালে ভাগ্‌গি বলে শিবীর আইবুড়ো নাম ঘুচাতে পুব্ব্‌ দেশ হতে একটি বছর ইগারর ছেলে এলো, তাই পর বিয়ে হল·· আহা সে বুড়ো বয়সে ভাতার পেয়ে বত্তে গ্যালো, ছেলেটিকে মার মতো যত্ন করত, পা ধুইয়ে দিত, বাতাস করত, সে যেন শিবীর গুরুপুত্তুর।' 'ঝকমারির মাশুল' (১৮৭৭) প্রহসনে বলা হয়েছে—'বুড়ো বয়সে ছোট মেয়ে বিয়ে করা এক জ্বালা।' রাধা-মাধব হালদার রচিত "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" (১৮৮৫) প্রহসনেও বৃদ্ধের তরুণী বিবাহের মানসিক বিভ্রান্তির প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে,—'এমন বামুন দেখিনে—৮০ বছর বয়সে একটা ছুঁড়ী বে করে উন্মাদ হয়েছেন। দু'দিন বাদে মরে যাবে আর একটা কুলধ্বজ রেখে যাবে।' পিতৃস্থানীয ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে নারীর যৌনসংস্কারে বাহিত বিপর্যয়ের ও বিকৃতির পরিচয়কেই একটি বর্ণনাত্মক কাহিনীর উপস্থাপনার মধ্যে বিধৃত করেছেন শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'নয়শো রূপেয়া' নামক প্রহসনের মধ্যে। প্রহসনটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। কানাই ঘোষাল নামক চরিত্রটির স্ত্রী চপলা তাদের ভৃত্যের সংগে কথা বললে ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হয়ে চোখ রাঙালে চপলা স্পষ্টকণ্ঠেই বলল, "কেন রে বুড়ো ড্যাকরা, তোকে আমায় বে করতে বলেছিল কে? তুই যেন না বুড়ো হয়েছিস, আমাদের অল্প বয়স, আমরা একটু হাসব না, আমোদ করবো না?····· মর! তোকে নিয়ে আমি আমোদ করবো কি রে? তুই যে আমার বাবার দশ বছরের বড়?"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) নাটকে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র প্রভাব আছে। এক বৃদ্ধ কৃপণ চতুর্থবার দার পরিগ্রহ

করতে গিয়ে কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তারই পরিচয় আলোচ্য নাটকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণবিহারী রায় রচিত 'পশ্চিম প্রহসন' (১৮৯২) নাটকে অসমবিবাহ বাতুল গবেন্দ্র পুত্র-পৌত্রাদি থাকা সত্ত্বেও বিবাহেচ্ছু। পাড়ার ছেলেরা মিথ্যা ঘটক সাজিয়ে গবেন্দ্রের বাড়িতে অনেক লোভজনক সম্বন্ধ প্রস্তাব পাঠায় এবং গবেন্দ্র তাদের খুবই আদরযত্ন করে। এইরকম এক মিথ্যা ঘটককে গবেন্দ্র টাকা দিলে সে গাযে হলুদের অনুষ্ঠান পর্যন্ত সমাধা করে পলায়ন করলে গবেন্দ্র অগত্যা একাই কনের বাড়ির সন্ধানে গিযে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। দ্বিতীয় বিবাহ প্রস্তাব ঠিক হলে বরযাত্রী না জোটায় গবেন্দ্র একাই বিবাহ করতে গিযে জানতে পারে কন্যা কলেরায মারা গেছে। পাড়ার ছেলেরা এবং পরে এক জ্যোতিষীকে পাঠিযে গবেন্দ্রের ভাগ্যদোষ কাটাবার জন্যে ছলনা করে তাকে গাধার পিঠে চড়িযে অপমান করলেও গবেন্দ্রের বিবাহ-বাতিক ঘুচল না।

উনিশ শতকীয অসমবিবাহকেন্দ্রিক নাট্য প্রহসনগুলির মধ্য দিয়ে এই-ভাবেই সমাজচিত্রের পর্যালোচনা-নিপুণ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়।

৯

পণপ্রথা ও বাংলা সামাজিক নাটক

বিবাহে পণগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কন্যাপণ গ্রহণে বিবাহকে আসুরবিবাহ বলে আখ্যাত করা হযেছে। এই আসুরবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হলেও আর্যসমাজে প্রচলিত হবার জন্যে নয। মনু উল্লেখিত আট প্রকার[৩৬] বিবাহ-ব্যতিরিক্ত অন্যতর প্রণালী আর্যশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। এই সকল বিবাহপ্রণালীর কোনটিতে পণগ্রহণ রীতি নেই; ব্রাহ্মবিবাহে বরকর্তৃগণ কন্যাপক্ষ থেকে অর্থ আদাযের দাবী করেন এরূপ কোন প্রমাণ নেই:

> 'অলঙ্কৃতা তু যঃ কন্যা বরায় সদৃশায় বৈ।
> ব্রাহ্মীয়েণ বিবাহেন দদ্যাতাস্তু সুপূজিতাম্॥ (ব্রাহ্মবিবাহ)

---

৩৬ ব্রাহ্মদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বোরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

স্বয়ং মনু কন্যাপণ সম্বন্ধে বলেছেন :

'ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী॥'
(মনু—তৃতীয় অধ্যায়, ৫১শ শ্লোক)

লোভে ও শুল্কে মুগ্ধ হয়ে আত্মকন্যা প্রদানকারীকে মহর্ষি কশ্যপ আত্ম-বিক্রয়ীরূপে উল্লেখ করেছেন :

'শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রযিণঃ পাপা মহকিল্বিষকারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলম্।
গমনাগমনেচৈব সর্ব শুল্কোঽভিধীযতে॥'

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে এ-বিষযে বলা হয়েছে :

'যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি বিক্রযং যদি।
বিপদা ধনলোভেন কুম্ভিপাকং স গচ্ছতি॥
কন্যামূত্র পুরীষাঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্ষাবদিন্দ্রা চতুর্দশঃ॥
মৃতশ্চ ব্যাধিযোনৌচ স লভেজ্জন্মনিশ্চিতম্॥

কন্যার পিতার কাছ থেকে পণগ্রহণ প্রথা শাস্ত্রোক্ত কোন বিবাহেই নেই। এই স্মৃতির আদেশ শুধুমাত্র শ্রুতির আদেশেই লঙ্ঘন করা যেতে পারে। আবার অনেকে বলেন কৌলীন্যপ্রথাজনিত যে প্রাপ্য তা গ্রহণে কোন প্রত্যবায় নেই—কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা কি কোন শাস্ত্রসম্মত নিয়ম? 'বিবাহে পণগ্রহণ' নামক পুস্তিকায় ললিতমোহন দাস উল্লেখ করেছেন,—"কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা যখন কোন শাস্ত্রেরই অনুমোদিত নহে, তখন উহার জন্য স্মৃতি অমান্য করা হিন্দুর পক্ষে কর্তব্য কিনা, সুবিবেচক পণ্ডিতগণই বিবেচনা করিতে পারেন। বাস্তবিক কৌলীন্য প্রথার দোহাই দিয়া পণগ্রহণে শাস্ত্রসংগত অধিকার নাই।"

পূর্বকালে বিবাহে পণগ্রহণ আর্যসমাজে প্রচলিত ছিল না। আর্যদের মধ্যে পণগ্রহণাত্মক আসুর বিবাহও প্রচলিত ছিল না। আর্যগণের অবনতির সংগে সংগে কন্যাপণ এ দেশে প্রচলিত হল। কিন্তু যে কোন সামাজিক নিয়মকে বৃহত্তর হিতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পণপ্রথা এই জাতীয়

হিতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপকারজনক হয়েছে কিনা বিচার্য। তবে পণগ্রহণে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার ভাব অনিবার্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়। তথাপি সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণের উপর নির্ভরতার পারম্পর্যে পণপ্রথা ব্যক্তিজীবনের বৃত্তকে ঘিরে নানা জটিল সম্পর্কেই সৃষ্টি করেছে। সমাজে এই পণপ্রথা অর্থশাস্ত্রের চাহিদা ও যোগানের নীতিনিয়মের মতো জটিল শ্রেণী বিন্যাসের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। বর ও কন্যার রূপ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আভিজাত্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বরপণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানদণ্ডের সৃষ্টি করেছে। কুলীনদের মধ্যে নির্বাচন ও নীতিনিয়মের দৃঢ়তা খুব বেশী বলে তাদের দাবীর উগ্রতাও সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। রাঢ়ী, শ্রোত্রীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদনে বিভিন্নভাবে এই পণপ্রথার আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে পণপ্রথা যেখানে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষেরই আথিক সংগতির উপর নির্ভরশীল, সেখানে পণপ্রথা স্পষ্টত কোন সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু যখনই সামাজিক জীবনে পণপ্রথা এক পক্ষকে লাভবান ও অপর পক্ষকে রিক্ত করবার ভারসাম্যহীনতায় পরিণত হয়েছে—তখনই তার মধ্যে সামাজিক বিনষ্টির বীজ উপ্ত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলার কুপ্রথা কবলিত এই সামাজিক নীতিনিয়মই আবার আমাদের প্রকারান্তরে এই শিক্ষাও দিয়েছিল যে, সর্বাঙ্গীণ আর্থিক মুক্তি ব্যতীত সমাজজীবনের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়।

ইংরেজশাসিতকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে অভিজাত শ্রেণী-বিন্যাসের উৎপত্তি হয়েছিল—তার সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। একদিকে ভূমি ব্যবস্থার অসম বণ্টনব্যবস্থা ও অন্যদিকে অত্যধিক করভারের পীড়ন অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ক্রমশঃ চাকুরীজীবী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। কাজেই পণপ্রথার মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণী সম্পত্তি বৃদ্ধির সুযোগ পেলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই সংকটের বলি হয়েছিলেন। এদিকে এই সুযোগে বিবাহ ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে রক্ষণশীল অর্থনীতির এক স্বতন্ত্র মানদণ্ড সৃষ্টি করেছিল। অর্থ-নৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে কৌলীন্যপ্রথাও পণ গ্রহণের সমাজ বিজ্ঞানানুমোদিত মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িককালে এই বিষয়ক কিছু আলোচনা-পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল—রাধিকাপ্রসাদ শেঠ চৌধুরী

প্রণীত 'বরপণ ও ক্ষতি' মাধবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'কন্যাপণ বিনাশিকা' কাশীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'কন্যাপণ বিনাশিকা', হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের'কন্যাদায়' প্রভৃতি পুস্তিকায় পণপ্রথার সামাজিক সংগতি-অসংগতিজনিত বিচার করা হয়েছিল। 'বঙ্গ-বিবাহ' নামক গ্রন্থে পণপ্রথা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল—'এ উপার্জনে পরিশ্রম নাই, আয়াস নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই, রাজকর নাই।' বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুসমাজে কন্যাদায় সমস্যার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির অমর্যাদার প্রশ্ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ—তেমনি এর ফলে বাঙালীর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডও বিধ্বস্ত হয়েছে। পণপ্রথার মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণী 'শিক্ষাবিদ্যাব্যবসায়ী' শ্রেণীতে পরিণত হয়ে ঘোরতর সামাজিক সংকট সৃষ্টি করেছে। পণগৃহীত বিবাহকে 'আসুর বিবাহ' রূপে চিহ্নিত করে এই কুৎসিত প্রথার প্রতি তিক্ত ও বিরূপ মন্তব্য উচ্চারিত হযেছিল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ৩২ সংখ্যায় (১০ই আষাঢ়, ১২৯১): "ছেলে যে পরিমাণে পাশ দিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে।......অনেক স্থলে অনেকে যেমন সমাজ সংস্কার ব্যাপারে প্রবর্তিত হইয়াছেন, এ বিষযেও তেমনি সকল জাতীয়ের সকল লোকেরই একটি সংস্কার ক্রিয়া আরম্ভ করা কর্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পর মিলিত হইযা এইরূপ এক একটি নিয়ম করুন যে, বিবাহকালে কোন বরকর্তা কন্যাকর্তার নিকটে কোন প্রকার অসংগত দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না।......আমাদের কন্যাদানের যে প্রথা আছে তাহাতে কন্যাকর্তা প্রায বিত্তসাধ্য করেন না। শাস্ত্রেও আছে সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হইবে। অতএব যাহার যেমন সংগতি তিনি তেমনি কন্যাভরণ, বরাভরণ প্রভৃতি দিতে ত্রুটি করেন না। তবে কন্যাকর্তাকে পীড়ন করা কেন?" বিষয়বস্তুর ভয়াবহতা প্রমাণে পত্রিকাতে রূপচাঁদ পক্ষীর এই বিষয়ক একটি শ্লেষ সংগীত উদ্ধৃত হয়েছে।[৩৭]

উনিশ শতকীয় বাংলা সামাজিক নাটক ও প্রহসনে যুগপৎ এই প্রথার ব্যঙ্গাত্মক নিন্দা ও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই শতকের প্রথম ভাগের নাটকগুলির মধ্যে কন্যাপণ প্রথা ও শেষভাগে রচিত নাটকগুলির মধ্যে বরপণ প্রথার ব্যাপকতাকে আশ্রয় করা হয়েছে। রাধামাধব হালদারের

৩৭ পরিশিষ্ট (৯)-তে সংগীতটি উদ্ধৃত হল।

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৫) প্রহসনে কন্যাপণ লোভী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণকে গো-ব্যবসায়ীরূপে নিন্দিত করা হয়েছে।

হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩) প্রহসনে কন্যার পিতাকে কশাইয়ের সংগে তুলনা করা হয়েছে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 'কন্যাদায়' নাটকে সমাজে পণপ্রথার কুফল ও কন্যার বিবাহে পিতৃকুলের দুর্দশার ছবি এঁকেছেন। পুত্রের বিবাহ দ্বারা প্রচুর বিত্ত-লাভের প্রচেষ্টা দরিদ্র কন্যাদের পিতাদের শোষণ করছে এবং কন্যাদায় ভারে পীড়িত পিতার অন্তর্বেদনা কিভাবে কন্যার কোমল প্রাণকেও ব্যথাতুর করে তুলছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে এ নাটকে। কন্যাকে সুপাত্রস্থ করার ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও দেনা পাওনার মানদণ্ডে কন্যার বিচার এবং পুত্রের পিতার কাছে দরিদ্র কন্যাপক্ষের আত্মবিক্রয়ের করুণ রূপ নাট্যকারকে ব্যথিত করেছে। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন,—"বিবাহে বর পক্ষীয়দিগের অর্থলাভেচ্ছা বলবতী হওয়াতে ভদ্র সমাজে যে কি বিষম আঘাত লাগিতেছে তাহা তৎকালে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহারই প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল, এবং প্রসংগক্রমে ইহাও দেখাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমাদিগের সংস্কার চেষ্টা অধিকাংশ স্থলে অকিঞ্চিৎকর ও আন্তরিকতা-শূন্য।......প্রায় বিংশ বৎসরের মধ্যে বর্ণিত সমাজের অপকর্ষ ভিন্ন উন্নতির ভাব দেখা গেল না। বিবাহসংকট উত্তরোত্তর আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করিয়াছে।" নাটকটিতে দেখানো হয়েছে কন্যাদায়গ্রস্ত রামবাবুর কন্যা সুশীলার সংগে শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত যুবক গোপালের বিবাহ হল এবং ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবাহে যৌতুকদান বা পণপ্রথার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্যজীবনের সুখ শান্তি নির্ধারিত হয় না। পণপ্রথা কণ্টকিত হিন্দুসমাজে সুশীলার রূপগুণের কোন মূল্যই নেই, পিতার দারিদ্র্যের কারণে তার সহজে বিবাহ হয় না। সুশীলার পিতাকে রাজবল্লভবাবু তাঁর পুত্র সুরেনের সংগে বিবাহ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভবাবুর স্ত্রী হরসুন্দরী তার দাসীর পরামর্শে এই বিবাহ যাতে না অনুষ্ঠিত হয় সেই চক্রান্ত করলেন। এদিকে আদর্শবাদী যুবক গোপাল কন্যাদায়গ্রস্ত রামবাবুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো। বিবাহে পণপ্রথার নীচতা সে কোনমতেই সহ্য করল না। সুশীলাও গোপালের মতো আদর্শনিষ্ঠ

সৎ যুবকের পরিবারে এসে সুখী হল। তুলনাক্রমে নাটকীয় উপকাহিনী বিস্তারের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, গোপালের বন্ধু নবীন বিবাহে পণগ্রহণ করে ধনী কন্যার পাণিগ্রহণ করলেও সুখী হয়নি। কিন্তু সুশীলা সুমিষ্ট ব্যবহারে ও মাধুর্যে সংসারকে শান্তশ্রীতে ভরিয়ে তুলেছে। আবার রামবাবুর অর্থাৎ সুশীলার পিতার সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহারে গোপাল ও তার পরিবারও তৃপ্ত। এ-কথাই নাট্যকার প্রমাণ করেছেন যে, বিবাহে যৌতুক ও পণগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ শান্তি নিরূপিত হয় না।

'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৬) প্রহসনে রাধাবিনোদ হালদার শুধুমাত্র কন্যাপণের অর্থগৃধ্নু দিকটি নয়—তার সংগে অসমবিবাহের যৌনসংকট ও তজ্জাত ব্যভিচারের দিকটিও বিশ্লেষণ করেছেন। পণপ্রথারূপ সমাজনীতিই কিন্তু এই বিপর্যয়ের কেন্দ্রীয় শক্তি। এই সংগে নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে বিশ্লেষিত হতে পারে—ভজহরির কন্যা সুশীলা যৌবনবতী ও সুন্দরী। বহু ব্যক্তিই বিবাহ প্রস্তাব দিলেও ভজহরির নির্ধারিত কন্যাপণের অঙ্কের সমবিন্দুতে পৌঁছনো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। নটবর বহু কষ্ট করে এক হাজার টাকা সঞ্চয় করে ভজহরির কাছে বিবাহ প্রস্তাব আনলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে—নটবর ক্ষুব্ধ হয়ে এর প্রতিশোধ নেবার বাসনা প্রকাশ করে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সুহাসিনীর সন্তানাদি না হওয়ায় ভজহরি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর কন্যা সুশীলা। দুই স্ত্রী অহর্নিশি তুমুল দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিদ্রূপবাণে ব্যাপৃতা থাকায় ভজহরি দুইবার বিবাহ করার দরুণ আত্মধিক্কার দিতে থাকে। অর্থলোভী ভজহরি শুধুমাত্র টাকার লোভে এক অশীতিপর বৃদ্ধের সংগে সুন্দরী কন্যা সুশীলার বিবাহ দিলেন। বৃদ্ধ স্বামী তারাচাঁদ যজমানী করে কোনমতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। একদিকে অবস্থা বৈগুণ্যে লাঞ্ছনা ও অন্যদিকে অসমবিবাহ সুশীলার জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। এদিকে অপমানিত নটবর কুটনী কমলার সহায়তায় সুশীলার সংগে যোগাযোগ করল। সুশীলার সংগে তার পূর্বেই আকর্ষণ ছিল। প্রেমালাপকে বিবাহে উত্তীর্ণ করতে চেয়ে নানা কৌশলে বৃদ্ধকে কাশী যাবার জন্যে অনুরোধ জানালে তরুণী স্ত্রীর সংগে সে যায়। নটবরও সুশীলার নির্দেশমতো কাশী যায় এবং সেখানে সুশীলা সুকৌশলে বৃদ্ধকে প্রতাড়িত করে নটবরের সংগে মিলিত হয়। এ নাটকে কন্যাপণের বিষময় পরিণতির সংগে অসমবিবাহ ও অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম চিত্রিত হয়েছে।

শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত 'নয়শো রূপেয়া' প্রহসনটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে; এ নাটকের মধ্যে একদিকে যেমন অর্থলোলুপতার তীব্রতার মধ্য দিয়ে কন্যাকে পণ্যদ্রব্যেরই সমার্থক করে তোলা হয়েছে—তেমনি নাট্যকার যৌন-সমস্যার দিকটিকেও সুতীক্ষ্ণভাবেই তুলে ধরেছেন।

জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রণীত 'অস্থরোদ্বাহ' (১৮৬৯) প্রহসনের ভূমিকায় গ্রন্থকার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কন্যাপণবিষয়ক রীতির নিন্দা করেছেন। কাহিনীর সূচনাতেই লক্ষ্য করা যায়—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হরিহর চক্রবর্তীর স্ত্রী কামিনীর কাছে প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষীরোদা বর্তমান যুগের বিবাহসংক্রান্ত আলোচনায় হৃদয়হীন পিতারা অর্থলোভে কিভাবে পলিতকেশ বৃদ্ধের সংগে কন্যাকে বিবাহ দেন—সে-বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। এমন সময় সৌদামিনী নামক এক কায়স্থ কন্যা এসে কেদারনাথ রায়ের সংগে কামিনীর কন্যাকে বিবাহ দিতে বললে কামিনী শ্রোত্রীয় সমাজের পণপ্রথা বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে, তার স্বামী কেদারের সংগে বিবাহ তো দেবেনই না—বরং যেখানে দশ টাকা বেশী পাবেন, সেখানে বিবাহ দেবেন। জ্ঞানদার জন্যে কলকাতা থেকে ইতিমধ্যে যে সম্বন্ধ আসে সে পক্ষ পণ হিসেবে ৪০০ টাকা দিতে রাজী হলেও পাত্রের বয়স ছত্রিশ—অথচ জ্ঞানদার বয়স মাত্র তিন। এদিকে কেদারের বাবার বন্ধু গঙ্গাপ্রসাদ কেদারের জন্য একটি বয়স্থা পাত্রী নির্বাচিত করেন এবং তার সংগেই কেদারের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। একই দিনে হরিহরের বাড়ীতেও প্রৌঢ়ের সংগে শিশু জ্ঞানদার বিবাহানুষ্ঠানে পণ নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। হরিহর ক্রমোচ্চ হারে পণের মাত্রা বাড়াতে থাকেন এবং বরকর্তা ক্রুদ্ধ হলেও বরের নির্দেশে বিপুল পণের চাহিদা মিটিয়ে দেন। কিন্তু বিবাহের পরে বর বুঝতে পারল যে, বিবাহের নামে তার এখন ভিক্ষুকেরই দশা। এদিকে কেদারনাথ বিয়ের পর জানতে পারে যে, তার নববিবাহিতা স্ত্রী বিধবা—অর্থলোভেই তাকে পুনর্বিবাহ দেওয়া হয়েছে। অতএব সমাজের ভয়ে এই বিবাহ অসিদ্ধ বলে কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে পরিত্যাগ করাই স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সেখান থেকেও ব্যভিচারিণী বলে বহিষ্কৃতা হলে কুমুদিনী আত্মহত্যা করে। নাটকটিতে সমসাময়িক কন্যাপণ-প্রথার ও সামাজিক রীতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

হীরালাল ঘোষ রচিত 'রোকা কড়ি চোকা মাল' (১৮৭৯) প্রহসনে

নাট্যকার ব্যক্তিত্ব ও মানবতার দিক দিয়ে পাত্রকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও পণ্যদ্রব্যের সামগ্রীরূপে চিত্রিত করেছেন। গোবরডাঙ্গার রাখাল রায়ের বিবাহযোগ্যা কন্যা কুসুমকুমারী। ইছাপুরের পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক পাত্রের সন্ধান নিয়ে ঘটকী এলো। এদিকে রাখাল কন্যাকে বিনা খরচায় ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চায়। অবশেষে খাঁটুরা থেকে একটি সম্বন্ধ আসে। রাখাল তার ভাই রাসবিহারীকে নিয়ে পাত্রের পিতার সংগে সাক্ষাৎ করলে পাত্রের গুণগান করে তিনি দীর্ঘ এক ফর্দ দিলেন। উভয়ে যুক্তি করে রাখাল ও রাসবিহারী পাত্রের পিতার পণের দাবী পুরোপুরি মেনে নেন। যথাসময়ে বিবাহ বাসর বসে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরে পাত্রের পিতা একান্ত অধৈর্য হয়ে রাখালবাবুকে সেই সেই বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেন। শুধুমাত্র কন্যাটিই তাঁর প্রাপ্য এই কথা বলে রাখাল সকলের মাঝখানে কন্যাকে এনে দাঁড় করালেন। পিতা সক্রোধে পশ্চাৎবর্তী হলেও পুত্র পাত্রীর রূপে বিমুগ্ধ হযে বিয়ে না করে কিছুতেই যাবে না বলে জেদ ধরে। কন্যাপক্ষীয়েরা মহানন্দে কন্যার বিবাহে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু পাত্রের পিতা আর্থিক ক্ষতির প্রসংগ স্মরণ করে মুহুর্মুহু কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

যতীন্দ্রনাথ শর্মা রচিত 'কন্যাদায়' (১৮৯৩) প্রহসনটির মধ্য দিযে কন্যাদায়ের মর্মযন্ত্রণা ও বরপণের নির্লজ্জ নিরাবরণ প্রকাশের মধ্য দিযে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের প্রতি প্রতিঘাত হেনে নাট্যকাব সমাজমনের আত্মসংবিৎ ফেরাতে চেযেছেন। চন্দ্রনাথবাবু কন্যাকে সুপাত্রে বিবাহ দেবার জন্যে পণলোভী সমাজের চরিতার্থতার কারণে দালাল কামিনীকে জমি বিক্রয় করতে চান। চন্দ্রনাথবাবুকে তাঁদের দেশে চলে যেতে বলেন—কাবণ সেখানে কন্যাপণ পাওয়া যায। কিন্তু চন্দ্রনাথ তাতে রাজী নন। এদিকে শিক্ষিত উকিল বিপিনবাবু ওকালতিতে পসার জমাতে অসমর্থ হযে ঘটকালীকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চন্দ্রনাথ বিপিনের শরণাপন্ন হলে বিপিন ঘটক-বিদায় হিসেবে একশত টাকা দাবী করেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ মাত্র দশ টাকা দিতে সম্মত হন। বিপিন শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজী হলেন বটে, কিন্তু সমস্ত টাকাটাই কৌশলে আদায় করতে অভিসন্ধি করলেন। বৃদ্ধ জমিদার যোগেনবাবুর কাছে পাঁচ হাজার টাকায় বাড়ী বাঁধা দিযে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনাথবাবু শ্যামাচরণবাবুর পুত্র কিশোরীর সংগে বিবাহ পাকাপাকি করেন। উন্নতমনা

যুবক কিশোরী পিতার অর্থলোভের এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে সকলের অগোচরেই যোগেনবাবুর টাকা পরিশোধ করে দলিলটি চন্দ্রনাথবাবুকে প্রত্যর্পণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রনাথ উদারচেতা জামাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এদিকে পিতার মনে অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুঃখ সৃষ্টির জন্য অনুতপ্ত হয়ে কিশোরী কিছুদিনের জন্যে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এনে পিতার হাতে দিলে পিতার মনোকষ্ট দূর হয়। এদিকে অর্থলোভী জমিদার যোগেনবাবুর পুত্রের বিবাহ দিয়ে এক হাজার টাকা ঘটক বিদায়ের লোভে বিপিন এক পতিতার কন্যা প্রমদার সংগে বিবাহ স্থির করেন। টাকার লোভে যোগেন-বাবু কুলশীলের পরিচয় না জেনেই বিবাহকার্য নিষ্পন্ন করলেন। পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে ধিক্কার দিলে যোগেশবাবু কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা করেন।

'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' (১৮৯০) প্রহসনে বরপণকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজ-জীবনে পৈশাচিকতা ও দুর্নীতি কতোখানি প্রকট হয়েছিল—নাট্যকার তারই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং এই নির্মম প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছেন এবং এই বিশিষ্ট সামাজিক ব্যাধির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। পুত্রের বিবাহে ১৪০০০৲ পণ দাবী করে লোভেন্দ্রবাবু বড়লোক হতে চাইলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়ে প্রচুর পণলোভের আশায় পূর্ব থেকেই পুত্রকে বাবুগিরিতে প্রচুর অর্থ দান করে তাকে মানুষ করেছিলেন। তার ফলে পুত্র গবেন্দ্র অধঃপতনের পথে ক্রমশঃ আফিঙ, মদ ও বেশ্যাসক্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বলপূর্বক মায়ের অর্থ ও অলঙ্কার চুরি করে অসৎ পথে ব্যয় করে। এদিকে গোবিন্দপুরের পরাণবাবুর মেয়ের সংগে গবেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ প্রস্তাব এলে লোভেন্দ্র ১০০০০৲ থেকে এক পয়সা কমাতে রাজী হলেন না; ইতিপূর্বে পরাণবাবু দুই মেয়ের বিবাহকালে লোভেন্দ্রের কাছে বাড়ী বন্ধক দিয়ে দুই দফায় দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। পরাণের দুই বন্ধু শ্যামবাবু ও হরিবাবু লোভেন্দ্রকে জব্দ করবার পরিকল্পনা করলেন। পুত্রকে সৎপথে ফেরাতে গেলে গবেন্দ্র লোভেন্দ্রকে প্রহার করে ফিরিয়ে দেয়। এই সময়ে হরিবাবু লোভেন্দ্রকে এক অলৌকিক ক্ষমতাধিকারী সন্ন্যাসীর পরিচয় দিলে অর্থ লোভে লোভেন্দ্র সন্ন্যাসীরূপী শ্যামবাবুর কাছে যান। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকজন কাবুলীর মুখোস পরে লোভেন্দ্রের কাছে বিশ হাজার টাকা দাবী করে—অনাদায়ে তলোয়ার উঁচিয়ে তাকে হত্যা করবার ভয় দেখায়। লোভেন্দ্র গবেন্দ্রকে চিঠি লিখে বিশ

হাজার টাকা দাবী পূরণ করলে হরিবাবুর দল প্রস্থান করলেন। এইভাবে লোভেন্দ্রের অর্থনেশার অন্ত ঘটল।

সমাজে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে পণপ্রথার সংগে জড়িত করে তৎকালে শিক্ষাকে কিভাবে বৈষয়িকতার কাজে ব্যবহৃত করা হয়েছিল—তারও প্রমাণবহ কয়েকটি নাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রুচিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে জড়িত করা হয়েছে। দুর্গাচরণ রায় রচিত 'পাশ করা ছেলে' (১৮৭৯) প্রহসনটি এই দৃষ্টিকোণে রচিত। বারাণসীর কালেক্টরের সেরেস্তাদার তারাপ্রসন্নবাবুর কন্যার সংগে দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামদাস শর্মার পুত্র কিশোরীর বিবাহ হয়। কিশোরী পাশ করা ছেলে এবং খুবই সৎ। কিন্তু তারাপ্রসন্নের কন্যা নগেন্দ্রবালা দরিদ্রের ঘরে এসে পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারল না। মানসিক যন্ত্রণায় কিশোরী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাধাবিনোদ হালদার রচিত 'পাশ করা জামাই' (১৮৮০) প্রহসনের নায়ক কেদার বি. এ. পাশ; প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তার পিতা তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। অতএব ৫০০০৲ টাকার কমে তিনি পুত্রকে বিবাহ দিতে নারাজ। শেষে ঐ নির্ধারিত অঙ্কেই বিবাহ স্থির হয় এবং বিবাহের রাত্রে অন্যান্য মহিলাদের কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বিবাহবাসর ত্যাগ করলে অর্থ লোভী পিতা পুত্রের ব্যবহারে অপদস্থ হন।

অজ্ঞাত লেখক প্রণীত 'রহস্যের অন্তর্জলী' প্রহসনে কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের পণপ্রথা ও অর্থলোভের পরিচয় ফুটে উঠেছে স্বকৃতভঙ্গ কুলীন চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ হরচন্দ্র চক্রবর্তীর চরিত্রের মাধ্যমে; প্রথম ব্যক্তি নিজে বিবাহ করে ও দ্বিতীয়জন কন্যা বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করেন।

পণপ্রথার সামাজিক দুর্নীতির উপর আক্রমণ করে রচিত বিখ্যাত নাটক অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪); এই 'সামাজিক নাট্যলীলায়' নাট্যকার পণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এল. এ. পড়া নন্দলালের পিতা গোপীনাথ সরকার কিভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত মন্মথ মিত্রকে সর্বস্বান্ত করে বরপণ আদায় করল এবং নন্দলাল কিভাবে সেই অর্থ থেকে পিতাকে বঞ্চিত করে বিলাত পাড়ি দিল তারই পরিচয় প্রহসনখানিতে পাই। পাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বিবাহে ব্যবসায় রূপে ব্যবহার করার রীতিকে নাট্যকার নিম্নরূপে শ্লেষবিদ্ধ করেছেন:

"ঘটক। তবে এই চারহাজার টাকা!

গোপী। হ্যাঁ, আর ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি আর সোনার চশমা?

ঘটক। চশমা?

গোপী। ছেলে কি তবে শুধু চোখে কলেজে যাবে?

ঘটক। কেন, চক্ষের কোন ব্যামো হয়েছিল না কি?

গোপী। তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখ না, এল.-এর বিদ্যা এমন সূক্ষ্ম হয়েছে, চশমা না হলে স্পষ্ট দেখা যায় না।

চন্দ্রনাথ। সর্বাঙ্গসুন্দর হচ্ছে, তবে একটা প্রধান অঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

গোপী। কি দাদা—কি দাদা—বল তো, বুড়ো হয়েছি, কত রকম কি নতুন হয়েছে, সব জানিও না, মনেও পড়ে না।

চন্দ্র। একটি সোনার ল্যাজ, বিদ্যার চাপে ছেলে ঝুঁকে পড়লে চাড়া দিতে হবে তো?"

সমাজ-অঙ্গের এই বীভৎসরীতিকে ধিক্কার জানিয়ে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার গোপীনাথের মুখ দিয়ে বলেছেন,—'ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ী আছে—সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে!' 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের সামাজিক মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে এটিকে 'ধারাপাত, বর্ণপরিচয়ের মত বাঙালীর প্রতি ঘরে ঘরে' অবাধ প্রবেশের দাবী করেছিলেন। স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সালের ২২শে নভেম্বর নাটকটি প্রথম অভিনীত হলে তৎকালীন অনেক সংবাদ-পত্রে এর অকুণ্ঠ সুখ্যাতি হয়েছিল। এই নাটকখানি ও তার অভিনয় আমাদের বিভ্রান্ত সমাজকে কতোখানি আত্মস্থ করেছিল—সে-সম্বন্ধে অভিনয়ের বিজ্ঞাপন পত্রে (পরে 'রূপ ও রঙ্গ' ১৮ আশ্বিন, ১৩৩১ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত) স্বয়ং নাট্যকার বলেছিলেন,—"বিবাহ বিভ্রাট কি করিয়াছে? এ বিষয়ে আমাদের বেশী বলা ভাল দেখায় না; শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয়ের অতি অল্প পরেই রঙ্গমঞ্চে 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অবতারণা করা হয়; এইটুকু মনে করিয়া লইয়া তৎপূর্বের ও পরের সময়ের পর্যালোচনা করুন। কি স্বদেশীয় কলেজে শিক্ষিত, কি বিলাতী বিদ্যা লাভান্তে প্রত্যাগত সমাজের ভিত্তিস্বরূপ বঙ্গের মুখোজ্জ্বল

যুবকগণের আচার ব্যবহার চালচলনের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। 'যুবতীরাও' যেন কিছু সংযতা হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।'

বাংলার সমাজজীবনের পণপ্রথার বিষময় ফল নির্দেশ করে তদানীন্তন সমাজ-হিতৈষী মনীষী সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন 'বলিদান' নাটক (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে); অতি-নাট্যিক ঘটনার সমাবেশ নাটকখানিতে আছে। গিরিশ-প্রতিভা ভাবমুখীন—বস্তুমুখী নয়। সমাজদৃষ্টির স্বাভাবিক সহজাত প্রেরণা তাই তাঁর নাটকে অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষ সমাজবোধ থেকে আধ্যাত্মিক আদর্শে বরং তিনি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। ব্যবহারিক সমাজ সমস্যার রূপকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন বলে বহির্বিক্ষোভের কথাই সেখানে বড়। তাই তিনি নিপুণ সমাজদ্রষ্টা ছিলেন না। বৃহত্তর যে সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক জীবন আশ্রয় করে পণপ্রথার বিস্তার ও প্রসারতা ঘটেছিল—সেই সুতীক্ষ্ণ সমস্যাচিত্রণের দিকটি তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র ছিল না।[৩৮] তথাপি উদ্দেশ্যের সফলতায় 'বলিদান' বাংলার জনপ্রিয় নাটকগুলির একটি; এর সংবর্ধনায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় (১৯শে এপ্রিল, ১৯০৫) মন্তব্য করেছিলেন:

"Babu Giris Chandra Ghose's latest social tragedy which is having a successful run at Minerva deserves well of the Hindu Public of Bengal to whom it is addressed he mercilessly castigates the dowry system and if the function of the stage is to educate public opinion by object lessons, let us hope the distinguished playwright's mirror of the ugly feature in our social fabric, will produce the desired effect."

---

৩৮ 'বলিদান' নাটকের মতো সামাজিক বিয়োগান্তক নাটক রচনা করলেও এর প্রতি গিরিশচন্দ্রের খুব আন্তরিক আনুকূল্য ছিল না। বলিদান-এর অভিনয় যখন খুবই জমজমাট—তখন একদিন অভিনয়ান্তে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন,—"মশায়, এমন Powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব। Marriage Problem নিয়ে আমি একটা farce করেছি, আপনি তা নিয়ে একটা বড় tragedy করলেন। উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, 'এ সব নাটক তো আমার লেখবার কথা নয়। মনে করেছিলাম, শেষ বয়সে দু' চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা বুড়ো বয়সেও এ নর্দমা ঘাঁটতে হচ্ছে। এ-সব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাঁটা এক।' —রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে এইরূপ—কলকাতা শহরের একজন মধ্যবিত্ত চাকুরী-জীবী করুণাময় বসুর তিনকন্যা কিরণ্ময়ী, হিরণ্ময়ী, জ্যোতির্ময়ী ও এক পুত্র নলিন। বহু অনুসন্ধান করে প্রথমা কন্যার বিবাহ দিলেও লম্পট স্বামী ও শাশুড়ীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পিত্রালয়ে আশ্রয় নিল। দ্বিতীয়া কন্যাকেও অনুরূপ চেষ্টা ও যত্নে বৃদ্ধ ও রুগ্ন বরে পাত্রস্থ করলে অল্প দিনের মধ্যে সেও বিধবা হল এবং পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করল। দুই কন্যার বিবাহে দেনা-গ্রস্ত হয়ে আর্থিক কৃচ্ছ্রতায় পুত্রের পড়া বন্ধ হল। জ্যেষ্ঠা বিধবাকন্যা হিরণ্ময়ী আত্মঘাতিনী হল। এদিকে প্রতিবেশী এক দুশ্চরিত্র লম্পটের সংগে বাধ্য হয়ে তৃতীয়া কন্যা জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ দিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন। দারিদ্র্যে ম্রিয়মান, কন্যাদায়ে উদ্বাস্ত এবং সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করুণাময়ের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে উন্নতচেতা, উদারপ্রাণ শিক্ষিত ও ধনবান যুবক কিশোর জ্যোতির্ময়ীকে বিবাহ করে করুণাময়কে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে চাইল। বিবাহলগ্নে পূর্বোক্ত লম্পট পুত্রের পিতা বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে জ্যোতির্ময়ীকে বাগ্‌দত্তা বলে দাবী করলে সত্যভ্রষ্ট হলেন বলে আত্মগ্লানিতে করুণাময়ের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কিশোরের সংগেই জ্যোতির্ময়ীর বিবাহ হল। অনুশোচনায় সেই রাত্রেই করুণাময় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলে স্ত্রীও তাঁর পথ অনুসরণ করলেন,—'আমার পোড়া পেটের জন্য, আমার ছেলেমেয়ের জন্য—লোকের কাছে মাথা হেঁট করে এসেছ, তাই আপনাকে বলিদান দিয়েছ।' করুণাময়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী ঘনশ্যামের মুখ দিয়ে গিরিশচন্দ্র উচ্চারণ করেছেন : "আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান!—তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান!' 'বলিদান'-এর অসাধারণ মঞ্চ-সাফল্যের কথা সুবিদিত। মিনার্ভায় এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল ২৬শে চৈত্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দে ; সেই সংগে স্মরণীয় নাটকখানির ট্র্যাজিক সুরের সংগে সংগতি রেখে সুশীলাবালার কণ্ঠের গান—'উলু নয় রোদনধ্বনি', 'কলিতে অমর কনের শাশুড়ী, কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোথা হে মধুসূদন ইত্যাদি। গানগুলিও গভীর সামাজিক

তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (১৯০৭) প্রহসনের শেষ দিকেও পাত্রপক্ষের অহেতুক পণ চাওয়ার রীতির উল্লেখ করেছেন —পণপ্রথার রূঢ়তা দেখান অবশ্য নাটকটির মূল উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচ্য সময় সীমার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে নাটকটি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' (১০ এপ্রিল, ১৯১৬) তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটির বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনার ইতিহাস প্রসংগে দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখ করেছেন: "সামাজিক নাটকের রচনার কথাপ্রসংগে একদিন ৺ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় দ্বিজেন্দ্রকে improvident marriage বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিতে বলেন। সেই কথামতো কন্যার বিবাহে ক্ষমতাতীত ব্যয়ের বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্র এই 'বঙ্গনারী' নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন।" এই নাটকে সামাজিক নাট্যাদর্শের সম্ভাবনাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যবিবাহের কুফল ও পণপ্রথার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। নাটকখানির মধ্যে সামাজিক বিতর্কের অভাব না থাকলেও তা চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। বাংলা সামাজিক নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত উপাদান ও পদ্ধতিরই পথচারী দ্বিজেন্দ্রলাল। তাই 'বঙ্গনারী' নাটকের উপরেও গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের প্রভাব লক্ষণীয়। 'বঙ্গনারী'র দুঃখবিভ্রান্ত গৃহকর্তার সংগে 'বলিদান'-এর করুণাময় তুলনীয়। সমাজজীবনের আন্দোলন-মুখর ও সমস্যাকীর্ণ অনিবার্যতায় দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের মর্মভেদী বেদনার পরিচয় পাই তাঁরই স্বীকারোক্তিতে: "প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সেদিন গিয়েছে। হাসিতামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।" উক্তিটি বাংলা নাটকের সমাজ তাৎপর্যের সংগে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের নিগূঢ় সংকেতবহ। মুকুন্দদাস তাঁর 'সমাজ' পালায় এই পণপ্রথার উচ্ছেদ কামনা করেছেন। সমসাময়িক সমাজ-জীবনের বহু বিচ্ছিন্ন বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের 'আয়না' (১৯০২) নামীয় সামাজিক নক্‌শানাটক। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যাদায় সমস্যা; বিধবা-বিবাহ, বৃদ্ধের অসমবিবাহ-বাতিক, আইনজীবীদের

প্রতি কটাক্ষ ইত্যাদি বিষয়-বিচিত্রায় সমৃদ্ধ হয়েও এ নাটকের নাট্যরস এক-মুখীন নয়—বিচিত্র মুখীন।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের একটি সংকটময় কুপ্রথা পণগ্রহণ রীতিকে অবলম্বন করে বাংলা নাট্যশাখারও পল্লবিত বিস্তার আমরা লক্ষ্য করি।

১০

সামাজিক ও নৈতিক ব্যভিচার এবং বাংলা নাটকে তার প্রভাব

উনিশ শতকে বণিক নগরী কলকাতায় শিল্প বাণিজ্য-কেন্দ্রিক নগরজীবন প্রতিষ্ঠার প্রবণতা থেকেই সমাজজীবনে জটিলতার সূত্রপাত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মানদণ্ডের মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হল। উৎপাদন রীতিতে পাশ্চাত্য বৈপ্লবিক প্রভাবের ফলে কুটীর শিল্পের অবনতি ঘটল এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রবল অভিঘাতের সম্মুখীন হল। কলকারখানা-সেতু-রেলপথ প্রভৃতির পুনর্নিমাণ ও পুনর্বিন্যাস নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করল; বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বাণী নবীন উৎসাহে সনাতন দেশাচার ও কুসংস্কারকে পর্যুদস্ত করতে লাগল। নতুন ভাবসম্পদপূর্ণ যন্ত্রযুগের প্রবর্তনায় ইংলণ্ডের লিভারপুল—ম্যাঞ্চেষ্টারের মতো কলকাতাতেও নগর নির্মাণের কার্য সুরু হল। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাও সমাজ মনকে প্রভাবিত করেছিল—আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা, ইঙ্গ-আমেরিকা যুদ্ধ, ভার্সাইয়ের সন্ধিস্থাপন (১৭৮৩), এ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক চিন্তাসমৃদ্ধ বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'The Wealth of Nations' (১৭৭৬), ব্যাস্টিল বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লবের প্রকাশ, মিল-স্পেন্সার-ডারউইন-মার্কসের প্রভাব ইত্যাদি। সব কিছুর সমবায়ে বাংলার সমাজজীবনে এক নতুন বোধ ও জাগরণ দেখা দিল। কলকাতার প্রাণ-জীবনের সংগে সমগ্র বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তি দেখা দিল। ফলে সমগ্র বাংলার শিক্ষিত ও সম্পন্ন সমাজ রূপের মধ্যে

ব্যাপকভাবে নাগরিক জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই প্রভাব বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে: "এই নূতন যুগের বাণী হইল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শাস্ত্র ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানব মনের মুক্তি, ব্যষ্টির মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণকে উচ্চস্থান দান।"[৩৯]

ইতিপূর্বে গ্রামীণ সমাজের কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারভুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে 'নগদ টাকার' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্রিক কলকাতার নাগরিকদের কাছে এই প্রয়োজনাতিরিক্ত 'কাঁচা টাকা'র আমদানী হতে লাগল—চাকুরীজীবীরা ব্যক্তিগতভাবে যেমন আয় করতেন, তেমনি স্বাধীন উপার্জনের ব্যয়ও স্বেচ্ছাচারিতায় দায়িত্ববোধকে অতিক্রম করতো—বিলাসী 'বাবু' সম্প্রদায়ের এই সামাজিক পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই বিবৃত করেছি। জমিদার প্রথার প্রবর্তন এবং বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের চাকুরীজীবীর ব্যভিচারের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে সমাজজীবনের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যভিচারের রূপ ও বাংলা নাটকে তার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবো।

উনিশ শতকের সমাজজীবনের এই বিলাসবৃত্তি মদ্যপান জৈব আকর্ষণোপ-ভোগ-জনিত ব্যভিচার (স্ত্রী বা পুরুষ উভয় পক্ষীয়) ও নৈতিক শৈথিল্যকে কেন্দ্র করে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজজীবনের সংস্পর্শজাত একটি অন্যতম কুপ্রথা হিসেবেই মদ্যপান লালিত হয়েছিল। হিন্দু সংরক্ষণশীল নীতিশাস্ত্র মদ্যপানকে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য বলে মনে করেছেন। ইতিপূর্বে মদ্যপান সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য শিক্ষানুশীলন ও অন্ধ পাশ্চাত্যানুসরণ শিক্ষিত সমাজেরমধ্যেওএই পাপাচারণকে বরণীয় করে তুলল এবং নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করল। এই সুরাপান নিবারণের জন্যেও সেকালে বহুতর প্রয়াস লক্ষ্যগোচর হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "........'ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং' প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিলাম। আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, সেই পূর্বপুরুষগণ আদেশ করিয়াছেন যে, মত্ত হস্তীতে তাড়া করিলে বরং হস্তীর পদতলে পড়িয়া মরিবে, তথাপি

৩৯ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ: ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত পৃ. ২২৩

শুণ্ডিকালয়ে আশ্রয় লইবে না।……আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ লক্ষ পরিবার আছে, যথা আমাদের নিজের পরিবার, যাহারা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার মদ্য দেখে নাই; এরূপ দেশে তোমাদের গভর্ণমেণ্টের অধীনে প্রকারান্তরে সুরাপানের আশ্রয় দেওয়া হইতেছে, এবং হাজার হাজার সুরার দোকান স্থাপিত হইতেছে।" (পৃ. ২১২) রাজনারায়ণ বসুও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,—'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।………যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সংগে সংগে বৃদ্ধি হইতে থাকে।' (সে কাল আর এ কাল —পৃ. ৭৯); প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাতি রাখার কি উপায়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—'কলিকাতার যেখানেই যাওয়া যায়, সেইখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।' মদ্যপান নিষেধের পরিপ্রেক্ষিত, কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Spirituous Drinks in Ancient India' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও মদ্যপানের বিরতি কখনই লক্ষ্য করা যায়নি। রামায়ণ-মহাভারত, বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ, কালিদাস কিংবা মাঘের রচনায় মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আদি আর্যজাতির মধ্যেও সুরার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আবার পরবর্তীকালে স্মৃতি গ্রন্থে 'মদ্যমপেয়মদেবমগ্রাহ্যং' বলে মদ্যপায়ীকে 'মহাপাতক' বলা হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার কলকাতায় সুরাপান নিবারণার্থ একটি সমিতি স্থাপন করেন। প্যারীচরণ পরিচালিত এই মদ্যবিরোধী আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগদান করেন। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত সংস্কার' সভা স্থাপন করে তার অধীনে যে পঞ্চপ্রকার সংস্কারমূলক কার্য পরিচালনা করেছিলেন—সুরাপান নিবারণ কার্য প্রচার ছিল তার অন্যতম। এই বিভাগে 'মদ না গরল' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই মদ্যনিবারণী আন্দোলন সত্ত্বেও তদানীন্তন ইংরেজ সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্য ও রাজকোষের স্ফীতির কারণে মদ্যকে অলিতে-গলিতে—হাটে-গঞ্জে সহজপ্রাপ্য ও সুলভ করে দিয়েছিলেন। শহরের শিক্ষিত বাবু শ্রেণীর অনুকরণ স্ত্রীসমাজ

ও বালক সমাজকেও সবতোভাবে গ্রাস করেছিল। অনেক স্ত্রীলোক মদ্যপান বিষয়ে স্বামীকেও পরাস্ত করতে সক্ষমা ছিলেন। 'সমাজ-সময়-সংস্করণ' (১৮৮৩) নামক একটি প্রহসন এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়—স্বামী তার স্ত্রী সম্পর্কে মদ্যপানের অভ্যাস বিষয়ে মন্তব্য করছে—'এই বিষয়ে সে আমার বড়দাদা। আমার কোনদিন এক ডোজ হলেও হয়, না হলেও হয়, কিন্তু তার না হলে নয়।' নব্য বাংলার সমাজমনের মদ্যপানকেন্দ্রিক এই বীভৎসতার পরিচয়কে সোচ্চার করে বহু সামাজিক প্রহসন ও নাটক রচিত হয়েছে এবং এই ব্যভিচার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে যে কতোখানি সর্বগ্রাসীরূপে ক্ষতিকর তারই স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ক সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ নাট্য রচনা মধুসূধন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০); নববাবু প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভায় সব্যধর্মশাস্ত্রের যে আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়, তার স্বরূপ নিম্নরূপ: জেণ্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে'—বক্তৃতা শেষে নববাবু 'লেট্ আস এঞ্জয় আওয়ার-সেল্ভস বলে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক বারবনিতা সঙ্গ দ্বারা সভার কার্য শেষ করলেন। মধুসূদনের এ নাটকটিতে বাস্তব দৃষ্টিভংগীর চিত্তগ্রাহিতা আছে। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় যে সামাজিক আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তার মধ্যে চর্মচক্ষে ধ্বংসাত্মক দিকটি লক্ষণীয় হলেও—তাদের বিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতি সামাজিক গঠনমূলকতারও তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। সমগ্রের কল্যাণের জন্যে বিচার বুদ্ধির মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাধীনতার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে মানবচিন্তা ও সমাজচিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্যীকরণ চেয়েছেন তাঁরা। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় চিত্রিত ইয়ং বেঙ্গলের স্বরূপকে আপাত বিকৃত-রুচির পরিচায়নে চিহ্নিত করেছিলেন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকা:

> 'ভদ্রলোকের ছেলে যত
> কদাচারে সদা রত
> সুরাপান অবিরত।
> ... ...
> কাঙালী বাঙালী ছেলে

ভুলেও না বাংলা বলে
ম্লেচ্ছ কহে অনর্গলে
তেঁরিয়া হইয়া পথে চলে
কাছ দিয়া গেলে বলে
'গো টু হেল'

কিন্তু এ নাটকে মধুসূদন নববাবুদের অসংগতি ও বিচ্যুতির দিকটিও সমালোচনা করেছেন। নববাবু মধুসূদনের ব্যক্তি-আত্মার মুখপাত্র হলেও—শ্রেণীস্বভাবই তার মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রকট। আবার কর্তামশায়ের ধর্মভীরু বৈষ্ণব ভাবধারার পরিচয়কে এই পটভূমিকার বিপরীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিত্রিত করে মূল প্রচ্ছদকে আরও ঔজ্জ্বল্য দিয়েছেন।

'একেই কি সভ্যতার' অনুকরণে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনখানি রচিত হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান নৈতিক ভিত্তিকেও যে কতোখানি শিথিল করে ফেলেছিল—দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' তার বলিষ্ঠ শিল্পরূপ। 'সুরাপান নিবারণী সভা' বা Temperence Society প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পকাল পরেই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র 'সধবার একাদশী' নাট্যারম্ভের ভূমিকালিপির প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ উদ্ধার করা যেতে পারে,—'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন লইয়া বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া নগর কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে নীলকর বিরোধ, বিধবা-বিবাহ এবং সুরাপান নিবারণ লইয়াও সমাজে অনুরূপ তরঙ্গ উঠিতে দেখি। এই আন্দোলনের জের কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইন প্রণয়নের দাবী জানাইয়া স-কাউন্সিল বড়লাটেরদরবার অবধি, অন্যদিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া জনসাধারণের দরবার অবধি পৌঁছিয়াছিল।' রামগতি ন্যায়রত্ন, লালবিহারী দে কিংবা কালীপ্রসন্ন ঘোষ সামাজিক চেতনা বা নৈতিকতার মানদণ্ডে 'সধবার একাদশী'কে যোগ্য সম্মান না দিলেও নাটকখানি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক দলিল। মদকেই সামাজিক সাম্যের মানদণ্ডরূপে ব্যাখ্যা করে মদ্যপ নিমচাঁদ বলেছে,—'মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু

বিধান শাস্ত্রে লেখা নাই। যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠয়ে দিলাম, তাঁতী, সোনার বেনে, কামার, কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুপক্ষে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো?' অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল দেখানো এ নাটকে নাট্যকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হলেও শেষাবধি জীবনরহস্যের গভীরে নাট্যকারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নাটকটি উচ্চসংস্পর্শ জীবনসংবেদনায় বিশিষ্ট ও সহানুভূতির অশ্রুতে সিক্ত—এর মূল কারণ দীনবন্ধুর আত্মনিরপেক্ষ বস্তুরসচেতনা ও স্নিগ্ধ গভীর সমবেদনা। সামাজিক দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারলেই সমগ্রের কল্যাণ সম্ভব—এ কথা দীনবন্ধু বুঝেছিলেন। সামাজিক অধঃপতনের মর্মন্তুদ বর্ণনায় 'সধবার একাদশী' সমাজে সুরাপান নিবারণ কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিল। 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হবার পর প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধুর সংগে দেখা করে বলেছিলেন,—'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে, এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে'। নিমচাঁদের ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের সমগ্র বেদনাভাসটুকু গ্রহণ করেই দীনবন্ধু চরিত্রটির মানবিক রূপ দান করেছেন। অশ্রুদীপ্ত করুণরসের মধ্য দিয়েই সে আত্মসমালোচনা করে—'রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম লজ্জা মান মর্যাদা-পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল।' কিংবা সেই চূড়ান্ত আর্তনাদের কথা—'তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয তা গিয়েছ…তুমি কে, চাও কি, কাঁদ কেন? আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কু-চরিত্রে আপনি কম্পিত।' তৎকালীন শিক্ষিত মদ্যপানোন্মত্ত বিচারশীল মনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' নাটক প্রসংগে অমৃতলাল বসু মন্তব্য করেছেন: 'That play was the unconscious germ of the public stage' এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন,—"ভদ্রলোক হইতে হইলে মদ্যপান করা উচিত, এই ধারণা তখন আমাদের মজ্জাগত হইয়াছিল। কিন্তু স্টেজের উপরে মদের বোতলে লাল জল পুরিয়া মদ্যপানের অভিনয় করা হইত।' 'সধবার একদশী'-তে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া গিরিশবাবু বললেন, 'রাত্তিরে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় সর্দি বসে যাবে, আসল মদ নইলে চলবে

কেন?' অতঃপর আমাদের নিমচাঁদকে আর মদ্যপানের ভান করিতে হইত না। অনেক দিন পরে স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী একজন অভিনেতাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া বলিয়াছেন, 'আমি কখনও থিয়েটার দেখি না। তোমাদের পাবলিক থিয়েটার কিন্তু সমাজের একটা উপকার করেছে। আমাদের পাড়ায় রাস্তায় মাতালদের বেলেল্লাগিরি একেবারে কমে গেছে'।"[৪০]

১৮৫৯ সালে ইতিপূর্বেই মদ্যপানের উপরে একটি প্রহসন নাটক রচিত হয় —মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা'; নাটকটিতে গোপালচন্দ্র, হরিহর, নিতাই ও শ্যামলাল চারজন ইয়ার। এদের প্রত্যেকেই বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হলেও নেশাগ্রস্ত ও অধঃপতিত। পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্ট করেও এবং অর্ধাহারে থেকেও নেশার প্রভাব থেকে মুক্ত তারা হতে পারে না। প্রসন্নবাবুর বৈঠকখানায় চারজন ইয়ারের গতাযাত সুরু হয়। ইতিমধ্যে মদ্যপানজনিত অর্থনাশের ফলে প্রসন্নবাবুব সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হল— শুধুমাত্র বসতবাড়ী অবশিষ্ট রইল। শেষ পর্যন্ত এই বসতবাড়ী বিক্রি করে চার ইয়ারের বৃন্দাবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ হল।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার রচিত 'সুধা না গরল' নামীয় প্রহসন রচিত হয় ১৮৭০ সালে। উকিল বিধুবাবু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়ে আত্মগর্বে স্ফীত এবং নিজেকে কুসংস্কারমুক্ত বলে মনে করেন। গণেশডাক্তার বিধুবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। মদ্যপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েও তিনি ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং নিজের স্ত্রীকে উপেক্ষা করে পরস্ত্রী আসক্ত। তার বৈঠকখানায় নরক গুলজার হয় এবং নলিনবিহারী, শম্ভু, গোলাপী বাঈজী ইত্যাদির দৈনন্দিন শুভাগমন ঘটে। শম্ভুর স্ত্রী স্বামীকে মদ ও বেশ্যা ছাড়তে বললে সে লাথি মেরে স্ত্রীকে হত্যা করে। এদিকে গণেশ ডাক্তার পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে গিয়ে অপদস্থ হন এবং দেশত্যাগী হতে বাধ্য হন।

'মাতালের জননী বিলাপ' প্রহসনটি রচনা করেন রামচন্দ্র দত্ত এবং এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে; মদ্যপানজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা আলোচ্য প্রহসনের প্রতিপাদ্য। হরিশবাবু সম্ভ্রান্ত লোক হযেও মদ্যপ। বহুবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হযেও মদ্যপান ত্যাগ করতে পারেন না বলে তাঁর মনেও অনুশোচনার অবধি নেই।

৪০ পুরাতন প্রসঙ্গ—পৃ. ২৭৮

এটর্ণি বন্ধু হরিশবাবুর সঙ্গে মদ্যপান করে নৃত্যরত অবস্থায় পতিতালয়ে গমন করেন। মা হরিশবাবুকে 'মদ্যপান অসভ্যতার চিহ্ন' বলে মদ্যপান থেকে মুক্ত হতে বললে অধৈর্য হয়ে মাকে লাথি মেরে টাকার বাক্স নিয়ে উধাও হয়। 'এমন দিন কবে হবে যেদিন সকলে মদ গরল বলে আর কেউ স্পর্শ করবে না' এই খেদোক্তি করতে করতে হরিশবাবুর মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী (১৮৬৭) নাটকেও জমিদার ভোলানাথ চৌধুরীর বৈঠকখানায় ইয়ার-সম্মিলিত সুরা-মহিমাজ্ঞাপক একটি সংগীত রয়েছে :

'নেশার রাজা মদের মজা
না খেলে কি বলতে পারি
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদশা মারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন শেরী।
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী
সায়েব মেয়ে বিয়ে করি
ঘর জামায় হতেম তারি॥'

'বারুণীবিলাস নাটক' (১২৭৪)—টাইটেল পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে—কলিকাতাস্থ সুরাপান নিবারণী সভার বিজ্ঞাপনানুসারে পাটনা সুবাপান নিবারণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আদেশে পাটনা কলেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। নান্দীতেই নাটকের উদ্দেশ্য সোচ্চার :

"সুরায় ডুবিল ভুবন।
ইহার প্রবাহ রোধে করগো যতন।
এ জল বিষের প্রায়, জর জর করে কায়, উর্বর উষর হল
কত উপবন,
করে সুরা রোগ-তাপ, করায়িছে কত পাপ, আনিছে বহিয়ে
দেখ অকাল মরণ।"

এ নাটকের কাহিনী অংশ অনুল্লেখ্য। সমস্ত নাটক জুড়ে মদ্যপান জনিত পরিণতি কতকগুলি বিক্ষিপ্ত চিত্র ও চরিত্রের সংযোগে দেখানো হয়েছে।

বারুণী-বিলাস নাটক।

কলিকাতায় সুরাপান-নিবারণী সভার

বিজ্ঞাপনানুসারে

পাটনা সুরাপান-নিবারণী সভার

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

আদেশে

পাটনা কালেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা।

চোরবাগান ২৪ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে

শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৪।

মাতাল ও মদ্যপানজনিত কুফলের চিত্রিত বীভৎস দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

১. "সুমতি। মাতালের অকার্যও কিছু নেই, অখাদ্যও কিছু নেই। কাল দাদা বল্যেন, কোথায় নাকি একটা মড়া পোড়াতে গিয়েছিল, তারপর যেই সেটা আধপোড়া হয়ে এলো আর লোভ সামলাতে পারল্যে না, অমনি মদের চাট করে ফেললে।" (পৃ. ৬১)

২. "তায় যদি বারুণীর বিষম তিমির।
আবরণ করে আসি জ্ঞানের মিহির॥
তবে কি নিস্তার থাকে কুপথেতে ধায়।
কিছু না দেখিতে পায় হায় হায় হায়॥"

৩. "সুরার জ্বালায় হল ঘোর দায, দেহ প্রাণ মোর জ্বলিল।
একে পান করে, অন্য জ্বলে মরে, সুরা এ কি গুণ ধরিল॥
জ্বলে শোকানল, হইনু বিকল, প্রাণ বুঝি দেহ ছাড়িল।
নিশ্চয এবাব, বুঝি সবাকার, সুরা প্রতি ঘৃণা জন্মিল॥'

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) প্রহসনেও মদ্যপান জনিত গ্লানির চিত্রণ আছে। শিবপুরের জমিদার কমলাকান্ত রায়ের মৃত ভ্রাতাব দুই পুত্র শারদা ও বরদা। শারদা নিরুদ্দিষ্ট। বরদা অসৎ সঙ্গে আসক্ত এবং মদ্যপ। বন্ধুরা মিলে কমলাকান্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করতে চাইল—কিন্তু কমলাকান্ত রায় ঘটনার দিনই পূর্বাহ্নে সব জানতে পেরে সাবধান হয়ে যায় এবং বিধুকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দেয়। বরদার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এবং গোরাচাঁদের স্ত্রী যামিনীর দুঃখ যে তাদের স্বামীরা রাত্রে বাড়ী ফেরে না। যামিনী বরদাকান্তের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে এক জায়গায় বলেছে,—'সই! বিধির ত বিবেচনা নাই—বঙ্গরমণীর প্রতি বিধির ত বিবেচনা নাই। দেখ দেখি বিধি আমাদের সকলই দিয়েছে, রূপ-যৌবন-পতি সকলই আমরা পেয়েছি। কিন্তু পেয়েও এক মুহূর্তের জন্য সুখিনী হতে পাচ্ছি না, কেবল দুঃখানলে দগ্ধ হচ্চি। রাক্ষসী সুরা সতীন হয়ে সকল সুখ হতে আমাদের বঞ্চিত কচ্চে।' (পৃ. ২০) নাটকখানির একত্রিশ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণের মুখে সুরার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এদিকে সারদার স্ত্রী সৌদামিনী স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোরাচাঁদকে প্রেমপত্র লিখতে

সুরু করে। এইসব ব্যভিচার দেখে কমলাকান্ত কাশীবাসী হলেন। গোরাচাঁদের মনে সুদীর্ঘ ক্রূর পরিকল্পনা ছিল—বরদাকে মদ্যপান করিয়ে লিভার পচিয়ে মেরে ফেলা। তবেই কমলাকান্ত ও নিরুদ্দিষ্ট শারদার অনুপস্থিতিতে সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে সৌদামিনীকে করায়ত্ত করতে পারবে। বরদা অত্যধিক মদ্যপান হেতু মারা গেল এবং স্ত্রী হেমাঙ্গিনী পাগল হয়ে আত্মহত্যা করল। গোরাচাঁদের অত্যাচারে সৌদামিনী কাশীতে পালিয়ে যায় এবং বহু বাধা বিপত্তির পর সারদার সংগে মিলিত হয়— 'দুঃখ জলধি থেকে উদ্ধার পেয়ে আজ সুখমন্দাকিনীতে সন্তরণ করছি। এই সেই ভয়ংকর তমোময় বিষময়গৃহ আজ আলোকময়।' এদিকে নিজ কর্মদোষে গোরাচাঁদ বিষপান করে আত্মহত্যা করে।

রাজকৃষ্ণ রায় রচিত 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৪) প্রহসনে মাহেশে দ্বাদশ গোপালের দর্শন উপলক্ষে কলকাতার বাবুসমাজের মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক ব্যভিচারের উন্মত্ততার পরিচয় আছে। নাটকটির সামাজিক মূল্য বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন: "ইহার আর কোন গুণ না থাকিলেও সেকালের সমাজজীবনের বিকৃত রুচি এবং নৈতিক অধঃপতনের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে কতকটা মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" নাটকখানির সমাপ্তি সংগীত একটি বাউলগান এবং এর মধ্য দিয়ে চার-ইয়ারের মদ্যপানের উন্মত্ততার পরিণাম ঘোষিত হয়েছে।

রাজকৃষ্ণ রায় রচিত 'কলির প্রহ্লাদ' (১২৯৫) নাটকে একটি মাতালের গান সংযোজিত হয়েছে:

'তোর নাম রেখেছি মদ বোতলা।
মনের সাধে, ও আমার মন
খেলনা মদের ঢালা গেলা॥
মদে মেখে চাটের রুটি,
গড়্‌না শুঁড়ির চরণ দু'টি
আয় দু'জনে সেই চরণে
পরিয়ে দি নোট টাকার মালা॥'

অজ্ঞাতনামার 'এই এক প্রহসন' (১৮৮১) নাটকে বামাপদবাবু নামে অফিসের এক কেরাণীর সংগে হলধরবাবু নামক আর এক কেরাণীর পুস্তক ক্রয় করার সূত্রে ঘটনাক্রমে পরিচয় হয়। হলধর এক ঠিকানা দিয়ে বামাপদবাবুকে নিমন্ত্রণ করে। বামাপদবাবু ঠিকানা-নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখেন সেটি একটি পতিতালয়। বামাপদবাবুকে সেখানে মদ্যপান করে বক্তৃতা দিতে হয় এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অজ্ঞান হবার পূর্বে এক টুকরো কাগজে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সাবধানে থাকতে এবং এক হাজার টাকার তোড়াটি পত্রবাহকদের হাতে দেবার জন্যে লেখেন। হলধর ও পান্না সেই পত্র নিয়ে বামাপদবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়াকে দিলে তিনি সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করে হলধরকে আটকাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। পরে বামাপদবাবু প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, জীবনে ভ্রান্ত পথে আর পা বাড়াবেন না। এক ইযার মদ্যপ বন্ধু এসে বামাপদবাবুকে পুনরায় মদ্যপানের অনুরোধ জানালে বামাপদবাবু তাকে বুঝিয়ে বলেন যে,—মানুষ লক্ষ টাকা খরচ করে মুখে চুণ মাখে, কিন্তু সত্যের তুল্য আর কিছুই নেই।

মদ্যপান বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯); গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের সামাজিকতা প্রশ্নের মধ্যেও যুগপ্রভাবিত একটি প্রত্যয় বাঙ্ময়। তা হল নবযুক্তি ও বিচারবোধের দ্বারা প্রাচীন সমাজের রীতিনীতিগুলিকে গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃস্থাপন। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য বৃত্তি, শিক্ষা, মদ্যাসক্তি পারিবারিক জীবনের মধ্যে কিরূপ বিপর্যয় আনে—করুণ ও গম্ভীর রসের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের প্রতি এই নবজাগ্রত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। সামাজিক নাটকের ভিন্নতর পদ্ধতিটি য়ুরোপীয় সাহিত্যে উদ্ভাবিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই। ইবসেন, বার্ণাড্‌শ, গল্‌সওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকারেরা সমাজসমস্যামূলক নাটক রচনার নবতর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলছে তারই নতুন আবিষ্ক্রিয়ায় তাঁদের নাটক অর্থগৌরব মণ্ডিত হয়েছে। সামাজিক দুর্নীতি ও গ্লানিকে তাঁরা বুদ্ধি ও বিশ্লেষণাত্মক মননশীলতায় রূপ দিয়েছেন। ধূলিধূসরিত বাস্তবসমাজে অবতরণ করে সামাজিক বৈষম্য ও রূঢ় অসংগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করেছেন। বাংলা নাটকে সমাজজীবনের চিত্রায়ণ তুলনায় এতোটা তীক্ষ্ণ নয়। মূল সমস্যা ও

অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়েও বাংলা সামাজিক নাটক প্রায়শঃই পরিবারকেন্দ্রিক। প্রফুল্ল নাটকেও মদ্যপানের মূল সমস্যা ও অবক্ষয়ের দ্বন্দ্ব মৌলিক শক্তির সংযোজক হিসেবে সক্রিয়—কিন্তু তৎকালীন বাঙালীসমাজের উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হিসেবে পরিবারের একান্নবর্তিতার উপরেই নাটকটির পটভূমি প্রতিষ্ঠিত। একটি ঘূর্ণ্যমান আবর্তের মধ্যে পারিবারিক বিপর্যয়, ধর্ম ও নীতিবোধের দুর্বার প্রবৃত্তির কাছে পরাজয় আবার অপরাধমূলক প্রবৃত্তির অনিবার্য শাস্তি—পরিণতি পর্যন্ত falling action-কে ধরে রেখেছে। মদ্যপান নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক সমস্যা—কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতার সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি প্রফুল্ল নাটকে অনুপস্থিত। এই বিশিষ্ট সমস্যাটির আলোড়নে, চেতনাচেতনে যুক্তি ও বিবেকের বলিষ্ঠতা নিয়ে ব্যক্তি-আত্মার গভীর পরিচয়ে যোগেশ চরিত্রটি যথেষ্ট সুঠাম নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'দাদা ও দিদি' (১৯০৮)* নামক একটি প্রহসনেও এ-দেশে মদ্যপান প্রবর্তনের পশ্চাৎভূমি বিশ্লেষণ করে ইংরেজের বৈশ্যনীতির আর্থিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দেশবাসীর সুকুমার বৃত্তি-বিধ্বংসী ও পারিবারিক জীবনের অশান্তির মর্মপীড়াদায়ক দিকটিও তিনি এ নাটকে বিশ্লেষণ করেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা নাটকে চিত্রিত সমাজজীবনের নৈতিক ব্যভিচার শুধুমাত্র মদ্যপানের সংগেই জড়িত ছিল না। সমাজনীতির শাসনে অবদমিত জৈব সত্তার সমাজনীতিকে অস্বীকার করবার ঔদাসীন্য ও আর্থিক প্রতিপত্তি এই নৈতিক ব্যভিচারের সহায়তা করেছিল। ধর্মনৈতিক ভেকধারণ করে সামাজিক প্রতিপত্তি এ ব্যভিচারে সহায়তা করে। স্ত্রী বা পুরুষের অতৃপ্ত জৈব আকাঙ্ক্ষা তাদের ব্যভিচারে প্রণোদিত করে। কৌলীন্যপ্রথা একদা নারীর নৈতিক ব্যভিচারের পোষকতা করেছে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিলম্ব ব্যভিচারের দৃষ্টান্তকে বাড়িয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক জীবনের বাণিজ্য-শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পটভূমি, চাকুরীজীবীর

---

* রচনাকাল আমাদের আলোচনার সীমাবহির্ভূত বলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

ক্রম-প্রসারতা, জমিদারী প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে ব্যভিচারের নিরঙ্কুশ অধিকার কিভাবে বিস্তৃত হয়েছিল—তার পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি। নৈতিক ব্যভিচারের একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল বেশ্যাসক্তি।[৪১] এ-বিষয়ে সমসাময়িক একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যায়—"আজকাল দেখা যাইতেছে দেশে বারবণিতার সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা শহরে তাহাদের সংখ্যা ৫০,০০০-এর উপর এবং প্রতি ঘরে যদি দুটি করিয়া টাকাও প্রতি রাত্রে ব্যয় হয়, তাহা হইলেও দিন ১০০,০০০ লক্ষ টাকা এই বেশ্যার দ্বারে অকারণ ব্যয় হইতেছে। তারপর শহর-বাজার ত দূরের কথা, সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে সামান্য একটু দুধের বাজার পর্যন্ত আছে, সেইখানেই ইহাদের দু'চারজনের বসত আছে এবং প্রতি বৎসরই দু'একজন করিয়া নতুন নতুন করিয়া আমদানী হইতেছে।" (সমাজসমস্যা: যামিনীমোহন ঘোষ ১৩২২ সাল) সে সময়কার সমাজের 'বাবুদের' প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বারবণিতার সংসর্গ বৃদ্ধি কি পরিমাণ লক্ষিত হয়েছিল—রাজনারায়ণ বসুর প্রখ্যাত স্মৃতিচয়নিকা 'সে কাল আর একাল' গ্রন্থে সে বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে: 'এ কালে যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত।' উনিশ শতকে নগরসভ্যতার নবপত্তনে রম্যা নগরী কলকাতার নব্যরূপ প্রত্যক্ষগোচর হল—'ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর, স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর'; পল্লীজীবনের সঙ্গে এই নগরসভ্যতার জীবনের কিঞ্চিৎ সংযোগ হয়তো ছিল—চাকুরে বাবুরা স্ত্রী-পুত্রকে গৃহে রেখে আসতেন এবং উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করতেন পতিতা সেবায়। কলকাতার দৃষ্টান্ত মফঃস্বলেও গ্রহণীয় হয়ে উঠলে বাংলার সমাজজীবনের নীতিনিয়ম সামগ্রিক ধ্বংসের সম্মুখীন হল। অবশ্য মাত্রাগত দিক দিয়ে নাগরিক

৪১ বাবুদের চরিতার্থতায় বাইনাচেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় কলকাতায় পুজো উপলক্ষে 'বাইনাচ' প্রবর্তনের পর অন্যান্য বাবুদের মধ্যেও এর প্রভাব ও অনুসরণ দৃষ্টিগোচর হয়। কালে উৎসবের উপলক্ষ ঘুচে গিয়ে নৈতিক ভ্রষ্টতার প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়ায়। এই নৈতিক ভ্রষ্টতার সমসাময়িককালে সমালোচিতও হয়েছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবরের 'Friend of India' পত্রিকা বলেছেন,—"The disgraceful exhibition of prostitutes dancing before on idol, which the wealthier residents adopted, in order to attract European guests."

জীবনায়নের ব্যভিচার পল্লীজীবনে হয়তো ঠিক সেই পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়নি মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে পল্লীসমাজের রুচি ও ভ্রষ্ট নীতিবোধের পরিচয় লাভ করা যায়। জমিদারী প্রথার নিষ্ঠুর প্রজা-পীড়নের দিকটিও এর মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পটের কাছে জাতিভ্রংশকর বলে কিছুই নেই। আজন্মার কারণে মুসলমান রায়ৎ হানিফ গাজী পুরো খাজনা শোধ করে দিতে পারেনি। ভক্ত প্রসাদ তাকে মাফ করতে অরাজী। কিন্তু গদাধর নামক অনুচরের মুখে যখন শুনল যে, হানিফের যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী-কে সে ভক্তপ্রসাদের ভোগের জন্য এনে দিতে পারে—সেই মুহূর্তেই সে হানিফের বাকী খাজনা মাফ করে দিল। ভক্ত প্রসাদের লাম্পট্যের পরিচায়ক কিছু নাট্যাংশ উদ্ধৃত হল :

"ভক্ত। হাঁ তা সত্য বটে! (স্বগত) ছুঁড়ীর নব যৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশ্যে) ও পাঁচী, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগরটি হয়ে উঠেছিস।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।"

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার পাল রচিত 'বেশ্যাশক্তি নিবর্তন নাটক' প্রকাশিত হয়। কলকাতার ক্রমবর্ধমান পতিতার বিবরণের পরিচয় আছে নাটক-খানিতে। ছিদাম ঘোষের পুত্র শ্যামাচরণ মদ্যপ এবং লম্পট বলে তার স্ত্রীর দুঃখের অবধি নেই। এর উপরে আছে শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণা। এদিকে ছিদামের কন্যা বিনোদিনীও স্বামী দ্বারা পরিত্যক্তা। একবার বহু সাধ্য সাধনায় বিনোদিনীর স্বামী মদনকৃষ্ণকে আনানো হল। এই সূত্রে শশিমুখী ও মদনকৃষ্ণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। কু প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্যে মদনকৃষ্ণের সংগে সে কৌশলে গৃহত্যাগ করল। পথিমধ্যে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। মদনকৃষ্ণের জেল হয়। শশিমুখী পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। ওদিকে শ্যামাচরণও

ঈশ্বরোক্তরতি

বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত

☞ এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা মাত্র

এক পতিতার সংগে দিনাতিপাত করে। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন: "বেশ্যাসক্তি নিবর্তন নাটক মুদ্রিত হইল। ইহা কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অন্য কোন ইংরেজি নাটকের অনুরূপ নহে, কুলাঙ্গনাগণ বিরহ বেদনায় বঞ্চিত হইলে তাহারদিগের চিত্ত যে প্রকার উত্তেজিত হয় এবং তাহারা কুলমার্গ পরিহার পূর্বক বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণাভোগ করে, পরবধূ-মধুপান প্রত্যাশী লম্পটগণ যে সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক হয়, যেরূপ উত্তেজনা এবং ক্লেশ ও অপমান সহ্য করে, এই পুস্তকে নাটকচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে এতৎ পাঠে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বেশ্যাসক্তি নিবৃত্তি হয় ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজে পতিতাসক্তি প্রবল আকার ধারণ করে বহু সংগতি-সম্পন্ন পরিবারকে বিধ্বস্ত করতে চলেছিল। এর কুফল বিষয়ে অবহিত হয়ে শুভবুদ্ধি প্রণয়নে অমৃতলাল রচনা করলেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'তরুবালা'। সংগতি সম্পন্ন যুবক অখিল স্ত্রী তরুবালার প্রতি বিমুখ হয়ে পতিতা পারুলের 'পবিত্র প্রেমসাগরে' ভাসমান হলেন। পতি-পরায়ণা স্ত্রীকে পদাঘাত করে পারুলের গৃহে গিয়ে পারুলকে অন্য এক ব্যক্তির সংগে প্রণয় পরায়ণা দেখে—অখিলের মোহজাল ছিন্ন হল। গৃহে প্রত্যাগত হয়ে স্ত্রীর কল্যাণী স্বরূপের উপলব্ধি ঘটল তাঁর।

রাধামাধব হালদার রচিত 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩) উল্লেখ-যোগ্য। ধনীগৃহের 'শুদ্ধান্তঃপুর' পান দোষের প্রবলতায় কি পরিমাণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে—এরূপ পারিবারিক কুৎসা অবলম্বনে ক্ষেত্রমোহন ঘটক রচনা করেছিলেন 'কামিনীনাটক' (১২৭৫); জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার রচিত 'সুধা না গরল?' (১৮৭০) নাটকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত মদ্যপায়িতা ও লাম্পট্যের পরিচয় চিত্রিত হয়েছে। নাটকটিতে গণেশডাক্তার বিধুবাবুর বন্ধু—মদ্যপানের বিরুদ্ধতা প্রকাশ্যে করলেও তিনি মদ্যপ।

প্যারীমোহন সেন রচিত 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা, তিন লয়ে কলিকাতা' (১৮৬৩) প্রহসনের সারাংশ নিম্নরূপ—

কলকাতা শহর দেখতে এসে এক সাধু একটি অদ্ভুত গান শুনল—যার সারার্থ হল লাম্পট্যই কলকাতার প্রাণ বিন্দু। জনৈক পথিককে আহ্বান করে এই বিষয়ে সাধু জিজ্ঞাসা করলে পথিক বেশী লম্পট তাকে নিয়ে পতিতা পল্লী

সোনাগাছীতে গিয়ে নগরের কুৎসিত জীবন-পরিচয় প্রত্যক্ষ করালো। মদ্যপান ও লাম্পট্য প্রত্যক্ষ করতে করতে শুদ্ধাচারী সাধুও লাম্পট্যের জীবন বরণ করে বারবণিতা সংসর্গ করতে লাগল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫) প্রহসনে দেখিয়েছেন,—কলকাতায় চাকরী পেয়ে সুধীর প্রতিবেশী ভোলানাথের তত্ত্বাবধানে আপন স্ত্রী ও দাসীকে রেখে যায়। এদিকে সুমতির অর্থের প্রযোজন হলে অর্থ দেবার ছলে ভোলানাথ সুধীরের স্ত্রী সুমতির কাছে কু-অভিসন্ধি ব্যক্ত করে। ভোলানাথ স্থানীয় এক মুন্সেফের পেশকার। মুন্সেফও অনুরূপভাবে সুমতির কাছে দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করে। ফিরে এসে সুধীর আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে দু'জনকেই সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করে একটি মনোজ্ঞ উপায় উদ্ভাবন করল। সুমতিকে ভোলানাথ ও মন্সেফকে নিমন্ত্রণ করতে বলল। সুধীর অনুপস্থিত জেনে দু'জনেই পরম আহ্লাদিত হয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এলো। দাসীর সহায়তায় তাদের বিড়ম্বিত করল সুমতি। আর ঠিক সেই সময়েই সুধীর এসে উপস্থিত। তার সামনে সম্মানিত ব্যক্তিদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হল এবং তাদের গালে তেল কালি মাখিযে লাম্পট্যের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হল।

'জেলদর্পণ' নাটকে বেশ্যাসক্ত জমিদার শিবনাথ বাবুব পরিচয আছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'গাধা ও আমি' (১৮৮৯) প্রহসনে নাট্যকার কর্তৃক 'ভাক্ত সমাজ সংস্কারের নিখুঁত ফটোগ্রাফ' অঙ্কিত হলেও বিত্তশালী ও রক্ষণশীল বামনদাসের দুই পুত্র—সদ্য বিলাত প্রত্যাগত জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদা এবং কনিষ্ঠ বরদা। দু'ভাই মিলিতভাবে সমাজসংস্কারের যে কর্মসূচী নির্ধারিত করল তা প্রকারান্তরে নীতিভ্রষ্টতারই নামান্তর—সেগুলি হল দেশীয় পোশাক পরিহার, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার ও বেশ্যাবিবাহ। বিবাহার্থে দুই ভাই বেশ্যাসংগ্রহে পটু, আচার্যের পুত্র প্যালারামকে দুটি বেশ্যা সংগ্রহ করে দিতে বলে। এই জাতীয় নীতিভ্রষ্টতা শেষাবধি কিভাবে উপযুক্ত শাস্তি পেযেছিল—প্রহসনখানিতে তা দেখানো হয়েছে।

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'তুমি যে সর্বনেশে গোবর্ধন' (১৮৭৯) নামক প্রহসন নাট্যে দেখিয়েছেন—হরিহরবাবুর পুত্র গোবর্ধন অসৎ সঙ্গে মিশে শিক্ষালাভ করল যে, গণিকালয়ে গিয়ে মদ্যপান করাই প্রশস্ত। অতএব সে বন্ধু সমভিব্যাহারে গরাণহাটার খুকুমণী বেশ্যার গৃহে এসে উপস্থিত হল।

তার পিতা হরিহরবাবু পূর্ব থেকেই এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ভৃত্যসহ সেখানে উপস্থিত হলে গোবর্ধনের বন্ধুবর্গ পলায়ন করে এবং হরিহরবাবু পুত্রকে প্রচণ্ড প্রহার করে। কিন্তু গুণবান পুত্র গঞ্জিকা সেবন করে গাত্রব্যথা লাঘব করে পুনরায় গণিকালয়ে যেতে সুরু করে। শেষ পর্যন্ত পুত্রের কারণেই দুশ্চিন্তায় হরিহর-বাবুর দেহান্তর ঘটল।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮১) নাটকে পতিতার কাছে অপমানিত এক ভদ্রসন্তানের চৈতন্যোদয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী রচিত 'গোলকধাঁধা' (১৮৮২) প্রহসননাট্যে জমিদার কৃষ্ণকান্ত চৌধুরীর লাম্পট্য চিত্রিত হয়েছে। শিবে পাগলা তার বৈঠকখানায় এসে জানিয়ে দিয়ে যায় যে, প্রকৃত সতী মৃত্যুর বিনিময়েও সতীত্ব রক্ষা করে। এই শিবে পাগলা হল আসলে বিনোদবালার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী। এদিকে জমিদারের দেওয়ান গৃহস্থ বধূ বিনোদবালার সন্ধান দিয়ে জমিদার কৃষ্ণকান্তকে রাত্রে তার বাড়ী যেতে বলে দেয়। এদিকে শিবে-পাগলাবেশী নগেন্দ্র বিনোদবালার সংগে সাক্ষাৎ করে জমিদার ও তার অনুচরদের কৌশলে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করে জব্দ করতে চাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত হলে নগেন্দ্র স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সকলকে প্রচণ্ড প্রহার করে গৃহ থেকে বিতাড়িত করলেন।

বেচুলাল বেণিয়া রচিত 'সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১৮৮৫) নব্যবাবু হনুমানের মদ্যপ, লম্পট ও গঞ্জিকাসেবী লালসার আসক্তিতে কিভাবে অধঃপতিত হয় তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'জমীদার দর্পণ (১৮৭৩) নাটকটি জমিদারী-তন্ত্রের নির্মম স্বরূপ প্রকটিত করে একদা 'জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল। জমিদারী প্রকৃতির অনুষঙ্গ উপাদানগুলির ব্যভিচারী দিককে এখানে নাট্যকার কাজে লাগিয়েছেন। নাট্যকার 'প্রস্তাবনাতেই' 'সূত্রধার' কে দিয়ে বলিয়েছেন :

> 'হা ধর্ম! তোমার ধর্ম লুকাল ভারতে ;
> জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে!

পাতকীর কর্মদোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল।
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম,
জমীদার।"

উনিশ শতকের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে জমিদার-তন্ত্রের স্বরূপ এঁকেছেন নাট্যকার। প্রজা আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহারকে প্রলোভনে বশীভূত করতে অক্ষম হয়ে লালসায় জমিদার হাওয়ান আলী আবুকে ধরে আনবার জন্যে লোক পাঠালেন। কৃষ্ণমণি মারফৎ প্রেরিত হাওয়ানের কুপ্রস্তাবের অমান্য ঘটলে তার পরিণতি বিষযে সচেতন হযেও ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করল। অনিবার্য ফলস্বরূপ চরম অত্যাচারে গর্ভবতী রমণীর মৃত্যু হল। নেপথ্য থেকে একটি সংগীত সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে জমিদার চরিত্রের ব্যভিচারী লীলার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হযেছে :

'দুষ্ট লোক রাতেব বেলা, ঠিক যেন হয কলির চেলা
কেউ চুরি, কেউ কামের খেলা
খুন করে কেউ লুকাইল।'

এ সংগে এ কথাও স্বীকার্য যে, জমিদারী প্রথার ব্যভিচারের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ামূলক মনোভাবও সমাজের রক্ষণশীলদের মধ্যে ছিল। এই জাতীয় একটি নাটক যামিনীকুমার পাকড়াশী প্রণীত 'জমিদার' (১৩১৬) নাটক, উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার বলেছেন,—"এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস বাঙ্গলার জমিদারেরা বড় নিষ্কর্মা, সর্বদা ভোগ বিলাসে কাল যাপন করা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন কর্ম নাই। অধিকাংশ বাঙালীই চাকুরীজীবী—দাসত্ব যাহাদের ব্যবসা, তাহাদের মনে এ ধারণা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ-দুঃখের ভার ভগবান যাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার যে কি সুখে সময়াতিবাহিত হয, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না।"

হরিহর নন্দী রচিত 'শিখছ কোথা? ঠেকৃছি যথা' (১৮৮৮) প্রহসনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পানাসক্তি ও গণিকাগৃহে গমনের পরিচয় আছে। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের 'বিচিত্র অন্নপ্রাশন' (১৮৮৯) নাটকে চারুবাবু নামক

এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অফিসের ক্যাশ চুরি করে পতিতার পুত্রের অন্নপ্রাশন করিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে—তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৯৫ সালে প্রকাশিত যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায় 'কলির কাপ' নামক ঘটনাপ্রধান প্রহসনে দেখালেন—কাশীপুরের জমিদারের মৃত্যু হলে তার পোষ্য-পুত্র হরিহর সমগ্র বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে ষ্টেটের প্রধান কর্মচারী রমাকান্তের পরামর্শে লাম্পট্য বৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) প্রণীত 'অপূর্ব সতী নাটক' (১৮৭৫) এ পতিতা দুহিতার প্রণয় নিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য পর্বে স্ত্রী জাতির নৈতিক ব্যভিচারকে কেন্দ্র করেও কয়েকটি নাট্য-প্রহসন রচিত হয়েছিল। সমাজে ব্যভিচারী পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হয়ে স্ত্রী চরিত্রের নৈতিক মান অধঃপতিত হবার পর তা স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র স্বরূপে লালিত হয়েছে। কযেকটি নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে এই স্বরূপকে প্রকটিত করা হযেছে। নাটকগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি না থাকলেও সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচায়ন ও ব্যভিচার-মুক্তির নৈতিক নিষ্ঠার পরিচয় আছে। কৃষ্ণকুমারী বসু রচিত 'তুই না অবলা' (১৮৭৪) নাটকের ভূমিকায় এই কল্যাণী ইচ্ছার পরিচয় দিযে নাট্যকার বলেছেন,—"কেবল কুলবালাগণকে সতীত্বের প্রাধান্য শিক্ষা দেওযাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে সকলে অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করতঃ দর্শন করিলে বাধিত হইব। শারীরিক অসামর্থ্যও রুগ্নতা স্বামীর ক্ষেত্রে অসমতার কারণ হওয়ায় পূর্ণ যৌবনাপত্নীর ব্যর্থ যৌবন কিভাবে পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারই মর্মঘাতী পরিচয় নাটকখানির প্রতিপাদ্য।

রসরাজ অমৃতলাল মোলিয়্যারের অনুসরণে রচিত 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬) প্রহসনে অঘোরবাবুর পত্নীকে মদ্যপায়িনী ও স্বৈরাচারিণীরূপে অঙ্কিত করেছেন। স্ত্রীকে স্বামীর অনুরোধে এখানেও মদ্যপায়িনী হতে হয়েছে—'মিন্‌সে খায় আমাকেও শিখিয়েছে, বলে, তোর অম্বলের ব্যারামের উপকার হবে।' মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়নে চরিত্রের এই স্খলন অবশ্য বারবনিতার কার্যক্রমের মতো পর্যায়ে পর্যবসিত হয়নি।

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রহস্য মুকুর' (১৮৮৬) প্রহসনকে ব্যভিচারী জমিদারের উপেক্ষিতা পত্নীর নৈতিক স্খলন, বটকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'কলির কুলটা'

(১৮৭০) প্রহসনে দুশ্চরিত্রা কুলনারীর জীবন পরিণাম, অজ্ঞাতনামার 'হেমন্তকুমারী' (১৮৬৮) প্রহসনে দেবরের সংগে অবৈধ প্রণয়কাহিনী ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় আরও কয়েকটি প্রহসন-নাট্যের সন্ধান দিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—"বিনোদবিহারী বসুর 'সরসীলতার গুপ্তকথা' (১৮৮৩), এস. এন্. লাহার 'গোপালমণির স্বপ্নকথা' (১৮৮৭) মণিলাল মিত্র প্রণীত 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা', হারাণশশী দে প্রণীত 'কলিকালের রসিক মেয়ে' (১৮৮৮) ইত্যাদি বহু প্রহসন রচিত হয়।......... সাহিত্যের জন্য ইহাদের মূল্য নহে—ইহাদের প্রকৃত মূল্য যাহা, তাহা সামাজিক ও ঐতিহাসিক।' (বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন: পৃ. ৩৫৫) প্রহসনগুলি বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় নারীর এই নৈতিক জীবনমানের শৈথিল্য নাগরিক জীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবারাশ্রয়ে যে পরিমাণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল—পল্লীর যৌথ-পারিবারিক ভিত্তির মধ্যে নানা কর্তব্যের ভূমিকায় আত্মনিষ্ঠা নারীর জীবনাশ্রয়ে তা লক্ষ্য করা যায়নি। ব্যভিচারের প্রবণতা সেখানে বিপর্যয় আনতে পারেনি। সমসাময়িককালে কলকাতা হাইকোর্টে মাতুল-ভাগিনেয়ী সম্পর্কিত একটি ব্যভিচারমূলক মোকর্দমা অবলম্বনে 'মক্কেল মামা' (১৮৭৮) ও মহেশচন্দ্র দাস দে-র 'মামা-ভাগ্নীর নাটক' (১৮৭৮) রচিত হয়।

সমসাময়িককালে এলোকেশী তারকেশ্বর মোহান্তের কাহিনী একটি উত্তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। হুগলী জেলার ঘোলা গ্রাম নিবাসী নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের কন্যা এলোকেশীর সংগে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়েছিল। নবীন স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে কলকাতায় এক ছাপাখানায় চাকুরী করত। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এলোকেশী তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজ মাধব গিরির সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ঘোলা গ্রামে এসে স্ত্রী সম্পর্কে এই কথা জানতে পেরে স্ত্রীকে কলকাতা নিয়ে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল নবীন। এলোকেশীকে গ্রামান্তরে নিয়ে যাবার সমস্ত চেষ্টাও মোহান্ত ব্যর্থ করে দেয়। উপায়ান্তর না দেখে ক্রোধোন্মত্ত নবীন এলোকেশীকে হত্যা করে। বিচারে নবীনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং মোহান্তের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই মূল ঘটনাকে মোটামুটি অবিকৃত রেখে এবং কিছু কিছু কল্পিত তথ্য সংযোগে সেকালে বহু নাট্যপ্রহসন

রচিত হয়েছিল। এই প্রহসনগুলি হল—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রচিত তারকেশ্বর নাটক' অর্থাৎ 'মোহান্তলীলা' (১৮৭৩), লক্ষ্মীকান্ত দাস রচিত 'মোহান্তের এই কি কাজ' (১৮৭৩), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের রচিত 'মোহান্তের-এই কি দশা' (১৮৭৩), মোহান্তের শেষ কান্না (১৮৭৪), হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহন্ত পক্ষে ভূতো নন্দী' (১২৮০), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মোহন্তের যেসা কি তেসা (১৮৭৪), চন্দ্রকুমার দাসের 'মোহন্তের কি সাজা' (১৮৭৫), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' (১৮৭৪), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের দফারফা', 'তারকেশ্বর নাটক', 'মোহন্তের কারাবাস' (১৮৭৩), নন্দলাল রায়ের 'মোহন্ত এলোকেশী', রাজেন্দ্রলাল ঘোষের 'নবীন মহন্ত', 'নবীনের খেদ', হরিলাল শীল প্রণীত 'নবীন নাটক' (১৮৭৬) ইত্যাদি।

ইতিপূর্বে নব্যশিক্ষাদর্শ ও ইয়ংবেঙ্গল পর্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি। এই নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকের আচার-আচরণের অনেক অতিশয়িত ও অতিরঞ্জিত দিক নিয়ে প্রভূত নাটক রচিত হয়েছে। এ সকল নাটকেও চিত্রিত চরিত্রগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত আতিশয্য দেখা দিয়েছে এবং নাট্যকারের নৈতিক শৈথিল্যকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এর কার্যকারণ-যোগাত্মক সামাজিক পটভূমি আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'সুরুচির ধ্বজা' প্রহসনে বাঙাল গিরিধারীর পুত্র লালচাঁদের 'আধুনিক যুবকে' রূপান্তরণ এবং তার বিচিত্র আচার-আচরণ চিত্রিত হয়েছে। স্ত্রী সামাজিক ও প্রগতিপরায়ণা হলে সে 'রাজা উপাধি পেতো বলে লালচাঁদ দাবী করে। কেননা, তার মতে 'আজকালকার দিনে wife নিয়েই পসার। ব্রাহ্ম বন্ধু চারু তাকে পরামর্শ দেয়—স্ত্রীকে 'ডাইভোর্স' করতে; তাদের সমাজে পঁচিশ বছর বয়স্কা নবাগতা এক যুবতীর সংগে লালচাঁদের বিবাহ ব্যাপারে চিন্তার কথাও প্রসংগত স্বীকার করে। আচার্য লালচাঁদের কাছে অর্থ প্রত্যাশী হয়ে পরিণয়ের বিষয় অনুমোদন করলেন। কালাচাঁদের স্ত্রী সুরুচি অশিক্ষিত লালচাঁদের আর্থিক প্রতিপত্তিতে আসক্ত হয়। বিবাহে পিতার অমত থাকায় লালচাঁদ জানায় যে, সে নিজেই সুরুচির গৃহে আশ্রয় নেবে। লালচাঁদের সমস্ত ষড়যন্ত্র জানতে পেরে তার পিতা সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। শূন্য হাতে সুরুচির কাছে আশ্রয়

নিলে আশাভঙ্গে সুরুচি তাকে প্রত্যাখ্যান করল। শেষ পর্যন্ত লালচাঁদ তার পিতার কাছে নিজের বুদ্ধিহীনতা স্বীকার করল।

ধর্মের নামে ভণ্ডামীর পরিচয় দিয়ে ভণ্ড দলপতি ও জমিদার হরিহরবাবুর দণ্ডপ্রাপ্তিকে চিত্রিত করেছেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভণ্ড দলপতি দণ্ড' প্রহসনে। হরিহরবাবু বাহিরে ধর্মধ্বজী—কিন্তু অন্তরে অপরের অনিষ্ট কামনা করে। লুসি নামে তার একটি ফিরিঙ্গি রক্ষিতা ছিল। বাঙালী গণিকাদের কার্তিক পূজা দেখে সেও অনাচারে পূজা সুরু করল—লুসির নৃত্যগীত ও মদ্যপানের মধ্য দিয়ে পূজা শেষ হল। নন্দরামবাবু প্রতিবেশী সমভিব্যাহারে হরিহরবাবুকে জব্দ করলেন।

'কস্যচিৎ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য' প্রণীত এবং গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?' (১৮৮০) মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতার' অনুসরণে রচিত। নাট্যকার 'ভূমিকা'য় তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেছেন:

"বাংলার উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতি প্রেম-ডোরের বন্ধনে।
উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ
গড়লেম 'বাঙ্গালি সাহেব' নব্য প্রহসন।
যদি কারো মস্তকেতে এ টুপি হয় ফিট্,
হিণ্ট্ লয়ে শুধ্‌রে যাও হয়ে পড় টীট্॥
চটোনা চটোনা কেউ শুনে আমার কথা,
দেশের দুর্দশা দেখে মনে পেয়েছি ব্যথা।
অনৈক্য-অসিতে হায়! হিন্দু সমাজেরে,
খণ্ড খণ্ড করি কাটে, জ্বলে মরি হেরে,
শোকের জ্বালায় জ্বলে পাগলের মত,
আবোল তাবোল বলে বক্‌লেম কত।"

নাট্যকার বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য এ নাটকে দেখিয়েছেন যে, বাঙালীর ছেলে হিন্দুয়ানি বিসর্জন দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি সাহেব করে তুলবার আপ্রাণ প্রয়াসে সচেষ্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃত সৎগুণগুলি স্বীকরণ না করে

কেবলমাত্র অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণে সাহেব হবার অপচেষ্টা ভ্রান্তিকর। এই নাটকে রামধনবাবুর পুত্র গোপাল সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত এবং হিন্দুধর্মের যাবতীয় আচরণই তার কাছে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বলে নিন্দিত। পিতা ধার্মিক রামধনবাবু হিন্দুমতে গোপালের প্রায়শ্চিত্ত-করণের জন্য শিরোমণিকে নিযুক্ত করলে গোপাল কৃত্রিম ফিরিঙ্গি উচ্চারণে উষ্মা প্রকাশ করল—'আমি গরু কি মাংস বড়ো ভালোবাসে। It is capital food, সে বড়ো আচ্ছা খাদ্য আছে; it gives strength; টাহাটে জোর হয়......কিন্তু যে দিন হইতে টুমরা ব্রামহন্ সকল, টুমরা চোর সকল গরু মাংস খাইটে মানা করিয়াছে, সেই ডিন হইটে you have robbed the nation of its strength & spirit.' গোপাল নিজের স্ত্রীকেও 'গৌণ' পরিয়ে টেবিলে বসিয়ে খানা খাওয়াতে অভ্যস্তা হতে শিক্ষা দেয়। রামধনবাবুর দুই প্রতিবেশী বন্ধু বৃন্দাবন ও নিবারণ ব্রাহ্ম ও বিলাত ফেরৎ সাহেবদের স্বভাব নিয়ে আলোচনা করতে করতে তাদের আধুনিক শিক্ষিত মন ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীনতার নিন্দা করেছেন। বাউল-গানের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছেন, 'এবার ডুবলো হিন্দুয়ানি !/কলিকাল স্রোতে ডুবলো হিন্দুয়ানি ॥/ধর্মকর্ম জাত বাঙালীর—ও-সব যায় রে ভেসে,/ডুবলো হিন্দুয়ানি'। কাহিনীর মধ্যে বিলাত-প্রত্যাগত বিনোদের উল্লেখও আছে। বিলাত ফেরৎ হয়েও বিনোদের হিন্দু-ধর্মে ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে নাট্যকার সত্যিকারের শিক্ষার মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেছেন। কারণ নাট্যকারের মতে—'মায়ে কাঁদায়ে যে জন করে ধর্ম আস্ফালন/তার ভজনপূজন বৃথাই।' নাটকের শেষের দিকে গোপালের পরিবর্তন হয়েছে। রাজপুত বীর প্রতাপের শৌর্যবীর্য ও হিন্দুসমাজের পুনরৈক্য স্থাপন প্রয়াস গোপালের মনে স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার করেছে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অজস্র বিভেদ দূরীভূত হয়ে হিন্দুসমাজের ঐক্যবদ্ধতা কাম্য হয়ে উঠেছে—'যে একতারা রূপ শক্তির সাধনে,/দলিল দানবদলে দেবদেবীগণে,/তাহারি সাধনে ধাও হিন্দুগণ।' গোপাল ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের আশ্রয়ের মধ্যেই জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'চাবুক' (১৯০৫) প্রহসনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে:

"কেউ ঘাড় কামানো মুখেতে সিগার
কালা এই বাঙ্গালা মন টেকে না আর,
তা'র কোটের রঙে, মুখের রঙে
ফারাক বোঝা ভার।"

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'কাজের খতম', 'থিয়েটার' প্রভৃতি পঞ্চ রং নকশানাট্যেও বিলাতীয়ানা, মহিলাদের শাড়ী-গাউন প্রভৃতি নিয়ে ব্যঙ্গের প্রকাশ আছে। গিরিশচন্দ্র 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' নাটকেও দাবী করেছিলেন 'দুনিয়া পুরাণো, হেথা চলবে নাকো নয়া ঢং'—কারণ 'হিন্দুয়ানি টপ্‌কে গেলে, কালি মেখে সাজবে সঙ্‌। আধুনিকাদের নব্য বেশবাসকেও ব্যঙ্গবিদ্ধ করে বলা হয়েছে:

'বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে পিঠে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডির মুখে ছাই॥'

গিরিশচন্দ্রের 'বড় দিনের বখ্‌শিস' (১৮৯৪) প্রহসনে বিদেশী-সভ্যতার প্রভাবাগত নাগরিক রুচিকে ব্যঙ্গ করে সমাজের সুভদ্রসংযত দিককে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস লক্ষিত হয়।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নৈতিক ভ্রষ্টাচারের আর একটি বিধ্বস্ত চিত্র উদ্ঘাটিত হতে দেখি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বক্কেশ্বর' (১২৯৬) নাটকে; নীতিভ্রষ্ট 'free love' আন্দোলন নিয়ে এ নাটক হল 'a faithtul picture of the growing evils of an unworthy cause', অজ্ঞানচন্দ্র খাস্তগীর বিলাত ফেরৎ এবং তিনি এই আন্দোলনের প্রবর্তক। অজ্ঞানচন্দ্র বলে:

'স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেবে, পূর্ণমাত্রায় দাও। বিবাহ তো একটা Civil contract মাত্র—তবে এত বাধাবাধি কেন? বিলাতী বিবিরা এখানকার বাঁধাবাঁধি অবস্থার idea ই form কর্তে পারে না। তাই সেথায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান উন্নতি—তাই western civilisation-এব এতো মান! এখানেও আমি তাই করতে চাই।'

নীতিভ্রষ্ট স্বাধীন প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে অজ্ঞানচন্দ্র তার আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্যে বিত্তশালী লোকের সহায়তার সন্ধান করে। অজ্ঞানচন্দ্র যখন জোড়ায় জোড়ায় 'রোলকল' করে—সমবেত সংগীত করতে করতে একটি একটি করে পুরুষ পরস্ত্রীর হাত ধরে ঘরে ঢোকে:

'এবার মাদামাদী এক হয়েছি জুটে,
সমাজ বাধা আপনি যাবে টুটে'—
ভাই-ভগিনী সবাই মিলে বলবো গো মুখ ফুটে ;—
যারে দেখব ভালো, বাসবো ভালো
মেরে বিয়ের মুখে ঝাঁটা।
হাঁটি হাঁটি পা পা, গায়ের ওপর দিয়ে গা!
গুটি গুটি চল ভাই, জোড়া গেঁথে বাড়ী যাই।'

এদিকে স্বয়ং অজ্ঞানচন্দ্রের কন্যা মিস্ অবলা তার বাড়ীর বামুনঠাকুরের সংগে প্রণয় করে এবং অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়ে। স্বাধীন প্রেমের প্রথম শ্রেণীর সমর্থক হয়েও অজ্ঞানচন্দ্র বামুনঠাকুরের উপর খুব চোটপাট সুরু করে এবং কন্যাকে মেথর জমাদারের সংগে বিবাহ দিয়ে অর্থশালী লোককেও হাতে রাখতে চায়। অবলা প্রেমের দোহাই দিয়ে মাষ্টার বক্কেশ্বরকে বিবাহ করতে অনুরোধ জানায়। মেথর জমাদারের সংগে বক্কেশ্বরের স্ত্রী 'স্বাধীন প্রেম' করেছিল বলে অবলা বক্কেশ্বরকে স্ত্রী বর্জন করতে বলে। অবলার পূর্বপ্রণয়ী বামুনঠাকুর অবলাকে উদ্ধার করতে এসে বক্কেশ্বরকে পা ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এদিকে মেথর জমাদারের কাছ থেকে অবলাকে বিবাহ দেবার প্রস্তাব করে অজ্ঞানচন্দ্র ৫০০০ টাকা আগাম নিয়েছে—মেথর জমাদার 'কনের অন্তঃস্বত্তার কাহিনী জানতে পারল, অজ্ঞানের কাছে টাকা ফেরৎ চাইল। সমস্ত ঘটনা দেখে বক্কেশ্বর যা বলল, তা সমগ্র সমাজের প্রতি কটাক্ষে তাৎপর্যবহ :

'দু কথা বলে যাই। ওহে ভায়া—তোমাদের দেখছি—
ধর্মকর্ম সকল ফাঁকি মূলেতে রোজগার।
... ...
পরের ঘরে স্বাধীন পীরিত কোর্তে চালাচালি।
নিজের ঘরে উথলুলো প্রেম—পড়লো কুলে কালি॥
লজ্জা সরম নেই—তবুও কোচ্ছো কদাচার।
ছি ছি তোমাদের সকল ফক্কিকার!
ও পোড়ার মুখ দেখিও নাকো আর!'

১১

পেশাগত নানা বৃত্তি, ভ্রষ্টাচার ও বাংলা নাটক

এই নৈতিক ভ্রষ্টাচার পেশাগত দিক দিয়েও সামাজিক অধঃপতিত মানদণ্ডের জন্য দায়ী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী মতধারার মধ্যে পার্থক্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকে চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী বিভিন্ন বৃত্তিধারী সামাজিক মানুষের নৈতিক ও আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রহসন রচিত হয়েছে। সমাজমনের পর্যালোচনা করে যে সদাজাগর নীতিবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকারেরা—তা শুধুমাত্র প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণমাত্রেই পর্যবসিত হয়নি। প্রথমেই চিকিৎসক গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার কারণে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় উনিশ শতকীয় বাংলা নাট্য প্রহসনে লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তার স্বরূপ সন্ধান করা যাক্। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'ডাক্তারবাবু' প্রহসনে স্বয়ং চিকিৎসকের জবানীতেই তাঁদের পেশাগত দুর্নীতির বিষয়ে ভূমিকায় ব্যক্ত হয়েছে: "ডাক্তার হইয়া ডাক্তারদিগের দোষগুণ বর্ণনা করিতে হইলে স্বভাবতই চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হইতে পারে, আমি এই নিমিত্ত আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, তবে আমি গৃহছিদ্র কেন প্রকাশ করিলাম। আমার উত্তর এই যে, আমি সমাজকে আমার সহযোগীদের অপেক্ষা অধিকতর যত্নের সামগ্রী বলিয়া মনে করি।" উনিশ শতকের তদানীন্তন সমাজে চিকিৎসকেরা সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেতেন বলেই শ্রদ্ধার আকর্ষণে উচ্চপদাসীন ছিলেন। এই উচ্চপদাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে অনেক সময় চিকিৎসকেরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতারণার ভূমিকায় নেমে নীতিভ্রষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন রোগী ও তার পরিবারের সরল বিশ্বাসের ও রোগাতঙ্কের অধীরতাকে এবং মানুষের সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে চিকিৎসকদের দুর্নীতি সমাজের মর্মান্তিক পরিণতিকে সূচিত করেছে। এই হৃদয়হীনতা ও ছলচাতুরীর চিত্রকে বহু প্রহসন নাটকের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'কানাকড়ি' (১৮৮৮) প্রহসনে স্বয়ং চিকিৎসকের মুখেই এই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে—"রুগী যদি আমার ভিজিট না দিয়ে মরে যায়, তা হলে তার বাপ খুড়ো জ্যেঠা ছেলে মা মাসী, এমন কি তার স্ত্রীর কাছ থেকেও ভিজিট আদায় করি।

যদি সহজে না দেয় তো নালিশ করে ডিক্রি জারী করি।" সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগে আর্থিক ক্ষেত্রে নীতিহীনতার ভ্রষ্টাচার সেদিন লালিত হয়েছে এই চিকিৎসক সমাজের দ্বারা। ডাক্তারীর সুযোগে মদ্য বিক্রয়,[৪২] চিকিৎসকদের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক চুক্তি, রোগী ভাঙানোর দুর্নীতি ইত্যাদির চর্চা চলেছিল এবং নাট্য প্রহসনে তা তীক্ষ্ণভাবে সমালোচিত হয়েছে। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' (১৮৭২) তে আবার রক্ষণশীল চিকিৎসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে আক্ষেপ জানানো হয়েছে—তা-ও সমাজমনের আলোকিত আর একটি দিক 'পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে নরক ঘেঁটে মাসে পাঁচ টাকা পাই না।' বাংলা প্রহসনে চিকিৎসকদের বৃত্তিগত নীতিভ্রষ্টতার বিষয়ে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৮২) মন্তব্য করা হয়েছিল : "এইরূপ আচরণ বা দুরাচরণের শাসন হওয়া উচিত। আইন-আদালতে ইহার প্রতিকার হইতে পারে না—সমাজ কর্তৃক এই সর্বনেশে সামাজিক অপরাধের দমন হওয়া সম্ভব······চতুর্দিকে ইহার মৌখিক আলোচনা হইলেও ডাক্তার ভায়ারা ভীত, লজ্জিত ও সতর্কিত হইতে পারে। সেই আলোচনার জন্য সংবাদপত্র ও নাটক-প্রহসনাদির উপায় যেমন আশু কার্যকর সাধন, এমন আর কিছুই নয়।"

এই জাতীয় কয়েকটি নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বেই 'জনৈক ডাক্তার' প্রণীত 'ডাক্তারবাবু' (১৮৭৬) প্রহসনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে একটি কবিতাংশের উল্লেখের মধ্য দিয়ে চিকিৎসকের দুর্নীতির আশ্রয় ও তজ্জাত আয় প্রসংগে ব্যঙ্গের প্রবাহ সমুপস্থিত :

'কিবা ফন্দী ডাক্তারী, বলিহারি যাই
এ হেন শুঁড়ী ভায়ার মুখে দিল ছাই।

---

৪২ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বারুণীবিলাস নাটক'-এ শিশির নামক এক চিকিৎসকের জবানীতে অন্য এক চিকিৎসক সম্বন্ধে এই মদ্য প্রসংগে বলা হয়েছে :

"শিশির। চিকিৎসা উহার উপজীবিকা, অথচ এ দেশে যাতে সুরাপান রহিত হয় তার চেষ্টা পাচ্যেন! আপনার পায়ে আপনি যে কুড়ুল মাচ্যেন তা বোঝেন না। সুরাপান রহিত হলে কি আর ব্যবসা চলবে? একেবারে যে নিরন্ন হতে হবে।

ভট্টের সতত ইচ্ছা নিত্য শ্রাদ্ধ পটে,
মাদৃশ বৈদ্যের ইচ্ছা নিত্য রোগী ঘটে,
সুরা গেলে এঁদের সিকের ওঠে হাঁড়ি—
তাই বলি সুরা তুমি থাক বাড়ী বাড়ী।"

নাহি লাগে ঘুসঘাস, নাহি লাইসেন,
ডজন ডজন আসে ব্রাণ্ডি শ্যাম্‌পেন।
মদকে ওষুধ বলে বেচে দিনরাত,
চেয়ে থাকে এক্‌সাইজ, গালে দেয় হাত।
বাপের এ্যাকাউণ্টে ছেলে মদ খেয়ে বাঁচে
রসিদে এসেন্স লেখে ধবা পড়ে পাছে।
শুঁড়িখানা রাতে বন্ধ, আছে আইন জারী,
কত্তো ভায়া তরে যান, পেয়ে ডিসপেন্‌সারী॥'

চিকিৎসকদের দুর্নীতিমূলক আয়নীতি নিয়ে, গ্রাম্যমানুষের অজ্ঞানতার সুযোগে হাতুড়ে ডাক্তারের আচরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগে সম্পর্কিত যৌন ও সাংস্কৃতিক দিক ইত্যাদি নানা প্রসংগ ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে রচিত প্রহসন নাটকগুলি হল—রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০), কুঞ্জবিহারী ঘোষ 'ঠেঙ্গাপ্যাথিক ভুঁইফোড় ডাক্তার' (১৮৮৭), শ্রীনাথ কুণ্ডুর 'গত নিকাশ রাজকৃষ্ণ দত্তের 'যেমন রোগ তেমনি বোমা' (১৮৮২), চণ্ডীচরণ ঘোষের 'ভিষক্‌-কুল-তিলক' (১৮৯৯) ইত্যাদি।

শিক্ষা চাকুরী ভিত্তিক হয়ে পড়ায় উনিশ শতকের চতুর্থ পর্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে লঘুচিত্ততা দেখা দিয়েছিল। বাণিজ্য-বিমুখ বাঙালী সমাজ ডাক্তারি, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারীং ইত্যাদি বৃত্তির দিকে ঝুঁকেছিল। কিঞ্চিৎ সংস্থান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা 'ওকালতিব মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত' হতেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশী হওয়ায় ওকালতি ব্যবসায়েও অন্নসংস্থান কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে অনেকে শিক্ষকের বৃত্তির দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবে উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্তের আধিপত্যের ইতিহাসে আইনজীবীদের লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কিংবা সংসদ-সদস্যদের (১৮৯৩-৯৯) বৃত্তিপরিচয় পর্যালোচনা করলেও আইনজীবীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষিত ও সাধারণ মধ্যবিত্তের যে প্রসার সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা অভিজাত জমিদার শ্রেণীর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। যাই হোক উকিল মোক্তারীর ভূমিকার গুরুত্ব এ থেকে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামী যুগে ভূম্যধিকারী কর্তৃক বাদশাহের দরবারে নিযুক্ত এই উকিলেরা একদা

নিয়োগকারীর পক্ষ সমর্থন করে বাদশাহের সন্তুষ্টি-সাধন করতেন। পরবর্তীকালে এই ব্যবহারজীবীরা বিচারকের সহায়তার বদলে বাদী বা প্রতিবাদীর ব্যক্তিগত পক্ষ সমর্থনের আইনানুগ প্রতিনিধি সত্তারূপে বিবেচিত হয়েছেন। কিন্তু সমাজের রক্ষণশীল পক্ষীয়দের মনোভাব নব্যসংস্কৃতি সম্পন্নদের বিরুদ্ধতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নব্য আইন শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক জগতের সম্পর্ক-সংযোগ কম বলেও অনিবার্য দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছিলেন সেকালীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়:

'(আমি) সামলা নিয়ে পড়েছি কি মুসকিলে,
(এ যে) মগজে জড়ালো কম্‌লি
ছাড়ে না ছেড়ে দিলে ॥'

বাংলা নাটকেও উকীল সম্প্রদায়ের এই সামাজিক প্রতিপত্তি, দুর্নীতি কিংবা রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণে দুর্দশার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করি।

রমানাথ সান্যালের 'নব্য উকিল' (১৮৭৫) প্রহসনে রক্ষণশীলের খেদ ব্যক্ত হয়েছে:

'বাঙালী উকীল যেন আর
কেহ হয় না।
দালালের পরে তেল যেন
কেহ দেয় না ॥
শামলা মাথায় যেন
গাছতলে বসে না।
উকীলের দশা দেখে
লোক যেন হাসে না ॥'

দুর্দশাগ্রস্ত উকিলের আয়নীতির প্রসংগ নিয়েও প্রহসনটিতে ব্যঙ্গ আছে। রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'স্বরুচির ধ্বজা' প্রহসনেও উকিল প্যারীর মুখ দিয়ে ব্যবহারজীবীর দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অন্যতম চরিত্র চারুর সংলাপে ব্যক্ত হযেছে—'Bar-এ এমনই দুর্দশা হযেছে বটে। নাই বা হবে কেন? মরা গাঙ্‌, কুমীরে ভরা। অন্য স্বাধীন বাণিজ্যের দিকে ত আর কেউ যাবেন না।' উকিলদের আত্মপক্ষীয় দুর্নীতি, আসামীর পক্ষে মিথ্যাভাষণ, মক্কেল ভাঙানো, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি দিক নিয়েও প্রতিক্রিয়াশীল সংরক্ষণ

মানসিকতা বাংলা নাটকে দেখা যায়। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত 'রায় বাহার' (১৮৯১) প্রহসনে ৫০০৲ হ্যাণ্ড নোটের অভিযোগে অভিযুক্ত মক্কেলকে শঠতার পরামর্শ দিয়েছেন উকিল বিজয়বাবু। বিজয়বাবুর সাধারণীকরণ করলে সমাজ-চিত্রের যথার্থ চিত্র পরিস্ফুট হয়। নীতি কিংবা দুর্নীতির চেয়েও আর্থিক বিনিময় বড় সম্পর্ক হয়ে ওঠায় উকিল মক্কেলের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ন্যায়-নীতি ও সামাজিক আইন কানুনের মধ্যে স্থিতিসাম্য রাখবার কারণে এই জাতীয় আর্থিক-সংযোগের সমৃদ্ধিও প্রহসনকার ও নাট্যকারদের দ্বারা ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে। দুর্গাদাস রচিত 'ছবি' প্রহসনে এ-বিষয়ে বলা হয়েছে,—'আইনে বড় একটা প্রেম পাওয়া যায় না। তবে উকীলে-মক্কেলে প্রেম হয়, সে প্রেমে কোকিল ডাকে না, ফুল ফোটে না—তবে ঘুঘু ডাকে, সরষে ফুল ফোটে!' রমানাথ সান্যালের 'নব্য উকিল' (১৮৭৫) প্রহসনটির কথাও স্মরণীয়। ওকালতী-কেন্দ্রিক বাংলার সামাজিক নাটকগুলি অর্থনীতি-ভিত্তিক হলেও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ এবং এই বিশিষ্ট সমাজসমস্যাবিষয়ক ভাবনা সে ক্ষেত্রে নগণ্য নয়।

শিক্ষার জাতীয় ভিত্তি ও শিক্ষকতার বৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে বিশিষ্ট সামাজিক মনোজীবন ব্যাপ্ত হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেও সে-যুগে প্রহসন নাটক রচিত হয়েছিল।[৪৩] শিক্ষাখাতে ব্যয় স্বল্পতার সরকারী রীতি শিক্ষক সমাজের আর্থিক মর্যাদাকে কিভাবে বিপর্যস্ত করেছিল,তার পরিচয়ও বাংলা নাটকে পাওয়া যায়। কাজেই প্রহসনে বিদ্ধ এই দৃষ্টিকোণ আয়নীতি নির্ভর নয়—অবস্থাঘটিত ও পরিবেশ সাপেক্ষ। পাড়াগাঁয়ে সাহেবদের মনস্তুষ্টির কারণে এডেড্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা নিয়ে রচিত হরিমোহন ভট্টাচার্যের 'দশের গতিক' (১৮৭৪) প্রহসনে এই নিদারুণ সত্যের প্রতিচ্ছায়া আছে। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭২) প্রহসনে এই জাতীয় সমাজচিত্রের অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে: 'মহাশয়, এখনকার দিনে সার্টিফিকেট হতে উপরোধের জোর জেয়াদা। দু'মাস পরে গভর্ণমেণ্ট অবশ্য ২৫৲ মঞ্জুর করেছেন। মহাশয় স্বাক্ষরের বেলা অনেককে পাওয়া যায়, কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলা অনেকে পিছু হটেন, যাঁরা এই ২৫৲-র

---

৪৩ 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা' মন্তব্য করেছিলেন: 'টীচার্স বা শিক্ষকের কার্যে অনেকে নিযুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম অধিক অথচ বেতন অল্প সুতরাং তৎপদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ক্লেশ নিবারণ হয় না।"

'চান্দায় রইলেন, তাঁদের মহিমা শুনুন। গভর্ণমেণ্টের নিয়ম এই স্থানীয় দাতব্য সমুদায় আদায় করে বিল পাঠালে পর সাহায্যের টাকা মঞ্জুর হয়ে বিল আসে। ৩।৪ মাসেও এক মাসের চান্দা আদায় হয় না। আমাকে উপরের মাষ্টার বললেন, তাঁকে নাকি ডেপুটি বাবু বলে দিয়েছেন, চান্দা আদায় না হলেও হয়েছে এরূপ স্বীকার করে বিল পাঠাতে হবে—নতুবা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যাবে না।' শিক্ষক পোষণ সমাজচিত্রের অর্থ অপব্যয়ের নামান্তর রূপেই বিবেচিত হয়েছিল। তাই পঠনকার্য ব্যতিরিক্ত বুদ্ধিগত কিংবা কায়িক কাজের বিনিময়ও শিক্ষকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে এবং তা সমাজজীবনের অত্যন্ত বেদনা-বিদ্ধ একটি দিক। দুর্গাদাস দে-র 'Encore 99' নাটকে এই জাতীয় বেদনারঞ্জিত পরিচয় প্রকাশিত বাঁদুরে-গোপালের টিউটরকে তার বাবা বলেছে,—'মাষ্টার, মাষ্টার কাল যে যাবার সময় গরুর জাব দিয়ে যাওনি, তামাক কল্‌কে সেজে যাওনি, জান তোমার প্রতি আমার রোজ দু' পয়সার ওপর পড়ে। কাল থেকে আর তোমায় আসতে হবে না। আমাদের পরামাণিকের ছেলে এবার পাশ হয়েছে। সে দেড় পয়সা করে নিতে চেয়েছে। তাকে দিয়ে তোমার চেয়ে ঢের কাজ পাবো। খেউরী করা, জল তোলা তামাক সাজা, তামাক দেওয়া, গরুর জাব দেওয়া। আর ছেলেটাকে পড়িয়ে দুটো মাথা কামিয়ে যেতে পারে, তাতেও দু'পয়সা পাবে।'

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'হতভাগা শিক্ষক' (ঢাকা, ১৮৭২), আশুতোষ সেনের 'স্কুলমাষ্টার' (১৮৮৮) ইত্যাদি প্রহসননাট্যে শিক্ষক ও শিক্ষকতার বিষয়ে বক্তব্য আছে। নিয়মানুবর্তিতা-শূন্য হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের পরিচালক সমিতি অর্থনৈতিক সাফল্যের দৃষ্টিভংগীকেই প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাসংকটের সৃষ্টি করেন—তা-ও ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে।

১২

কেরাণীবৃত্তি ও বাংলা নাটক

নব্যসংস্কৃতি-নির্ভর অর্থনীতিক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালীর সমাজজীবনের সমস্যা জটিল রূপ গ্রহণ করেছিল। আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশও কলকাতা শহরের আর্থিক কর্মজীবনকে কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। আবার

এই নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্য ও প্রশাসন-কেন্দ্রিক হওয়ায় কর্মজীবনের বিস্তার ঘটেছে: কর্মকে কেন্দ্র করেই অর্থাৎ চাকুরীর আশ্রয়েই। স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বাঙালীর অনীহা উনিশ শতকের অগ্রগতির সংগে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময়কার বাংলার সমাজজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা (২৫শে নবেম্বর, ১৮৯২) 'বঙ্গীয় বাণিজ্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়-তে বলেছিলেন: "এ দেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে যে লোকে ইতস্ততঃ চীনাকোট, চাঁদনীর জুতা, শীল আংটি, গার্ড চেইন ও বাঁকা সিঁতি দর্শন করিয়া অহংকার করে সেটি কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচযমাত্র······বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন।······চাকরেরা সহাস্য বদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী তেরজি জমাখরচাদি শুদ্ধ রেকড় সই হিসাব রাখিতেছে।" সওদাগরী ও বেসরকারী অফিসে মধ্যবিত্ত নব্যসংস্কৃতি সম্পন্ন বাঙালীর 'কেরাণীরূপী' কর্মমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ ছিল। আবার 'ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যবিত্তেরাই যেহেতু গোড়া থেকে অগ্রগামী হয়েছিলেন, এবং কলকাতা শহর বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, সেইজন্য শিক্ষিত বাঙালীরাই প্রধানত এই চাকরীর ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-দেওয়া শিক্ষা-প্রবর্তনের আগে শুধু এই সরকারী চাকরীর ক্ষেত্র কলকাতা শহরে যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, এবং তার কাজকর্ম ও বেতনের যে কত বৈচিত্র্য ছিল, তার পরিচয় থেকে দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের নগর কেন্দ্রিক কর্ম সুযোগের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।'[৪৪] বাঙালীদের 'দেশীয় কেরাণী সম্প্রদায়'রূপে সৃষ্টির মূলে ইংরেজদের মিতব্যয়নীতি কার্যকর হয়েছিল। ১৮৩১-৩২ সালে হল্ট ম্যাকেঞ্জী তাঁর পালামেণ্টারী ভাষণে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন যে, শাসনখাতে ব্যয় সংকোচের জন্য এ দেশীয় ব্যক্তি নিয়োগই প্রশস্ত। উচ্চপদে ইংরেজ রাখার কারণ ছিল প্রাপ্য বেতনের উদ্বৃত্তকে স্বজাতীয় মূলধন হিসেবে লগ্নীকরণ। ১৮৪৩ সালের 'পঞ্চদশ অ্যাক্ট' অনুযায়ী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হলেও ১৮৩৩-এর সনদেই ইংরেজদের এদেশে অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় কার্যতঃ

৪৪ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা: বিনয় ঘোষ পৃ. ১৭৮

খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ কর্মক্ষেত্রে ঘটত। নব্য কেরাণী সম্প্রদায় সৃষ্টির মূলে এক মিশ্রমানসিকতার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে মেকলে তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক সনদে বলেছিলেন,—'We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in morals and in intellect'; শিল্পগত পুঁজিবাদের স্বার্থই তাদের জীবনমানকে উন্নত করে এদেশে শিল্পের বাজার সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এই যান্ত্রিক উদ্দেশ্যের অনিবার্য ফসল হল নব্য জমিদার-উমেদার, মুৎসুদ্দী ও কেরাণী সম্প্রদায়। এর ফলে নগর কেন্দ্রিক শিল্পজীবনের সংগে পাল্লা দিযে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যেও লক্ষণীয় বিভেদ ও বৈষম্য সমাজজীবনের সামগ্রিকতাকে বিপর্যস্ত করেছিল। শিল্পপুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক আয়নীতির পশ্চাৎ পটভূমিই গ্রামীণ মধ্যশ্রেণী বিকাশে প্রণোদিত করেছে। জমিদার শ্রেণী মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে লগ্নী টাকার সুদের মতো জমিদারীর মুনাফা ভোগ করেছেন। আর তাই দেখে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা' মন্তব্য করেছিলেন: "গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দশা সমস্ত সন্দর্শন-পূর্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।" জমিদার-মুৎসুদ্দী-কেরাণী সৃষ্টির সামাজিক পরিণতি অপরোক্ষভাবে পরবর্তীকালের সমাজজীবনের অনিবার্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। আবার যে ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্যে কেরাণী সম্প্রদায়ের সমাজের পত্তন—সেই কারণেই তাদের বেতনহ্রাসের চেষ্টা কিংবা কেরাণীদের আয়নীতির সংগে জড়িত উচ্চপদস্থ সাহেবদের অত্যাচারের চিত্রও লক্ষিত হয়েছে।[৪৫] সরকারী

৪৫ এরই করুণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে চিত্রদর্শন' (১২৯৭) পত্রিকায়:

'কেরাণী জীবনে নাহি তিলেক সুখ
সবাই দেখে কালিকলম,
বোঝে না যে কত দুঃখ।
সকাল থেকে সন্ধ্যা ধরে
কেবল মরি মাছি মেরে।
ফুলল কপাল ছেলাম করে
উন্নতি নাই এতটুক।'

ইংরেজ কেরাণী ও দেশীয় কেরাণীদের মধ্যে আর্থিক মানের পার্থক্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। শিক্ষিত কেরাণীদের হীন আয়নীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়ে সামগ্রিক জাতীয় আয়নীতিকেই অত্যন্ত হীন পর্যায়ে অবনমিত করেছিল।

বাংলা প্রহসন নাট্যধারার মধ্যেও নব্যসংস্কৃতিভুক্ত কেরাণী-বৃত্তির প্রসংগ এসেছে। কখনও তা নগরকেন্দ্রিক অভিনন্দন পেয়েছে, কখনও গ্রামকেন্দ্রিক সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভংগীর মধ্য দিয়ে সমালোচিত হয়েছে।

বাঙালীসমাজের চাকুরী-প্রিয়তার ও বাণিজ্যবিরাগের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় পাই 'বঙ্গদর্পণ' নাটকে (১২৯১); নাট্যকার 'ভূমিকা'-তে যা বলেছেন, তা তৎকালীন সমাজজীবন পর্যালোচনায় যথেষ্ট তাৎপর্যবহ বলে উদ্ধৃত করা গেল:

"আত্ম-মান বিনাশক 'অসুখের শেষ' চাকরীতে যাহাতে আমাদের বীতরাগ এবং স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এইজন্যই আমার এইখানি প্রণয়ন করা।—বলিতে পারি না সাধারণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে কি চক্ষে দেখিবেন।······মহামান্য ভারতহিতৈষী F. Pincott সাহেব আমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন, সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন—সাধারণের নিকট আমার কেবলমাত্র এই প্রার্থনা। ভারতহিতৈষী F. Pincott সাহেবের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষতঃ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক—In my opinion the future of India depends on her manufacturing industry. As long as India keeps so exclusively to agriculture she will remain poor, but if her manufacturing industries are developed, the vast resources of the country and the limitless command of cheap labour, will bring her boundless wealth, for she will be able to compete with the whole world. If I could infuse an honest commercial spirit into the heart of Indians, I would speedily make that nation the richest, and most powerful on the face of the earth.'

সত্যচরণ সেনগুপ্ত প্রণীত 'কেরাণীবাবু' (১৩১৫, অগ্রহায়ণ) নাট্যপ্রহসনের মূল বক্তব্য চাকুরীর উমেদার ও কেরাণীকুলের ব্যবসায়-বৈরাগ্য ও চাকুরীর

বঙ্গদর্পণ।

THE MIRROR OF BENGAL

A DRAMA

"Where there is a will there is a way."

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।
(৯'১, সিমুলিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

কলিকাতা।
ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং প্রেশে
শ্রীপ্রেম চাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮১ সাল।

জন্ত আকৃতি। কাহিনী অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। 'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকার বলেছেন: "এ পুস্তকে অনেকের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে—আমার নিজেরও। প্রহসনের রীত্যনুসারে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ বিন্যাস থাকিলেও গালি দিবার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হয় নাই। বর্তমান সময়ে আমরা যে ছাঁচে গঠিত তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের আশায় ইহার অবতারণা।" নাটকখানির কয়েকটি গানের উল্লেখের মধ্য দিয়েই চাকুরীর উমেদারগণের স্বরূপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালীসমাজের একাংশের পরিচয় প্রকট হয়েছে:

'আমরা সব হা-ভাতেব দল
দেখ দেশ ছেড়েছি পালিয়ে এছি
নাইকো বুকে বল।'
... ...
'দেখ হাড় বেরিয়েছে বুক শুকিয়েছে
পেটে নাই অন্নজল।
এ. বি. সি. ডি সুরু যখন,
কত আশা ছিল তখন।
এখন যে এতো বিদ্যে সব বেরুল,
এই কি কর্মফল?
ওগো সাহেব দাও গো চাকরী
তোমার টিপবো চরণতল।'
... .
'আমরা চাকরী করবো ভেট ভরাবো
ব্যবসাকাজ আর করবো না,
শিখেছি যে লেখাপড়া,—
নইলে খাতির পাবো না,
পয়সা যত পাই বা না পাই,
বিদেশেতে থাকবো সদাই;
চাক্‌রে-পুরুষ বলবে মোদের
তা যেমন-তেমন হোক্ না।

ব্যবসা করে মরুক তারা
যারা লেখাপড়া জানে না॥'
... .
'আমরা সব অফিসে চলেছি
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ পডছে বৃষ্টি—তবু বেরিয়েছি।
দশটা বুঝি বেজে গেল চল ভাই চ'লে চল—
তিনটি দিন 'লেট' করে 'ডিগ্রেড' হয়েছি।
চাকরী করা বড জ্বালা বুঝতে পেরেছি॥'

নব্য সংস্কৃতিভুক্ত কেরাণীদের প্রসংগকে কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'চক্ষুস্থির' (১৮৮২) প্রহসনে রক্ষণশীলদেব পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ বিদ্ধ করা হয়েছে:

'অধম গোলাম জঘন্য বাঙালী
গোলামি করিযা বাবু নাম কেনা।
যতই পোশাকে সাজাও ও দেহ—
গোলাম বলিযা কেবা চিনিবে না।
... ...
বাবু, বাহাদুব যত নাম লও
গোলামি নিশান এই সমুচয॥

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' (১৮৮৫) প্রহসনেও অনুরূপ ব্যঙ্গ বিধৃত:

'যার কর্ম নিক্তি ধরা
সোনারূপা তৌল করা
সেজন কেরাণী হযে কুঠী যায় চলিয়া
হাতুডি পিটিয়ে যার,
পিতা গেছে যমদ্বার—
তার পুত্র রহিয়াছে টেবিলেতে বসিয়া॥'

কেরাণীকুল-বৃত্তির সংকীর্ণ পরিধিতে ব্যাপক চাপ সৃষ্টির ফলে বেকারত্বের পরিণতির দিকে ইংগিত দিয়েছেন প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায তাঁর 'কেরাণীচরিত' (১৮৮৫) প্রহসনে। হীরা নামীয় চরিত্রের মুখ দিয়ে নাট্যকার আক্ষেপোক্তি নিবেদন করেছেন,—'ওহে বি.এ পাশ কল্লে আর কি হবে বল! আজকাল

বি.এ. ওয়ালারে কেউ পোছে কি ?” কেরাণী জীবনের বাস্তব চিত্র ও মিথ্যা ইজ্জত বোধকে ব্যঙ্গ করে তার শূন্যগর্ভত্বকে প্রমাণ করা হয়েছে যোগেন্দ্রনাথ-ঘোষের ‘কেরাণীদর্পণ’ (১৮৭৪) এবং নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বড়বাবু’ (১৮৯১) প্রহসন নাট্যে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘কলির হাট’ প্রহসনে ব্যঙ্গাত্মক ভংগীতে করুণ মন্তব্য করা হয়েছে—ভূতকে চাকরীর বাজার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে গিয়ে দুর্ভিক্ষকে বলছে,—‘চাকরীর বাজার বড় গরম। দশ-পনেরো টাকা মাইনের ওপর নেই। তাও তো পোশাক প্রভৃতির খরচা সাত টাকায় দাঁড়ায়। এতেও লোকে খবর নেয়, কেরাণী ম’ল কিনা !’

অমৃতলাল বসুর ‘একাকার’ (১৩০২) প্রহসনে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের ও জাতীয় বৃত্তি গ্রহণের আবশ্যকতাই প্রতিপাদন করেছেন। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় বৃত্তিত্যাগী বাঙ্গালীর জীবিকাসমস্যার সংগে চাকুরীলিপ্সার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তদানীন্তনকালের চাকুরী-প্রাণ বাঙালীসমাজের এই বিশিষ্ট প্রতিরূপের মধ্যে কর্মপ্রার্থী উমেদারের পরিচয়, ফিরিঙ্গি কেরাণীর লক্ষণীয় স্বাতন্ত্রিকতা ও আভিজাত্য, কর্মপ্রার্থী যুবকের দেশসেবার মিথ্যা চাতুরী, কর্মহীন বাঙালী সন্তানের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার ভয়াবহতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আপনাপন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার মধ্যেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও ভারসাম্যের স্থিতি বলে নাট্যকার নির্দেশ করেছেন। নাটকখানির সামাজিক মূল্যাবধারণায় একটুখানি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তৎকালীন ‘অনুশীলন ও পুরোহিত’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) পত্রিকা : “এরূপে অভিনয় দেখিয়া যে বাঙালীর চৈতন্য হইবে, প্রহসনকর্তার যদি এইরূপ মনে থাকে তবে তাহা ভুল। চির-পদানত চাকুরে বাঙ্গালী প্রত্যহ আপীসে বসিয়া হয়তো এরূপ অভিনয় দেখিতে-ছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড় প্রাণে চৈতন্য জন্মাইতে পারিবেন ? তবে আমাদের সমাজকলঙ্ক অকীর্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক।”

বাঙালীর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির পটভূমিতে সমাজ ও জাতির সমস্যা সমাধানের প্রয়াস গিরিশচন্দ্রের রূপক নাটকগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। ‘মহাপূজা’ (১৮৯০) রূপকনাটকে বৃটনেশ্বরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন দেবীর পারস্পরিক বাক্যসংলাপের মধ্য

দিয়ে বাঙালীর শিল্পবাণিজ্যের প্রতি উদাসীনতার কথাই ব্যাখ্যাত হয়েছে :

'কিন্তু এই দুঃখ মনে ভারত সন্তানগণে,
কোন মতে শিখিল না আপন নির্ভর,
শিল্পকার্যে নিয়োজিত করিল না কর।
... ...
সুজলা সুফলা বামা ফলে ফুলে সাজে শ্যামা,
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল।
শারীরিক প্রেম বিনা শরীর দুর্বল॥'

'হীরক জুবিলী' (১৮৯৭) নাটকে জমিদার শ্রেণীর দুর্বিনীত ব্যবহার নগর-কেন্দ্রিক মানুষের বাণিজ্যবিমুখী ও চাকুরীপ্রিয় মনোভাব গ্রামীণ ভূমিজীবী সম্প্রদায়কে কি পরিমাণে বিপর্যস্ত করেছিল—তারই ছবি এঁকেছেন। ভূমিজীবী সম্প্রদায় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আবেদন প্রসংগে স্বদেশীয় সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের কারুণ্যকে ব্যক্ত করেছে—

'মা, হলজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও—আমরা উপায় বিহীন অর্থহীন, দীন আমাদের প্রতি করুণাকটাক্ষ কর।······দেখ মা আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, উৎসাহ হীন।'

১৩

বাঙালীসমাজের 'টাইটেল' মোহ ও বাংলা নাটক

উনিশ শতকের বাবু-কালচারের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। সাংস্কৃতিক অধিকার ও আভিজাত্য অর্জনের আত্যন্তিক একটি প্রয়াসও ছিল এই ঐতিহ্যের পরিপূরক। এই অধিকার ও আভিজাত্য অর্জনের জন্য সমাজে এক কালে প্রভূত অপব্যয় অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করেছিল। অর্থলিপ্সু শাসক সম্প্রদায়ও এই দুর্বলতার আশ্রয় নিয়ে অকাতরে 'টাইটেল' বিতরণ করেছেন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক স্ফীতি ঘটিয়েছেন। এর পশ্চাতেও বৈশ্যনীতি কার্যকর। 'সুলভ সমাচার পত্রিকা'য় (১৮৭১, ১লা জানুয়ারী) এ বিষয়ক একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়—"বঙ্গদেশের মধ্যে ১২ জন

মহারাজা, ১৯ জন রাজাবাহাদুর, ১৪ জন রাজা, ৭ জন কুমার, ২৩ জন রায়-বাহাদুর, ৪ জন খাঁ বাহাদুর, ৭১ জন সর্দার, ১ জন বাবু বাহাদুর, এবং ৪ জন নবাব-বাহাদুর আছেন······যাঁহারা রাজাবাহাদুর প্রভৃতি খেতাব-সকল পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন ভাল কাজ করাতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্মান করিয়া সেই সকল খেতাব দিয়াছেন।" অনেক ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এই সকল খেতাবও পৈতৃক সম্পত্তির মতো বংশ পরম্পরায় চলত। বৈশ্যনীতির পোষক শিল্পপুঁজিপতি ইংরেজ সম্প্রদায় সমাজের বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীকে ভূমিমুখীন করবার জন্য আর্থিক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখন অর্থের প্রলোভনে বিত্তমুখীন হবার মতো মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্যেই হয়তো প্রকারান্তর হিসেবে সাংস্কৃতিক আভিজাত্যে চিহ্নিত করণের পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বৈশ্যনীতির প্রয়োজনেই শিল্পপুঁজিপতিরা ভূমিমুখীনতার দিকে চাপ আরও বাড়াতে চাইলো। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে তৈরী 'জমিদার' গড়তে পারলে একদিকে ইংরেজ ধনতন্ত্র যেমন সম্পদসমৃদ্ধিতে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে—তেমনি অন্যদিকে জমিদারদের সহায়তায় কাঁচামাল সরবরাহ করার কাজও সহজতর হয়ে পড়ে। এর উপর সামন্ত পরিচয় জ্ঞাপক খেতাব প্রাপ্তির পরেই ভূমির দিকে মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভূমিনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির পরেই ইংরেজরা শিল্পপুঁজি বৃদ্ধির অর্থ লগ্নীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। ফলে প্রত্যক্ষভাবে অর্থের বিমিময়েও টাইটেল দেওয়া হয়েছে। বাবু কালচারের নব্য ঐতিহ্য ইংরেজী দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে বিলাসিতায় মত্ত হয়েছে—খেতাব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে তা আরও ক্রমবর্ধমান করেছে। বাবুয়ানা ও বিলাসিতায় এ দেশের বাজারে চাহিদার তেজীভাব দেখা দিলে—সাধারণের মধ্যেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রচুর বিত্তব্যয় করে খেতাব সংগ্রহের মোহমত্ততায় শেষ পর্যন্ত জাতীয় মূলধনের অপচয় হতে লাগল এবং তা অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার সৃষ্টি করল। এ-বিষয়েও সমাজে সচেতন জনমানস কতোখানি সংগঠিত হয়েছিল—সে-বিষয়ে 'অনুসন্ধান পত্রিকায় (১৭ই আষাঢ়, ১৩০৪) ব্যঙ্গোক্তি লক্ষণীয়; 'চাকির বলেই চকৃচকে উপাধিমালা গলায় দুলাইয়া অনেক গোবর গণেশ গা ফুলাইয়া বেড়ায়।'[৪৬]

৪৬ কিংবা 'চন্দ্রদর্শন' পত্রিকায় (১২৯৭) প্রকাশিত ব্যঙ্গোক্তি :

'খেতাব' কিংবা 'টাইটেলের' উপর এই উন্মাদ-প্রায় আকর্ষণ, অর্থব্যয়, আত্মসন্তুষ্টি ও সামাজিক দুর্দশার চিত্র বহু নাট্য প্রহসনেই বিধৃত হয়েছে। বিত্ত-বানদের একদা সমাজের পরহিতায় ব্যয়সাধ্য বহু কার্য সম্পাদনের দিকে আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু নব্য সংস্কৃতির খেতাব মোহের আত্যন্তিক আকর্ষণ তাদের সমাজহিতকর মোহকর আকর্ষণ থেকে ক্রমশঃ মুক্তপুরুষ করে তুলল। এ পরিচয় পাই গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) প্রহসনে—যেখানে নব্য গোরাচাঁদ প্রাচীনদের কাজের সংগে ববোদার কাজের তুলনা করে সদম্ভে বলেছে—'ডারটি রিভাব সুরধুনির পরিবর্তে সুরা-ধনীর আরাধনা কর্চো, এগুলো কি অসদ্ব্যয় হচ্ছে?'

নিমচাঁদশীলের 'এরাই আবার বড়লোক (১৮৬৭) প্রহসনে ধনীর দানের স্বক্ষেত্র বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে—লিমসন্ কোম্পানীব রেলওয়ের চাঁদার

'আমি রাজা হয়েছি, আমি রাজা হয়েছি।
সত্যস্বর্গ চতুর্বর্গ দুটোই পেয়েছি।
বাপ পিতেমো মুড়ো খেয়ে
সবাই মল্যো বুড়ো হয়ে—
চ্যাকা খে'য় ভ্যাকা হল
জ্যাঠা খুড়া মোর।
সুখ না চিনে দুঃখ কিনে
কল্লে জীবনভোর।
রাজা হলেম ভাগ্যে আমি
লেজা খেয়েছি।
জমিজমার নাইকো ল্যাঠা—
বাস্তু কেবল তেরো কাঠা
থাক না নীচে কপ্নি অাঁটা ক্ষতি কি তার
সাচ্চা দেওয়া আচ্ছা রকম
পাগড়ি ত মাথায়॥'

২. 'আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি
কত অবিদ্বানের ঘরে।
কেহ হল সাহেব সুবো
রীতিমতো সেলাম করে॥'

—সচিত্র বিশ্বসংগীত: বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত।

খাতায় কিংবা অবলাকুলের অনুকূলে সব রকম খাতেই রাজাবাবু নামের কারণে চাঁদা দেন—কিন্তু সমাজের নির্ধন ব্যক্তিরা এ আনুকূল্যে বঞ্চিত। এঁদের সংগে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাও এই সূত্রেই ঘনিয়ে উঠেছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কানাকড়ি' প্রহসনে (১৮৮৮) হরিবৃদ্ধা একটি কানাকড়ি পেয়েছে—'যাদের দরজায় সেপাই সন্তরী পাহারা দেয়' তাদের কাছ থেকে। অথচ এঁরাই মিথ্যে খেতাবের জন্য অজস্র অপব্যয় করছেন। প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' নাটকে খেতাব লোভ জনিত অপব্যয় ও আয়-ব্যয়ের সমানুপাতিকতার অসামঞ্জস্য দেখানো হয়েছে। খেতাব প্রাপ্তির পর নিজস্ব পরিচিতি মহলে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাবার হাস্যকর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কিশোরলাল দত্তের 'হায়রে পয়সা' (১৮৭৭) প্রহসনে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি (১৮৮৯) প্রহসনে জমিদার মহেন্দ্র রায় উপাধিপাগল খ্যাতির বিড়ম্বনায় সঞ্চিত বিষয়-সম্পত্তি সবই দান করে প্রায় সমাধি লাভের অবস্থা। পরে যখন বসতভিটাও বাঁধা পড়ল—সেই নিঃস্ব অবস্থায় সরকার 'রাজাবাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করলেন। এদিকে রাজবাহাদুরের কাছে অর্থপ্রত্যাশী হয়ে রীতি অনুযায়ী বহু চাঁদার দাবী এলো। 'রাজা' প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব মানসিকতায় বিপর্যস্ত হলেন—একদিকে রাজার সম্মান, আর একদিকে বিপুল ঋণের ভার ভাগ্যের পরিহাসে অন্নসংস্থানও বন্ধ হল। অথচ রাজা হয়ে চাকুরীর দরখাস্ত করাও চলে না। বন্ধুর পরামর্শে দুর্ভিক্ষ সহায়ক সংস্থার তহবিল তছরূপ করে কনেষ্টবলের প্রহারে জর্জরিত হয়ে খেতাবের মোহ সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে মোহমুক্ত হন।

অমৃতলাল বসুর 'রাজা বাহাদুর' (১৮৯১) প্রহসনে এক লম্পট এবং মূর্খ বাঙাল জমিদার 'রাজা' খেতাব লাভে প্রত্যাশী। কলকাতার এক ধূর্ত ব্যক্তি এক মদ্যপ সাহেবের সংগে পরামর্শ করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সেই জমিদারকে খেতাব দেবার ব্যবস্থা করল। এমন সময় জমিদারের স্ত্রী দেশ প্রত্যাগতা হয়ে স্বামীকে নাস্তানাবুদ করল। বাঙাল গাণিক্যধনের রাজা হবার ব্যগ্রতা ব্যঙ্গবিদ্ধ হল।

দুর্গাদাস দে-র 'লবাব' (১৮৯৮) প্রহসনের পরিণতিতেও খেতাব-মোহগ্রস্ত নায়ক টুনিরামের 'লেজপ্রাপ্তি' এবং 'সলেজ' টুনিরামকে জু-গার্ডেনের খাঁচায়

পুরে ব্যঙ্গ ও রঙ্গের সৃষ্টি করা হযেছে। টাইটেলের জন্য টুনিরাম চাপরাশীদের তোষামোদ করেছে।

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙালীর মুখে ছাই' (১৮৭৫) প্রহসনে নান্দী অংশেই সচেতন সমাজমুখীন উদ্দেশ্যের পরিচয় মেলে:

'আপনার গুণস্বামী
উপদেশ কি দিব আমি,
জনমে অহিত যাহা
রায বাহাদুর কারণ।
যদি ভাব আমার স্যার,
হবে কেন মুক্ত দ্বার,
ভাবিয়ে তাহাই মনে করুন
ইংরাজ সেবন।'

উনিশ শতকের সমস্যা-প্রধান বাংলা নাট্যপ্রহসনের যুগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতিহীন ব্যক্তির মোহ ও তৎপ্রসূত আচরণ পারিবারিক অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে সমাজের ক্ষতিসাধন করেছে, তারই পরিচয় পরিস্ফুট। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার চতুর দূরদৃষ্টিতে খেতাবের শ্রেণীবিভাগ করে বিত্তনাশ-প্রয়াসী বিভিন্ন শ্রেণীর ধনীর অর্থনাশের সুযোগ নিযে নিজেদের অর্থনীতিকে সংগঠিত করেছে।

তৃতীয় পর্ব : প্রথম অধ্যায়

সমাজচিত্রে ব্যাপকতা ও বাংলা নাটক

সামাজিক পটভূমি (১৮৫৭-১৮৭০)

প্রাক্-সিপাহী বিদ্রোহ পর্বের বাংলার সামাজিকজীবনের তাৎপর্য এবং নাট্যসাহিত্যে তার প্রভাবের আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে, রাজনৈতিক চেতনা তখনও শিক্ষিত বাঙালী মানসের তলদেশ স্পর্শ করতে পারেনি। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের জ্ঞান ও মনীষাদীপ্ত কর্মভাবনা, ধর্মসভার সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণশীল মনোবৃত্তি আর সেই একই সঙ্গে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের বন্ধনমুক্তির ব্যাকুলতা প্রতিঘাত-তরঙ্গিত সামাজিক কোলাহলের যে বিচিত্ররূপ সৃষ্টি করেছিল, বাংলা নাট্য ক্ষেত্রেও সেই সামাজিক স্বরূপের ব্যাখ্যা করা চলে। তৎকালীন সমাজসংস্কারের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম সংগঠিত হচ্ছিল। প্রগতিবাদী এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কারমূলক যে নাটক রচিত হয়েছিল—তার মধ্যে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রাম নয়, শিক্ষিতসমাজকে মদ্যপানে প্রণোদিত করে কিংবা 'শোষণ যন্ত্রের কেরাণী' তৈরী করবার যে অর্থনৈতিক বৈশ্যনীতি সক্রিয় ছিল—তার বিরুদ্ধে জেহাদও ছিল। বাঙালীর এই মানসরূপই প্রত্যক্ষভাবে তাকে নাট্যরচনা, নাট্যশালা স্থাপন এবং রঙ্গমঞ্চে শ্রেণী সচেতন নাট্যোপস্থাপনায় ক্রমশঃ উদ্দীপিত করেছিল। তবে এই শ্রেণীর সমাজসংস্কারমূলক দৃষ্টিভংগীর মধ্যে অর্থনৈতিক কিংবা রাজনীতির অবদমনের বিশ্লেষিত পরিপ্রেক্ষিত অনুপস্থিত।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সমাজচিত্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উৎসের মধ্যে ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গেছে। সামাজিক সূত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সাধনার মিলন ঘটেছে। গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পর্বও এর মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছে। সামন্ত যুগের ভাঙ্গন এবং পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্য যুগের অভ্যুদয়, নগরে বা শহরে শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হওয়া ইত্যাদির মধ্য

দিয়ে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণী বিন্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজদেহের জটিলতা বৃদ্ধি পেল। বিদেশী শাসনের নাগপাশে বাংলাদেশের ধনতান্ত্রিক ইতিহাসের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব না হলেও বিরোধ-জটিল অসম বিকল্পের মধ্যে এই সময়কার সমাজজীবনে নবযুগের ঐতিহাসিক লক্ষণ অনেক পরিমাণেই ফুটেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ন ও তার রূপের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সমাজ-দৃষ্টিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশসত্তা ও জাতিসত্তা বিষয়ে একটি ক্রমোন্নত চেতনার উগ্র ঐতিহ্যবাহী মনোভঙ্গি দৃষ্টিগোচর হতে লাগল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার বিচিত্র সন্নিবেশের ফলে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তনায় সংযোগ-সান্নিধ্য ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্বাধীনতা সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা-নির্মুক্ত সম্প্রসারিত মানসচেতনায় উন্মীলন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন: "ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে এতগুলি ঘটনার বিচিত্র সংযোগ ও সংঘাত হয়েছিল উনিশ শতকের ঐতিহাসিক কারণে। যতটা ব্যাপকভাবে হয়েছিল, আর কোথাও তা হয়নি। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম আধুনিক সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবোধ অঙ্কুরিত হয়ে বাংলার বাইরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে।"[১]

বাংলার সামাজিকজীবনের এই সচলতার মধ্যেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৮৫০ সাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসে যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছিল—সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতবর্ষের সরাসরি বৃটিশ শাসনাধীন হবার পর নতুন শাসন কাঠামোয় শিক্ষিত ভারতীয়ের স্থান সংকুচিত হল। বিদেশী শাসক এবং এদেশীয় শাসিতের মধ্যে একটা বৈরীভাব সৃষ্টি হল। খানিকটা বিকেন্দ্রিত ও উদ্দেশহীনতা সত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন জনস্তরে এ আন্দোলন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল! তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী-মানস অনুকূলতার স্বীকৃতি দেয়নি। এই প্রতিকূল মানসিকতার সমাজতান্ত্রিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বৃটিশের প্রশাসনযন্ত্র প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে উত্তর ভাবত থেকে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত সীমায় বাঙালীর অবস্থার নিম্ন পরিসংখ্যানটি উল্লেখযোগ্য:

---

১ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ: দেশ (সাহিত্য সংখ্যা) ১৩৭৪

সাল	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী (মোট) (প্রবেশিকা)	উত্তীর্ণ বাঙালী
১৮৫৭-৮১	২০,০০০	১৬,০০০
	মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী (এফ. এ)	
১৮৬১-৮১	৫,০০০	৪,০০০
	মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী (বি. এ)	
১৮৫৮-৮১	১,৭০০	১,৫০০
	মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী (এম. এ)	
১৮৬১-৮১	৪২৩	৩৫০

শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের এই প্রসার বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটাল। বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত স্বার্থ সচেতনতার সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের স্বার্থ সংঘাত অনিবার্য সমাজ নিয়মের মতোই দেখা দিল। চাহিদা-যোগানের সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীর চাকুরী সংস্থান কঠিন সমস্যায় রূপ নিল। ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্বেও ইংরেজ সরকার তা মানেননি। ‘সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবে শঙ্কিত হয়েই এর অভিব্যক্তিরূপে পরবর্তীকালে ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট্ পাশ হয়েছিল। উপরন্তু ইংরেজ শাসকেরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আনুগত্য বিষয়েও সংশয়াপন্ন ছিলেন। তাই ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বইপত্র পরীক্ষান্তে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিলের ভার পড়েছিলো লঙ্ সাহেবের উপরে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহানুভূতিসূচক দণ্ডপ্রাপ্ত কাগজ ‘সমাচার সুধাবর্ষণ’, ‘দূরবীন’ প্রভৃতি পত্রিকা বিষয়ে তিনি নিরুচ্চার ছিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেণী এতাবৎ কাল পুঁথিগত রাজনীতি চর্চা করেছে, চাকুরীপ্রিয় বাঙালী যুবকের পক্ষে প্রত্যক্ষ-ভাবে ইংরেজ বিরোধিতা সম্ভবপর হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবপুষ্ট জমিদার শ্রেণী কিংবা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সম্পর্কপুষ্ট ব্যবসাজীবী বাঙালী সম্প্রদায়ও বিদ্রোহের প্রতিকূলতাই দেখিয়েছেন। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে শাসকদের স্বার্থ বিরোধের সুতীব্র সংঘাত শাসক-শাসিতের বৈরীভাব তথা জাতীয়তাবোধের ক্রমসংঘবদ্ধরূপই প্রকটিত করল।

বাংলাদেশের সমাজজীবনে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা স্তর দেখা গিয়েছিল। জমিদার কিংবা অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিদ্রোহের প্রতি নিন্দাসূচক মনোভাব অনেকটা কূটনীতি সম্ভূতও ছিল। বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশ 'খয়ের খাঁ' হয়ে গিয়ে ইংরেজের নীতির প্রারম্ভিক সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছিল। বাঙালী মধ্যবিত্তের এই 'ক্রীতদাস-সুলভ আনুগত্যের প্রতিনিধি' 'খয়ের খাঁ' গোষ্ঠীর দাপট ও প্রভুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েও ইংরেজ সরকার প্রাদেশিকতার বিষক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন।[২]

এই শ্রেণীর বাঙালী মধ্যবিত্তের আচরণ অযোধ্যা কিংবা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাঙালী বিদ্বেষের সৃষ্টি কি পরিমাণে করেছিল—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সেই দৃষ্টি-কোণের নিরপেক্ষ পরিচয়ই দিয়েছেন। বিত্তশালী আত্মরক্ষা নীতির নিন্দাও প্রগতিবাদীদের রাজনৈতিক চেতনায় উত্তরণে সহায়তা করেছে। বাংলার জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৫৭ সালের ২২শে মে মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের আচরণের যে নিন্দাত্মক প্রস্তাব গ্রহণ করেন—বর্ধমানের মহারাজা ও অন্যান্য আড়াই হাজার নাগরিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সেই প্রতিবেদন-পত্র ইংরেজ সরকারেব কাছে প্রেরিত হয়েছিল দিল্লীর পতনের পর। এর পশ্চাৎপটে যে ক্রমোদ্ভিন্ন রাজনৈতিক চেতনার বিকশিত সম্ভাবনা ছিল, সে প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন: 'We must remember that the British Indian Association was before the Revolt of the sepoys and the foundation of the Universities, a very tender Plant struggling for survival in uncongenial soil Bengal in 1857 was not prepared for systematic political efforts for the achievment of a well-defined political ideal.'[৩]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালী সাংবাদিকরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে প্রগতিশীল

২ বিদ্রোহকালে জেনারেল হ্যাভলক কানপুর, দখলকালে এই জাতীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরাই বলেছিলেন: "It is well known your excellency's lordship that we the Bengalees, are a cowardly people."

৩ Studies in the Bengal Renaissance—Ed. by Atul Gupta. P.-150

দৃষ্টিভংগী সৃষ্টিতে সমুৎসুক ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও তাদের ফৌজী নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনাত্মক প্রতিবাদ ছিল। বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"[৪] নামীয় সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হরিশচন্দ্র ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভংগীর সামঞ্জস্য বজায় রেখে একদিকে যেমন সরকারের বৈধ শাসননীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন—অপরদিকে তেমনি অবৈধ আচরণের তোষণ নীতির বিরোধিতা করেছেন। এই সময়কার সমাজ ও যুগকালের সচলতা ও চাঞ্চল্য এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধ-এর সক্রিয়তাকে কতখানি সম্ভাবিত করেছিল—সে-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন: "হিন্দু প্যাট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নব্য-বঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সং পৃ. ১৯৭)। হরিশ-চন্দ্রের সাংবাদিকতা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ সংস্থাপন করে যে নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল, এই বিদ্রোহের মূলেও সেই জাতীয়চেতনার সুদূর প্রসারী প্রভাবেরই প্রতিরূপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন: "There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule". বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ বিদেশী শাসনের মোহপাশ[৫] থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মানস সৃষ্টিতে প্রয়াসী হচ্ছিলেন—হরিশচন্দ্র তাঁদেরই প্রতিনিধি। ইংরেজ শাসনের

---

৪ এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'জাগৃতি ও জাতীয়তা' গ্রন্থে বলেছেন: "এই সময় হইতেই দেশী ও বিদেশীর মধ্যে জাতিবৈরী বা জাতিবৈরীতা দেখা দিতে থাকে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই জাতিবৈরের কথা নির্ভয়ে ব্যাখ্যাত করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে এই যে জাতিবৈরীতা দেখা দেয় তাহা আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।" পৃ. ১২২

৫ Hindu patriot: 21st May 1857

প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি কৃষ্ণদাস পাল কিংবা কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতো নরম পন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার পোষকতা করেননি।

কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ইংরেজরাই প্রথম এই অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিলেন। অবশ্য কৃষক ও জনসাধারণের সোৎসাহ সহযোগিতা সত্ত্বেও সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্ররূপ 'কৃষক-বিদ্রোহ' মোটেই নয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ বলেছেন: "তখনকার কালে কৃষক ও সিপাইদের চেতনা ছিল নিম্ন স্তরের। তাদের বিক্ষোভ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কৃষক ও সিপাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে স্থানীয় সামন্ত প্রভুরা দেশীয় রাজা-জমিদার-তালুকদার প্রভৃতিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগিয়েছিল। অনেক সময় সিপাহীরা নিজেরাই নিজেদের অক্ষমতার দরুণ এই সমস্ত প্রভুদের নেতৃত্ব বরণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।"[৬] লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি রাজকীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় দেশীয় রাজারাও ইংরেজদের বিরুদ্ধচারী হলেন। 'ইনাম কমিশন' গঠিত হবার পর তালুকদারদের উপর সম্পত্তির স্বত্ব প্রমাণের জন্য দলিল পত্রাদি পেশ করতে না পারার কারণে ২০,০০০ তালুকদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের পূর্বে বহু নিষ্কর জমির ভোগ দখলের সপক্ষে প্রমাণাদি না দিতে পেরে বহু জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এইভাবে ইংরেজ সরকার নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকে বিধ্বস্ত করে দিতে লাগল। বিদ্রোহকালীন প্রচারিত ঘোষণাপত্র থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জমিদার, বণিক, সরকারী কর্মচারী দেশের সকল বৃত্তির মানুষকে এক মহাজোটের শক্তিতে সংঘবদ্ধ করা হচ্ছিল। জনবিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আলোড়ন দেখা দিল। এই দেশাত্মবোধের মধ্যে অবশ্য স্থানিকরূপ অনেক সময় সর্ব-ভারতীয় অখণ্ডরূপের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেনি। গনচেতনার এই ক্রমোন্মুখ পরিমণ্ডলের মধ্যে রাজকীয় ও তালুকদারী স্বার্থবুদ্ধি নির্মম বাস্তব সত্যরূপে প্রকট হয়েছে। মধ্যযুগীয় সমাজের গোষ্ঠ-কেন্দ্রিক সংকীর্ণতায় তখনও ভাঙ্গন ধরেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাবিদ্রোহের মূল্যায়ন করে হরিদাস-মুখোপাধ্যায় তাঁর '১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ' পুস্তিকায় মন্তব্য করেছেন,

৬ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা (২য় সং) পৃ. ৮০

"মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পটভূমিকাতে ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকে যদি প্রগতি বলে স্বীকার করি, তাহলে একথা মানতেই হবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার বা মাৎস্যন্যায়ের পটভূমিতে ভারতবর্ষে প্রাক্ ১৮৫৭-র যুগে ইংরেজ শাসন ও সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল অভিব্যক্তি।" (পৃ. ২৪)

রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইংরেজ নেতৃত্বে উনিশ শতকে ১৮৫৭ পর্যন্ত যে সমাজ বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। নিয়মতান্ত্রিক শাসনের আদর্শগত প্রেরণা বহু মানুষের চেতনায় অভীপ্সিত হওয়ায় রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার ও স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ডঃ সুরেন সেন এই বিদ্রোহের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম ব্যথার সন্ধান পাননি—তিনি এর মধ্যে মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খল ফিউড্যাল ব্যবস্থা ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্তশ্রেণীর মৃত্যু যন্ত্রণাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের ব্যাখ্যা, নেতৃত্বের প্রকৃতি ও উপাদানবিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যাত হতে পারে। এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'My life and time নামীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,—"The mutiny did not touch our people at all in Bengal but the suppression of it and the returning prospect of settled government was hailed with universal delight by them" ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ইংরেজ রাজশক্তির স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত নানা উদারনৈতিক ও সংস্কারমূলক প্রয়াস রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থী জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ভূমি বিক্রয়ের নতুন নতুন আইন, পল্লী অর্থনীতিতে সর্বাত্মক ভাঙ্গন, সামরিক বাহিনীতে সিপাহীদের ধূমায়িত অসন্তোষের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে ধর্মনীতিগত কারণের আধিক্য ইত্যাদি নানা কারণই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানুষকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় প্রণোদিত করেছিল। তবে সাধারণভাবে ইংরেজ বিদ্বেষ বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করলেও তাদের মানসভূমির মধ্যে স্বার্থের অমিল ও লক্ষ্যের অভিন্নতার দিকটিও ছিল পর্যালোচনা সাপেক্ষ।

এই সময় বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে ভারতীয় ও

য়ুরোপীয় সমাজের বিচ্ছেদ-বৈষম্যের মাত্রা কর্মে ও লক্ষ্যে পারস্পরিক মত ও পথকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ব্যাপক জঙ্গী আইন প্রবর্তনের চেষ্টা ও বাঙালীকে নিরস্ত্রীকরণের বিদ্বিষ্ট প্রয়াস বাংলার সামাজিক-জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করল। যদিচ 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং' সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এক বছরের জন্য প্রেস আইন ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করেছিলেন। কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করার দরুণ ভারতীয় জাতি যুদ্ধ বিদ্যায় যেমন অজ্ঞ থেকে গেল আবার অন্যদিক দিয়ে আইন বলে তাদের নিরস্ত্র করেও রাখা হল। এ-বিষয়ে 'ক্যালকাটা রিভিউ' (ডিসেম্বর, ১৮৫৭) পত্রিকায় 'The Indian crisis of 1857' প্রবন্ধে এই বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল—'The primary causes of the Bengal Mutiny has been the letter want of discipline and the spirit of insubordination inseperable from the Brahmanic caste system upheld in the Bengal Army.' ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবী কিংবা নিষ্কর জমি পুনর্দানের দাবীতেও বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণ নিহিত ছিল। একটা বিশেষ শ্রেণীরূপে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিলেন নব্য শিক্ষিতেরা। সমাজ বোধ ও ইতিহাসের বিচারে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অনেক উপকরণ এ সময় দৃষ্টিগোচর হলেও তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের বৃটিশ নির্ভরশীল মননাদর্শ এই অভ্যুত্থানের সামগ্রিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি বলেই হয়তো বিদ্রোহের সফলতার সম্ভাবনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। দেশীয় রাজা কিংবা সামন্ত শ্রেণীর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভংগী ব্যাপকতর কোন দেশপ্রেমের ভাবাদর্শে রূপ পায়নি। লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতীয়া তোপী, নানা সাহেব, কুমার সিংহের মতো সামন্ত নেতা কয়েকজনই মাত্র এই দ্বিধাচিত্ততা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। দেশীয় রাজা, জমিদার কিংবা তালুকদার শ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চালাতো, তারই প্রতিদান স্বরূপ উক্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালনাধীন বিদ্রোহ এই শ্রেণী রূপের উদ্যম ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বৃটিশ আপোষ নীতি শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের বলিষ্ঠতাকে ব্যাহত করেছে। 'উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ' ও সংকীর্ণ-তার সম্পর্ক বিদ্রোহের সামগ্রিক চরিত্রশক্তিকে বিকেন্দ্রিত করেছে। এই শ্রেণীরূপের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—"এই বিদ্রোহে ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশের কৃষক জনগণ যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই যে এই সংগ্রামের প্রাণশক্তিরূপে কাজ করিয়া এই বিদ্রোহকে অর্ধ-ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি কোণে ছড়াইয়া দিয়াছিল তাহা গ্রামবাসী কৃষক জনগণের উপর ইংরেজদের ভয়াবহ অত্যাচারের বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়।······সারা ভারতের কৃষক জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহী বাহিনীর সত্যিকারের সিপাহী।"[৭] অর্ধচেতনাসম্পন্ন কৃষকদের মধ্যেও কোন সচেতন বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। এই বিদ্রোহের সূত্রপাতের পূর্বেই কৃষকসমাজ শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পূর্ব পটভূমি তৈরী করে রক্ষা কবচের সন্ধান চেয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে তাদের উৎসুক মনোজীবনের ভূমিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল বিদ্রোহের নেতৃত্বের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকা দেখে। তথাপি এ কথাও ঠিক যে, ইতিপূর্বে ফরাজী, চোঁয়ার, সাঁওতাল প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষক সংগ্রামের যে গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা এই মহা-বিদ্রোহের মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতি নিঃসংশয় সমর্থন স্থাপন করেছিল। উত্তর ভারতের বিদ্রোহ ইংরেজের চণ্ডনীতির সামনে যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল—কৃষকদের বিদ্রোহ তখনও অবদমিত হয়নি। ১৮৫৯ সালের নীল বিদ্রোহের উপরেও ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের প্রভাব কতখানি কার্যকর ছিল সে-বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে: "সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানাসাহেব ও তাঁতীয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নীল বিদ্রোহী কৃষকেরাও তাহাদের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিল।"[৮]

ভারত সরকার ১৮৫৬ সালের ২৫শে জুলাই 'General Enlistment Act' প্রস্তুত করেন এবং ক্যানিং ভারতে আসার পরই এই আইন চালু হওয়ায় সিপাহীদের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দ্রুততা বাড়িয়ে দেয়। সিপাহীদের মন যখন এইসব ঐতিহাসিক কারণে বিক্ষুব্ধ তখন টোটার প্রশ্ন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক পৃথকীকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দৃঢ়তা-কেই সূচিত করেছিল। বিদেশী শাসকের দীর্ঘদিনের শোষণ, অত্যাচার ও পীড়নের বিক্ষুব্ধ মানসিকতাই বিদ্রোহের সুপ্ত শক্তিকে সর্বাত্মকরূপে জাগিয়ে দিয়েছিল। পীড়নের চাপের মধ্য দিয়েই জাতীয়চেতনার উন্মেষ সম্ভব হয়েছে।

---

৭ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক : সুপ্রকাশ রায়, পৃ.৯৫

৮ যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য়)—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃ. ৭৮১

এই আত্মশক্তির চেতনার স্ফূরণই টোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে সামাজিক অভিপ্রায় নির্দেশ করেছিল। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিদ্রোহের দ্রুত প্রসারতার মধ্যে এই অভিপ্রায়েরই অমোঘ ইংগিত ব্যক্ত। সামরিক বিদ্রোহ ও গণবিদ্রোহের মিলিত ভূমিকাই মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাঙালীর নব-জাতীয়তাবোধ সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রচিন্তার ধারায় তা স্বতন্ত্র মূল্য পায়নি। গঠন-মূলক বিপ্লবাত্মক কোন কর্মপন্থাকে এর মধ্যে একমুখীন করা সম্ভব হয়নি। অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে সমাজনীতির পর্যালোচনা করে এই জাতীয়তাবাদকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' বলে এক কথায় আখ্যাত করলে সমাজ তত্ত্বগত দিক দিয়ে তা ইতিহাসানুমোদিত হবে না। তবে তা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনার ক্রমোন্মুখ প্রয়াসরূপে মূল্যবহ। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের বীরত্বও উপলব্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ১৮৬০ সালে লিখিত মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগল নির্জ্ঞান মনের এই অবদমিত বীরত্বের বাসনাকেই আবিষ্কার করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই বিশিষ্ট চেতনাকেই 'রাজনৈতিক' অভিধায় চিহ্নিত করে বলা হয়েছে: "The post-mutiny era in Bengal saw an unmistakable tendency towards the growth of bolder political philosophy deriving its main inspiration from nationalism."[৯]

সিপাহী বিদ্রোহের অর্থনৈতিক পটভূমিকা ও তার বিস্তার

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসগত আলোচনা ছাড়াও অর্থনৈতিক কাঠামো ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ দ্বারা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই একশত বৎসরের ইতিহাসের পর্যালোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারতের স্বাধীন সামাজিক বিকাশের স্বতন্ত্র শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই ছিল ভারতীয়

৯ History of Bengal (1757-1905)—Ed. by N. K. Sinha. P. 171.

অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তিভূমিও বিপর্যস্ত হয়ে অসন্তোষের ধূমায়িত পরিবেশ রচনা করেছিল। এর কিছুটা প্রাসঙ্গিক পূর্ব পটভূমি বিস্তারেরও প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের এদেশে বাণিজ্য বিস্তারের সূত্রপাতেই নব অভ্যুদিত বণিকশ্রেণী ও তাঁদের পক্ষীয় প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রশক্তিও তখন ক্ষীয়মান। সুতরাং য়ুরোপীয় অনুপ্রবেশকারীদের এদেশীয় বণিক ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের প্রতি-রোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু বৈশ্যশ্রেণী যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যুগের প্রকৃত সামাজিক নিয়ন্ত্রীশক্তি হল টাকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন ছলে-বলে নানাভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। তাঁদের অনুসৃত রাজস্ব আদায়ের নীতি, জমির উপর কৃষকের চিরাচরিত অধিকারকে নিষ্পিষ্ট করে তাদের ভূমিস্বত্ব রহিতকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি কৃষক সমাজকে বিধ্বস্ত করল। ভূমি রাজস্ব খাতের আদায়ও বাংলাদেশে চারগুণ বর্ধিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই মোগল সম্রাটগণ জায়গীরদারী প্রথার মাধ্যমে ভূমি রাজস্বের ইজারার যে রেওয়াজ শুরু করেছিলেন—সেই রাজশক্তির সামাজিক ব্যবস্থাব প্রতিরূপের মধ্য দিয়েই চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হযেছিল। জমিদারদের জমি বন্দোবস্তের মূল সূত্র নিযে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে একদা সংঘর্ষ বেধেছিল। এর ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত রায়ত-ওয়ারী প্রথাই সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারী বন্দোবস্ত সরকারী রাজস্বের স্ফীতিকরণে অসমর্থ বলে সরকারেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে কৃষকসমাজের বন্দোবস্ত যে ভূমিকা তৈরী করল—তা ক্রমশঃ কৃষক বিদ্রোহের অনিবার্যতায় রূপান্তরিত হল। কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির অনুকূলতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমাজব্যবস্থার যে জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল—কৃষকদের তা লাভবান করতে পারেনি। কারণ ক্রমবর্ধমান খাজনার হার তাদের জীবন-ধারণের মানদণ্ডকে ক্রমশঃ অবনত করেছিল। প্রচলিত দাদনরীতিও ছিল এর একটি মর্মন্তুদ দিক। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পদশালী হয়ে উঠলেও কৃষকশ্রেণী বা কারিগরসমাজে সেই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধির অংশ ভাগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কোম্পানীর রাজত্বের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা কৃষি ও শিল্পের যে বিস্তার এনেছিল—তা এদেশের জনগণকে দরিদ্র করল। বণিকের কোষাগারে তার দেনাই বাড়ালো। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজ শক্তিশালী হয়ে

উঠে ভারতের শিল্প ধ্বংস করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্যে কাপড়, লবণ ও তামাকের ব্যবসায়ে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পরাস্ত হচ্ছিল। অথচ কোম্পানীর বণিকদের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন ব্যবসায় করমুক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ করমুক্ত য়ুরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বণিক ক্রমশঃ পর্যুদস্ত হতে লাগল। বিদেশী শক্তির ক্ষমতাশালী রাজশক্তির আক্রমণে বাংলার সুপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বাণিজ্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হতে লাগল। ইতিপূর্বেই ১৭৬৫ সালের ১০ই আগস্টের গভর্ণর কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির ঘোষণা বাণিজ্য প্রভাব বিস্তারের এক ঐতিহাসিক দলিলরূপে স্বীকৃতি পেয়ে তা সমাজ দেহে কার্যকর হয়েছিল। ভারতীয় কৃষি ও বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করে শক্তিশালী বাণিজ্য শক্তিকে পরাভূত করবার যে নজীর সৃষ্ট হয়েছিল—বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতের কৃষি ও বাণিজ্যকে ক্রমশঃ অধিকার করে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিরঙ্কুশ আর্থিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ধনতান্ত্রিক শিল্পের এই মূলধনস্ফীতির উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—"সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বস্ত্রে ইংলণ্ডের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হল ইংলণ্ডের অভিযান ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলবার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত রীতিমতো ইংলণ্ডের তৈরী মাল বেচবার বাজার হয়ে দাঁড়াল। মোরল্যাণ্ডের হিসাব অনুসারে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে সমুদ্র পথে ৫ কোটি বর্গগজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল এবং ৩ কোটি ১০ লক্ষ বর্গগজ গিয়েছিল ইউরোপে। কিন্তু ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩০ সালের ভিতর ভারতে ইংলণ্ডের বস্ত্র আমদানি বেড়ে গেল শতকরা ৬২ ভাগ।" ১৭০১ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় রেশমী বস্ত্র আমদানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছিল তাতেও ভারতীয় আমদানির মন্দাভাব লক্ষিত না হওয়ায় ১৭২০ তে ইংলণ্ডে ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণত রদ হল। ফলতঃ ভারতীয় বাজারেও ভারতীয় ব্যবসায়ী বৃত্তিচ্যুত হয়ে শিল্প-প্রধান ভারত কৃষি-মুখীনতার দিকে ঝুঁকলো। তবে ভারতীয় কারিগরী ব্যবসায় ক্রম-ক্ষীয়মান হলেও সম্পূর্ণত ধ্বংস হয়নি। ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে ইংলণ্ডের নিরঙ্কুশ সামগ্রিক অনুপ্রবেশ ও প্রভুত্ব সর্বশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের ধূমায়িত বহ্নির মধ্য দিয়ে

এক নতুনতর চেতনায় জন্ম হয়েছিল। ভারতীয় নবীন জাতীয়তা গঠনে এর মূল্য অনস্বীকার্য। তথাপি এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, জাতিগত ঐক্য-চেতনার শক্তিতেই বৃটিশ শক্তি ভারতীয় অর্থনীতিকে আত্মসাৎ করে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল। ভারতের তথা বাংলার নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষমতার সম্মুখীন হয়ে কৌশলে তাকে আয়ত্ত করেছে, আবার মধ্যবিত্তশ্রেণীও ইংলণ্ডের শক্তির সহায়তাতেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মধ্যবিত্তশ্রেণী মহাবিদ্রোহের সমর্থনে এই অর্থনৈতিক কারণেও হয়তো অনুকূলতা প্রদর্শন করেননি। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করা হয়েছিল,—'ইংলণ্ডের কাছে ভারতের আর্থনীতিক পরাজয় সমান সমান আর্থনীতিক শক্তির দ্বন্দ্বে ঘটেনি। এ পরাজয় হল একটি শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রীভূত সামরিক শক্তির কাছে একটি উদীয়মান আর্থনীতিক শক্তির পরাজয়। বিজেতারা এই নতুন আর্থনীতিক শক্তিটিকে করায়ত্ত করে নতুন অর্থনীতিকে নিজেদের মতো করে নিতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে প্রাচীনতার প্রতিনিধিগত অবস্থান যতই থাকুক—মূলতঃ এ বিরোধের অন্তরাত্মা ছিল ভারতীয় স্বাধীন আর্থনীতিক আত্মশক্তির প্রতিবিরোধ।"[১০]

১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে আইন করে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ১৮৫০ থেকেই গড়ে ওঠা কিছু কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে বৃটিশ শিল্পের তুলনায় পশ্চাৎগামী ভারতীয় শিল্প সাম্রাজ্যিক কর্তৃপক্ষের বাধা নিষেধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্রেণীগত অসন্তোষ বৃহত্তর জাতীয় বিক্ষোভে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তারই ব্যাখ্যা করে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'একাল এ সেকাল' গ্রন্থে বলেছেন: "ইউরোপীয় প্রয়োজন ও বিলাস এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না।" তা হবারও উপায় ছিল না। কারণ ১৮৫৮-র আইনে আর্থিক বন্দোবস্তের ধারাগুলির বিন্যাস-ধর্মিতার মধ্যেই ভারতীয় আর্থিক মানদণ্ডের বিপর্যয়ের ইঙ্গিত ছিল। ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা-বৃদ্ধির জন্য ভারতের স্থানীয় ব্যবসায় বাণিজ্যকে নির্মমভাবে বিনষ্ট করেছিল, "India

১০ পরিচয় (জুলাই, ১৯৭০)

is then reduced from the state of a manufacturing to that of an agricultural country." (India under Early British Rule: R. C. Dutt) বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরেও শঙ্কাপূর্ণ মন্থরতার বিস্তার লক্ষ্য করা গেল। অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাংলার শিল্প-বাণিজ্যকে আগ্রাসী ক্ষুধায় গ্রাস করে নিল। মধ্যবিত্তসমাজেও এই অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা জাতির শোচনীয় পরাজয় সূচিত করেছিল। বিলেতি যন্ত্রশিল্পের প্রভাব ভারতীয়গণের বৃত্তিচ্যুতি ঘটিয়ে যে অর্থনৈতিক পশ্চাদপসরণ ঘটিয়েছিল—ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে ইতিপূর্বেই 'সমাচার চন্দ্রিকা (১৮৪৩, ৩০শে. জ্যৈষ্ঠ) মন্তব্য করেছিলেন, "কোম্পানী বাহাদুর এক্ষণে কলে কৌশলে রাজ্য করিতে বড় নিপুণ হইয়াছেন। ......ইহাদিগের কলের কথা শুনিয়া কে না বিকল্প হইবেন যাহা হউক ইংলণ্ডীয় বাহাদুরদিগের কলবল ছলকৌশল সকলই প্রশংসনীয়।"

এই সময় ভূমি ব্যবস্থারও নানা জাতীয় সংস্কার হয়েছিল। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েই সরকার চাষীদের রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। জমিদারদিগের পক্ষে অর্ধভূমিকরের নিয়ম অনুসৃত হত। যে সকল ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চলিত ছিল না সে সকল ক্ষেত্রে ১৮৫৫ সালের সাহারাণপুর বিধি অনুযায়ী প্রকৃত প্রজাকরের অর্ধেক সরকারকে দেয়-রূপে গৃহীত হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসীর দ্বারা নিরূপিত 'সাহারাণপুর নিয়মাবলীর' ৩৬ নং ধারায় এ-বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে: "গভর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তী কার্যকারক-দিগের প্রতি আমাদের ৫২ প্যারায় লিখিত নিয়ম এই পরিমাণে পরিবর্তন করিবার সংকল্প করিয়াছেন যে, খরচ বাদে গড় আয়ের অর্ধাংশের মধ্যেই রাজার দাবী সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে প্রত্যেক সম্পত্তির গড় উৎপত্তির অধিকাংশই রাজকররূপে লওয় হইবে।......যে জমি বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার আয় সূক্ষ্মরূপে জানিবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উক্ত আদেশাবলীর ৪৭ হইতে ৫১ প্যারায় যেরূপ সাবধান হবার কথা বলা হইয়াছে তদ্বিষয়ে কালেক্টরের বিশেষ লক্ষ্য করা কর্তব্য।"[১১]

১১ প্রবন্ধ সংকলন: রমেশচন্দ্র দত্ত—নিখিল সেন সম্পাদিত পৃ. ১৭৪

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারেরা একা জমির সম্পূর্ণ মালিক হইয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। জমিদারগণ তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাবর্গের স্বত্বাবদ্ধ মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছেন

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালে বাংলার খাজনা আইন পাশ করে চাষী সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান প্রচলিত করবার সময় সরকার প্রজাবর্গের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত নতুন আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতাসীন ছিলেন—এই আইন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আইন দ্বারা প্রজাগণের উপকারার্থেই এই আইনের প্রয়োগ-পরিচালনা সংঘটিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইনের ৭ ধারা অনুসারে এই শ্রেণীর রায়ৎ সম্বন্ধে জমিদারগণের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ধারা অনুসারে (১) নিকটস্থ সমশ্রেণীর জমির সমশ্রেণীর প্রজার দেয় নিরিখ অপেক্ষা খাজনার নিরিখ কম না হইলে, (২) কিংবা রায়তগণের ব্যয় ও পরিশ্রম বিনা জমির উৎপাদিকা শক্তি কিংবা জমির উৎপন্নের দাম বৃদ্ধি না হইলে, (৩) কিংবা জরিপে জমির পরিমাণ যে পরিমাণ জমির জন্য খাজনা দেওয়া হইত তাহা অপেক্ষা বেশী থাকা সাব্যস্ত না হইলে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট রায়তগণের খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিত না। ১০ আইন জারী হইবার পূর্বে প্রথমে খাজনা বৃদ্ধির সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিতে কেবল উপরোক্ত ১ ও ৩ দফার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে আইন-জারীর সময় ২য় দফার বিধানটি আইনভুক্ত করা হয়। এই দ্বিতীয় দফার বিধানটি উক্ত আইনের দ্বারা জমিদার পক্ষে নূতন সৃষ্টি হয়।"[১২]

এর ফলে রায়তগণের পক্ষে ১২ বছরের জন্যে ভোগ-দখল-জনিত দখলিসত্ব ও জমিদার দিগের পক্ষে জমির উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে খাজনা বৃদ্ধির স্বত্ব লাভ হল। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে অন্য কোন মধ্যবর্তী ও চিরস্থায়ী হস্তান্তর যোগ্য স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে সে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে আসছিল—তাদের খাজনা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ আইনের দ্বারা রদ হয়েছিল। কিন্তু মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে

মাত্র, অর্থাৎ তাঁহারা উক্ত প্রজাবর্গের স্বত্ব বজায় রাখিতে বাধ্য। জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমির একক সম্পূর্ণ মালিক নহেন।

—ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃ. ২১

১২ ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সাতকড়ি হালদার প্রণীত। (প্রজাসত্ববিষয়ক পূর্বাপর আইন সংবলিত এই ইতিহাস গ্রন্থখানি চৈতন্য লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে)

নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে আসেনি—তাদের খাজনা কোন্‌কোন্‌ স্থলে বৃদ্ধি করা যেতে পারে তদ্বিষয়ক কোন বিধানও এই আইনের দ্বারা বলবৎ করা হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর কালে অযোধ্যায় ক্যানিং যে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন—সে সমস্ত ক্ষেত্রে যে-সব তালুকদারেরা বশ্যতা স্বীকার করেন তাদের জমি প্রত্যার্পণ করা হয়। এই সঙ্গেই ১৮৬৮ সালে অযোধ্যা খাজনা আইন পাশ করে বাংলার খাজনা আইনের অনুরূপ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রাপ্য রাজস্ব অনাদায়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি আইন ঐ সালেরই ১১ আইন প্রসিদ্ধ। এতে জমিদারগণের অধীনস্থ প্রজাদিগের স্বত্ববিষয়ক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদারী যেরূপ সত্ত্ববিশিষ্ট ছিল সেইরূপ অবস্থায় দেবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সকল দায় সৃষ্টি হয়েছে তৎসমুদয় রহিত করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। অধীনস্থ প্রজাদিগের ক্ষতি ১৮৫৯ সালে ১১ আইনের দ্বারা কতক অংশে রহিত ও কতক অংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৮৬০ সালে উত্তর ভারতে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার পশ্চাতভূমিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দিকটিও উপেক্ষণীয় দিক ছিল না।

১৮৫৯ সালে ক্যানিং প্রবর্তিত একটি প্রস্তাব কার্যত প্রয়োগ করতে গেলে ইংরেজ বৈশ্যনীতি তার বিরোধিতা করে। আমদানী শুল্কের তারতম্য রহিত-করণ এবং শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কম লাভ জনক, সে শুল্কের অবলুপ্তি এবং আমদানী শুল্ক বাড়াবার প্রস্তাব তিনি করেছিলেন। এসম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"ভারতের প্রথম অর্থ সচিব জেমস্‌ উইলসন যখন এদেশে এলেন তখন তাঁকে এই ত্রুটি সংশোধনের উপদেশ দেওয়া ছিল এবং তিনিও সেই অনুসারে ১৮৬০ সালে ভারতীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানী শুল্ক বন্ধ করে দিলেন কিন্তু বিদেশী শিল্প দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক অনেক কমিয়ে দিলেন।"[১৩] ইংরেজ বণিকদের মানসিক সন্তুষ্টি বিধান এতে হলেও অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকারকে অনেক রাজস্বই প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। বৃটিশ শক্তিকে যে পরিমাণ অর্থের দাবী মেটাতে হতো, শিল্পজাতদ্রব্য রপ্তানী করে তা সংগ্রহ করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানীই ছিল এই অর্থ সংগ্রহের মূল মাধ্যম। কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বা মূল্য বৃদ্ধিতে ভারতীয়

১৩ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস—রমেশচন্দ্র দত্ত (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ সিরিজ) পৃ. ৫১

চাষীরা উপকৃত হয়নি। ভারতীয় অর্থনীতিও কিছু লাভবান হয়নি। 'কেননা যখনই খাদ্য দ্রব্যের দাম কিছু বেড়েছে তখনই যেখানে যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়নি সেখানে সেখানে ভূমি রাজস্ব যথাসম্ভব বাড়ানো হয়েছে।'[১৪] এই সময়ে ভারত সরকার সমধিক ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। সিপাহী বিদ্রোহ কালীন ঋণ সামগ্রী ভিক্টোরিয়ার উনিশ বছরের শাসনকালের পরিব্যাপ্তির মধ্যেই দ্বিগুণিত হল। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের খরচও ভারতীয় অর্থনীতিকেই বহন করতে হত। ফলে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ দেখা দিল, তারই ফলে করভার দুর্বিষহ হয়ে পড়ল। নুন, চিনি ইত্যাদির উপর করভার চাপিয়ে রাজ শাসনের প্রথম বারো বছরের মধ্যেই করভার দেড় গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। প্রাদেশিক স্তরেও কেন্দ্রীয় সাহায্যচ্যুতির কারণে 'প্রাদেশিক কর' চালু হল। ফলে প্রদেশগুলি থেকেই প্রাদেশিক সরকারের প্রয়োজনীয় খরচ সংকুলান হতে লাগল। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতের শাসনভার যখন প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ সরকার গ্রহণ করলেন— তখন এইভাবেই অর্থনৈতিক আত্যন্তিক চাপ, রাজনৈতিক একাধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের বৈষম্য ও শোষণের ক্রম বিস্তার নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত মানসিক-তার মধ্যে শাসক বিরোধী প্রতিক্রিয়াকেই ঘনভূত করে তুলল। দেশীয় মূলধন বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে সমানুপাতিকতা রক্ষা করতে না পেরে ইতিপূর্বেই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একেবারেই দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এই প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়েছে। 'ক্যালকাটা রিভিউ (১৮৪৮, জানুয়ারী— জুলাই, পৃ. ১৭২) পত্রিকায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে ইংরেজ রাজশক্তির অর্থনৈতিক শোষণ অর্থাৎ বৃহৎ ব্যবসায় ও শিল্প জগৎ থেকে দেশীয় পুঁজিকে বিপর্যস্ত করার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এদিকে আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের কারণে ভারতে উৎপন্ন তুলোর বাজারদর মন্দা হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক সংকটকে সম্ভাবিত করল।[১৫] দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম অবনতি ১৮৭০ সালে চরমে পৌছল।

১৪ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস—রমেশচন্দ্র দত্ত (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজ) পৃ. ৫২

১৫ সপ্তম এডওয়ার্ডের যুবরাজরূপে ভারত আগমন উপলক্ষে নবীনচন্দ্র সেন নিমন্ত্রণে বাণিজ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা করে সখেদে বলেছিলেন :

সিপাহি বিদ্রোহ ও বাংলা নাটক

মহাবিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক বিস্তার, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস[১৬] প্রচুর লেখা হলেও নাটক পরিমাণে খুবই কম লেখা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে 'নির্বাপিত দীপ' নামে একটি নাটকের সন্ধান মেলে। মূল নাটকখানির 'টাইটেল পেজ লুপ্ত। কিন্তু গ্রন্থ তালিকায় নাট্যকারের নাম পাওয়া না গেলেও প্রকাশক ও প্রকাশের কালের উল্লেখ আছে। নাটকটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—প্রকাশক হলেন অমৃতলাল নিয়োগী। সুকুমার মিত্র প্রণীত '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ নামীয় গ্রন্থে এই নাটকের উল্লেখ আছে এবং এটি অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। যাই হোক ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবোধমূলক মনোভঙ্গীই এই নাটকের বিষয়বস্তু। নানাসাহেব ও ঝাঁন্সীর রানীর ঐতিহাসিক চরিত্র রূপের পাশে কল্পিত বহু বাঙ্গালী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে নাটকখানি মোট ৫০পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দেশাত্মবোধক মোট বারোখানি সংগীত নাটকের শেষে সন্নিবিষ্ট। নাটকের মূল গল্পটি পুরোপুরি অনৈতিহাসিক না হলেও কল্পিত অংশই বেশী খয়ের খাঁ শ্রেণীর যে বাঙালী চরিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে—তা অনেকটাই ইতিহাস-ভিত্তিক। নাট্যকার ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে ভারতবর্ষীয় যথার্থ মুক্তিযজ্ঞের সংগ্রামরূপে দ্বিধাহীন চিত্তে দেখিয়েছেন এবং

'ভারতের তন্ত্র নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার।
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল,
জন্ম দিবার পুলে লবণ তাহার।'

১৬ সিপাহী বিদ্রোহকে নিয়ে লিখিত উপন্যাস হল চিত্তবিনোদিনী (১৮৭৪) শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যাত্মক উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'নানাসাহেব' (১৮৭৯) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে মহাবিদ্রোহকে বিবেচনা করেছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রা' (১৮৮৪) উপন্যাসে, মহাবিদ্রোহের ইতিহাসের একটি বিশেষ অংশ অবলম্বন করে চণ্ডীচরণ সেনের 'ঝাঁন্সীর রানী' (১৮৮৮) উপন্যাস প্রকাশিত হয়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমর সিংহ' (১৮৮৯) উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত মত প্রকাশিত হয়নি, তাঁতিয়া তোপীর বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়া' প্রিয়ম্বদা দেবীর 'অশোকা' (১৮৯০)।

একথাই তিনি অভ্রান্তরূপে সত্য প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, বাঙালী বিশ্বাসঘাতকতাই এই স্বাধীনতার সংগ্রামকে দ্বিধাদীর্ণ করে বিপর্যস্ত করেছে। যে দেশ-কাল-সমাজের পটভূমি নাটকখানির কেন্দ্রীয়শক্তি, তা হল বাঙালী মধ্যবিত্তের সমাজচেতনার মধ্যে নবোপলব্ধ জাতীয়তাবাদ এবং তারই স্পর্শমণিতে 'খয়ের খাঁ'রূপ শ্রেণী-চরিত্রের প্রতি প্রবল বিরূপতা ও ঘৃণার জাগরণ। 'নির্বাপিত দীপ' এই সমাজ পটভূমি ও জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি। বিঠুরের নানাসাহেব এবং ঝাঁন্সীর মহারাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে দৃঢ় সংকল্প :

"কম্পিত কর আজি ভারত ভুবন।
ভারত সমরাঙ্গনে
শ্বেতাঙ্গ যবনগণে ;
পাঠাও রে শমন ভবন ॥"

কিন্তু বাঙালী সেনাপতি গোপাল এ ব্যাপারে উৎসাহী নন—বরং ইংরেজের জয়গানে তিনি অকুণ্ঠ—"যেমন করে হোক্, বিঠুর রাজ্যের অনিষ্ট আমায় করতেই হচ্ছে। উনি ভাবছেন বাঙালীরা"[১৭] ওর সাহায্য করবে, আ মর! বাঙালীরা কি সেই জাত?"

নানাসাহেবের অবিমৃষ্যকারিতায় গোপাল তার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেল। নানাসাহেবের সমর্থক এবং মুক্তি সংগ্রামে অর্থ সাহায্যে ইচ্ছুক বাঙালী নেতা রামলাল বসুর একমাত্র রূপসী কন্যা কৃষ্ণভামিনীকে নানাসাহেব অপহরণ করেন। কন্যা শোকাতুর রামলালকে গোপাল এক বেনামা পত্র মাধ্যমে জানিয়ে দেয় যে, নানাসাহেব তাঁর কন্যাকে অপহরণ করেছেন। রামলাল পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারলেও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে নানাসাহেবের পত্নী মহীকুমারী কৃষ্ণভামিনীর মুক্তির

১৭ ইংরেজদের স্বপক্ষে তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (২৬. ২. ১৮৫৯) ও সিপাহীদের বিরূপতা করে মন্তব্য করা হয়েছিল : "অবোধ অবাধ্য সিপাহীগণ এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমরাজ্যের বহু মূর্খ লোকে একেবারে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া প্রভাকর তুল্য তেজপুঞ্জ বৃটিশ পরাক্রমকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ফলত ঐ পতঙ্গরাশি সেই সূর্যকরে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক কেমন ভূমিতলে পতিত হয়, অবোধেরা সেই প্রকার বৃটিশ পরাক্রমের ভয়ংকর প্রতাপে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গোপাল কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে কৃষ্ণভামিনীকে হত্যা করল এবং কৃষ্ণভামিনীর মৃতদেহ একটি সিন্ধুকে করে রামলালের কাছে প্রেরণ করল। শোকোন্মত্ত রামলাল নানাসাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ক্যানিং এবং হ্যাভলকের কাছে গিয়ে জানালেন,—"বাঙালীরা ইংরাজদের সাপক্ষ। লাটসাহেব নমস্কার। উপকার—উপকার—তোমাদের উপকার করতে এসেছি। এই চিঠিগুলি পড়। নানা যেখানেই থাক্—আপনাদের কামান তার পশ্চাৎ যাবেই—এই আমি পত্র পেয়েছি।" এদিকে রণমঙ্গলা মন্দিরের সামনে মহীকুমারীর আকুল আবেদন :

"রণমঙ্গলা মঙ্গলদান কর।
রণ অঙ্গনে অঙ্গনা ক্রোড়ে ধর॥
অতি ভীষণ সমর কালানলে।
রাখ জননী তনয়া বৎসলে॥
দীন ভারত আকাশে সুখশশী।
ওই উদিছে আবার হাসি হাসি॥"

কিন্তু যুদ্ধে নানাসাহেবের পরাজয় ঘটল। নানাসাহেবের পলায়ন কালে গোপাল তাঁকে গুলি করে হত্যা করল। ঘটনাস্থলেই গোপাল ধরা পড়ল এবং নানাসাহেবের ভাই মধু-রাওয়ের অস্ত্রাঘাতে নিহত হল। সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে ঝাঁসীর রানী পলায়ন করলেন এবং খেদোক্তি করলেন,—'কেন আমি বাঙালীকে বিশ্বাস কর্লেম? কেনই বা তাকে মন্ত্রীত্ব পদ দিলেম? কেনই বা তাকে সেনাপতিত্বে বরণ করলেম?' এদিকে মহীকুমারী সহমরণে গেলেন। নানাসাহেবের নির্বাপিত চিতাবহ্নির পটভূমিকায় একটি গান সংযোজিত করেছেন নাট্যকার :

সমস্ত জগৎ গেল, ওই সব পুড়ে গেল ;
ভারত গৌরব রাশি ওই পুড়ে গেল রে!
ভারত সৌভাগ্য দীপ নির্বাপিত হল রে!

(পৃ.—৪৯)

নাটকখানির সমাপ্তিতে বাঙালী জাতিকে উদ্দেশ্য করে একটি দৈববাণী উচ্চারিত হয়েছে :

"শোন চন্দ্র সূর্য তারা শোন গ্রহগণ।
শোন স্বর্গ-মর্ত্যবাসী শোন ত্রিভুবন॥
শোন্ রে বাঙালী জাতি,
জ্বালালি বিষের বাতি ;
ডুবিল তোদেরি তরে স্বাধীন তপন।
নারী রক্তপাতে পুনঃ বঙ্গের পতন॥"

নাটকখানির পরিশিষ্টে সংযোজিত গানগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। এগুলির মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় দিয়ে নাট্যকার যুগোপযোগী সমাজচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন। এই কারণেই গানগুলির উল্লেখ আমরা করছি :

১. ভারতে আবার জ্বলিল অনল।
জাগিল আবার আর্যসুতদল,
আবার কাঁপিল ভূধর সকল,
ধরণী আবার কাঁপিল আজ।
পামর ইংরেজ করেছিল মনে,
কেহ নাই বুঝি ভারত ভুবনে।
আসুক এখন দেখিতে এখানে
—কি সেজেছে বীর ধরি বীর সাজ॥

করালে কৃপাণ করিয়ে ধারণ,
চল রণাঙ্গনে চল সৈন্যগণ,
দেখিব কেমন শ্বেত বীরগণ,
কি বলে ভারত শাসন করে।
আর্যসুত, কর অসি উম্মোচন,
কেড়ে লও পুনঃ স্বাধীনতা ধন,
কেড়ে লও পুনঃ রাজসিংহাসন
নাচহ আবার আনন্দভরে॥

উজ্জ্বলিত হোক্ আজি অনন্ত সাগর,
ধরুক প্রচণ্ড মূর্তি প্রচণ্ডভাস্কর,

শত শত ইরম্মদ ফেলুক অম্বর,
দগ্ধ হোক একেবারে ইংরাজ নিকর ॥

২. মোহ নিদ্রা ত্যজ জাগরে ভারতবাসী।
কত সহিবি আর, বহিবি সন্তাপরাশি ॥
বীর গরব ভরে, ভীম কৃপাণ করে,
তেজ তপনরূপে, নাচ অরাতি নাশি।
ছাড় জীবন আশা, শত্রু শোণিত তৃষা,—
মিটাও মনের সাধে, অরি হৃদয় শোধি ॥

৩. রণমদে মাতরে এখন।
শত্রুগণে রণাঙ্গনে কর আবাহন
নিষ্কোষিয়া তরবারি,
জয় জয় রব করি,
কম্পিত কর আজি ভারতভুবন।
ভারত সমরাঙ্গনে
শ্বেতাঙ্গ যবনগণে
পাঠাও রে শমন ভবন ॥

মনোমোহন বসু রচিত 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫) মূলত পৌরাণিক বিষয় অবলম্বী করুণ রসাত্মক মিলনাত্মক নাটক। নাটকখানির মধ্যে উনিশ শতকের হিন্দুর নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়তার বাণী ও বৈদেশিক শোষণের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। যদিচ এ-বিষয়ের উল্লেখ কিছুটা প্রসঙ্গবিচ্যুত। গীতাভিনয়রূপেও এ নাটক অভিনীত হয়েছে এবং গানগুলির মধ্যে সে-যুগের পরাধীনতাবোধের লক্ষণীয় তথ্যবহ ইতিহাস ধরা পড়েছে। নাটকীয় রসতাৎপর্যের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সংগীতগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য অপরিসীম। সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার হাতে নিযে বৃটিশ শক্তি কিভাবে করভারে দেশবাসীকে বিপর্যস্ত ও পীড়িত করেছিলেন এবং তার ফলে অর্থনৈতিক মানদণ্ডও কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি। করভার-পীড়িত এই জনগণের দুঃখকে 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' মনোমোহন বাণীবিদ্ধ করেছেন :

"দে কর, দে কর, রব নিরুত্তর
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর
করদানে নর-নিকর কাতর,
আয়-কর শুনে গায়ে আসে জ্বর
লবণটুকু খাবো তাতেও লাগে কর!
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!
করের দায়ে অঙ্গ জরজর
শোণিত শোষণ করে শর্তকর
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর।
অস্থিভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর!
কতো আর কর মুনিবর।
হাহাকার রব নিরন্তর।"

পরাধীন দেশের পীড়িত মানুষের অন্তহীন দুঃখের পরিচয়কে সমাজ-সচেতন নাট্যকার নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন:

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তবু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য ভূমে,
পূর্ব-গর্ব সর্ব থর্ব হল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য বংশ অগৌরব ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন।

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সারা শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
　　হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতী কর্মকার, করে হাহাকার ;
সুতা-জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না আর,
　　হল কি দেশের দুর্দিন !
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ,
　　বাকল টেনা ডোর কপিন্।
সূচ-সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে
প্রদীপ জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
　　কিছুতে লোক নয় স্বাধীন॥"

সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিকজীবনের প্রতিফলন নাটকখানির মধ্যে এইভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক বিদ্রোহের বিপ্লব ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের জাগরণ

সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক তিনবছর পরে রামচন্দ্র ভৌমিকের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক (২রা আশ্বিন, ১৭৮২ শকাব্দ—১৮৬০ খ্রী. ঢাকা) ; এই নাটকের পশ্চাৎপটে বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনের ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বিপ্লবাত্মক পরিচয় নিহিত। সামাজিক রূপের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের পরিচয়েরও এই সূত্রপাত। পাশ্চাত্য লেখক এ স্বীকৃতির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সোচ্চার—'The story of the Indigo Industry is more interesting historically and more pathetically instructive than that of almost any other Indian Agricultural or industrial substance."[১] নীলচাষের পরিণামের বিচ্ছিন্ন কোন সত্য নয—ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিকূল ও অনুকূল ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসানুগ অভিপ্রায় নাটকখানিকে স্বয়ংস্বতন্ত্র করে রেখেছে।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকেই বাংলা নীতি ও জীবনচর্যার সামগ্রিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাংলার নীলচাষীদের উপরে যে অত্যাচার চলেছিল—তাদের অবক্ষয়িত আত্মার প্রতিরূপ ক্ষতার্ত বেদনায় চিত্রিত হয়েছে নীলদর্পণ নাটকে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবে ব্যর্থ হলেও ভারতবাসীর সামনে এই বিদ্রোহ যে নতুন আদর্শ তুলে ধরেছিল তা নব-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙালী সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের যখন ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছিলেন—তখন নীল বিদ্রোহী কৃষকেরা নানাসাহেব ও তাঁতীয়া তোপীর নামে শপথ নিয়েছিল। 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস'

১ The Commercial products of India : George Watt P. 668,

লেখক সতীশচন্দ্র মিত্রও এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে বলেছিলেন,—'সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলবিদ্রোহী কৃষকরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিত।' সিপাহী বিদ্রোহের পরেই একটানা কতকগুলি কৃষক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। 'জমিদার কিংবা প্ল্যান্টার'দের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র হিসেবে যে কৃষকশ্রেণী এতোকাল ব্যবহৃত হয়েছে—তা'রাই শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে মুক্তি প্রযাসী হতে চাইলো। নীলচাষের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা বিদ্রোহের আকারে বিস্তৃত হল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী দ্রব্যের অন্যতম ছিল নীল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবরের সবকারী ঘোষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, জনৈক ফরাসী ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ইউরোপীয নীলকর। চন্দননগরের নিকটস্থ তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায দুটি নীলকুঠি স্থাপন করে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন রায় রচিত 'ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড, ১৯২২) গ্রন্থে উল্লেখিত আছে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলায নীলের কুঠি খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু এই লাভজনক ব্যবসায়ের ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রসারের ফলে নীলকুঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতেই ৩১টি নীলকুঠি স্থাপিত হল। ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট, গ্যাস্ট্রেলের সমীক্ষা কিংবা গ্র্যান্টের 'মিনিটে ফরিদপুর, যশোহর ও নদীযায় উৎপন্ন নীলকেই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নদীযা ও যশোহর জেলায নীলকুঠিতে নিষ্ঠুর অত্যাচার, প্রজা ও জমিদারবর্গের সংগে অত্যাচারী নীলকরদের দুঃশাসন মূর্তির দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এ সম্বন্ধে হারাণচন্দ্র চাকলাদার 'ডন' পত্রিকায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—নিরঙ্কুশ স্বৈবতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে বৃটিশ শক্তি দাস-মালিকের মনোবৃত্তি নিযেই রায়তদের নীলচাষে বাধ্য করেছিল—'every form of oppression that unrestrained tyranny could devise or the inventive imagination of repacity could contrive was put into practice by the Indigo planters"

নীলকর সাহেবেরা জোর করে চাষীদের চুক্তি কবিয়ে সই করিয়ে নিত। কৃষকদের নিজেদের শ্রম, লাঙ্গল ও বলদ নিয়ে যে নীল উৎপাদন করতে হত—সে শ্রমের ফল জমা হত কুঠির গুদামে। আবশ্যিক নীলচাষের চিহ্নিত সীমার

বাইরে যে জমির অংশটুকু অবশিষ্ট থাকতো—লাঙ্গল, বলদ ও শ্রমের অভাবে তাতেও ফসল ফলানো যেত না। নীলকরদের এই শোষণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল—'The object of the planters was to secure the maximum profit at the minimum or no cost ; he wanted the indigo plant without paying nearly the cost of its production to the raiyat and at a nominal price which, even if fully paid, would be ruinously unprofitable' ; অত্যাচারী নীলকরদের সংগে প্রকাশ্যভাবেই বহু প্রজা ও জমিদারদের সংগ্রামের সূচনা হল। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের এই নীল আন্দোলনের পশ্চাৎপর্বে দীর্ঘ সঞ্চিত বেদনা ছিল—'About the time when the rent question was settled by the new law, there had been a combination of the ryots and an out break against the Indigo-system known as the Indigo rebellion ' (Memories of my Indian career—Cembell, Sir George) ; প্রথমে জমিদারদের অধীনে অল্প জমিজমা নিয়ে নীলকরেরা স্থানীয় রায়তদের সাহায্যে নীলচাষ সুরু করে। এ বিষয়ে 'যশোহর-খুলনা জেলার' ইতিহাসকার লিখেছেন : 'পরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম আইনে (Regulation VIII of 1819) জমিদারদিগকে পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারগণ নবাগত নীলকরদের বড় বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজের অথবা পরের জমিদারীর মধ্যে পৃথক-ভাবে পত্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন।" ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের এই ধারা সম্পর্কে 'ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে : "১৮১৯ খৃ. অব্দের ৮ আইনের ২ ধারা দ্বারা যে সকল পাট্টা ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫ আইন ও ১৮ আইনের পূর্বের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে চিরকালের নিমিত্ত কিংবা দশ বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য দেওয়া হইযাছিল তৎসমুদয় কাইমি করা হয়।" (পৃ. ২৪) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নং রেগুলেশন যখন প্রচারিত হয়—তখন এর ৩২ ধারা দ্বারা বিধান করা হয়েছিল জমিদারী রাজস্ব অনাদায়ে বিক্রীত হলে খরিদ্দার 'কদিমি খোদকস্তা' রায়তগণকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না। নীলকর যে সব চাষীদের টাকা বা নীলবীজ দাদন

দিয়েছে—তাদের জমির উপর একটা বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার পেল। কিন্তু অসন্তুষ্ট নীলকরদের নতুন দাবীর ভিত্তিতে ১৮৩০ সালের যে পঞ্চম আইন পরিকল্পিত ছিল তার মধ্যে নতুন দাবী সোচ্চার ছিল। এই আইনবলে ঘোষণা করা হল যে, দাদন গ্রহণকারী কৃষকের পক্ষে নীলের চাষ না করা আইন বিরুদ্ধ এবং এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতেও অভিযোগ আনীত হতে পারে এবং তা প্রমাণ-সাপেক্ষে কৃষকদের কারাদণ্ড হতে পারে। এই আইন পাশ হবার পর কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৮৩০ সালে পঞ্চম আইন পাশ হবার দু'বছর পরে নীলকর-দের সম্পর্কে বিলেতের ডিরেক্টরদের সংগে কোম্পানী সরকারের যে-সব চিঠিপত্র ও রিপোর্ট বিনিময় হয়েছিল তা আলোচনা করে ডিরেক্টরগণ গভর্ণর জেনারে-লকে যে পত্র (১০ই এপ্রিল, ১৮৩২) দিয়েছিলেন, তাতে রায়তদের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণের অত্যাচারে কোম্পানীর দৈনন্দিন শাসনকার্য নীল জেলাগুলিতে ব্যাহত হয়ে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতিসাধন করল। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সনদ প্রণয়নকালে ১৮৩৩ সালে নীলের চুক্তির বিষয়টি অন্যতম বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। নীলচুক্তির আইনগত দিকেই প্রশ্নটি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

বাংলার বিভিন্ন জেলার ইতিহাসে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সমকালীন 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল : 'মফঃস্বলে কোন কোন নীলকরেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই যে প্রজা নীলের দাদন না দেয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা।'

এই ব্যাপক অত্যাচার বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার' কয়েকটি মন্তব্য আমরা সংকলন করছি—যার মধ্য দিয়ে অত্যাচারের প্রত্যক্ষ চিত্র উপস্থাপিত :

১. ইংরেজ নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আর কি লিখিব, যাঁহা-দিগের অত্যাচারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কত কত ভদ্র সন্তান আপনারদিগকে পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারদিগের উপদ্রবে কত কত দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বাভাবিক হীনবল

প্রযুক্ত অগত্যা তাঁহারদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ মনের দুঃখে কালহরণ করিতেছে।

২. নীলকরেরাই রাজা এবং হর্তা কর্তা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অত্যাচার প্রতিকার হইবার কোনপ্রকার সদুপায় হওয়া দূরে থাকুক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সমীপে তাহার বিচারও হয় না।

৩. নীলপ্রধান প্রদেশবাসী প্রজাপুঞ্জের প্রতি পুনর্বার নানাপ্রকার পীড়নারম্ভ হইয়াছে, আমরা হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ পত্র পাঠে অবগত হইলাম, রাজশাসন ও রাজবিচারের বিশৃঙ্খলা জন্য নীলকরগণ আপনাপন দুষ্টাভিসন্ধি সকল সিদ্ধ করণার্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন প্রকাশ করণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে চারিদিকে প্রজাগণ হাহাকার শব্দ করিতেছে।

এই অত্যাচার বিষয়ে নদীয়া জেলার কমিশনার তৎকালীন বাংলার সরকারকে যে পত্র দিয়েছিলেন (No 94, Dt. 19th, August 1856) তাতেও উল্লেখিত আছে : 'A full enquiry would, I can well believe, show that there are good grounds for the general unpopularity of the present system of growing Indigo. The repeal in 1835 of those parts of regulation of 1830, which held the instigator to break engagements equally liable with the ryots for the penalty of such breach and which made wilful neglect to sow and cultivate a misdemeanour on the part of the ryot who had agreed to do so, denoted I suppose nothing more than withdrawal of a protection to planters, which further consideration convinced the ligislature to be unjustifiable. No preamble being given to Act XVI of 1835, I can but conjecture that it was the result of such a conviction. It was not directed against the advance system which was left as it had been recognised by Regulation VI of 1823."[2] এই সকল কারণেই নীল আবাদের প্রতি প্রজাদের আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছিল। নীল

২ The Dacca News (7th August 1858)

কমিশনের রিপোর্টেও এ-বিষয়ের স্বীকৃতি আছে—'ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রজারা আমাদের জানাইয়াছে যে সাঁপগ্রস্ত হইলে মনুষ্যের যে প্রকার কষ্ট পাইতে হয় সেইপ্রকার জীবনাবধি নীলকর্ম তাহাদের পক্ষে তাহারা জ্ঞান করিয়াছে।" (দফা-১৩১) কিন্তু জমিদারদের সংগে নীলকরদের সম্পর্কের মধ্যে কমিশন অপ্রীতিকর কোন বিরূপতা দেখতে পাননি। এর পক্ষে আমরা নীল কমিশনের রিপোর্টের কয়েকটি 'দফা' উপস্থাপিত করছি:

দফা ৪০। জমিদারের সহিত নীলকরের ব্যবহারের কথা লিখিতে হইলে ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, নীলকরেরা ক্রমশঃ জমীদারী ও তালুকদারী ও পত্তনিদারী ও হরিএক মিয়াদের ইজারদারি স্বত্ব অধিকার করিয়াছেন—প্রায় সকল কুঠিতে প্রথমে বে-এলাকার রায়তদের দ্বারা চাষ হইত অর্থাৎ ভিন্ন জমিদারির প্রজাদিগকে দাদন দিয়া নীলের কর্ম আরম্ভ করিয়াছিল ইহাতে আমরা কোন আপত্তি এবং দোষ দেখিনা কারণ যে কোন প্রজা হোক্ তাহার সহিত আপন কর্মের জন্য চুক্তি ও বন্দোবস্ত করিতে অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় নীলকরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আইনে ও দেশের চলিত প্রথায় এমন কোন নিয়ম নাই যে, প্রজার সহিত চাষ আবাদ এবং অন্য প্রকার কর্মের চুক্তি করিতে হইলে তাহার জমীদারকে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় মধ্যবর্তি রাখিতে হইবে এবং জমিদারেরও এমন কোন স্বত্ব অথবা ক্ষমতা নাই যে প্রজারা স্বেচ্ছাধীন এবং যথার্থপক্ষে কোন এক লাভের কর্মে প্রবর্ত হইলে তাহারা অর্থাৎ জমীদারে তদ্বিষয়ে কোনপ্রকারে হস্তক্ষেপণ করিতে কিংবা লাভের ভাগী হইতে পারেন, সামন্যত যে পর্যন্ত জমিদার তাহার প্রজার নিকটে যথার্থ খাজনা পান সে পর্যন্ত প্রজারা তাহার জমিতে কি ফসলের চাষ করে তদ্বিষয়ে তিনি লক্ষ এবং হস্তক্ষেপণ করেন না এবং তাহা করা উচিত হয় না কিন্তু আমরা জানি যে সকল জমিতে অতিরিক্ত লাভের ফসল জন্মে তাহার খাজনা জমীদারের অন্য জমি হইতে অধিক করিয়া লইয়া থাকেন এবং প্রজারাও বিনা ওজরে তাহা আদায় করে।

দফা ৪৩। নীলকর ও অন্যান্য সাহেব ধনীদিগকে বাঙালী জমিদারেরা বাধা দেয় এবং তাহাদের কর্মের প্রতি হানি করে বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা যে সাক্ষ্য বাক্য পাইয়াছি তাহাতে স্পষ্ট

প্রকাশ হইতেছে যে কেবল টাকার বিষয় নিষ্পত্ত করিবার গোলযোগ ভিন্ন জমিদার ও নীলকরের মধ্যে আর কোন প্রকারের আপত্ত জন্মে না।

দফা ৫২। কেহ কেহ নীলকরদের বিরুদ্ধে এই কথা কহে যে চুক্তিপত্রের অছিলায় সাদা ইষ্টাম্প কাগজে প্রজাকে দিযা তাহাদের যে নাম দস্তখৎ করিয়া রাখেন পরে ঐ প্রজা কুঠির কোনপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ কবিলে তাহার দস্তখতী সাদা কাগজে কর্জা টাকার খত লিখিয়া আদালতে নালিশ করিয়া তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিযা ডিক্রী প্রাপ্ত হএন কিন্তু আমরা এই কথা বিশ্বাস করি না যেহেতুক নীলকরেরা কখনও আপন প্রজার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে না।

এ ছাড়াও নীলকরদের সংগে প্রজাদের সম্বন্ধ বিষযে সরকারের করণীয় ভূমিকা প্রসংগেও কমিশন যে মূল্যবান মতামত দিয়েছিলেন—তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য মূল্যবহ :

১. নীলকর ও জমিদারদিগকে বিনা বেতনে আপন এলাকার মধ্যে বেজিষ্টারী ক্ষমতা অর্পণ বিষয়।

২. ফৌজদারী মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়।

৩. পুলিশ সংক্রান্ত কর্ম এবং কর্মচারীদিগকে উৎকৃষ্ট কবা এবং যাহাতে প্রজার বিষয় রক্ষা হয তাহার বিষয়।

৪ দেওযানী আদালতেব কর্মের প্রথার বিষয়।

৫. ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিষয়।

৬. একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনার নিযুক্তি।

৭. চুক্তি ভঙ্গকরণ বিষয়ের আইন।

২

নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারে বাংলাদেশের সমগ্র কৃষকজীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত হযেছিল যে, তা শুধুমাত্র বিদ্রোহেব উত্তেজনাকর সত্যেমাত্র পর্যবসিত হয়ে থাকেনি—এই সামাজিক নিপীডনের ইতিহাস ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা পেয়েছিল। নীলচাষ ও নীলকরসংক্রান্ত একটি তথ্যসম্বলিত তালিকা আমরা সংযোজিত করলাম। এই গুরুত্বপূর্ণ নীলচাষের ক্ষেত্রে নীলকরদের অত্যাচার

সীমাতিচারী ছিল। হরকরা, সংবাদ প্রভাকর, হিন্দু প্যাট্রিয়ট্, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় এই অত্যাচারের নানা প্রসংগ বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্র কৃষককে বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা, ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা, নীলচাষের নির্মম চুক্তিপত্র, উদগ্র অর্থলোভে কৃষকদের জীবন বিপন্ন করেও নীলকরদের নীতিশূন্য ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা প্রজাকুলের গৃহজীবনের পবিত্রতাকেও বিপর্যস্ত করেছে।

নীলচাষের নির্মম চুক্তিপত্রের স্বরূপ বিষয়ে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (৭ই এপ্রিল, ১৮৬০) পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল:

'This is written by me Scheedam Doss, this deed of contract for growing Indigo whereas yourself and your brother—purchased in 1260 Sal the factory and you have since by partition and demarkation come into sole possession of the above factory and its outstangs ; and whereas on the adjustment of the account resting on my previous contract to grow Indigo for the above factory there appears a balance of rupees against me. In consideration of those two rupees, and two rupees more which I now take in advance, I engage to cultivate two bighas of land with Indigo plant for your above named factory, from 1262 to 1271 Sal, being a period of ten years ; I engage to deliver this produce annually at the factory, and according to former custom the price there of shall be calculated at the rate of nine bundle per rupee. The price of seed, cost conveyance, and whatever other means of cultivated I may receive from the factory, shall be deducted there from. Should any balance be against me, I will discharge it by growing Indigo in the ensuing year on as many beeghas as shall be covered by the amount thereof, at the rate of two rupees per beegha. Should be price of the plant cover the amount of the advance, I shall annually take an advance to the extent above mentioned

during the terms of this engagement. Should I make default in cultivating or selling the produce to anybody else, I shall be liable to damages to the extent of the value of the corresponding quality of wrought dye. To this effect I execute this deed according to the contract I have entered into'"

বল প্রয়োগ দ্বারা এই জাতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত যেমন করা হত, তেমনি বন্দী করে আলোবাতাসহীন গুদামে অনাহারে 'শ্যামচাঁদ' প্রযোগে মৃত্যুর সংখ্যাতীত পরিচয় মেলে। দাদন-দানের অভিশপ্ত প্রণালীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃতপ্রায় চাষী ব্যর্থ আর্তনাদের চেষ্টা করে মিথ্যা জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে—"the worship of the blue Mammon is yearly inaugurated with the ceremony of making advances. Most our readers who hear so much of the liberality of the factoryin making these advances and the rascality of ryot in not working it off have probably never witnessed it." মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অত্যাচারের ভাষারূপ দিয়েছেন: "এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষায় (ভূস্বামীদিগের) ভয়ানক, তাঁদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক যেমন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রে দৃষ্টি করিলে, সহসা তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহাদের উভয়কেই অসীমপ্রায় বোধ হয়। সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিযা পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর।" টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৯০৯) উপন্যাসেও এই অত্যাচার দর্শনে সহানুভূতির কথাকার হয়ে উঠেছেন: "যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিমারের লাঙ্গুল বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্যকার পরদাজের পেট অল্পে পুরে না।"

অনাথনাথ বসু প্রণীত শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীতেও পাই,—"নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকরদিগের অত্যাচারের মাত্রা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অতিরিক্ত। নীল উৎপাদন উপলক্ষে নরহত্যা, গোহত্যা, গৃহদাহ, সতীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কতো পাপকর্মই যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিকারের আশায় রাইয়তগণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলপ্রাপ্ত হইত না।" নীলকরদের প্রতি জেলা বিচারকদের পক্ষপাতিত্বের পরিচয়ও মেলে। ইণ্ডিগো কমিশনের সাক্ষীর বিবৃতি প্রসংগে স্যার আস্‌লি ইডেনের বিবৃতিতে এই সত্যের অকপট প্রকাশঃ I consider that it has frequently been the case that the government officials have sacrificed justice to favour the planters. I will go further and say that, as a young Assistant, I confess, I have favoured my own countrymen in several instances." 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রে নীলকর ও নীলকরপক্ষীয়দের তীব্র কটাক্ষে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে।

নীলকরদের অত্যাচারের আর একটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। য়ুরোপীয় রাজকর্মচারীরা মফঃস্বলে অবস্থানকালে কুঠিয়াল সাহেবদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতো। দেশীয় পুলিশ কিংবা সমাজ-সংরক্ষণ শক্তি তাঁদের অসামাজিক দুষ্কর্মের প্রতিবিরোধ করতে গেলেই নানাভাবে তাঁদের অত্যাচারিত হতে হত। 'হিন্দুপ্যাট্রিয়টে' এই জাতীয় একটি অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ 'সিরাজগঞ্জ মহকুমার চালা কুঠির কুঠিয়াল কর্কবার্ণ সাহেব গাবগাছি গ্রামের এক অংশের মালিক। সে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নীল চাষ করিতে আদেশ দেয়। তাহারা ইহা করিতে অস্বীকার করায় কর্কবার্ণ একদিন শতাধিক লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল·········লাঠিয়ালরা প্রজাদের ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়া প্রায় একশত হালের গরু লইয়া চলিয়া গেল। আদালতে বিচার হইল। বিচারে তিনজন লাঠিয়ালের কঠোর শাস্তি হইল বটে, কিন্তু প্রধান আসামী কর্কবার্ণের নামটির উচ্চারিত হইল না।"[৩] নীলচাষীদের পক্ষে যারাই নেতৃত্ব করতো—তাদের নিপীড়িত করে এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে চালান করা হত। "প্রায় পঞ্চাশ

৩ যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' পুস্তিকায় প্রসংগটির উল্লেখ আছে।

জনের লোকের এরকম চিরতরে নিখোঁজ হইয়া যাওয়ার কথা পরে সরকারী হিসাব হইতেই জানা যায়।"

নীলকর সমাজের এই অসহ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন জনগণতন্ত্রের সমস্ত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে'ছিল। কিন্তু পঞ্চম দশকের শেষদিকে আর্থিক অবক্ষয়ের দ্রুততায় নীলের দর ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়তে লাগল। খাদ্য সামগ্রীর মূল্যমান দ্রুত বর্ধিত হতে লাগল। সুদ-সেলামী দিয়েও দরিদ্র প্রজারা এতোকাল যা সামান্য অর্থ পেয়ে আস'ছিল তাও বন্ধ হল। আর্থিক সংকট ও স্বৈরাচারী শক্তির দমননীতির মধ্যে পিষ্ট হয়ে সাধারণ প্রজাকুলের নাভিশ্বাস উঠল। অত্যাচারের এই গভীরতার ব্যাপ্তির ফলেই বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মের বুদ্ধিজীবী চিন্তানায়কেরা অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। প্রকৃতপক্ষে বহু ইংরেজ রাজপুরুষ উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মচারী ও জমিদারদের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন— ইংরেজ মিশনারীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁদের সোচ্চার প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। রেভারেণ্ড জি. সি. কুথবার্ট কৃষ্ণনগর ফ্যাক্টরীতে বাসকালীন নীলচাষবিষয়ক অভিজ্ঞতার সূত্রে বলেছেন: "that the system is a forced system, and is stained with oppression and cruelty." রাজশক্তি এই মিশনারীদের অনুকূল প্রীতির চক্ষে কখনই দেখেননি। 'ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টে' এই মিশনারীদের ভূমিকা প্রসংগে ১২০ দফায় ব্যক্ত হয়েছে:

"We have come to the last point of our inquiry under the first great head, viz the conduct of the missionaries and the crisis of the past season. A great deal of indignation has been evinced at Reverend gentlemen, whose errand is to proclaim peace and good will, taking on themselves the character of political agitations; certainly, if to express dislike of what they deem oppression, when forced on their notice, and to stand up for the rights of those who have had no tongue to plead for them, be to carry on agitation, the Missionaries of the church Missionary Society have done this. But in doing so they had no political object to gain except the contentment and will-being

of the agricultural population." অপরপক্ষে ইংরেজ মিশনারীদের নীলচাষ ও নীলকরসংক্রান্ত দৃষ্টিভংগীর ব্যাপক পরিচয়ও আমরা পাই। ১৮৫৫ সালে অনুষ্ঠিত 'Calcutta Missionary Conference' এর-'মিনিটে' দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের এ-বিষয়ক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়:

Minutes of the Calcutta Missionary Conference 1855

In the Select Committee on colonisation and the Settlement of Europeans in India, that unhappy controversy between Indigo Planters and the Calcutta Missionary Conference has been rescued from oblivion where, it had been hoped, it was eternally buried. The papers and letters of the clergymen, who took a prominent part in it, have been brought forward to lower the Planters in the estimation of the British Public, and to prove that granting facilities which might lead to an augmentation of the member of such settlers would obstruct the executive authorities in the administration of laws, retain the general prosperity of the country, and injure the condition of the labouring poor. These charges are of grave character, and if based on irrefagable evidence, must consign a community, consisting of several thousand individuals to ignominy and shame............

.........Indigo Planters are neither of the lowest nor highest grade of society, though a few, as in other communities, may have been lifted by Providence from circumstances of poverty, and now and then a titled person be found among them, they generally belong to the middle class, which sends forth their countrymen of the medical, legal and clerical profession, the civil, naval and military services.

.........In the diversified walks of business, piety of an exalted character has been exhibited that has exerted a power on the world, the effects of which will be felt through the present and a future life, while but few philanthropists have issued from courts and palaces. Admitting however, that the planters are governed by self-interest, the question then arises, is it peculiar to them ? Or when regulated by justice is it the evil thing it has been represented ? ....Before condemning the Planters, on equitable and dispassionate person will inquire whether they violate the principles of justice, he will thoroughly make himself acquainted with the subject, that he may duly weigh the respective statement of the contending parties, and taste their accuracy, uninfluenced by frothy declamation, he will strive to elicit facts and on them ground his honest judgment.

It is said that the cultivation of Indigo is forced and though not expressly stated, it is left to be inferred that the plant is an exotic, and has been introduced by British Settlers to the great detriment of the country.

If by forced cultivation be meant the crop is unremuneratory, how is it that natives, not the tenants of planters, and in no way connected with them, grow Indigo on their own account, and bring it to the factory for sale ? Would they do this if it were a positive loss or less profitable than other produce ? How is it that, when they purchase estates, they offer as much per beegha for indigo as rice-lands ? If they be not blind to their pecuniary interests, a fault with which few persons will charge them, these transactions, which are taking

place everyday, must be formed by actual experience to give a reasonable return for the capital invested.······ ···

We may here remark, that respecting the quantity of land appropriated to Indigo much error is abroad from the statement of some individuals who have written on the subject, one might be led to infer that this product monopolises the greater part of the country, and that the ryots are precluded from growing any other crops···for a confirmation of the truth of this statement reference may be made to the estate of Nischindapore, in Nuddea, which will prove that the figures which have been given are substantially correct :—

Villages on the estate··· ···467

Population	2, 88, 000 souls.	
Area	9, 51, 775 beegahs	
Fallow and waste land, with area of woods, gardens, houses, roads and pools.	2, 20, 000 „	
Under Cultivation	7,31,775 „	
Appropriated to Indigo, and cultivated by ryots	55, 000	
Appropriated to Indigo, and cultivated by the factory laborers.	12, 000	67, 000
Appropriated to other crops	6, 64, 775 beegahs	

(Calcutta Englishman, 24th Jan. 1860)

কুঠির ভিতরেও র'ইয়তদের যে অত্যাচার করা হত, তারই বর্ণনা করে পাদ্রী লঙ্‌ 'হরকরা' পত্রিকায় লেখেন :

"The Daily press here being all on the side of the Indigo planting interest, announce that peace and order are prevailing

now in the Indigo districts, with few exceptions..........A 'reign of terror' exists in certain districts—factory go-downs had they ears, could tell sad accounts of the sufferings of ryots." দেশীয় দুর্নীতিপরায়ণ গোমস্তা ও আমীনেরা তাদের দুর্নীতি দ্বারা রাইয়ত ও নীলকরদের ঠকিয়ে অর্থবান হয়ে উঠেছিল। তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ বিচারপতিদের বিচার বা পুলিশের কর্তব্য কর্মের মধ্যেও নিষ্ক্রিয়তা ছিল।[8] বিচারের ক্ষেত্রে বেথুনসাহেব তথাকথিত 'সাদাকালো'র পার্থক্য দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান —যেমন 'বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স', 'নীলকর সংঘ' ও নানা ইংরেজ প্রতিষ্ঠান বিলটিকে 'Black Act' বা 'কালা আইনরূপে' চিহ্নিত করেছিলেন। বাঙালীর রাষ্ট্রীয় শক্তিতে উদ্বুদ্ধ প্রথম সংঘবদ্ধ চেতনা বহু বিরোধিতা করেও বিলটিকে আইনে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়নি। বিচার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য-জনিত বৈষম্য নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়াজেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বাংলা সরকারের সেক্রেটারী বীডনকে এ-বিষয়ে আলোকসম্পাত করে জানিয়েছিলেন: "আমি এইমাত্র সোজা প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করি যে চাষীরা স্বেচ্ছায় নীলচাষ করতে রাজী কিনা এবং উত্তরে আমি যা জেনেছি তা হচ্ছে প্রতিকারহীন অত্যাচারের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।"

রাজা রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীলচাষকে সমর্থন করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে রামমোহন এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন যে, নীলচাষীরা অন্যান্য চাষীর তুলনায় অধিক বিত্তবান। রামমোহন রায়ের এই

---

8 "As regards the conduct of the police, it is not denied that up to this time, as a body, they are liable to the charge of venality and corruption and there can be no question that Indigo, like every agricultural or mercantile persuit, may suffer from the want of a really good police.

At the same time we observe that the police do not interfere, and are not authorised to interfere, in ordinary transactions between Planter and Ryot."—Indigo Commission Report No, 112.

মনোভাব প্রসংগে 'Indian Field' (Feb. 1860) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল,—"The great authority brought forward to confute charges against the Planting system is Rammohan Ray, who declared in the time of Lord W. Bentinck that he had lately taken tour through Bengal, and did not notice that the ryots in Indigo districts were worse off than the rest of the people. He even thought them better clothed than the generally of the natives. But what did Rammohun Roy know of the matter on a question of unitarian doctrine, we do not doubt that he was a great authority, but he never was in a position to speak with authority as to the condition of the people in Indigo districts; he made a hurried tour through several districts in Bengal and his remarks are no more entitled to respect in the face of the most contrary evidence, then the letters to the times of that most ridiculous imposture, Wingrove Cook, on the same subject. Moreover Rammohun's evidence was given thirty years ago, whereas we speak only of condition that the people in the present time. This constant assertain that the people in the Indigo district are better off than in those Rice districts, and the usual deduction therefrom that Indigo cultivation is beneficial to the people, is one of the most fallacious arguments that have even been put forward in defence of the planters, it is the result of the most extra-ordinary confusion of cause and effect, the fact is that the Planters are in these districts because they are rich, not that the districts are rich because of the Planters."

সমকালে নীলবিদ্রোহের প্রধান সমর্থক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাইয়তদের বিদ্রোহ ও লুণ্ঠনের অনেক উদাহরণ তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাহী, বারাসত, যশোহর প্রভৃতি নানাস্থানে কৃষক

বিদ্রোহ কিরূপ সর্বাত্মক অগ্নিময় রূপ ধারণ করেছিল—হরিশ্চন্দ্র তারও বিস্তৃত নিদর্শন চিত্রিত করেছেন। ক্রস নর্টনের 'Rebellion in India' নামক পুস্তকে হরিশ্চন্দ্র ও হিন্দুপ্যাট্রিয়টের সামাজিক ভূমিকা প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছিল: "Let the sceptical study the leading articles in the Hindu Patriot written by a Brahmin with a spirit, a degree of reflection and acuteness which would do honour to any journalism in the world." জীবনের পূর্ণমূল্য প্রতিষ্ঠায় সম্প্রসারিত জাতীয়তাবোধকেই নীল-আন্দোলনের মধ্যে আমরা সক্রিয় দেখেছি—এই অন্তর্নিহিত সমাজশক্তি ও জাতীয়তাবোধকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রগতিবাদী দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়ে রাষ্ট্রীয়শক্তির উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন: 'Bengal might well be proud of its peasantry. In no other country in the world is to be found in the tillers of the soil the virtues which the ryots of Bengal have so prominently displayed ever since the Indigo agitation has begun. Wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country……A revolution will have been effected in their social condition, the beneficial effects of which will reach all the country's institutions." স্বাধিকার অর্জন ও আত্মমর্যাদাকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নীল আন্দোলনরূপ বৃহত্তর জাতীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। সিপাহীবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে উত্তেজনাময় যে নবশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল—সেই নবশক্তির আকাঙ্ক্ষা নীলবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জাতীয়-জীবনে নবপ্রবুদ্ধ উদ্দীপনার সঞ্চার করল। এই গণবিদ্রোহ প্রকৃত দেশপ্রীতির মধ্য দিয়ে জাতির জীবনের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল—জীবন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমগ্রতার সংগে এই বিদ্রোহের চরিত্ররূপ সম্পৃক্ত হয়েছিল। ইংরেজ শাসকশ্রেণী ও নীলকরদের শোষণনীতির বিরুদ্ধে মধ্য বত্ত ও চাষীসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতার নেতৃত্বও সমাজ-সমীক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। নদীয়ার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস, মালদহের রফিক

মণ্ডল ও পাবনার মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির শৌর্য ও বীরত্বের ইতিহাস কিংবদন্তীর মতোই চতুর্দিক ব্যাপ্ত করেছিল। এরই বর্ণনাশ্রয়ী কাহিনী ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' 'A story of Patriotism in Bengal' নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন,—'It was the Indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation, শিশিরকুমার ঘোষের সহোদরা সৌদামিনী 'অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার' নামীয় পুস্তিকায় নীলবিদ্রোহের সংগে শিশিরকুমারের সংশ্রব প্রসংগে মন্তব্য করেছেন,—"প্রজাদিগের দুঃখের বিষয় যাহাতে গভর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয়, সে-বিষয়ে সেজদাদা সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার নিজের নাম না দিয়া ছদ্মনাম মন্মথলাল বলিয়া আপন নাম দিতেন। তাঁহার এ উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই। প্রজাদিগের দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট অবগত হইয়া নীলদিগের শাসন করিয়াছিলেন।" ১৮৬০-এর ২৬শে মে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত শিশিরকুমার ঘোষের একটি পত্র থেকে তৎকালীন সমাজ-পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত হওয়া যায়ঃ

"যশোহরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য মিঃ স্কিনার থানা কালোপোলে এলেন। চৌকিদারদের মারফৎ ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি প্রজাদের অভিযোগ দূর করতে এসেছেন। শুনে আট-দশ হাজার রায়ৎ ছুটে এলো। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাদের নীলের চাষ করতেই উপদেশ দিলেন, তারা বড়ই নিরাশ হল। তবু তারা সমস্বরে নিবেদন করল যে, তারা আর নীলচাষ করবে না। হুসেন শা বাদশার আমলে সেই যে তারা দু'টাকা করে নিয়েছিল, প্রতি বছর তার কুড়িগুণ করে দিয়েও তা আজও শোধ হয়নি। কারখানার জন্য তাদের গাছ কেটে নিয়েছে, বাছুর কেড়ে নিয়েছে, এমন কি তাদের ঘরের মুরগীর ডিমগুলিও সাহেবদের খাবার টেবিলে শোভা পেয়েছে।

মিঃ স্কিনার বললেন: 'তোমরা সরকারকে মান?' তারা বললে—'মানি'। 'তাহলে তোমরা সরকারের জন্য নীলচাষ কর' বললেন স্কিনার। ওরা বলল,—'ও আমাদের ইচ্ছাধীন। আমরা নীলচাষ করবো না।' মিঃ স্কিনার এই সাফ জবাবে কিছু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি দারোগার দিকে তাকালেন; দারোগা

হচ্ছে বাবু প্রসন্ন রায়; প্রসন্ন স্মিনারের কানে কানে কি বলল। তারপর নিজেই প্রত্যেক গ্রাম থেকে একজন মণ্ডল বেছে নিয়ে রায়তদের উদ্দেশ্যে বলল, —"ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে অল্প লোকের কথা বলাই ভালো। এই বলে ৪৯ জন মণ্ডলকে, ১০/১২ জন চৌকিদার আর ৬ জন বরকন্দাজের প্রহরায় থানায় আনা হল। তারপর তাদের উদ্দেশ্যে এমন সব হুমকী চলল, যার বর্ণনা দিতেও লজ্জা লাগে। ...প্রসন্ন দারোগার তক্ষুণি পদোন্নতি হল।"

এই সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনে পাবনা অঞ্চলে নেতৃত্ব করেছিলেন মহেশ-বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ রীড সরকারী রিপোর্টে মহেশচন্দ্র প্রসংগে মন্তব্য করেছিলেন :"...The magistrate of the district reports that there is a very strong combination amongst Ryots to break off their connection with indigo, and that one Mohesh Chandra Bandopadhyay, an inhabitant of Naddea district, is the prime mover in it."

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের কৃষাণ নায়ক রফিক মণ্ডলের নেতৃত্বে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আন্দোলনের যে স্বতস্ফূর্ত রূপ দেখা গিয়েছিল—সে প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে ১৮৬০ সালের ৮ই ডিসেম্বরের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায়। নীল-আন্দোলনে রফিক মণ্ডলের অবদান 'A landmark in the history of nationalism' রূপে স্বীকৃত হয়েছে। পাদ্রী লঙের বিস্তৃত জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে আমরা নীল-বিদ্রোহের বিস্তারের সংগে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভূমিকা ও ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা ও মননের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় স্থিতিবাদী দিকটিকেই প্রধানরূপে লক্ষ্য করি। রেভারেণ্ড লঙ্ এ-বিষয়ে বলেছিলেন-"এ-কথা আমি ভাল করেই জানি যে, গেল ১৬ বছর ধরে, নেটিভদের এসব সংবাদপত্রে নীলচাষ অবিরাম আক্রমণের বিষয় হয়ে আসছে। এসব সংবাদপত্রের মতামত জনসাধারণের মধ্যে নেমে আসছে। এমন সব পথে নেটিভদের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যার খবর ইউরোপীয়রা সামান্যই রাখে।......উদাহরণস্বরূপ আমি ১৮৬০ ২১ শে মে তারিখের 'সোমপ্রকাশ' থেকে 'নীলকরদের ধর্মবুদ্ধি' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধের অনুবাদ দাখিল করছি ......আর যে সব পত্রিকা দাখিল করছি, তাতে যে সব মতামত ব্যক্ত হয়েছে,

সেগুলো আমার মত না হলেও মাত্র নেটিভ মতামতের অভিব্যক্তি হিসেবে এগুলি উপস্থিত করছি।······নেটিভ জনমত নির্ণয়ের আর একটি সূত্র হলো লোকসংগীত। বাঙালীদের মনে সংগীতের প্রভাব খুব বেশী।" এই জাতীয়তাবাদী বাঙালী-মনন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় নীলকরবিরোধী অনেক সংগীত রচনা করেছিল—যা তাঁদের মানস চিন্তার মুক্তির বাহন :

১. "রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তিওট

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন॥
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল আগুনে,
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজেব বলে,
লুঠেছ সকল তো হে, কি আর আছে এখন॥
দীনজনে দুঃখ দিতে কাহার না লাগে চিতে
কেবল নীলের হেবি পাষাণ সমান মন॥
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।
বৃটন স্বভাবে শেষে কালি দিলে বঙ্গে এসে,

২. রাগ-সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

নীলদর্পণে লঙ্ সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে।
কারো·· কাব তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে॥
ঈডন্, গ্র্যাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান উংয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পড়ে কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নড়ে চড়ে পোড়ার মুখ দেখাইতেছে॥
বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্স অবিচার করে,
নির্দোষী লংকে ধরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে॥

৩. নীল বানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার॥"

ইংরেজদের নতুন কৃষিবিদ্যা এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতিও এই বিদ্রোহের পশ্চাৎপটে কার্যকর ছিল। শোষণ ও অত্যাচারের তীব্রতা সমাজ-দেহকে কাঁপিয়ে বিদ্রোহের ভাষায় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রাঢ়ের কোল অসন্তোষ, ফরিদপুরের ফারজি আন্দোলন এই প্রসংগে স্মরণীয়।

নীল-আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি

১৭৭৯ সালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যক্তিগতভাবে যখন সকলকে নীল-চাষের অনুমতি দিয়েছিল—তখন থেকেই এই লাভজনক ব্যবসায়ের অর্থ নৈতিক দিকের প্রতি বহু শেতাঙ্গ বণিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার একটি প্রবন্ধে এইদিকে আলোকপাত করে বলেছিলেন,—"The object of the planters was to secure the maximum profit at the minimum or no cost. He wanted the Indigo Plant without paying nearly the cost of its production to the raiyat and at a nominal price which even if fully paid, would be ruinously unprofitable." এই নীলচাষ ছিল দ্বিবিধ– নিজ আবাদী ও রায়তী-আবাদী। নিজ-আবাদীতে ক্ষেত-মজুরের প্রয়োজন হত।[৫] নিজ-আবাদের সমস্ত খরচাদি নিজেকেই বহন করতে হত বলে নীলকরেরা এর বিরুদ্ধ মনোভাবই পোষণ করতো। তাই নিজ-আবাদী চাষের চেয়ে রায়তী-আবাদী পরিমাণ ছিল স্বভাবতই অধিক। এই অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিকটি ব্যাখ্যা করেই জে. পি. গ্র্যাণ্ট তাঁর 'মিনিটে' উল্লেখ করেছিলেন: "In the paragraph 72 of their report the commission speak of the economical import-

৫ শুধুমাত্র নীল উৎপাদক জমি ও অন্যবিধ শস্যের সংগে উৎপাদিত নীলের উৎপাদনবিষয়ক একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যনির্ভর বিবরণীও সংযোজিত হল।

ance of the Bengal Indigo-trade, and of the great political advantage of having a large body of European gentlemen scattered over the country...and no one feels their great importance more strongly than I do." এ দেশ থেকে যে সকল দ্রব্য রপ্তানী হয়—তন্মধ্যে বিলেতে এবং অন্যান্য দেশে নীল বহুমূল্যে বিক্রয় হয়। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই নীল কমিশন নীল চাষ বিষয়ক অর্থনৈতিক দিক বিষয়ে যা ভেবেছেন-তা আমরা উদ্ধৃত করছি :

১. "The annual outturn of this dye on this side of India, for season, averages 1,05,000 maunds, and the value of this would be nearly two crores of rupees, or two millions sterling." (Paragraph 73)

২. "It is clear that even independent of all other political or social considerations, the loss or diminution of an export of such extent and value would be severly felt both in India and England." (Paragraph 74)

ইংলণ্ডে ও বিদেশে নীল অত্যন্ত মূল্যবান রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিলেতে নীলের বাজার দর, আমদানী, রপ্তানী ইত্যাদি বিষয়ক একটি পূর্ণ তালিকা আমরা 'Calcutta Review (জানুয়ারী-জুন ১৮৬০) পত্রিকার ৩৪ সংখ্যক ভল্যুম থেকে উদ্ধৃত করে সংযোজিত করছি। এ থেকে নীলচাষের অর্থনৈতিক দিকটির গুরুত্ব প্রমাণিত হবে। ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্টের ১০ নং প্যারাগ্রাফে জমিওয়ারী উৎপাদিত নীলের একটি হিসেব পাওয়া যায়—১ বিঘা জমিতে ১০ বাণ্ডিল নীলগাছ হত, ১০ বাণ্ডিল গাছ থেকে ২ সের নীল রং প্রস্তুত হত এবং ঐ ২ সের নীলের দাম ছিল ১০ টাকা অর্থাৎ মণপ্রতি ২০০ টাকা—চাষী এই উৎপাদনের জন্যে ২ টাকা ৮ আনার বেশী পেতো না। নীলকরদের উচ্চহারে লাভের প্রসংগ বিষয়ে প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীসমাজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,—"সমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' (২৪শে জুলাই, ১৮৫৮) নামক একটি ভারতীয় পত্রিকায় যে হিসাব বার হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে নীলকর যে পরিমাণ নীল গাছের জন্য চাষীদের ২০০৲ দিচ্ছে, সেই গাছ থেকে সে ১,৯৫০ টাকার নীল রং

পাচ্ছে। যদি রং প্রস্তুত করতে ২০০ টাকা খরচ ধরা হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, নীলকর মাত্র ৪০০ টাকা খরচ করে লাভ করছে ১,৭৫০ টাকা। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের লাভটা এইরকম অত্যধিক উচ্চ হারেই হত।" (পৃ. ৪৭)।

নীলকরেরা এমনিভাবেই নিম্নতম খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা করতো। স্বাধীনভাবে রায়ত নিজের জমিতে অন্য ফসল উৎপাদন করতে পারলে যা লাভ করতে পারতো—বাধ্যতামূলকভাবে নীলচাষের দরুণ সেখানে রায়তদের কোন লাভই থাকতো না। ফৌজদারী আদালতের নথীপত্রগুলি থেকে এই বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক চাপের দিকটি প্রমাণিত হয়। যে মুহূর্তে বোঝা গিয়েছিল যে, রাইয়তেরা আইনত ও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ব্যক্তি—সেই মুহূর্তেই অর্থনৈতিক অতিচাপের বেষ্টনী ভঙ্গ করার দিকে তাঁরা ঝুঁকেছিল। 'Indigo Plarters' Association'-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই জাতীয় দুটি মিটিংয়ের proceedings আমরা উদ্ধৃত করছি:"[৬]

"Proceedings of a meeting of the central commitee of the 'Indigo planters' Association, held at the Rooms of Assocition this 13th July 1858

Mr. Geo brown in the chair.

The Acting Secretary laid before the meeting the following letters on the subject of the necessity, felt by all the Planters to be existing in Mufussil, of some enactment to protect planters in their dealings with Ryots in respect of advances made to the latter.

Dated, Nuddea, the 5th June 1858
from F. R. Cockerell, Esq
Magistrate of Nuddea

To Jas. Forlong, Esq
Dear sir,

I am directed by the Commissioner to forward the accompanying extract of letter addressed by him to the government

৬ The Dacca News (৭ই আগষ্ট, ১৮৫৮) থেকে সংকলিত

of Bengal, on the subject of growing Indigo, the relations between the Planter and the ryots to take advances, and the present state of the law with reference hereto, and to request your opinion on this subject for communication to that officer and the government as early as may be convenient.

I am, dear sir, yours faithfully,
(signed) F. R. cockerell
Magistrate

অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, রায়তেরা নীলগাছের বিনিময়ে যে নামমাত্র মূল্য পেতো—আমলারা তাতে ভাগ বসাতো এবং সেই সামান্যতম অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অসদুপায় এমনভাবে অবলম্বিত হত যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রায়তের ভাগ্যে শূন্য প্রাপ্তি ঘটাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মস্ফীতিকরণে নীলকরেরা অন্যান্য ফসলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও নীলগাছের মূল্যবৃদ্ধি করেনি। বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁর 'Bengal under the Lt. Governors' vol. I গ্রন্থে এই বিষয়ে যা মন্তব্য করেছিলেন—তার মর্মার্থ হল: "যেহেতু এই একটিমাত্র দ্রব্যের কোনপ্রকার মূল্যবৃদ্ধি হয়নি, এইটেই হচ্ছে সব থেকে বড় কারণ যা রায়তের কাছে নীলচাষের অপকারিতাগুলিকে দ্বিগুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। চাষীর টাকার ক্ষতিটা ডবল হল ও অন্যান্য ক্ষতিগুলিও একই হারে বেড়ে গেল।" এদিকে নীলকরদের ক্ষেত্রে নীল ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। নীল ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক গুরুত্বের আরও পরিচয় পাই তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় গভর্ণর জেনারেল চার্লস থিয়োফিলাস মেটকাফের সমীপে প্রেরিত কলকাতার নীল বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিবেদন:

'That your Memorialists deeply interested in the Cultivation of Indigo, venture most earnestly to represent to your Honour in Council the alarm and distress with which they regard the proposal for rescinding sections 2 and 3 of the Regulation V of 1830 at the first meeting of the Legislative council in August next.

Your Honour is fully aware of the importance of Indigo

trade to the present prosperity of India, and of the immense extent of land and Capital to which it affords employments."[৭]

নদীয়ার মীরজান মণ্ডল নামে এক কৃষক নীলকরদের মধ্যে নীলকর, জমিদার ও মহাজনের মিলিত সত্তা বা প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। ঔপনিবেশিকতার প্রতিভূ এই নীলকরেরা ছিল আবার শাসক শ্রেণীও। নীলচাষের অর্থনৈতিক বনিয়াদ তাই প্রজাগণতন্ত্রী প্যাটার্ণে রচিত হতে পারেনি।

যুগন্ধর নাটক 'নীলদর্পণ'

রাষ্ট্রীয় ক্রমোন্মুখচেতনার সংগে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি সংমিশ্রিত করে দীনবন্ধু জাতীয়তার সুরে জীবনানুভাবনাকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। এই বিশিষ্ট গুণধর্মই 'নীলদর্পণ' নাটকের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। 'ইংলিশ ম্যান' কাগজ (১৯০১) Literary Bengal কলমে লিখেছিলেন,—'On the Bengalee dramatists the only one well-known to European Readers is Dinobandhu Mitra........ He wrote 'Nil-Darpan' regarding the political effects of which Mr. Buckland gives so interesting a narrative in his book about the Lieuant governors of Bengal." সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের কাছে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে দীনবন্ধুর সংগেও বাংলা ও বাঙালীর বিশাল প্রাণ-মনের সংযোগ সাধিত হয়েছিল। নীলদর্পণ নাটকের মধ্যেও সেই গভীর জীবনমন্থনজাত লৌকিকচেতনা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভংগী, গণজীবনের বাস্তবমুখীন যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। আর সমস্ত সত্যচিত্রের চিত্রণে বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ, বস্তুসচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও হিতবাদী সত্যানুসন্ধিৎসার আগ্রহ মিশ্রিত হয়েছে। হিন্দু কলেজে একদা গৃহীত এই পাঠ তিনি সমাজাভিজ্ঞতার বাস্তব পাঠের সংগে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। অশ্রুমথিত জীবনযন্ত্রণার ও নিপীড়িত লাঞ্ছনার অসংগতিকে মর্মস্পর্শী শিল্পরূপ দিলেন তিনি সুতীক্ষ্ণ সহানুভূতি-সংযোগে।

---

৭ Indigo Commission Report—Appendix No 13

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ক্ল্যাসিক মূল্যায়ন এ প্রসংগেও স্মরণযোগ্য : 'কেবল সামাজিক অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নয়, তাঁর সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।......তাহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব দুঃখীর সংগে নহে, ইহা সর্বব্যাপী। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল।" দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করে জাতিকে সুষ্ঠু কর্মপথের নির্দেশনা দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করেছিল। গণ-অনুভূতিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই 'নীলদর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচার, নির্মম শাসন ও শোষণের নারকীয়তা থেকে ক্ষুধা ও মুক্তির আবেগের মধ্যে মানব-উদ্ধারের পালা রচনাই দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। নীল আন্দোলনের জাতীয় বিপ্লবাত্মক পশ্চাৎপটের অন্তরালে তিনি জাতীয় সংহতি ও অভ্যুত্থানের প্রশ্নটিকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বশ্রেণীর বাঙালী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও বিপর্যয়কে বাস্তব ঘনিষ্ঠ রূপ তিনি দিয়েছেন। সমস্ত তথ্যের সত্যবিচার ইতিহাসানুমোদিত পথেই সম্পন্ন হয়েছে। এই ইতিহাসচেতনাই তাঁর দৃষ্টিভংগীতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে অধিকতর সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। নীলদর্পণের জাতীয়তাবাদের আবেগ তাই সংগঠন-পন্থী—দীনবন্ধুর সত্তাতেও স্বাদেশিকতার এই স্বরূপটিই বিকশিত। নীলকর-অত্যাচারের সমাপ্তিঘোষণার শপথ নাটকের ভূমিকাতেই পরিব্যক্ত,—"নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন-পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন-ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য।" সমগ্র ভূমিকা-টি যুগধর্মের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। নীলদর্পণ নাটকের সাবিত্রী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাহেব-স্তুতি প্রচারিত হয়েছে—এ বক্তব্য ব্যঙ্গ-বিদ্ধ উগ্র প্রচারণা কিংবা নির্জলা রাজতোষামোদের কোনটাই নয়—এ আকৃতি হৃদয়বানের প্রতিকার-প্রার্থনা ; 'বড় ইংরেজের' হৃদয়ের কাছে প্রতিকারের প্রতিবেদনস্বরূপ। এই জাতীয় মানবতাবাদী বড় ইংরেজ জে. পি. গ্র্যাণ্ট—নীলকর-অত্যাচারের বিরোধিতা করে যিনি বাঙালীসমাজেও অক্ষয়

শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন, 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি অংশে তারও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে :

১. তোরাপ—"ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে? তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচিয়ে রাকে, মোরা প্যাটের ভাত কর্‌য্যি খাতি পারবো, আর সুমুন্দির নীল মাম্‌দো ঘাড়ে চাপতি পারবে না।"

ইতিপূর্বে হরিশ্চন্দ্র অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাগরণ ও সমাজ-বিপ্লবকে যে উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সংবাদপত্রে গণ-অভ্যুত্থানের যে মহোচ্চ ভূমিকা বিনির্মাণ করেছিলেন—সেই পন্থারই নাটকীয় শিল্পরূপ দিলেন দীনবন্ধু মিত্র। নাট্যকার পরিচয় গোপন করে নেপথ্যে থেকে নিপীড়িত জনগণের সংগে রাজশক্তির শক্তিলোলুপ ও অর্থগৃধ্নু স্পর্ধার কাম্য সংঘাতকেই তিনি চিত্রিত করেছেন। আইনের মান রক্ষা করে রাজরোষ থেকে মুক্ত হলেও বিবেকযন্ত্রণা থেকে যে মুক্ত হননি—পাদ্রী লঙের বিচার-কালীন দীনবন্ধুর আচরণ থেকে প্রমাণিত হয়—'he was present in Court and ready to exchage places with Mr. Long if that had been possible.'

পুঁজিবাদী ইংরেজশক্তির নির্লজ্জ লোভ-লোলুপতা অবক্ষয়িত কৃষকশ্রেণী-রূপের জীবনকে কোন্ পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তার বিশ্বস্ত করুণ কথাচিত্র এঁকেছেন দীনবন্ধু এই নাটকে। নীল কমিশনের সামনে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, অথবা পত্র বা প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন—নীলদর্পণ নাট্যচিত্রের অনেক বর্ণনার সংগে তার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নদীয়া জেলার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাই নাটকটির আখ্যান-অংশের ভিত্তিভূমি। জমিদারেরা জমি পত্তনি দিতে বাধ্য হলে গ্রামের যে সর্ববিধ্বংসী রূপ হতো—তার করুণ প্রতিফলন নীলদর্পণ নাটকের সাধুচরণ ও গোলকের পারস্পরিক বিষাদপূর্ণ আলোচনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। এই জাতীয় চিত্র কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"গোলক। যাওয়ার আর বাকী কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাষ দিয়াছে তাহাতে এবার নীল করবে, তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হল।

আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্বের মাঠের ধানী জমি কয়খানায় নীল না বুনি তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

... ...

সাধু। সেদিন সাহেব বল্লে, 'যদি তুমি আমীন খালাসীর কথা না শোন, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।

... ...

গোলক। ......দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারে কি কিছু ভাবনা থাকতো। তাই যদি নীলের দামগুণো চুকুয়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়!

নবীন। আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম। আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার পূজার সময় কি সমারোহ..... আমি কতো অর্থব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় একশত টাকা দান করিয়াছি,! আহা! এমন ঐশ্বর্যশালী হইযা এখন আমি স্ত্রী, ভাদ্রবধুর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা!"

বাস্তব ক্ষেত্রে আমীনেরা কি জাতীয় অত্যাচার করতো—তার একটি চিত্রচয়ন করছি মূল নাটক থেকে :

"রাই। মুই বলবো কি, জমিতি দাগ্ মারতি লাগল, মোর বুঝি য্যান্ বিদে কাটি পুড়য়ে দিতি লাগল। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শুনলে না।......মুই ফোজদুরী করবো বল্যে সেঁসয়ে এইচি। (আমীনকে দূরে দেখিয়া) ঐ হ্যাখ শালা আসচে, প্যায়দা সংগে কর্যে এনেছে, কুটি ধর্যে নিয়ে যাবে। (আমীন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ)

আমিন। বাঁদ রে শালাকে বাঁদ। (পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণকে বন্ধন)

রেবতী। ওমা ই কি, হ্যাঁ গা বাঁদো ক্যান্? কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়য়ে হ্যাকচো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথায়, তোরও যেতে হবে।...... তুই লেখাপড়া জানিস তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আসতে হবে।"

এবারে সমগ্র নাটকে ছড়িয়ে থাকা নীলকরদের অত্যাচারের একটি চিত্র উপস্থাপিত করছি :

"উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড্ড বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইযাছে, তাহা যদি কুটির, লাঙ্গল, গরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয, তবে আমি ৯ বিঘা নূতন করিযা ধানের জন্য লইতে পারি।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস্ দিতে হবে, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদকি সব ছোড় যাগা।"

আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্যও নীলকরেরা রাইয়তদের কুঠিতে ধরে রাখতেন। সাক্ষী দিতে নারাজ হলেই অত্যাচারে তাদের জর্জরিত হতে হত। নীলদর্পণ নাটক থেকে তোরাপের প্রসংগ উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

"গোপী।......এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমকহারামী করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরও, শূয়ার কি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাচা এট্টু জল দে, মুই পানি তিযেয় মলাম, বাবা, বাবা......

রোগ। তোর মুখে পেসাব করিয়ে দিবে না?"

নীলকরদের অত্যাচারের কথা যাতে বহির্বিশ্বে প্রচারিত না হয়—সেই কারণে বন্দী রায়তদের নিদিষ্ট কুঠিতে বেশী দিন রাখা হতো না। আত্মীয়-

স্বজনদের না জানিয়ে স্থানান্তরে চালান দেবার ব্যবস্থা ছিল—নাটকের নেপথ্য ভাষণে এই সত্যেরও স্বীকৃতি আছে—'এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয না, এ কান্সায়ণের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুঠিতে আছি তাও তো জানিতে পারিলাম না,জানিবই বা কেমন করে, রাত্রি যোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুট হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায?

বিদেশীয় নিপীড়ন ও নির্যাতনকে যেমন নীলদর্পণে নিরাভবণরূপে উদাহৃত করা হয়েছে—ঠিক তেমনিভাবেই নীলকবদের অন্যায় কাজেব সমর্থন দেশদ্রোহী আমির ও দেওযানদের চিত্রকেও প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা কবে স্বাদেশিকতার বীরধর্ম পালন করেছেন দীনবন্ধু মিত্র। এই মুক্তিযজ্ঞে কঠোব সত্যভাষণকেই তিনি লৌহবর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। পদীমযবাণী, গোপীনাথ ইত্যাদি চরিত্র-রূপের মধ্য দিযে এই সামাজিক সত্যেব পরিপ্রকাশ লক্ষ্য কার। এই শ্রেণীর দেশদ্রোহীদের প্রসংগে শশাঙ্কশেখব বাগচী মন্তব্য কবেছিলেন,—"সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয উচ্ছৃঙ্খল কুঠিযালগণের এই লালসার মূলে ইন্ধন যোগাইত এই দেশেরই কুঠির কর্মচারীগণ। ভালো একটি মেযের সন্ধান দিতে পাবিলে যে সন্ধান দিতেছে তাহাব পদোন্নতিব সম্ভাবনা থাকিত। আমিন এ কাজে নূতন ব্রতী নয, ধর্মাধর্ম বর্জিত সম্পূর্ণরূপে আত্মমর্যাদাশূন্য না হইলে নীলকবদের উপযুক্ত কর্মী হওযা যায না।"

নীলবিদ্রোহেব সামগ্রিক সাফল্যেব পশ্চাতে মধ্যাবিত্ত সমাজেব দৃষ্টিভংগী ও গঠনপন্থী কার্যাবলী স্বদেশের প্রতি আনুগত্য মেনে চলেছে। পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ও হিতবাদী নানা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদাযের সংলক্ষ্য ভূমিকা আমরা লক্ষ্য কবেছি। নীল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই সত্যের অপলাপ হতে আমরা দেখিনি। 'ভাবতবর্ষীয় সভা' যখন বাজানুগত্যের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে রাষ্ট্রনৈতিকচেতনায় উদ্বোধিত কবছিলেন—অত্যাচাবের বিরুদ্ধতা করবার আপোষহীন বলিষ্ঠ জীবনাদর্শে দীনবন্ধু তখন জাতির পৌরুষ ও চৈতন্যকে উদ্বোধিত করলেন। 'নীলদর্পণ' নাটক বাংলার স্বদেশী সাহিত্যে একক মহিমায় স্বয়ংস্বতন্ত্র এবং এরই ফলে "a sudden and remarkable change has come over the rural population of Bengal. All at once they have asserted their independence · the existing

instrument of Zamindars and Planters,has at length been roused to activity and has resolved to wear his claim no longer, the extraordinary with which the rural population at this moment, regard the system of Indigo Planting as persued in Lower Bengal, has produced in some localities an outburst unexpeeted by the most far-seeing."

নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ ঃ পরোক্ষ সংঘবদ্ধ জাতীয়তার চেতনা

মূল নাটকের প্রাণধর্ম বজায় রেখে মধুসূদন অনূদিত 'নীলদর্পণে মননশীল পাঠক তার সজাগ কল্পনা ও সুতীক্ষ্ণ বিচারের বিশ্বস্ত প্রাণভূমিটুকু খুঁজে পেয়েছিল। প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহান পাদ্রী লঙ্ সাহেব। অনুবাদকেব নাম অবশ্য অনূদিত নাটকে চিহ্নিত ছিল না। পাদ্রী লঙ্ ইংলণ্ডে এর বহু কপি প্রচার করেছিলেন। বাংলাদেশের শ্বেতাঙ্গসমাজে স্বাভাবিক কারণেই এব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। নীল কমিশনের সভাপতি সিটনকার এই সময়ে প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন। জমিদার ও ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী মি. ফার্গুসন বঙ্গীয় সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা করে অনূদিত নীলদর্পণের উল্লেখ করে একটি পত্রে লিখেছিলেন,—"It has been done without the sanction or knowledge of the government of Bengal, the committee will expect a formal and official disavowal of the proceeding and that the names of the Parties who have thus made use of the name and means of the Government to circulate a foul and malecious libel on Indigo Planters, tending to excite sedition and breaches of the peace, be given to us in order that they may be prosecuted with the utmost rigour of the law." শেষ পর্যন্ত বণিক সমিতি মুদ্রক ও প্রকাশকের নামে মামলা রুজু করলেন। নীলকরেরা এবং বৃটিশশক্তির মুখপত্র 'English Man' পত্রিকায় ফরিয়াদী পক্ষের প্রসিকিউটর পাদ্রী লঙ্‌কে আক্রমণ করে লেখেন,—

"This pamphlet was not written with a view of setting wrong, right or of mending the existing state of morals ; it was written with a view of setting race against race, the European against the native." (Trial of the Rev. James Long of the Church Missionery Society for libel—P. 4-5) ১৮৬১ সালের ১৯, ২০ ও ২৪শে জুলাই কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে যখন এই মামলা চলেছিল—তখন শিক্ষিত ও খ্যাতনামা বহু বাঙালীর সংগে বিদেশী সরকারী, বে-সরকারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মহতী উপস্থিতির মধ্যে দীনবন্ধুও ছিলেন। জর্জ স্মিথের 'Life of Alexander Duff' vol. II তে উল্লেখিত আছে—নীলদর্পণ নাটকের বিচারের রায়ে বিচারপতি মরডাণ্ট ওয়েল্‌স নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত-দুষ্ট এবং লঙ্‌-বিরোধী মন্তব্য করেছিলেন। জুরীরা লঙ্‌কে দোষী সাব্যস্ত করে এক হাজার টাকা জরিমানা সমেত এক বছরের জন্য সাধারণ জেলে পাঠালো। রায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়ে দেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ উকিলের ব্যয়ভার বহন করেন এবং স্বয়ং দীনবন্ধু মামলার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে একখানি মাত্র গ্রন্থের এ জাতীয় ব্যাপক বিপ্লবাত্মক আলোড়ন তুলনাহীন। এই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' (জুন, ১৮৬১) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল : "It may be said that such books as Nil Darpan act as an antidote to vice by exhibiting it in its most repulsive form, and thus give to the morals of society a healthy tone." তৎকালীন বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক নানা সভাসমিতি সংঘবদ্ধ স্বাদেশিক চিন্তার যে পরিচয় দিয়েছিলেন—তাতে পাদ্রী লঙের প্রতি অভিনন্দন সোচ্চার হয়েছিল। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীরা সমবেতভাবে একটি অভিনন্দনপত্রে নীলদর্পণ নাটককে স্বাগত জানিয়েছিলেন,—'That the Nil Darpan is a genuine expression of native feeling on the subject of Indigo-Planting, we can with confidence certify." পাদ্রী লঙের বিচারকালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বাঙালীর আত্মিক ও সামাজিক মর্যাদাকে আহত করেছিলেন—রাষ্ট্রনৈতিকবোধ উত্তীর্ণ ও

আত্মাধিকার-সচেতন আপামর জনসাধারণ সম্মিলিত হয়ে বিচারপতির পদত্যাগ দাবী করেন এবং জাতিকে ঐক্যবোধ উত্তীর্ণ হয়ে কর্তব্য সাধনে কঠোর ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মূলত নীলদর্পণের অনুবাদ ও লঙের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনৈতিক উন্মেষ পর্ব এবং বাঙালীর সমাজসচেতন ঐক্যচেতনার পদক্ষেপ ঘটল। সংঘবদ্ধ বাঙালীর জাতীয়চেতনা ও স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপ্ত পরিচয়ের মধ্যে আগামী দিনের শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের পদধ্বনি শুনে হয়তো প্রকারান্তরে ইংরেজ জাতিকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। দীনবন্ধু তাঁর স্বাদেশিক চিন্তা ও মতবাদকে সামগ্রিকভাবে নীলদর্পণে তুলে ধরেছিলেন এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' পেশাদারী অভিনযের সাফল্যে তার গুরুত্বই প্রমাণিত হয়েছে। এ-বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করবো। আমাদের দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হতে পারি যে, নীলদর্পণ নাটকের পশ্চাৎপটের সামাজিক অভিপ্রায়, জাতির ঐক্যবদ্ধ স্বাদেশিকচেতনার আধিমানসিকতা ইত্যাদির মধ্যেই পরবর্তীকালের স্বদেশ-চিন্তা ও জাতীয়তাবোধের বীজ নিহিত। এই প্রসংগে ডঃ রবীন্দ্রকুমার-দাশগুপ্তের মন্তব্যটি আমরা পরিশেষে স্মরণ করছি: "দীনবন্ধুর এই স্বদেশীর সংগে ১৯০৫-এর স্বদেশীর মিল না বুঝিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের আসল কথাটি বুঝিব না। ১৯১০ সালে লণ্ডনের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় স্যার ভ্যালেন্টিন চিরল কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে স্বদেশী কতকগুলি ইংরেজী-পড়া যুবকের হুজুকমাত্র ইহার সহিত দেশের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। চিরল সাহেব যে এ কথা মিথ্যা জানিয়াও ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের মূল প্রেরণা রাজনৈতিক নয়—অর্থনৈতিক। ঐ আন্দোলনে বাঙালী বলিল বিলাতী কাপড় পরিব না, দেশী কাপড় পরিব। বিলাতী কাপড় পরিলে ইংরাজ পুষ্ট হইবে, আমি অনাহারে মরিব। নীল-আন্দোলনে বাঙালী বলিল নীল বুনিব না—ধান বুনিব। নীল বুনিলে ইংরাজ বণিকের টাকা হইবে, আর আমি অনাহারে মরিব। দুই আন্দোলনই ইংরাজ বণিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন।"[৮]

---

৮ দেশ—সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০, পৃ. ২২৫

তৃতীয় পর্ব : তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয়তা বিকাশে ব্রাহ্মসমাজ ও বাংলা নাটক

১৮৬০ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কর্মতৎপরতাও বিশিষ্ট সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। রক্ষণশীলতার সংগে প্রগতিবাদিতার দ্বন্দ্বে বিজ্ঞান ও যুক্তির জয় তদানীন্তন সমাজমনকে পরিশীলিত করল। ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি ও স্বদেশনীতির ক্ষেত্রে পুনর্বিচারের প্রয়োজনীযতা দেখা দিল। সমাজমনের পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টি-ভংগীরও লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্বাদেশিকতার নবরূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের ভূমিকাটি তাৎপর্যবহ। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চের 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় এই কেন্দ্রীয় সমাজশক্তির স্বরূপটি ব্যাখ্যাত হয়েছে : "Brahmoism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politically···boldly and fearlessly we hope to teach and practise reforms." ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন স্বজাতিপ্রীতির উদ্বোধনে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নগরসংকীর্তন হযেছিল তার উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মজীবনী'তে :

> 'তোরা আয়রে ভাই, এতোদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান
> নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
> নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
> যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার।'

ব্রাহ্মসমাজের পুরাণ-বিরোধিতা এবং উপনিষদ-বেদানুরক্তি ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইয়ংবেঙ্গল দল এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কারণেই নবীন সমাজকে গ্রাস করতে পারেনি। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ এবং 'অধ্যাত্মবিদ্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যাসংক্রান্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের

নিগূঢ় সমন্বয় যুক্তি-বুদ্ধির গোচরীভূত হয়ে 'আত্মশক্তির উদ্দীপন' রূপ মঙ্গল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মমণ্ডলীর পরিচালনা-বিধিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনার রীতির মধ্যেও ব্রাহ্ম-সমাজের সামাজিক উপাসনার সংগে স্বদেশ উদ্ধারের প্রার্থনা-সংগীত উচ্চারিত :

"তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্যদের প্রিয়ভূমি সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে,
একবার দয়া করি তোল কর ধরি
দুর্দশা আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামী, জানিছ সে সব হে,
তাই প্রাণ কাঁদে ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দাও হে চেতনা।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে,
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুনঃ আনহে জীবন।"

(বিপিনচন্দ্র পালের 'নবযুগের বাংলা গ্রন্থে উল্লেখিত)

রাষ্ট্রীয় চিন্তার সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনে শ্রমিক ও কৃষকের রাজনৈতিক ভূমিকার উল্লেখ করে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন :

'উঠ জাগ শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর--
চল চল নারী-নর—
ঘুমাইবার আর বেলা নেই।
... .
ওই দেখ চলেছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্বাগ্রেতে ধায় তারা

পায় পায় ধনীরাও চলে,
ছোট বড় ধায় কুতূহলে।'

নারীজাতিকেও রাজনৈতিক সমানাধিকার দানের স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল :

'না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'

'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' মুখপত্র জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন ও তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সচেতনতা আনয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। 'রায়ত সভা' প্রতিষ্ঠা কিংবা কুলীআন্দোলনকে জনসমর্থনের আলোকে এনে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কুলী সমস্যাটিকেও[১] জাতীয় সমস্যার ভিত্তিতেই গুরুত্ব দান করেছিলেন। রেণ্ট য়ুনিয়ন ও রায়ত য়ুনিয়ন সম্পর্কেও ব্রাহ্ম মুখপত্র প্রগতিবাদী দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছিল। জাতীযতার শূন্য অনুশীলনে গঠনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির নান্দীপাঠ করা হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের নানাজাতীয় কর্মসূচীতে। সামাজিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত নানামুখী দিকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা তৃপ্ত হতে না পেরে রাজনারায়ণ বসুর 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' পাঠ করে আকৃষ্ট হলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের গভীর সান্নিধ্যে ধর্মৈষণার মধ্যে জীবনের অখণ্ড পরিপূর্ণতাকে খুঁজে পেয়ে জীবন-চিন্তা ও কর্ম-ভাবনার মধ্যে তা রূপায়িত করতে চাইলেন। ব্রাহ্মধর্মের বাণীকে প্রচারণার কারণে ১৮৬৪ সালে তিনি ভারতভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। ইতি-পূর্বে বাংলার সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বহির্বাংলায় প্রগতিশীল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎপরেই এই জাতীয় সামাজিক আড়োলনের প্রতিনিধি হিসেবে কেশবচন্দ্র স্বীকৃতি পেলেন। মনোজীবনের প্রবণতার দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সংগে কেশবচন্দ্রের পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথে উপনিষদের অনুসরণ থাকলেও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ চিন্তার অনুসারী ছিলেন তিনি। ব্রহ্মানন্দ কেশবের সংগে এই মৌল পার্থক্য শেষ পর্যন্ত মত বিরোধে পরিণত হল। ১৮৬৪ সালে প্রগতিশীল ও আবেগপন্থী

১ চা-কুলীদের ওপর শ্বেতাঙ্গ-অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন—'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) নাটক।

কেশবচন্দ্রের দিকেই নবীনের দল আনুগত্য প্রকাশ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, অঘোরনাথ গুপ্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।[২] দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতার অচলায়তন ভেঙ্গে ব্রাহ্ম মুক্ত সন্তানেরা বেরিয়ে এলেন। তাঁদের সর্বধর্মসমন্বয় এবং খ্রীষ্টান ধর্মানুরক্তির উদ্বেলতা 'নিত্য বিরোধ উপস্থিত হবার' 'প্রহেলিকা স্বরূপ মনে হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সমাজসংস্কার আন্দোলন ক্রমশঃ ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সমার্থবাচক হয়ে দাঁড়ালো। যুবনেতারা ব্রাহ্ম-সভা পরিচালনায় গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতির অনুসরণ সুরু করলেন—সে ক্ষেত্রে তাঁদের স্থিরীকৃত শপথ হল জাতিবৈষম্য না মানা, ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক উপবীত ত্যাগ, পৌত্তলিকতার সংগে সর্বতোভাবে সংস্রববর্জন, নারীস্বাধীনতার অতি-পক্ষপাত, হিন্দু আচার ও দেবদেবীর অস্তিত্বে অবিশ্বাস ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজের শুধু ধর্ম বিশ্বাস নয়—ব্রাহ্মসমাজজীবনের আবশ্যকীয় বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ করে ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তির একনায়কত্ব লোপ করে কেশবগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকতার সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পূর্বোল্লেখিত 'স্থিরীকৃত শপথগুলি' বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য মাত্র। গণতান্ত্রিক দাবীর সংগে সামাজিক অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কের এই সচেতনতাবোধের জন্যেই যুবশক্তির গভীর সমর্থনে সামাজিক সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু ব্রাহ্ম-আদর্শের এই জাতীয় মূল্যমানের সংগে প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবচন্দ্রের সূক্ষ্ম অন্তর্বিরোধ ছিল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার জেরও তিনি অতিক্রম করতে শেষ পর্যন্ত পারেননি। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক তিনি ছিলেন না—নব্য যুবক সম্প্রদায়ের পর্দা-প্রথার বিরোধিতাও তাঁর সমর্থন লাভ করেনি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হবার পরও দেখা গেছে সংস্কারের নামে তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিই আত্যন্তিক আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যতিরিক্ত সমাজ-সংস্কারের ভূমিকায় সংকীর্ণতা আসতে বাধ্য। কেশব সেন প্রবর্তিত ব্যক্তি-

২ "বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্রাহ্ম-প্রতিকূল প্রধান ব্যক্তিও বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌ব্রাহ্মণের গৌরব দিতে দ্বিধা করলেন না।" উনিশ-বিশ: ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২৫১

স্বাধীনতাতেও অহং প্রাধান্য এবং মতবিলাসিতার বিপর্যয় দেখা দিল। সংস্কারবাদ সদর্থক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে কয়েকটি চিহ্নিত সংস্কারমাত্রে পর্যবসিত হল। ১৮৬৬-র ১১ ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল—১৮৬৭ সালের ৭ই থেকে ১৫ই এপ্রিল সমগ্র উত্তর ভারত পরিক্রমাকালে কেশবচন্দ্রকে শিখ সমাজের গঠনতান্ত্রিক গড়ন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ১৮৬৮-তে দ্বিতীয়বার উত্তর ভারতে ধর্ম প্রচারের জন্য গেলে ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে তাঁকে কেন্দ্র করে এক বিশেব ধরনের নরপূজার প্রবর্তন হল। এই আত্মপূজার প্রবর্তনের বিরোধিতা কেশবচন্দ্র করেননি। কেশব-গোষ্ঠীতে নরপূজা ও গুরুবাদের এই প্রকাশ্য অনুপ্রবেশকে ব্রাহ্মসম্প্রদায় সমর্থন জানাতে পারেননি। ১৮৭০-এর অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে নভেম্বরের সূচনায় 'ভারতসংস্কাব সভা প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের গঠনরীতি ও নীতি দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হযেছিলেন। কিন্তু তার অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক মানদণ্ড কিংবা স্ত্রী-পুরুষের অধিকার পার্থক্য ইত্যাদি প্রসংগে তিনি খুব বেশী প্রভাবিত হননি। 'ভারতসংস্কার সভায' তিনি পাঁচটি কার্যধারা গ্রহণ করেছিলেন—.. স্ত্রী জাতির উন্নতি—তার জন্য বালিকা বিদ্যালয ও সভা ; ২ শিক্ষা—তার জন্যে শিল্প বিদ্যালয় ও শ্রমিক বিদ্যালয় : এই বিদ্যালযগুলির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল—(ক) সূত্রধরের কাজ, (খ) ঘড়ি মেরামত, (গ) মুদ্রাঙ্কন ও লিথোগ্রাফ, (ঘ) সূচীকার্য, (ঙ) খোদাই ;' ৩. সুলভ সাহিত্য—মাত্র এক পয়সা মূল্যে সরল ভাষায় সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হল ; ৪. সুরাপান ও মাদক নিবারণ—এই উদ্দেশ্যে একাধিক পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয ; ৫. দাতব্য --অনাথ আতুরদের সাহায্যার্থে সংগঠিত হল।

এই কার্যক্রমগুলির ক্ষেত্রে তিনি যুব সম্প্রদায়ের উৎসাহ সমর্থন ও সরকারের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর পরে যে বৃহৎ সামাজিক সংস্কারের কাজে কেশবচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেন, তা হল একটি বিশেষ সামাজিক পরিণামবাহী আইন—Special Marriage Act (1872) ; ব্রাহ্মবিবাহ বিবয়ে তিনি স্বতন্ত্র আইনের প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু আইন না হয়ে তা সৃষ্ট হল বিশেষ বিবাহ আইনরূপে—ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তা সংস্কারবাদীদের দুর্বল

করল। এই সময়েই রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[৩] বিষয়ক বক্তৃতায় ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্মের সাররূপে ব্যাখ্যা করলে—ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্ররূপেই কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যা করলেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল নবীন ব্রাহ্মদের প্রতিকূলতা বেড়েই চলল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কেশব-বিরোধী নবীন দলের মুখপত্র 'সমদর্শী'-তে কেশবচন্দ্র মত ও আচরণের প্রতিবাদ ঘোষিত হতে লাগল। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া বজ্রঘাতের অমোঘ দণ্ডের মতো সংঘর্ষকে ঘনায়মান করল আরও পরবর্তীকালে। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতির সংগে কুচবিহার-রাজের বিবাহকালে সুনীতির বয়স কিঞ্চিদধিক তেরো বৎসর। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়নি বলে তরুণদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করতে চাইল। কেশবচন্দ্র পদত্যাগে সম্মত না হলে ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে টাউন হলে সমবেত বিরুদ্ধ পক্ষ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটালেন। কেশবচন্দ্রও স্বতন্ত্রভাবে নিজ-প্রভাবাধীন 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'নববিধান' প্রসংগে বলেছিলেন: 'নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতী ছাচে তাহার নাম দিলেন New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র স্বদেশের মুখে মুখে ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতী attitude লইলেন,—এইখানে সমস্ত reform movement টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল।"

২

ব্রাহ্মসমাজের এই সমাজান্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বাংলা নাট্যধারার একটি রূপরেখা অঙ্কিত করা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার ধ্বজাধারী সমর্থক, সদাচারভ্রষ্টা

---

৩ "সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুর আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্বক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসু প্রভৃতি দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াতে লাগিলেন।" রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ সং) পৃ. ২৭৩

ইংরেজিশিক্ষিত নারীর রোমান্সরসগ্রস্ত মানস বিলাস, জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগকারী ভণ্ড সমাজমানসিকতা ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাঙ্গবিদ্ধ করে সমসাময়িককালে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই আমরা স্ত্রী-শিক্ষার সমাজমুখীন একটি দিকের আলোচনা করেছি। 'দেশ' (২০শে আষাঢ়, ১৩৭৬) পত্রিকায় প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরী রচিত একটি প্রবন্ধ 'পাশ করা মাগ বা সেকালের বাঙালীর চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা' নামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 'পাশ করা মাগ' ও 'বৌবাবু'[৪] নামক দু'টি নাটক যার প্রতিপাদ্য স্ত্রীশিক্ষা—সে-সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। নাটক দু খানির প্রকাশকাল সম্বন্ধে তিনি একটি নির্বিশেষ সাহিত্যিক যুগগত মূল্যমানকেই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী: "যে যুগে এই বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যে যুগে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এই ধরণের মত প্রকাশ করিয়া লেখকেরা বেশীর ভাগ বাঙালীর কাছে বাহবা পাইতেছিল, সেটা বাঙালী জীবনের কোন যুগ তাহা স্মরণ করিতে বলিব .....আমি ১৯১০ সনে প্রথম কলিকাতায় আসিয়া 'মডেল ভগিনী র মতো বইয়ের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেরও এর চেয়ে বেশী প্রশংসা শুনি নাই। সুতরাং অধিকাংশ বাঙালী যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" অথচ যুগ ও কালগত বিচারে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার ও কেশবচন্দ্রের ধর্মপ্রচার শেষ হযেছে, রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল', 'মাযার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশিত হযেছে, বিবকানন্দের ধর্মপ্রচার পর্যন্ত সুরু হয়েছে।

'পাশ করা মাগ' নাটকে স্ত্রী-শিক্ষার ফল একটু প্রতিক্রিয়াশীল তীব্র ও তীক্ষ্ণস্বরেই প্রকাশিত হয়েছে। নায়িকা কিরণশশী বেথুন স্কুলে পড়ার কারণে কিছুটা বিপথগামিনী হলেও শেষ পর্যন্ত অনুতপ্তা হয়ে সুস্থ জীবনবোধে প্রত্যাবর্তন করে অনুতপ্ত স্বরে স্বামীকে নিবেদন করছে—'তুমি আমাকে হত্যা কর, —তোমার হাতে আমার জীবন গেলে, আমি সুখে মর্লাম বোধ করবো।' স্বামীর প্রত্যুত্তর: 'না আমি হত্যা করতে পারবো না। তোর এখনও অনেক যাতনা আছে; তুই আমার সেই আদরের কিরণশশী, তুই আজ

৪ বৃটিশ মুাজিয়মে তিনি প্রহসন নাটক দু'খানির সন্ধান পেয়েছেন বলে প্রবন্ধে উল্লেখিত আছে।

ভিখারিণী ম্লেচ্ছ রমণী! ওঃ, আমি বড় আশা করেছিলেন; আমার পাশ করা মাগ।” স্কুল-কলেজে পড়া ও উচ্চ ডিগ্রীধারিণী বাঙালী মেয়েদের বচন-বাচনের একটি মোটামুটি চরিত্র-পরিচয় নায়িকা কিরণশশী ও তার ভগিনী চাতকিনীর সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে :

“কিরণ। আমি কেয়ার করি না। ড্যাম্ নাষ্টি নেটিভগণ, মেয়ে মানুষের অনার বোঝে না। ভাতার বলে যে একটা পদার্থ আছে—কি জানোয়ার আছে—তা আমার আইডিয়াতে আসে না; তা আমি কি ইষ্টুপিট নেটিভ পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে ব্রুট্ অসভ্য পরাধীনা বাঙালীর মতো থাকবো? তা কখনই নয়! যদিও আমি বাঙালীর মেয়ে—কিন্তু এখনকার বাঙালী মেয়ের মতো মূর্খ নই। আমি বেথুন স্কুলে হাইপ্রাইজ পেয়েছি; যেদিন তোমার বিয়ে হয়—সেইদিন তোমার পতি আমার মুখে ইংলিশ স্পীচ্ শুনে থাণ্ডার-ষ্ট্রাক হয়েছিল……

চাতকিনী। তোমাকে যদি নিতে আসে, তাহলে কি শ্বশুরবাড়ী যাবে না?

কিরণ। কেন যাব না? আমার হাজব্যাণ্ড যদি ইনভাইট করে পাঠায়, তাহলে না হয় এক ঘণ্টার মতো বেড়িয়ে আসি।

চাতকিনী। তবে কি তুমি শ্বশুরঘর করবে না?

কিরণ। নেভার, নেভার—এ প্রাণ থাকতে তো কখনই নয়। কখনও গরুর মত শ্বশুরবাড়ী যেয়ে গোয়ালে বাউণ্ড হয়ে থাকতে পারবো না।”

‘পাশ-করা মাগে’র এই বিচিত্র স্বভাবের নায়িকার স্বভাবসিদ্ধ দাম্পত্য-আলাপনের করুণমধুর ভৎর্সিত পরিচয় উল্লেখিত হয়েছে। স্ত্রীর ঘুষি ও ধাক্কা খেয়ে বিপর্যস্ত স্বামী জেরবার হয়ে উচ্চারণ করেছেন : “হে হিন্দু ভ্রাতাগণ! যদি মর্যাদা চাও, জাত চাও, তবে যেন কেউ পাশ করা মাগ না চায়—সকলে আমার দুরবস্থা দেখ, হায়রে পাশ করা মাগ!” শিক্ষিতা বউবাবু শরৎশশী স্বামী হরিশের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে স্বামীকে সক্রোধে চাকুরীর সন্ধানে নিরত হতে আজ্ঞা করেছে। হরিশ তার সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ করলে স্ত্রীর সংলাপ :

‘শরৎ। হরিশ, এ বড় দুঃখের বিষয় যে আমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণীর পাণিগ্রহণ করে, আজও বিশুদ্ধরূপ বাক্য বিন্যাস করতে শিখলে না;

হরিশ। এর উপর আবার বাক্যবিন্যাস, রক্ষা কর, তোমার ও জুতোর ঘাড় মোচড়ানো আর চেত্তা-খাওয়া ধনুক হয়ে লড়াই-এ নমস্কার!

শরৎ। when have you seen war?

হরিশ। when you deliver a lecture.

শরৎ। সে আবার কি?

হরিশ। ওই ডিঙ্গি মেরে মেরে, বুক চিতিয়ে চড দেখানো, ঘুসো উঠানো ......লেখাপড়া কি কেউ শেখে না?

শরৎ। উহ্‌। আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির ফল।'

'বউ-বাবু' নাটকেও অনুরূপভাবে বেচারা স্বামী উচ্চারণ করেছে: "এতো দেখে শুনেও কি লোকে শিখবে না? এতো দেখে শুনেও কি লোকে ইংরাজী মেজাজের স্ত্রীর স্বামী হবার ইচ্ছা করবে? .....পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগিণী কুহকিনী পত্নীর কুহক জালে জড়িত হলে লোকে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়, এ অভাগাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২) প্রহসনে নাটকের প্রথমভাগে পূর্ণ ও বিধুমুখীর পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করে স্বাধীনতাকামী ব্রাহ্মসমাজকে যে ব্যঙ্গ করেছেন—তাতে রঙ্গের প্রলেপ, ব্যঙ্গের প্রদাহ নেই। স্বামী-স্ত্রীর ঈর্ষাদগ্ধ সন্দেহের নিরসন ঘটেছে মধুর কৌতুকরসে। এই প্রহসনটি প্রথম প্রকাশকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ-মুহূর্তে আপন নাম প্রকাশ করেননি। এই নাটক রচিত হবার কয়েক বছর পূর্বে ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে স্ত্রী স্বাধীনতা ও খ্রীষ্টীয় উপাসনরীতির প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর নবপরিকল্পিত সমাজরূপের প্রতি বিরূপ মনোভাবকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকে রূপদান করেছেন। মদ্যপ স্বামী পূর্ণ ও তার কেশবভক্ত স্ত্রী বিধুমুখীর সংলাপাংশে পূর্ণ কেশবচন্দ্রকে 'স্যানজা' বলে সম্বোধন করলে স্ত্রী সক্ষোভে বলেছিলেন,—'আমাদের পরম গুরু, পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কিনা 'স্যানজা' বল্লে?'

নাট্যকার অমৃতলাল বসু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের গোঁড়ামী, হিন্দুয়ানির মিথ্যা মোহ ও ভড়ং, দেশ ও জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ববিধ

বাধার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। এই অভিঘাতের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সমধর্মীয়। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মতে,—'অমৃতলাল ভাবাদর্শে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমধর্মী হইলেও তিনি অপর দুইজন ব্যঙ্গকারের ন্যায় নিজের মত ও উদ্দেশ্য কারণে অকারণে জোর করিয়া তাঁহার লেখার মধ্যে ঢুকাইতে চান নাই।' অমৃতলালের দুই অঙ্কের নাটক 'বাবু' ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে মত্ত ভণ্ড বাক্যবাগীশ বাবু-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপের আঘাত হেনেছেন। আবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সর্ববিধ আতিশয্য, বাগ্‌ভঙ্গী ও ভাবভঙ্গী নিয়ে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্ম-সংস্কারক কন্দর্পকান্তকে সং সাজানো হয়েছে। ব্রাহ্ম লক্ষণকে এ নাটকে কিভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে ডঃ অরুণকুমার মিত্র বলেছেন: "তাহাদের ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বোধন লইয়া 'স্বামী-ভ্রাতা' ও 'ভগিনীকে বিবাহ', তাহাদের 'প্রেমাশ্রু বিসর্জন', তাদের হাসিমাত্রকেই অশ্লীল বিবেচনা করা, স্ত্রী-কে 'স্বামিনী' বলা প্রভৃতির হাস্যকরত্ব 'সংস্কারক' ও 'ধর্মধ্বজ' বাবুদের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে।"[৫] নাটকের শেষদিকে আপন স্ত্রী নীরদাকে মাতাল সেলারের কাছে অসহায় অবস্থায় ফেলে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রয়াসী ষষ্ঠীর অন্যান্য সংস্কারক সমভি-ব্যাহারে পলায়নের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের ব্যর্থ দিকটিকেই নাট্যকার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।[৬]

অমৃতলালের 'বৌমা' সামাজিক নক্‌সাটি ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ধর্মধ্বজ কপট ভারতসন্তান ও ব্রাহ্মসমাজানুমোদিত স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের 'ভ্রাতা-ভগিনী' সম্পর্ক নিয়ে রসিকতার দিকটিও আস্বাদ্য। নাটকে গুরু-দিদিমণিদের গানকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা হয়েছে:

৫ অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য (নাভানা) পৃ. ২৫৯

৬ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন: "ব্রাহ্মসমাজ এককালে শিক্ষিত লোকের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও কালক্রমে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সংগে ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমিতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর কোন কোন বিষয়ে কৃত্রিমতা ও আতিশয্য ছিল, কিন্তু ইহা যে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার দূর করিতে সহায়ক হইয়াছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস (৩য় সং) পৃ. ২২৯

'ঘুচবে জ্বালা কুলবালা বিদ্যা নিবি আয়
হবে না কানাকানি জানাজানি
বিদ্যা দিব জেনানায়।'

'কালাপানি' (১২৯৯)-তে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরূপতা ফুটেছে ছুলালচাঁদ বাবুর অন্তপুরে কাঁসারী পিসীর কণ্ঠে :

"বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্নি মেয়ে তোরা
বার মহলে শুনে এলো আমাদের ওরা
শুনে চম্‌কে ওঠে গা'টা
তোদের বুকের পাটা,
পেটে পেটে ছিল কি লো সবার এতো পোরা।
শুনলে যাদের নাম, ও মা গায়ে আসে ঘাম,
ছি ছি রাম রাম
সেই সাহেবের বগল ধরে করবি ঘোরাফেরা!"

অমৃতলালের 'নিমাইচাঁদ' (১৮৮৯) নক্শা নাটকে অনিলকুমারীর উৎকট রোমান্সপ্রিয়তার সংগে 'নভেলি প্রণয়ের কুহকে মগ্ন' 'বৌমা' প্রহসনের কিশোরীর অতিশয়িত দিকটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাপ্তা হিড়িম্বা হিন্দুপূজায় চাঁদা না দিলেও 'ইদে' দেয়, স্বামীর মুখের মাপে জুতো নির্মাণ করে, স্ত্রীকে 'মায়ের অধিক মান্য করা' ইত্যাদি প্রসংগ এবং মতিলালের মধ্যে 'বৌমা' নাটকে নাট্যকারের আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মদের প্রতি এককালে শ্রদ্ধা ও পরবর্তীকালে তাঁদের আতিশয্যের প্রতি তীব্র বিরাগ এ নাটকে ভাষারূপ পেয়েছে। ব্রাহ্মদের ভ্রাতা ও ভগিনী সম্পর্কের ব্যাঙ্গাত্মক পরিচয় দিতে গিয়ে নাটকে বামাদাস সম্পর্কে কিশোরী বলছে :

"বামাদাসবাবু দেখলেই বলেন, 'ও—পুঁটি,
তোকে করবোই সভ্য,—
ভগ্নী ভগ্নী তোর চোখ ছুটি।"

'খাসদখল' নাটকে 'উন্নতিশীল উকিল' লোকেনের স্ত্রী 'কবিতাময়ী' আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রী মোক্ষদার মানসবিলাসকে রূপায়িত করেছেন অমৃতলাল। আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীজাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তখন স্বাবলম্বী না হলেও

স্বামীর অর্থে 'পট-বিবি' সাজবার প্রয়াস মোক্ষদার একটি গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে :

'আমি যেন ছবিটি
ললিত লবঙ্গলতা কবিটি
তায় ভালবাসে স্বামী
সর্বে সর্বময়ী আমি
তিনি আনেন খেটে খুটে আমার হাতে চাবিটি।'

অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনেও বেপরোয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যঙ্গবিদ্ধ হযেছে। শিক্ষা বিভ্রাটের সর্বাত্মক কুফল সমাজজীবনে কিভাবে 'সতেজে উদাহৃত' হয়—সে-বিষয়ে সমালোচনা করে ব্রাহ্মদের গুরুবাদকে তিরস্কার করে প্রহসনটি সম্পর্কে 'নবজীবন' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,—'চাদর-নিবারণী' অথবা 'ভাতকাপড় নিবারণী সভা' ছাড়িযা ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে···এবং কিছুকালের জন্য ঝী-কেও আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিযা আমাদের মতি-গতি ফিরাইয়া লইতে হইবে।'

অমৃতলালের 'তাজ্জব ব্যাপার' (১২৯১) প্রহসনে স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের ক্রিযাকলাপ ও পাশ্চাত্য পন্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকরণকারীদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ আস্বাদ্য হযে উঠেছে। নারী উকিল, নারী সেরেস্তাদার, সংবাদপত্র সম্পাদিকা, পুলিশের মহিলা হেড-কনেষ্টবল থেকে বিবাহবাসরের ঘটকী পর্যন্ত বিচিত্র আলোকপ্রাপ্তা নারী চরিত্রের কল্পনা করা হয়েছে। অমৃত-লালের উগ্র সংরক্ষণশীল মনোভাবের সামাজিক দিকটিই নাটকখানিতে ফুটেছে। নারী-স্বাধীনতার উপর চরম ব্যঙ্গ থাকমণির সংগীতের মধ্য দিযে ব্যক্ত হয়েছে :

'আঃ বেঁচেছি
আমরা সব কাছা এঁটেছি॥
কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ
ভাতার দেখে করে ঠাট
প্রাণটা যেন গড়ের মাঠ
তাই তো মাল টেনেছি।'

বঙ্গদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার আধিক্য দেখে ভীত উড়িয়া সম্প্রদায়ের কথোপ-

কথন ও সংগীত, গড়ের মাঠে ভলান্টিয়ার রমণীদের ড্রিল প্রসংগের মধ্যে রঙ্গ-রসের অবতারণা করা হয়েছে।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র তার 'কলির হাট' (১৮৯২) নাটকে অমৃতলালের মতোই ব্রাহ্ম-প্রয়াসের বিপরীত মতবাদ অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজপথে শৌণ্ডিকালয়ের সামনে শিক্ষিতা তরুণী ছাত্রী চতুষ্টয়ের মুখে নাট্যকার একটি সংগীত যোজনা করেছেন :

"একজামিন দিয়ে এলেম সকলে
আজ গ্র্যাণ্ড গ্যাদারিং টাউনহলে
দেখে শুনে হদ্দ মেনে, যেন মিন্‌সেগুলো কান মলে।"

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'মজা' (১৯০০) নামক প্রহসননাট্যেও নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্ত্রী-সমাজের ফ্রী-লাভ, চাল-চলন, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রসংগকে ব্যঙ্গ করে যথার্থ কল্যাণী শক্তির পুনর্জাগরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। নব ধর্মাবলম্বী রমণীদের গানে পৌত্তলিকতা বিরোধীদের প্রতি বিদ্রূপ, মদনমোহিনীর গানে 'শাড়ী ছেড়ে গাউন সেঁটে বুকে বুরুচ এঁটে' রাজপথে বেরিয়ে-পড়া 'জেনানাগণকে' ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

'বাড়ীর কর্তা হলেন মিষ্টার গিন্নি এখন মিসেস্‌
কৃষ্ণবিষ্ণু ছেড়ে দিয়ে ভজতে পটু জিসেস্‌
তাই দুর্গা-কালী-শিবের ছবি টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি।'

'কাজের খতম' (১৮৯৮) প্রহসনের মধ্যেও শাড়ী-গাউন, খৃষ্টধর্মানুরক্তি এবং বিলাতিয়ানাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেননি। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণপন্থী সমাজমন এই সংস্কারকে সর্বতোভাবে মেনে নেয়নি। বাংলা নাটকেও এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি অমৃতলাল বসুর ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'একাকার' প্রহসন নাটকখানিতে। হিন্দুসমাজে বৃত্তিভেদে কর্ম ভেদ চলিত ছিল। কিন্তু বৃত্তি বংশগত হবার সংগে সংগেই সমাজের বর্ধিষ্ণুতা বাধাপ্রাপ্ত হল। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের আবশ্যকতাও অমৃতলালকে ভাবিত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষার মোহে সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষেরা স্বজাতীয় বৃত্তি ভুলে গিয়ে কেরাণীবৃত্তির চাকুরীর লোভে আত্মনিয়োগ করায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকটিকেই নাট্যকার প্রতিপাদ্য

করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সোচ্চার তিরস্কারও অনেক ক্ষেত্রে বক্তৃতার ঢঙে উদাহৃত হয়েছে। প্রাক্-ইংরেজ যুগের কুটিরশিল্প নির্ভর সমাজব্যবস্থায় ও ইংরেজ যুগে যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে সমাজচিত্রের ও অর্থনৈতিক মূল্যমানের পরিবর্তনের কথা নাট্যকার স্বীকার করেছেন ঠিকই—কিন্তু চিন্তাশীল ও উদার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজ-বনিয়াদের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়াশীলের সংস্কারকে আঁকড়ে থাকার জন্যে যুগসত্যের যথার্থ বিচার হয়নি। নাট্যকার জাতিবৈষম্য মেনে জাতিগত বৃত্তি অনুশীলনে সবাইকে 'একাকার' হতে বলেছেন। জাতিভেদের সমর্থক রাজনারায়ণ বসুকে এই প্রহসনখানি উপহার প্রদান করতে গিয়ে একটি পত্রে নাট্যকার এটি রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে স্বীকারোক্তি করেছিলেন: "এইমাত্র 'দাসী' নামক একটি পত্রিকা খুলিয়াই দেখিলাম যে, আপনার আত্মজীবনা হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাগলপুরে পূজনীয় রামতনুবাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাশয়ের তর্ক······সেবক প্রণীত একখানি কৌতুকনাট্য—নাম 'একাকার' উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন। ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে সংসারের অত বড় একটা কথার বিস্তার, তর্ক ও শেষ মীমাংসা অসম্ভব।" অমৃতলালের পক্ষ সমর্থন করে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা (১২ই মাঘ, ১৩০১) মন্তব্য করেন: "হিন্দুর পবিত্র প্রথা জাতিভেদ কর্মভেদ—যাহার অরক্ষণে দিন দিন আমরা এই চরম দুর্গতির সীমায় নিপতিত হইতেছি, 'একাকার -এর রঙ্গচিত্রে তাহারই দোষগুণ বড় সুন্দররূপে চিত্রিত।" নাট্যকার মহিলাদের গানের অবতারণার মাধ্যমে 'একাকারের' পরিণতি যেমন উল্লেখ কবেছেন—তেমনি তার প্রতিরোধেব পথের নির্দেশ দিয়েছেন:

"ধর্লে দেখ বিষম নেশা
করবে না কেউ জাতের পেশা
উল্টো আশায় সব খোয়ালে
ভাতের তরে হাহাকার।

আমরা যদি সত্যি সতী
করবো আদর মুটে পতি
চাষ ছেড়ে দাস হ'তে গেলে
কান ম'লে দেব তার॥"

রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন জেনানা' (১৮৮৫) নাটকেও স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়েছে। গৃহিণীর অলঙ্কার বিক্রয় করে এবং পিতার কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে নেপাল একটি প্রেস ক্রয় করল এবং একটি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করলো। তাতে কোন প্রকার আর্থিক লাভ না হলেও সেদিকে নেপালের ভ্রূক্ষেপ নেই। ধার করে পোশাকের ব্যবস্থা করে সে টাউনহলের সভায় যায় এবং কর্মব্রতই জীবনের উন্নতির একমাত্র সোপান বলে ভাবপ্রচার সুরু করে। প্রতিবেশী বীরেশ্বর তাকে উপদেশ দেয় প্রথমে নিজের পিতামাতা এবং গৃহজীবনের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে। কিন্তু ভাবলোকবাসী নেপাল এ দেশীয় ব্যক্তিগণের 'sacrificing spirit'-এর অভাব বলে তাকে এ-বিষয়ে ব্যঙ্গ করে। নেপাল তার শিক্ষিতা স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক পাঠে উদ্দীপিত করে। দুর্ভিক্ষ-তহবিলের অর্থ দিয়ে নেপাল স্ত্রীর বিলাতী পোষাক তৈরী করে। পুত্রবধূর গতিবিধির বিষয়ে মন্তব্য করলেই সে শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়কেই তিরস্কার করে। এদিকে স্ত্রীর বিলাসেচ্ছা মেটাতে গিয়ে নেপাল চতুর্দিকে প্রচণ্ডভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিকে হেমাঙ্গিনীর কোন দৃক্‌পাত নেই—সে কালীপদবাবু নামক এক সঙ্গীর সংগে 'পবিত্র প্রণয় বিষয়ে' আলোচনা করে উদ্যানে ভ্রমণে বেরিয়ে যায়। পাশ্চাত্য সমাজে চুম্বন দোষাবহ নয় বলে হেমাঙ্গিনী আমাদের সমাজেও চুম্বন প্রচলিত হওয়ার ঔচিত্য বিষয়ে কালীপদবাবুকে অবহিত করেন। মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ সুখবৃদ্ধির কারণে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন যে একান্ত প্রয়োজন—এ তত্ত্ব বুঝিয়ে হেমাঙ্গিনী কালীপদকে নির্জন গ্রোভের মধ্যে নিয়ে গেলে নেপথ্যে থেকে সবই নেপালের দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের দেনার দায়ে বিপর্যস্ত নেপাল হেমাঙ্গিনীর কাছে অর্থ প্রার্থনা করলে শিক্ষিতা স্ত্রী বললেন,—'Female-এর sacred bodyতে assault' করলে অভিযুক্ত হতে হবে।' আর কালীপদও তার 'দুর্বল female friend'-কে নেপালের ন্যায় 'দৈত্যের হস্তে' রেখে যেতে সম্মত হলেন না। নেপাল বাধা দিতে এলে প্রহৃত হল এবং তার দৃষ্টির সামনেই কালীপদবাবু তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে পলায়ন করল। স্ত্রী-শিক্ষার বিষময় ফল দর্শন করে নেপাল তখন তার কৃত কার্যের জন্য আক্ষেপ করতে লাগল। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে যে মুক্ত মতামত প্রকাশ করেছিল—বাস্তবক্ষেত্রে তাকে রূপ পেতে গিয়ে বিরূপ সামাজিক মনোভাবের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করতে হয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে এই সকল নাটকও পরোক্ষভাবে সামাজিক রূপের তথ্যসংযোজনায় সহায়তা করেছে।

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সপ্তাঙ্ক নাটক 'দুর্গোৎসব' (১৮৬৮) হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকা-বিরোধী ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে দুর্গোৎসবের উপযোগিতা প্রতিপাদনার্থ এই নাটকখানি রচিত। আখ্যায়িকা অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকেও ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজের বিরোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় ও তাঁর শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্তৃত চিত্রচয়নে নাট্যকার পরিবেশ-বিমুখী আত্মতৃপ্ত হিন্দুর শাস্ত্রবিলাসকে পরিহাস করেছেন।

৩

স্ত্রীসমাজের প্রগতিশীলতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে একদল সমাজপতি ও নাট্যকার যেমন সোচ্চার হয়েছিলেন—আবার বিপরীত মতাবলম্বী একদল নাট্যকার অবহেলিত স্ত্রীসমাজের প্রতি সর্বপ্রকার উদার মতাদর্শ ও সহানুভূতির পরিচয়াত্মক নাট্যরচনা করেন। এঁদের মধ্যে বিপিনবিহারী সেনগুপ্তের 'হিন্দুমহিলা নাটক' (১৮৬৮) উল্লেখযোগ্য। বাঙালী স্ত্রীসমাজের দুরবস্থাই এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গকামিনী নাটক' (১৮৬৮) পিতৃগৃহে অনূঢ়া কন্যার দুর্গতি ও বিধবাকন্যার লাঞ্ছনার চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে। স্ত্রীসমাজের প্রতি উদার মতাবলম্বী সহানুভূতির দৃষ্টিক্ষেপ করে বটুকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'হিন্দুমহিলা নাটক রচনা করেছিলেন। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারীর দুঃসহ লাঞ্ছনাকে নাটকের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠায় রসোজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে।

সম্প্রসারিত সমাজ-চেতনা : জাতীয়তাবোধ

বাঙালী জনমানসের একটি বিশেষ জাগৃতির উন্মেষ ঘটেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সম্মিলিত জাতীয়চেতনায়। ক্রমোন্মুখ রাষ্ট্রীয়-চেতনায়

'হিন্দুমেলার' উদ্বোধনের পর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে ধারণা আছে যে, ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে প্রথম জাতীয়তা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা জন্ম নেয়। এই চার্টারের সূত্র ধরেই আরও কয়েকটি কল্যাণমূলক সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ ঘটে। সেগুলিকে আমরা নিম্নরূপে স্মরণ করতে পারি :

১. দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে জমিদারী এসোসিয়েশন ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ১৮৪৩ সালে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে বেঙ্গল্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন—যার পশ্চাতে জর্জ টম্প্‌সনের চেষ্টাও কার্যকর ছিল।

৩. রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে দেশের নাড়ীর প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের পর শিক্ষিত বাঙালীর মনোজীবনে আত্মনির্ভরতার অভাববোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নবতর চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হল। শিক্ষিত বাঙালীরা সমসাময়িক পাশ্চাত্যদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের উগ্র প্রয়াস প্রত্যক্ষ করে স্বাধিকার বাসনায় উদ্বেলিত হযে উঠলেন। জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও স্থায়িত্ব ধারণা বাঙালীর কর্মবিচিন্তাতে প্রভাব বিস্তার করল। আমাদের সামাজিক বা ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠতা তখনও লাভ করেনি। আমাদের সনাতন রীতিনীতি য়ুরোপীয় জ্ঞানালোকের স্পর্শে জাগ্রত হযেছিল নিঃসন্দেহে—কিন্তু সেইসংগে আমাদের মধ্যে এ আশঙ্কাও সেদিন জেগেছিল—"আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে যে সকল সুনীতি ও সুরীতি লাভ করিয়াছি, তাহাও এই পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে।" সামাজিক ও ধর্মীয আন্দোলনের সংগে অসংসক্ত থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে যথার্থ প্রাণশক্তিকে জাগাতে পারেনি তখন। তাই জাতীয় গৌরবেচ্ছাকে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে জাতীয়তার জাগরণের প্রযোজন দেখা দিল। মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন থাকা কালেই রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণীসভা স্থাপন করে স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, পোষাক বিষয়ে আত্মভাব সংরক্ষণ ও পোষণের

ব্যাপকতর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' (আশ্বিন ১৭৮৮ শক) ইংরেজিতে যে অনুষ্ঠান পত্র রচনা করেছিলেন—তার কিয়দংশ স্মরণ করা যেতে পারে: "হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সংগীত, হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদের কথোপকথনের ভাষায় বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্র লেখা এবং বাঙ্গালীর সভাতে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকরপ্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজসংস্কার কার্য সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথাসকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহারকার্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়।" এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাতই স্বদেশানুরাগের ব্যাপকতর প্রবাহরূপে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার বৃহত্তর পরিসরে ব্যাপ্তি পেলো। নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপারে' সমাজ-আন্দোলনের ভিত্তিতে ও জাতীয়ভাব সঞ্চরণের জন্যে উক্ত অনুষ্ঠানপত্রটি স্বদেশচিন্তার মূল্যবান দলিলরূপে হুবহু মুদ্রিত হল এবং এই বর্ণিতব্য বিষয়বস্তু পাঠেই নবগোপাল মিত্রের মনে অনুরূপ জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার চিন্তা উদিত হয়।[৭] নবগোপাল মিত্রের 'জাতীয় সভা' মূলতঃ রাজনারায়ণের 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার আদর্শেই গঠিত হয়েছিল। জাতীয় মেলার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব নবগোপালকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন-বৃত্তির উন্মেষকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। জাতীয় ভাবের উদ্বোধনকল্পে এই জাতীয় মেলার কার্যকারিতা প্রসংগে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন: "কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে

৭ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী' সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।"

যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব-আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল।·········তাহা নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ।" জাতির স্বাদেশিক আদর্শকে নৈর্ব্যক্তিক সার্বজনীন রূপ দানের মহৎ ইচ্ছাকে নবগোপাল রূপ দিয়েছিলেন 'National Gathering' নামীয় একটি প্রবন্ধে। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসংগে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র ভূমিকা উল্লেখ করে বলেছেন: "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।" ১৮৬৭ সালে অর্থাৎ ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে বেলগাছিয়ায় উদ্যানবাটীতে হিন্দুমেলার যে প্রথম অধিবেশন উদ্যাপিত হয়েছিল—তার মুদ্রিত পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণীতে (১৭৮৯ শক) 'দেশীয় লোকের দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য সাধন' করাই প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ব্যক্ত হয়। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অধিবেশনে হিন্দুমেলার ঐতিহাসিক কার্যকারিতা ও তাঁর অভিপ্রায় বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করেন। হিন্দুমেলার ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসংগে সেই প্রস্তাবিত বক্তব্যকে উপস্থাপিত করছি: 'এই চৈত্র মেলার তত্ত্বাবধারকগণ এই মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমি আপনাকে এই কর্মের অনুপযুক্ত মনে করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধে যথাসাধ্য ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা, এইরূপ একত্রিত ফল যদ্যপি আপাতত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কতো আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কতো উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও হিন্দুদিগেরি জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন

বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্যে—ইহা ভারতভূমির জন্য।

ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে। অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের স্বদেশীয় কতিপয় ভদ্র মান্য ব্যক্তি এই মেলার কোন না কোন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একতা নিবন্ধন, স্বদেশানুরাগ বর্ধন ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দেশ জন্য মণ্ডলীসকল সংস্থাপিত হইয়াছে, কেহ কেহ দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেহ কেহ যাহাতে ভারত যুবক-যুবতী বিদ্যাভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্নশীল হইয়া সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বিদ্যা এবং জ্ঞান আমরা যেখান হইতে পাই তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইব না, কেহ কেহ সেই বিদ্যার ফল-স্বরূপ শিল্পজাত নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকগণের তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ হৃদয়ের প্রকৃত স্বর যে সংগীত—সেই সংগীতবিদ্যার উন্নতিসাধনে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদের শারীরিক দুর্বলতা বিমোচন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ মেলার জন্য সংগৃহীত অর্থ যাহাতে এই মেলারি নিমিত্ত ব্যয় হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। যখন আমাদের সকলেরি একরূপ যত্ন, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই কর্ম, বা এই উদ্দেশ্য সফল হইবেই হইবে, কিন্তু নিরুৎসাহের কর্ম নহে এবং সেই উৎসাহের জন্যই সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম ইতি।'

তারিখ ৩০ চৈত্র, শকাব্দ ১৭৮৯, শনিবার।

এর পরে নবগোপাল মিত্র 'আমাদের দেশ মধ্যে বা দেশ সম্পর্কে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছে' তৎসম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। এই বিবরণ রাজ্যসম্বন্ধীয়, বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, বিদ্যা সম্বন্ধীয় ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক ছিল। সমাজ বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"সমাজের উন্নতি জন্যে নানাপ্রকার উন্নতি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বহু স্থানে মদ্যপান বিবরণী সভা স্থাপিত হইতেছে। সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত অনেক সম্ভ্রান্ত লোক চৈত্র মেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, ইহার দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গল হউক দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় সৎকার্য অনুষ্ঠিত হউক এবং সকল জাতি ও শ্রেণী মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করুক।" এরপরে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শিবনাথ শর্মণঃ ইত্যাদির দেশাত্মবোধক পদ্যসকল পঠিত হয়েছিল। স্বদেশ সংগীতাত্মক এইসকল সংগীতের মধ্যে তৎকালীন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ যুগ ও জীবনের একটি আত্মার সংযোগ ছিল। এই সম্মেলন থেকেই সংগীতের মাধ্যমে ভারতচিন্তার বিকাশ সম্ভাবিত হয়েছিল। সমস্ত দিক দিয়েই এই চৈত্র মেলাকে নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল ঐতিহাসিক। এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের ভূমিকা পাঠ করেই উচ্চারণ করেছিলেন মনোমোহন বসু: "দেশের বর্তমান অবস্থানুসারে এমন একটি সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা আছে কিনা, যাহা আধুনিক সমুন্নত বিদ্যাবুদ্ধির সমাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভারতভূমির মঙ্গলভাণ্ডার স্বরূপ হইতে পারে ......যদি এমন রুচিকর কোন একটি মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তবে এই চৈত্রমেলা সেই অভাব দূরীকরণার্থে—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৭৯০ শকে বাংলা ১২৭৫ সনের ৩০শে চৈত্র; ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনের কার্যবিবরণীর 'কপি' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। মনোমোহন বসু এই তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় মেলার কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন: 'এই মেলারূপ সমাবেশটি অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে উন্নতি প্রসবের ক্ষমতা দান করিতেছে। কুজ্ঝটিকার পর নবোদিত অরুণকে দেখিয়াই যেমন মাধ্যাহ্নিক মার্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি অনুভব করিতে পারা যায়,

তেমনি হিন্দুসমাজের বহু বিশৃঙ্খলার পর এই মেলার আবির্ভাব দেখিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ প্রভাব অনুভূত হইতেছে।.........দেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের এইরূপ সদুৎসাহ, সদাগ্রহ এবং সৎসংকল্প দৃষ্টি করিযা কাহার অন্তঃকরণই বা আপনা হইতে সুখতরঙ্গে মগ্ন এবং আশাগগনে উত্থিত হয়?..... এই মেলা যে হিন্দু-জাতির কতো আরাধ্য বস্তু, তাহা বাক্যেও নয়, লেখনীতেও নয়, কিছুতেই প্রকাশ করিবার নয়, ধ্যান ভিন্ন হৃদ্বোধ হইবার উপায় নাই।" মেলার তৎকালীন অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুসারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক কিংবা রাজকীয় উন্নতিকে অধিরোহন সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দৈহিক ও সামাজিক উন্নতির সংগে সাহিত্য, কবিত্ব কিংবা বাগ্মীতার অনুশীলনে অন্তর্জীবনেব রসোদ্বোধন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে অখণ্ড ভারতচেতনার উন্মেষ সম্ভবপর ছিল। জাতিতে অর্থনৈতিক দিক দিযে আত্মনির্ভরশীল ও অন্নসংস্থানে বলবান করে তোলার বিষয়ে চিন্তা করেই মেলার উদ্যোক্তারা কৃষি শিল্পবিষযক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। তাছাড়া এর মধ্যে 'স্বদেশীয উদ্যোগ দ্বারা' স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি, স্বদেশের শিল্পের সংস্কার ও উত্থানেরও একটি লক্ষণীয দিক ছিল। ঢাকা শান্তিপুবের তন্তুবাযগণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, লক্ষ্ণৌযের ভাস্করগণ চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের সমব্যবসায়ী ও সমশিল্পীরা যখন এই চৈত্রমেলায় প্রদর্শনীর রঙ্গভূমিতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়—তখন এই মেলার সামাজিক ভূমিকা স্বজাতীয় গৌরবভূমির মর্যাদা পায়।

শুধুমাত্র ঐক্য ও অর্থনৈতিক নির্ভরতাই নয়, দেশবাসীর শারীরিক সাফল্যের মধ্য দিযে সমাজবন্ধন দৃঢ় করে সামাজিকতার পুনরুদ্ধার ব্রতও হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম—যা পরতন্ত্রতা থেকে মুক্ত। সেই স্বজাতিধর্মকে উদ্ধার করে হিন্দুমেলা 'আত্মনির্ভর নামা শোণিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলা'কে ছিন্ন করতে চেয়েছে। স্বাবলম্বন অভ্যাসকেই স্বাধীনতা লাভের অদ্বিতীয় সাধনরূপে গ্রহণ করা হযেছিল। এই সাধন পথের সামগ্রিকতা নিযে সংস্কৃতে 'ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা' নানা বিষয় কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল:

১. **বিদ্যা—**

'পূর্বৈঃ সুরিভিরত্র ভারত মহোদ্যানে চিরং রোপিতা।
বিদ্যামূলবতী মহোন্নতিলতা জ্ঞান প্রসূনোজ্জ্বলা।
তস্যাঃ সেবিতুমস্তিচেৎ সুখফলং বাঞ্ছা হৃদি ভ্রাতরঃ
তন্মূলংমিয়তং প্রযত্নসলিলৈঃ সিঞ্চন্তুসর্বে তদা॥'

২. **ভাষা**—কাঠিন্যাভিধদুর্গদুর্গমমহাবিদ্যাপুরীবিদ্যতে
শান্তিঃকাপিচ কোঽপি তত্র পরমানন্দশ্চিরং রাজতে
তন্মধ্যে যদি গন্তুমস্তি ভবতামিচ্ছা নিতান্তং তদা
ভাষাজ্ঞান বিশালরম্যসুগমদ্বারং সদা সেব্যতাম্॥

৩. **কৃষি**—যেয়ং ভারতভূমিরুর্বরতয়া জিত্বা সমস্তং জগৎ
সূতেদুর্লভশস্যরত্নমখিলং স্বল্পে প্রযাসে কৃতে।
স্বাধীনং কৃষিকর্ম গৌরবকরং তস্যাবিহায়াধুনা
রে রে ভারতবাসিনঃ পরবশা হা ধিক! কথং জীবথ।

৪. **বানিজ্য—**সৌভাগ্যং যদি গৌরবং যদি পরাং খ্যাতিং সমৃদ্ধিং যদি
প্রাধান্যং যদি চান জাতাসুলভং লব্ধু মতির্জায়তে।
লক্ষ্মীবন্ধনদামবৎ সুখসরঃ সোপানসন্তানবৎ বাণিজ্যং
পরমঙ্গভারতজনাঃ সর্বাত্মনা সেব্যতাম্॥

৫. **রাজনিয়ম**—সর্বান্ সোদরবৎসমীক্ষ্য চ করান্নুৎসর্থ পীড়াকরান্
সর্বেভ্যোনিজজাততুল্যবিভূতাং দত্বাখিলেকর্মণি
হং হো! ভারতবাসিনামহরহঃ কল্যাণকার্যেবতা
ইংলণ্ডীয় দয়ালুরাজপুরুষাঃ! কীর্তিশ্চিরং রক্ষত॥

৬. **উপসংহার—**

অয়ি মাতর্ভারতভূমি! ত্বংপুরাধর্মেণ বিদ্যয়া নিযমেনাচারেণ সমৃদ্ধ্যা প্রভাবেন গৌরবেণ চ ধরণ্যাং প্রাধান্যমনন্যসুলভমযাসীঃ সাম্প্রতং ক্ষীণপুণ্যানাং মন্দভাগ্যানামমীষাং তব পুত্রাণাং দোষেণোপস্থিতোঽযমহহ! তে কোপ্যপরিচিত-পূর্বো বিষমো দশবিপর্যাসঃ

... ...

পরাধীনাম্ মগ্নানতি-বিপুল দুঃখাম্বুধিজলে
বলক্ষীণান্ হীনান্ সকলসুখ সৌভাগ্যনিচয়ৈঃ।

কৃপাসিন্ধো! নাথ! ত্রিভুবনগুরো! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি বিতর কারুণ্যকণিকাম্॥

হিন্দুমেলায় চতুর্থ অধিবেশনের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাওয়া যায় না। চতুর্থ অধিবেশনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭০) প্রকাশিত হয়েছিল। মেলায় 'এতদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতদ্দেশীয় স্ত্রী পুরুষগণের কৃত' প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। চতুর্থ অধিবেশন চৈত্র সংক্রান্তির পরিবর্তে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হতে সুরু হল। ১৮৭০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন: 'আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্যের, ব্যায়াম ও শাস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এতো হীনতা······আমাদের সমাজ অনেক অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় শাসন সহ্য করিয়াছে এবং তাহাতে ইহাকে একরূপ নির্জীব ও নিস্তেজ করিয়া তুলিয়াছে। একটু নাড়াচাড়া না করিলে আবার উহার চৈতন্য জীবন্ত হওয়ার সম্ভব নাই।'

পঞ্চম অধিবেশন সম্পর্কে 'সুলভ সমাচার' (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১) পত্রিকায় এই মেলা বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হয়। এই অধিবেশনে জাতীয়তার জাগরণের সংগে সংগে শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতিও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র (২রা মার্চ, ১৮৭১) ভূমিকা লক্ষণীয়: 'ব্যায়াম চর্চার প্রথম সোপান নবগোপাল বাবু দেখাইয়াছেন, তিনি 'ধন্যবাদের পাত্র।' ১৮৭২ সালের ১১ই ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পন্ন হয়। মনোমোহন নববঙ্গকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,—"প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখবর্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরূক হও —উত্থান কর—চক্ষুরুন্মীলন কর—পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও— স্বাবলম্বন রূপ বসন পরিধান কর—ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর।" ১৮৭৩ সালের সপ্তম অধিবেশনের কিছু আগে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মেলা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন,—"ফাল্গুন মাসের ৫ তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশ হইবে। স্রোতের গতির দিক পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায় সেইদিকে অনেকের টনক নড়িয়াছে। বাবু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে

শ্রোতাদের অফুরন্ত উৎসাহ দেখা যায়।……আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মেলাটি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয় এবং অনেক লোকেরও সমাবেশ হয়।……হিন্দু সমাজ ভিন্ন দেশীয় রাজার অধীনে অবস্থিত, এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রাদুর্ভাব। এক্ষেত্রে বলক্ষয়ী সমাজকে পুনঃ সবল করা কঠিন কাজ।…জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য যদি হিন্দুসমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করা লক্ষ্য হয় তাহা হইতে অনেক বিলম্ব আছে এবং বিলম্বে হওয়ারও সন্দেহ আছে। মেলার কর্তৃপক্ষরা ইহাকে আপাতত একসূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলেও উহার পুনর্জীবনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।" মেলা সমাপনান্তে পত্রিকা মন্তব্য করেন,—"আমরা যখন দেশীয়গণের এরূপ কোন নিঃস্বার্থ উৎসব দেখি, তখনই আমরা পুনর্বার যে জীবিত হইব এই আশায় আশান্বিত হই।" এই মেলায় জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের মর্মস্পর্শিতা বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মফঃস্বলেও নাট্যাভিনয় বিষয়ে নবগোপাল মিত্রকে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমসাময়িক সামাজিক জীবন তাৎপর্য অনুধাবন করবার জন্যেও পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন: "……দেশের মধ্যে আপাতত রাজনৈতিক সম্বন্ধে লোকের স্বার্থ ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং যদি কোথায কোন অত্যাচার হইতেছে মেলা দ্বারা নবগোপাল বাবু তাহার সংগ্রহ করেন তবে বিস্তর উপকার হইতে পারে……তিনি পুতুল দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক দুর্দশা প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।" ১৮৭৪ সালের ১১ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী অষ্টম অধিবেশন হয়। রাজনারায়ণ বসু মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-ঘটিত একটি বক্তৃতা দেন। মন্তব্য-লিপি পাঠ সমাপ্ত করা হলে মনোমোহন বসু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসংগে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৮৭৫-এর নবম অধিবেশনে কিশোর রবীন্দ্রনাথ সাধারণ সমক্ষে 'হিন্দু মেলার উপহার' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। দশম অধিবেশন (১৮৭৬) বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন: "আনন্দমোহন বসুর স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন বা ছাত্রসভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নব্য ইটালী, ম্যাটসিনি, শিখ শক্তির অভ্যুদয় প্রভৃতি শীর্ষক যে-সব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের যুবক-সমাজ একেবারে যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ সাধারণ শিক্ষিতের অধিগম্য একটি রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠায়ও

তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ'নামে একটি সর্বসাধারণের রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠায়ও তৎপর হইয়াছিলেন।······জাতীয় মেলা যে-সব উদ্দেশ্য সাধনে এতদিন তৎপর ছিলেন তাহাও এই সভার কর্তব্য মধ্যে গণ্য হইল।······জাতীয় মেলা একাকী যে-সব কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদিনে সাহিত্য, নাটক, কাব্য, পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ এবং ইণ্ডিয়ান লীগের মত রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়া তাহা বস্তুগত হইবার অবকাশ পাইল।" একাদশ অধিবেশন প্রসংগেও 'সাধারণী' পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল যে, ইণ্ডিয়ান লীগ ও এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় মেলার অস্তিত্ব তারই দ্বৈতরূপের অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থ পর্ব : প্রথম অধ্যায়

জাতীয় ভাবৈষণার বিস্তারের পর্ব (১৮৭০-৮০)

বাংলার সমাজজীবনের পর্যালোচনা করে ইতিপূর্বে আমরা সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতি ও নীল-আন্দোলনের সংঘবদ্ধ জাতীয়তার ঐক্যচেতনা বিষয়ে আলোচনা করেছি। সমাজচিন্তার সম্প্রসারিত রূপের মধ্য দিয়ে নবোপলব্ধ জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকশিত রূপটিই আমরা হিন্দুমেলার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এই মেলার প্রসঙ্গ পর্যায়ে নানা রাজনৈতিক আলোচনাও অঙ্গীভূত হয়েছিল। হিন্দুমেলার নবজাতীয়তার সূত্রে ধরে নানা ঘটনা পরম্পরায় পরবর্তী রাষ্ট্রনীতিতে আত্মশক্তিই বৃহত্তর সমাজশক্তিরূপে প্রমাণিত হয়েছিল। এই নবজাতীয়তার মহৎ মন্ত্র উচ্চারণ করে মেলার পক্ষ থেকে একদা মনোমোহন বসু উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন : "স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ প্রদর্শক কর, তিনি অচিরে নির্মল আনন্দমন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন।" সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকার সূত্রপাত এখানেই। দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতাও প্রকারান্তরে জাতীয়চেতনার জাগরণে সহায়তা করেছে। বিদেশীবর্জন ও স্বদেশীয় সামগ্রীর পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে এ পর্ব সূচিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক শিশির-কুমার ঘোষ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের মানস-ভূমিকায় ভারতবাসীর যোগ্যতা বিষয়ে ১৮৭০ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় রাজনৈতিকচেতনার গুরুত্বকে স্বীকার করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা থেকে লক্ষণীয়রূপে পাঁচ টাকায় হ্রাস করে দিয়েছিলেন তিনি। ভূম্যধিকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার কারণে এসোসিয়েশনের অন্যান্য সভ্যরা তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভংগীর স্বীকৃতি দিলেন না। এই কারণেই তিনি 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা বিষয়ে চিন্তা করেন। শিশিরকুমারের এই ভূমিকা এবং সমাজে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার বিস্তার বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "শিশিরকুমার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন, তাঁর অগ্রজ

হেমন্তকুমার বঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চলে গিয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সাধারণকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।" (পৃ. ১০৮) বিশাল ভারতবর্ষকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের কারণে নানা প্রকোষ্ঠে স্বতন্ত্র করে তুলবার রাজনৈতিক তাৎপর্য বা অভিপ্রায় বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালী সচেতন হয়ে উঠল। প্রগতিশীল 'রাজনৈতিক পাদ্রী' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠায় শিশিরকুমারকে সহায়তা করেছিলেন।

যুবছাত্র শক্তির ভূমিকা দেশ ও জাতির জীবনমূলে সংসক্ত একটি অনিবার্য শক্তি। আনন্দমোহন বসুর মাধ্যমে 'স্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৫-৭৬) নামে এই জাতীয় শক্তি-উদ্দীপক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। পুণার ছাত্র সভার আদর্শে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রসভা'র সহ-সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষে শিখ সম্প্রদায়ের জাগরণ' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন—তাতে জাতির স্বদেশপ্রেমকে ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত করে স্বদেশপ্রীতির নবদৃষ্টির পরীক্ষা দিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক ভাষণও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধুনিক তথ্যনির্ভর দেশাত্মবোধক ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। শক্তিশালী জনমতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়চেতনার ঐক্য প্রতিস্থাপনে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছিলেন। য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণপ্রকৃতির সংগে প্রত্যয়নিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি ও ভক্তির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।[১] তাঁরই প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে—রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশোদ্ধারের নীতি ও নিয়ম অনুশীলনের জন্য গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। স্বায়ত্ত শাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে সুরেন্দ্রনাথ 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারত সভার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্ত শাসনকে গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পেতে চেয়েছিল।

---

১ ইটালীর সদ্যোজাগ্রত জাতীয়তাবোধ বাঙালীকেও সেদিন উৎসাহিত করেছিল। সুরেন্দ্রনাথও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মোহমুক্ত হয়ে মাৎসিনীর জীবনাদর্শকে সমর্থন করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মাৎসিনীর আত্মজীবনী অবলম্বন 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় (১২৮২) 'জোসেফ ম্যাটসিনী ও নব্য ইতালী' প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন।

লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার আফঘানিস্তানের সংগে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন—তার প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতেও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-সংকট দেখা দিয়েছিল তাতে ত্রাণকর্তার ভূমিকাতে তো নয়ই—বরং দুর্ভিক্ষ-তহবিলের অর্থ ব্যয় করতেন ইংরেজ সরকার আফঘান সমর পরিচালনায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতবাসীর ক্রমোন্মুখ রাজনৈতিকচেতনা ১৮৬০-এর শেষার্ধে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক তাৎপর্যে বেশ কিছুটা প্রতিক্রিয়ামুখর হয়েছিল। সমগ্র সমাজ-রূপের দৃষ্টিভংগীও এই পরিবর্তিত মানসভংগীর দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রে বৃটিশ শাসন-সমীক্ষার প্রতিবাদে বাঙালী যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—বৃটিশ সরকার স্বাভাবিকভাবেই সেই জাতীয় ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকও প্রতিনিধিদের সম্মেলনে 'নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশন' সংগঠিত করলেন। ১৮৭৮ সালেই 'ভার্ণাকুলার প্রেস আইনের' সহায়তায় একদিকে দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করলেন, আর একদিকে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ আইনরূপে 'আর্মস অ্যাক্ট' (১৮৭৯) চালু হল। শাসক-শাসিতের রাজনৈতিক সম্পর্কের তিক্ততা প্রবল হয়ে উঠল। লর্ড লিটনের শাসনকালে প্রেস-আইন পরিত্যক্ত হয়েছিল। এর প্রত্যক্ষ ফলকে ব্যাখ্যা করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন: "By these measures Lord Lytton instead of reconciling the new political consciousness in this country to British Rule······helped to create and strengthen a new anti-British feeling among our people."

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় অর্থ ভারতকে সংগ্রহ করতে হত খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করে। ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা চাষীদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের কোন ভূমিকা তৈরী করতে পারেনি। খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করে ভূমিরাজস্বের মহার্ঘ্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ১৮৭৭ সালে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ভারতসচিব তুলোজাত জিনিসের উপর শুল্ক রহিতকরণে সুপারিশ করেন। পরামর্শ-সভার একান্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও লিটন শুল্ক রহিত করলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্থির পটভূমিকায় বাংলার সমাজজীবনে জাতীয়তার

প্রস্তুতি-পর্ব বিনির্মাণ হচ্ছিল। আবার এই সংগেই জনজাগরণের ব্যাপারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সে সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'Brahmo Samaj and the battle of Swaraj in India' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'Anandamohan as a leader of the new Sadharan Brahma Samaj was engaged in framing a constitution for his church which was meant to be a model for the future constitution of a free and democratic India.' ধর্মসংস্কার মুক্ত গণতান্ত্রিক চিন্তার উদ্বোধন হতে সুরু হল এইভাবে। বৃটিশ বিরোধী আত্ম-প্রত্যয়ে দৃঢ় মনোভাব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ভাব-ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছিল। প্রথম যুগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' জাতীয়তার জাগরণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—বাঙালীকে সর্বতোভাবে সমাজমুখীন ও স্বদেশাভিমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা—"নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালী স্পৃহনীয় ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন……যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাপ্তাহিক 'সাধারণী' (১২৮০) পত্রিকার মধ্য দিয়েও বাংলার সমসাময়িক সমাজজীবনের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। ইংরাজি শিক্ষার মধ্য দিয়েই বাঙালীর অন্তরে প্রকারান্তরে জাতীয় অভাববোধের তীব্রতা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালীর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতি বিষয়েও আমাদের সমাজমনকে সচেতন করেছেন 'সাধারণী' পত্রিকা—"ইংরাজ আমাদিগকে ইতিহাস পড়াইযাছেন, আমাদের নিজের ইতিহাস নাই, এই দিব্যজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।"

ধর্মবৈষম্যজনিত বিভেদ অর্থবণ্টনের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করলে মানুষের সমাজমুখীন মনোজীবন যে বিপর্যস্ত হয়, সেই গণতান্ত্রিক সমাজাভিমুখী চিন্তাধারা ব্যক্ত করে রাষ্ট্রিক সাধনা ও জাতীয়তাকে ব্যাখ্যা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সংঘবদ্ধতাকেই জাতির ও সমাজের সংবিধানরূপে রচনা করে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় জাতীয়তার জাগরণকে চিত্রিত করতে চাইলেন।

চতুর্থ পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ রঙ্গালয় ও বাংলা নাটকে ভারতচিন্তা

বাংলা নাটকে 'সখের থিয়েটার'-এর কাল (১৮৫৭-১৮৭২) ছিল সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত। এদেশের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে 'সখের থিয়েটার' যুগের অভিজাতদের উদ্যোগ মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু এই নাটকাভিনয় জনসাধারণের অবারিত প্রবেশ-সিদ্ধ ছিল না। এছাড়া সে-যুগের নাট্যাভিনয়ে আরও কতকগুলি অসম্পূর্ণতা ছিল। এই কারণগুলি হল—প্রথমত, বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা তখন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-রূপে ও নিয়মিত শুরু হয়নি। দ্বিতীয়ত, বিশেষ উৎসাহী বা ধনী ব্যক্তির খেয়াল বা সখ থেকে উদ্ভূত বলে এই অভিনয়ে তাঁর 'মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা উৎসাহ লোপের' সংগে সংগেই তা বন্ধ হয়ে যেতো। কাজেই ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটক ও অভিনয়ের, ঐতিহাসিক কারণ-সম্মত একটি অনিবার্য ফলশ্রুতি।

ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিকজীবনের যুগান্তরের মধ্যেই আধুনিক বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়ের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সূচিত হল। ১৮৫৭ সালে তিনটি সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা নাটক ধনী বাঙালীর বৈঠকখানা ও সখের নাট্যশালার যুগ অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু এই সময়কার বাঙালীর ক্রমোন্মুখ জাতীয়চেতনা বিষয়েও আমাদের অবহিত থাকতে হবে। বৃটেনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নবতর দেশাত্মবোধের লক্ষণ এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৮৫৯ সাল থেকেই বাংলার নীলবিদ্রোহের গণ-আন্দোলন ব্যাপক রূপ পেতে থাকে। গণদরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন ও কৃষকবিদ্রোহের রাজনৈতিক স্তর পেরিয়ে নীল আন্দোলনের আগুন যে কিভাবে ধূমায়িত হয়েছিল—বড়লাটের একখানা চিঠিতে তার পরিচয় স্পষ্ট,—'I feel that a shot-fired anger of fear by one foolish planter might put every farmer in Lower Bengal in flames.'

বাংলার পেশাদারী নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই শুরু। নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সাধারণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করে দিয়েই নীলদর্পণের অভিনয় প্রথম গণ-সংযোগের ইতিহাস রচনা করে। নীলদর্পণ অভিনীত হবার কালে 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' সম্পূর্ণ নাম ছিল—'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি।' এ-বিষয়ে 'সুলভ সমাচার পত্রিকা' (১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭২) মন্তব্য করেন : "কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির সভ্যরা গত শনিবার রাত্রে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছিল। এই অভিনয়ের মধ্যে দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন, বাঙালীজীবন ও সমাজের বিশিষ্ট রূপটি স্পষ্টোজ্জ্বল ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল—সমকালীন পত্র পত্রিকার মন্তব্য তা প্রমাণ করে :

১. 'গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় গিয়াছে।……খোস-পোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জনের সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইযা এই অভিনয কর্ম সম্পাদন করিতেছেন।'—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭২

২. 'The event is of national importance.'—ন্যাশনাল পেপার।

৩. 'বঙ্গবাসীদের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা এই জাতীয় নাট্যালয়কে অবজ্ঞা না করিয়া ইহাতে ক্রমশঃ উৎসাহ ও যোগ স্থাপন করেন।'—এড়ুকেশন গেজেট, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।

দীনবন্ধু মিত্রের স্বাদেশিকচেতনা, চিন্তা ও মতবাদ রঙ্গমঞ্চের ক্রমাগত সাফল্যে ব্যাপ্ত হয়ে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী 'সমাজমনকে উদ্দীপ্ত করেছিল।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বলেছেন : "প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যাশনাল থিযেটার নামকরণ যে নীলদর্পণ মহলা দিবার সময হয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই……ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ লইয়াই গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দু প্রভৃতির মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে গিরিশচন্দ্র দল ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র লীলাবতীর অভিনয়ে একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলদর্পণ অভিনয়ের সময়ে তাঁহার সহিত বাগবাজারের দলের কোন সংস্রব ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ

হয়, 'লীলাবতী' অভিনয়ের পূর্বেই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণের প্রস্তাব উঠে।"[১]

ন্যাশনাল থিয়েটার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয়তার অগ্নিবাণী প্রচার করণ মানসে পশ্চিম ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছিল। নীলদর্পণ প্রথম সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল ঢাকায়। ন্যাশনাল থিয়েটারের আনুকূল্যে অভিনীত নীলদর্পণ নাটকের সংঘবদ্ধ স্বাদেশিকচেতনা ইংরেজ রাজশক্তিকে কতখানি ভাবিত ও আতঙ্কিত করেছিল—নিম্নোদ্ধৃত অংশটি তার পরিচয়বহ: 'A native paper tells us that the play of Nil Darpan is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its represention in calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised,' ('ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭২); সংঘবদ্ধ স্বাদেশিকচেতনা ও ঐক্যবদ্ধ স্বনির্ভরতার যে যুগন্ধর ভাবধারা 'নীলদর্পণ' নাটকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে প্রকারান্তরে ন্যাশনাল থিয়েটারই সহায়তা করেছে। নবগোপাল মিত্র জাতীয়ভাবে বিভোর ছিলেন বলে এই রঙ্গালয়ের এরূপ নামকরণ করেছিলেন রঙ্গালয় যে জাতীয় ভাব প্রচারে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অংশভাগী নবগোপাল তা যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেই জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত হয়ে যাতে সেখানেই অভিনীত হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই উদ্যম ও আগ্রহাতিশয্যে 'জাতীয় সভা'র কয়েকটি অধিবেশন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১ "কিন্তু এই নামকরণ লইয়া দলের মধ্যে একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র সমস্ত জাতির নাম লইয়া এরূপ একটি দরিদ্র নাট্যমঞ্চ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিলেন, এরূপ নাম দিলে ভিন্ন জাতির চক্ষে বাঙালী জাতি হীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দলের অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন তাঁহার কথা শুনিলো না, তখন তিনি দলের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন।"

—বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: —মন্মথমোহন বসু; পৃ. ৭৯

প্রস্তুতি পর্বে সামাজিক অনাচারকে কেন্দ্র করে যে সমাজমূলক নাট্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল—এ-যুগে সেই সামাজিকচেতনা সম্প্রসারিত হয়ে দেশাত্ম-বোধের পটভূমিকায় জাতি সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। বাঙালীর স্বদেশানুরাগের সংহতি ও সংবর্ধনের এই অভিপ্রায়টিও সমাজতান্ত্রিক সত্য। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাপর্বের সূচনা থেকেই উদ্যোগীদের মধ্যে বিবদমান পারস্পরিক মতপার্থক্যের কারণে তা দৃঢ়বদ্ধ রূপ পায়নি। তাই 'সহৃদয়-সামাজিক' দর্শকের রুচিই নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার ইত্যাদির সৃষ্টি, পারস্পরিক ভাঙ্গনের ইতিহাস বাংলা রঙ্গমঞ্চের অস্থিতাবস্থার কথাই প্রমাণ করে। ১৮৮০ সাল থেকে এই অস্থিতাবস্থার অবসান ঘটে। তবে একথা ঠিক যে, ১৮৭২ থেকেই ইতিহাস-চেতনা বাঙালীর মনে দোলা দিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠা ও সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনার মধ্যে দিয়ে রসচর্চ্চার সম্মিলিত রূপের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনা গেল। জাতীয় জীবনের শৌর্য-বীর্য কিংবা গৌরবকে এই যুগের কবি ও কথাসাহিত্যি-কেরাও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপনার এই আবেগ-চঞ্চল মুহূর্ত অতীত ইতিহাসের সংঘাতাতুর মুহূর্তগুলিকে নব তাৎপর্যে রঞ্জিত করে তুলল। ইতিহাসের বিজ্ঞান নির্ভর বিচারের মধ্যে দিয়ে একটা 'অবিশেষ সাধারণ সত্যের' পরিচয় মেলে—বিজ্ঞানানুমোদিত এই জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আছে ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা। কিন্তু এই জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্লীন সত্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কি প্রযোজন? এ-বিষয়ে আলোকপাত করে অতুল গুপ্ত তাঁর 'ইতিহাসের মুক্তি' নামক গ্রন্থে বলেছেন: "ইতিহাস যখন বিজ্ঞান-তখন গবেষণায় ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের বিষয়গুলি আয়ত্ত করে পরিশ্রম করলেই সকল ঐতিহাসিক সমানমূল্যের ইতিহাস রচনা করতে পারেন।" ইতিহাস যে একটা বিজ্ঞান এই চেতনা উনিশ শতকের মাঝামাঝি একজন চিন্তাজীবী সচেতনভাবেই প্রচার করেছিলেন। রোমান্স-নির্ভর আর এক ধরনের ইতিহাসে দীপ্তিময় কল্পনার লাবণ্য থাকে। ছায়াশরীরী অতীতের লুপ্ত ধূপের স্মৃতিগন্ধসার উদ্ঘাটনার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বীরোচিত মুহূর্তের রোমাঞ্চকর উদ্দীপন ও সদাজাগ্রত উৎকণ্ঠা নিরুদ্দিষ্ট স্বপ্নকামনাকে বর্ণময় করে

তুলতে চেয়েছে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও এই জাতীয় রোমান্সের স্বাদকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এবং 'গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ' বিষয়েও উল্লেখ করেছিলেন। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতায়, বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও এই চেতনারই উদ্দীপনাময় বর্ণোজ্জ্বল রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই চেতনার মূল অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে 'দীপ নির্বাণ' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন :

"আর্য-অবনতি-কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা ,
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল।"

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও এই স্বদেশবোধ ও স্বজাতিবোধের উপলব্ধি দানা বাঁধতে লাগল জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য ধারার সঙ্গে। ইতিপূর্বে মধুসূদন তার 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে ইতিহাসের পটভূমিতে জাতীয়চেতনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও যুগের সংগ্রাম ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মানসের প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। মধুসূদন একটি মানবিক কাহিনীকেই ঐতিহাসিক ঘটনার বলয়ে গ্রথিত করেছিলেন। ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকার চরিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মানবরসের মূলাধাররূপে ক্রিয়া করেছে। ইতিপূর্বে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন বলেছিলেন :

"শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর,
হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

ঐতিহাসিক নাটক-সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াসে মধুসূদনই পথিকৃৎ—কেন না এ-জাতীয় ট্র্যাডিশন তখনও গড়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণের উদ্দেশ্যমুখী একাগ্রতা স্বদেশানুরাগের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে প্রথম স্মরণীয় দৃষ্টান্তরূপে দেখা দিল ১৮৭৩ সালে

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নাটকে। সাময়িক যুগোচিত আবেদনের অতি-প্রত্যক্ষতা লক্ষ্য করে অমৃতলাল বসু বলেছিলেন: "এই ভারতমাতার অভিনয়ই বড় শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল। সাধারণে বিষয়টি বড় appreciate করলে। 'ভারতমাতার' ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সেগুলোর আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন ভারতমাতার অভিনয় না হত, সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারতসংগীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হত ঐতিহাসিক নাটকের তথ্যগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েও সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনকে এ-নাটক শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে। বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর দুর্দশা ব্যক্ত করে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলার স্বদেশচেতনা ও ভাবাদর্শ রঙ্গালয়কে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে জাতি গঠনে কতখানি সহায়তা করেছিল—'ভারতমাতা'র অভিনয়-সাফল্য প্রসংগে ১৮৭৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেছিলেন, 'গত শনিবারে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই বারিক' প্রহসনের পর 'ভারত-মাতা'র একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইযাছিল······সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন ও এমন একটি শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যাহা কস্মিনকালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেমন সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ উহা আবার সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশনাল থিয়েটার এই দুইটি মহৎ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইবেন।' মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল 'ভারত মাতা' নাটকের মধ্যে 'gospel of the religion of the mother land'-এর স্বরূপদর্শন করেছিলেন এবং বলেছিলেন: 'the name indicates the nature of the theme and the religious idealisation which might have inspired it.' ভারতমাতার দুঃখদৈন্য দূর করার উচ্চাদর্শে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে নাট্যকার 'ভারতমাতা'র প্রারম্ভেই সূত্রধরের গান সংযোজিত করেছেন:

> "হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখ না চাহিয়ে।
> পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
>
> রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্বনাশ,
> ভুগিছ অশেষ ভোগ, কূপে পড়িয়ে।

হিংসারূপ পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
ম'জনা ম'জনা হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে ॥"

রূপকের দৃশ্য যখন হিমালয় পর্বতের পটভূমিতে উদ্ঘাটিত হল—তখন চিন্তামগ্না আলুলায়িত কেশা ভারতমাতা আসীনা এবং 'সম্মুখে ভারত সন্তানগণ নিদ্রিত।' ভারতমাতা চোখ খুলে অনুতাপ করতে করতে গান ধরলেন :

"উঠ উঠ যাদুমণি কতকাল ঘুমাবে আর।
পালাল ভারতলক্ষ্মী, তাঁর আরাধনা কর ॥
মায়ের বচন ধব, জ্ঞান অসি করে কর,—
এ দুঃখ যন্ত্রণা হতে কররে মোরে উদ্ধার।
হইয়ে তোদের জননী, পরাধীনা অভাগিনী,
এ জ্বালা সহে না প্রাণে হর দুঃখ হর হর।
স্বাধীনতা মহাধন বলনাবে কি কারণ,
লভিবারে বাছাধন, হও না কেন তৎপর ॥"

'বাবা, আর কতকাল তোরা এ প্রকার নিদ্রিত থাকবি ?·· তোদের এখন কি দশা, তোরা কি ছিলি, কি হলি, একবার ভাব দেখি ? তোদের অভাগা জননীর দুরবস্থা একবার দেখ। বাবা, অলংকারগুলি দস্যুতে অপহরণ কবেছে, একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্র আর কতকাল পরতে হবে যাদু ?' এরপরে ভারতমাতার গীত—

'স্বাধীনতা অসি হেসে করে ধর, পবাধীন গ্রন্থি কাটরে সত্বর, যতনে রতন, স্বাধীনতা ধন, লভিবারে যাদু কর প্রাণপণ ; যে ধন বিহনে তোদের জননী, এই দেখ যাদু পথের ভিখারিণী।' 'ভারতমাতা' নাটকে ভারত সন্তানগণের উক্তির মধ্যে দিযেও ভারতমাতাকে আবেদনে অসহায় সন্তানদের জাতীয় দুর্দ্দশার চিত্র ফুটেছে :

"১ম। মা, আমাদের চারিদিকে বন্ধ, কোন্ দিকে যাই মা ? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি করবো মা ? কেমন করে খাব মা ?

২য়। মা, ইচ্ছে হয় যে মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতিপালিত হই, মা তাও হতে দেয় না মা !

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন পর্যন্ত খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের তাঁতগুলি পর্যন্ত বন্ধ। কি করি কোথায় যাই মা, কার কাছে গেলে দুধ খেতে পাবো মা ?”

ভারতমাতার কথায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে ভারত সন্তানগণ দুঃখ নিবেদন করলে এক সাহেব এসে তর্জন গর্জন করল—‘মহারাণীকে ডাকতে তোদের মনে অণুমাত্র ভয় সঞ্চার হলো না ?……মহারাণী, ইংলণ্ডেশ্বরী তা জানিস ? এর পরেই সাহেব ভারত সন্তানদের পদাঘাত করলেন। দ্বিতীয় সাহেব প্রবেশ করে প্রথম সাহেবকে পদাঘাত করলে সে দ্রুত প্রস্থান করল। দ্বিতীয় সাহেব ভারতমাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : ‘মা কিছু দুঃখ করো না, তোমাদের দুঃখ রজনী শীঘ্রই অবসান হইবে।…আর এই যে সজ্জন পালক, প্রজারঞ্জক মহামতী লর্ড নর্থব্রুক গভর্ণর জেনারেল হয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর করবেন।’ ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আস্থাই নাট্যকার প্রমাণ করেছেন উনিশ শতকের উত্তরার্ধে ও বাঙালীর সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধের জাগর মুহূর্তেও ইংরেজ বিরোধিতার কথা কেউ বলেননি।

এ প্রসঙ্গে ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন : ‘কিন্তু সে যুগের অনেক জাতীয় সংগীতের সঙ্গে হিন্দুমেলা উপলক্ষে যে সব গান রচিত কিংবা গীত হয়েছিল তার প্রভেদ চোখে পড়বে। তখনকার দেশাত্মবোধক সংগীত সাধারণতঃ ভারত ভিক্ষা বা ভারত বিলোপে পরিণত হত। যে রচনাকে স্বাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা মনে করা হত তাতেও ইংরেজের স্তুতির অন্ত ছিল না।’[২] (যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত ‘হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের ভূমিকা) জাতীয়তাবোধ জাগরণের এই সচেতন মুহূর্তে সাহস, ধৈর্য্য ও ঐক্যের সমন্বিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যুগ মনীষীরা সংগঠনপন্থী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন :

১. ‘ভ্রাতৃগণ আর কেন করো গাত্রোত্থান
জননীর দুঃখানল করিতে নির্বাণ॥’

---

২ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে রচিত কবিতাটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

“ধন্য রে বৃটেন ধন্য শিক্ষা তোর
যুগ যুগান্তের অমানিশা ঘোর
তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত ভবন
এ সখ্য বন্ধনে বাঁধিল॥”

২. ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে আইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?"

ভ্রান্তিমুক্ত হয়ে, স্বাবলম্বনে কর্ম ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে দেশজননীর মুক্তি মানসে চক্ষুরুন্মীলনের আবেদনে 'ভারতমাতা' নাটকটি সোচ্চার।

'ভারতে যবন' (১৮৭৪) রূপকটিও উল্লিখিত চিন্তাচেতনার অনুকরণেই তৎকালীন সামাজিক মনের পরিচয়বহ।

'বিজ্ঞাপনে' নাট্যকারকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদন করেছেন: "এই মাস্কথানি ইংরাজ বাহাদুরের রাজত্বের দুই তিন শত বর্ষ পূর্বে প্রজাপীড়ক যবনদিগের রাজত্বকালের ঘটনা অবলম্বন করিযা লিখিত হইয়াছে।" স্বাধীনতার অত্যুগ্র কামনা প্রকাশ করে নাট্যকার লিখেছেন:

'স্বাধীনতা সম কি আছে আর ?
পামর যবনে করি কি ভয় ?'

পরাধীনতা, কাপুরুষতা ও স্বাধীনতার অভাবই যে ভারতের দুরবস্থার জন্য দাযী—স্মরণ করিয়ে দিয়েই প্রধান চরিত্র ব্যাসদেব উচ্চারণ করেছে:

'স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণ মন
লভিতে সে ধন করহে যতন।
... ...
যবন মরিবে এ জ্বালা যাইবে
জননীর দুঃখ আর না থাকিবে
স্বাধীনতা মণি হৃদয়ে ধরিবে
বিলম্ব না আর, হও অগ্রসর—'

উদাসীনের সংগীতে স্বাধীনতা-কামী ভারতবাসীর আবেগাত্মক পরিচয় ফুটেছে। ভারতসন্তানকে সংগ্রামে উদ্দীপিত করতে চেয়ে নাট্যকার বলেছেন,—"ধন্য, হিন্দু কুল গৌরব, বৎস, যদি তোমার ন্যায় সকল আর্য সন্তানগণের অন্তঃকরণ স্বাধীনতা স্পৃহায় প্রজ্বলিত হতো, তাহলে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি কি কখনও পরাধীন থাকে ? ভারতমাতা কি এত দুর্দ্দশা ভোগ করেন, কখনই না।" বাঙালীর চিত্ত বিক্ষোভ ও সুতীব্র স্বদেশাভিমান তাঁর নাটকে স্বাতন্ত্র্যের পরিমণ্ডল রচনা করেছে। সংগীতের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার

জাতির প্রতি যে উদাত্ত আবেদন জানিয়েছেন—তা দেশকালের অনিবার্য প্রতিশ্রুতি :

"১. স্বাধীনতা সম কি আছে আর,
বীরের জীবন, বীর অলংকার,
বীরপ্রসূ হায়! ভারত জননী,
অশ্রুজলে তাঁর ভাসিছে ধরণী
হারায়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা-মণি।
২. ওরে কুলাঙ্গার আর্যসুতগণ,
জননীর দশা দেখরে এখন,
পুত্র হয়ে হায় বল্, কি করে
মাতারে সঁপিলি যবন-করে?
৩. স্বাধীনতা হেতু কে-না বল হায়—
অরাতি-নিকরে বিক্রম দেখায়?
... ...
ধর করবার, বিলম্ব না আর,
এখনি যবনে কররে সংহার
যবন মারিবে এ জ্বালা যাইবে,
জননীর দুঃখ আর না থাকিবে,
স্বাধীনতা—মণি হৃদয়ে ধরিবে,
বিলম্ব না; আর, হও অগ্রসর,
বীরদর্পে নাশ যবন-নিকর॥"

সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সর্বপ্রকার বিরোধমুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। জাতীয়তা ও স্বদেশানুরাগের অখণ্ডত্বের উপলব্ধি এ নাটকের মধ্যে থাকলেও নাট্যরস স্বীকৃতি পায়নি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগে কিরণচন্দ্রের রচিত বলে 'গোপন চুম্বন' (১৮৭৮) নামে একটি নাট্য-নিবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা'র অনুসরণে রচিত হয়েছিল হারাণচন্দ্র ঘোষের চতুরঙ্গ রূপক নাটক 'ভারত দুঃখিনী' (১৮৭৫); ভারতমাতার রূপক চরিত্র এখানে প্রধান চরিত্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রদেশ

ও রাজ্য রূপকাশ্রয়ে 'কন্যাবর্গ'রূপে চরিত্রায়িত হয়েছে। নামগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বঙ্গসুন্দরী, অযোধ্যা, মত্রবালা, মালবিকা ইত্যাদি। ভারত-মাতার আইডিয়াটিকে সমগ্ররূপে সার্থক করে তুলতে অবশ্য নাট্যকার অসমর্থ হয়েছেন। সত্যকার ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার শাসন প্রতাপের কাছে দুঃখিনী ভারতমাতার ছবি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তথা 'অখণ্ড' ভারতের কল্পনা শিক্ষিতসমাজের ব্যক্তি মানসের কল্পিত প্রতিবিম্বন মাত্র। সাধারণ্যে এই ব্যক্তিমানসের কল্পনার রং তখনও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই নাটকটির আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক যুগমানসের পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী এই শ্লোকটির মর্ম অনেকেই অনুভব করেছিলেন এবং সাহিত্যে বঙ্গদেশ ভাবনা বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সাধারণ পাঠকের মনে দাগ কাটছিল। এখন ভারতমাতাকে আড়াল করে বঙ্গমাতা আবির্ভূত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অগ্রণী মনস্বী সাহিত্যিকের রচনায় (আনন্দমঠ—১৮৮১-৮২)। বঙ্কিম-চন্দ্র যাঁকে মা বলে বন্দনা করলেন নাম না করে তিনি দশভূজা দুর্গা......... স্বর্গমর্ত্যের দেবীর সঙ্গে দেশমাতৃকার অভিন্নতা দেখিয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারত-চিন্তাকে মূর্তি দিলেন। তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাকে বঙ্গচিন্তা বলবো না, ভারতচিন্তাই বলবো। বাঙালীর বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী নিজের বলে নিতে দ্বিধা করেনি।"[৩]

১৭৯৬ শকে বিপিনবিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' নাটকে নাট্যকার যবনদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। নাট্যারম্ভেই যে সংগীত যোজনা করেছেন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য লক্ষণীয়:

> "জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
> যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে !
> ....সিংহের ঔরসে
> শৃগাল কি পাপে মোরা ?"

নাটকের প্রথমাঙ্কে অন্নদার কণ্ঠের একটি গীতের মধ্যে দিয়ে যবনের অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণের বক্তব্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্নদার মুখে নাট্যকার যে কথাগুলি সংযোজিত করেছেন—তার মধ্যে দিয়ে যবন কবলিত

৩ দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৭৪

ভারতের করুণ অবস্থাই প্রতিভাত হয়েছে—"মাতঃ আমরাই কি তোমার পুত্র মা, যে তোমার উপর গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পরদ্রব্য লুণ্ঠন প্রভৃতি শত শত দুষ্কর্ম হচ্ছে দেখেও নিশ্চিন্ত রয়েছি!" যবন কবলিত ভারতে জমিদারগণের দুরবস্থার চিত্রও লক্ষণীয়। চারুনেত্রার কণ্ঠসংগীতের মধ্যে দিয়েও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য আর্যসুতদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,—'জেগে আছ যারা সবে ওঠ ত্বরা করি।' সরলার অন্তর্বিশ্লেষণের মধ্যেও স্বদেশচিন্তার দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে। বিবাহের কথায় সরলার উক্তির মধ্যে দিয়ে এই বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে,—"যতদিন না দুঃখিনী জন্মভূমির পরাধীনতার মোচন হয়, ততদিন আমার কুমারীত্বের মোচনের প্রয়োজন নাই।" শেষ পর্যন্ত ম্লেচ্ছ জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ভারতবাসীর সুসজ্জিত যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

স্বদেশ-ভাবনার বীর ব্রতে বাঙালীকে উদ্দীপিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকার :

'দেখ জগতের মধ্যে যত জাতি
সবাই সাধিছে আপন উন্নতি

মনুষ্য কি নই আমরা সকলে
তারা কি দেবতা জন্মেছে ভূতলে
রচেছে কি বিধি মোদের মৃণালে
তাদের করেছে প্রস্তরময়।
....
ওরে বঙ্গবাসী কুলাঙ্গারগণ
কি ছার রাখিয়া এ ছার জীবন
কর ধর্মযুদ্ধ হউক মরণ
বন্ধন-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাক্।'

বঙ্কিমচন্দ্রীয় নব্য দেশাত্মবোধের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে হরলাল রায় রচনা করেছিলেন 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটক। এই নাটকে নবোপলব্ধ যে জাতীয়তাবোধ চিত্রিত তা সম্পূর্ণত যুগচিন্তানুসারী। বাংলার ইতিহাসই এখানে নাট্যকারের গৃহীত বিষয়বস্তু। হীনতার গ্লানি থেকে বাঙালীকে

উত্তীর্ণ করে নবশক্তির বীর্য বলিষ্ঠতায় পুনরুদ্বোধিত করবার প্রয়াসই শিল্পরূপ পেয়েছে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্র চিত্রণে। লক্ষ্মণ সেনের জাতীয়তাধর্মী চরিত্ররূপের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের উত্তরার্ধের বাংলার সমাজজীবনের এই স্বাদেশিক-চেতনাই সোচ্চার হযে উঠেছে। নাট্যকার লক্ষ্মণ সেনকে লাক্ষ্মণ্য সেন রূপে চিত্রিত করেছেন। মন্ত্রী মহেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতাকেই তাঁর পরাজয়ের মূল কারণরূপে বর্ণিত করে লক্ষ্মণ সেনকে দেশপ্রেমিক ও মহান যোদ্ধারূপে দেখানো হয়েছে। জাগতিক সব কিছুর মধ্যেই স্বাধীনতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছেন। নাটকে এক জায়গায় তিনি বলেছেন,—"হস্তপদ বদ্ধ হয়ে অতল বিষসাগরে নিমগ্ন হতে হল। এ শত জন্মের দুষ্কৃতির ফল। যার শরীর হতে অস্থিমাংস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিগলিত হয়ে পড়ে সে-ওকি এতো যন্ত্রণা ভোগ করে? কোটি কোটি লোক আমার প্রজা, আমি কিনা বিনা যুদ্ধে দুরাচার ম্লেচ্ছদিগকে রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি? বঙ্গে কি বীর নাই?......বিধাতা, বঙ্গভূমি কি দোষে দোষী যে তাহার পায়ে অধীনতা শৃঙ্খল পরাচ্ছ?" ভাগ্য-বিড়ম্বিত লক্ষ্মণ সেন বক্তিয়ার খিলজীর কাছে পরাজিত হলেন। বক্তিয়ার দেশ-প্রেমিক বিরাট সেনকে সর্বপ্রকার মোহে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েও পারলেন না:

'বি—আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মা-কে মা বলবো? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব। ওহে মুসলমান সেনাপতি, বঙ্গ-ভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীর মধ্যে নাই। বিদেশের সুখের জন্য বঙ্গভূমিকে ভুলতে পারি না।

ব—তোমার বাক্য বাক্য নয়, মধুবর্ষণ। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি, তুমি স্বদেশে থাক, কিন্তু স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করতে চেষ্টা কর না—

বি—বিরাট সেনকে স্বাধীনতা দিলে সে স্বদেশীয়গণকে স্বাধীন হতে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে কাজ নাই। চল আমি তোমার ভয় নিবারণের জন্য স্বেচ্ছাপূর্বক ফাঁসি কাষ্ঠে উঠছি।'

নাটকখানির স্বদেশচিন্তাবিষয়ক বহু সামাজিক উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বিজেন্দ্র-লালের পরবর্তীকালের নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'র কথা মনে করিয়ে দেয়। নাট্যকার হরলাল স্বদেশপ্রেমে একদিক যেমন বাঙালীকে উদ্বোধিত করেছেন—অপর-দিকে তেমনি বাঙালীর জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলির সমালোচনা

করে জাতীয় যুগোপযোগী কর্তব্য পালন করেছেন। তুর্কী আক্রমণের পট-ভূমিকায় নাট্যকার বাঙালী চরিত্রের পর্যালোচনা নিম্নরূপে করেছেন :

"ব। বাঙ্গালীরা কেমন?

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীরা বড় দুর্বল।

ব। (হাস্য করিয়া স্বগত) বাঙ্গালীরা দুর্বল, খোদা তাদের সুখী করেই অকর্মণ্য করে ফেলেছেন। খোদা তাদের সব দিয়েছেন কিন্তু আত্ম-রক্ষার উপায় দেন নাই।

দ্বিতীয় দূত। বাঙ্গালীরা বড় নিস্তেজ, তাদের কথায় তেজ নেই, চলনে তেজ নেই, কাজে তেজ নেই।

ব। (স্বগত) বাঙ্গালীদের জয় করা সহজ। জয় করে শাসনাধীনে রাখাও সহজ। এমন জাতির ওপর গুরুতর অত্যাচার করেও তাদের দু'কথায় নরম করা যায়।" (২য় অঙ্ক : ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

বাঙালীর জাতীয়জীবনের এই নৈরাশ্যজনক চিত্রচয়ন ও আত্মবিদ্রূপের অন্তরালেও কিন্তু বঙ্কিম প্রদর্শিত জাতীয়তাবোধের প্রেরণার প্রস্তুতি-পর্বটি লক্ষণীয়। মূলত দেশাত্মবোধ বর্জিত হীনম্মন্যতা থেকে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির ছিদ্রপথ দিয়েই বিশ্বাসঘাতী অপশক্তির জন্ম। এ-কথাই বক্তিয়ার চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত,—"মন্ত্রী, লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু বিশ্বাসঘাতক·········স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে পারে। যে জাতির মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে তাদের কোন কালেই মঙ্গল নাই।"

লক্ষ্মণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট সেনের মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকীয় সমাজ-জীবনের জাতীয় ঐক্য ও বীরব্রতের উপাসনার ক্রান্তিলগ্নের এক বিপ্লবী পুরুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি বৃটিশ রাজনীতির আর একটি বিশেষ দিকের সমালোচনা করেছেন। বাঙালীকে লোভের মোহপাশে বদ্ধ করে তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে বিধ্বস্ত করে দেবার সুচতুর প্রয়াসটিকেও তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

হরলাল রায়ের অপর নাটক 'হেমলতা' (১৮৭৩) রচিত হয়েছিল রাজ-স্থানের বিশ্ববিশ্রুত পটভূমিকায়। চিতোরের রাজা বিক্রম সিংহের কন্যা হেমলতার সঙ্গে বীরশ্রেষ্ঠ সত্যসখার প্রণয় বৃত্তান্ত নাটকখানির মূল বিষয় হলেও সত্যসখার চরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দুর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সংরক্ষণ

প্রয়াসে হিন্দু ধর্ম রক্ষা, হিন্দুজাতির পৌরুষ ও ঐক্যের পুনরুদ্ধার, হৃত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রসংগের আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রীয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। জাতিধর্মের মধ্যে পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব সাধনার পবিত্রতা রক্ষা করতে পারলে তবেই জাতীয়তাবোধ সমৃদ্ধ হয়। 'হেমলতা' নাটকেও এই চিন্তারই ভাব-পরিণতি। ন্যাশনাল থিয়েটারের পুরাতন বাটীতে ১৮৭৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর 'হেমলতা' নাটক অভিনীত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (১৮ই ডিসেম্বর) এই অভিনয়ের সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশিত হয়—"বাংলা সাহিত্যে যদি বীররস প্রধান পুস্তকের অসদ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি শ্রোতার অভাবে নহে··· গত শনিবারে ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমলতা নাটকের অভিনয়ে আমরা ইহার আর একটি প্রমাণ পাইয়াছি······হেমলতার ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্য হয় নাই।"

ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দিয়ে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট নাম। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের এই দিকটি প্রসঙ্গে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন: "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।" কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে তিনি ইতিহাসের তথ্যকে 'নিজস্ব মানস-ইচ্ছা ও আদর্শ আনুযায়ী' রূপ দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুমেলা ভারতচেতনারই একটি বিশিষ্ট স্তর। একতা নিবন্ধন স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতির পূর্ণ জাগরণের মাধ্যম হিন্দুমেলা বাংলা নাট্য সাহিত্যকেও সঞ্জীবিত করেছে। স্বদেশীভাবের উদ্বোধনের আশা নিয়েই ১৮৭৪ সালে 'পুরুবিক্রম' নাটক রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। গ্রীক বীর আলোকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পটভূমিতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পাঞ্জাব দেশীয় নরপতি পুরুর বিক্রম প্রদর্শনই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যুগজয়ী সঙ্গীতটি এই নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে:

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি-হিমাদ্রি সমান?"

'পুরুবিক্রমের' দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি সংযোজিত হয়ে 'ন্যাশনাল' আন্দোলনের ভূমিকা রচনা করেছিল। নারীপ্রেম পুরুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। সবাই পুরুকে ত্যাগ করলেও সেকেন্দরের সম্মুখে দৃপ্ত কণ্ঠে পুরু উচ্চারণ করেছে: 'সে নরাধম প্রেম হতে আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ করতে পারবে না।' রাজা পুরুর মধ্যে যে স্বদেশপ্রীতি প্রকাশিত—তার মধ্যে ইংরেজ শাসনে পীড়িত ভারতবাসীর অনিঃশেষ মুক্তির বাণী রূপ লাভ করেছে। অবশ্য এ নাটকে নাট্যকার কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়েছেন। উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবোধের যে ধারণা তিনি এই নাটকে প্রকাশ করেছেন—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে সে মূল্যমানের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুযুগের ইতিহাস ছেড়ে মধ্যযুগের সমাজেতিহাসকে আশ্রয় করেছেন। হিন্দুসমাজে পারস্পরিক জাতি-বিদ্বেষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কতখানি মর্মপীড়িত করেছিল—তার পরিচয় প্রবন্ধান্তরে ব্যক্ত করেছিলেন তিনি: "......এখন হিন্দু জাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। ......এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি এবং পৃথিবীর 'অনেক জাতিই' এই একতার অভাবে স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।"[৪]

মধ্যযুগের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের ঐশ্বর্যময় কাহিনীর ভিত্তিতে তাই তিনি ১৮৭৫ সালে রচনা করলেন 'সরোজিনী' নাটক। মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুশক্তির প্রতিক্রিয়াশীল জাগরণের চেষ্টায় বাঙালী নাট্যকারেরা রাজস্থান কাহিনীকে গ্রহণ করলেন। 'সরোজিনী নাটকেও হিন্দু জাতীয়তা-মূলক প্রভাব আছে বলেই রাজপুত জাতির আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারণের কুসংস্কার

৪ ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা: প্রবন্ধ মঞ্জরী

কিংবা আভ্যন্তরীণ বিবাদের কথা নাট্যকার একটু সখেদেই বর্ণনা করেছেন। চিতোরের দুর্গদ্বারে আলাউদ্দীন যখন দ্বিতীয়বার সসৈন্যে উপস্থিত, সেই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও মেবারের রাজাকে দৈব প্রত্যাশাধীনরূপে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। রাজপুত জাতির গৃহযুদ্ধ বিষয়টি ঐতিহাসিক সত্য হলেও স্বজাতিবোধে সংহত লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার মধ্যে যুগোচিত শপথ উচ্চারিত :

"বিজয়সিংহ।······যখন মাতৃভূমি আমাদের কার্য করতে বলেছেন, তখন তাই যথেষ্ট আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।"

ন্যাশনাল থিয়েটারে উপর্যুপরি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হযে দেশবাসীকে দেশাত্মবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'সরোজিনী' নাটক। বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয়তা বিস্তারে 'সরোজিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন : "স্বাদেশিকতার প্রেরণা হিসাবে 'সরোজিনী' একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে······রাজপুতের অপূর্ব দেশভক্তি বাংলা নাট্যকলায় প্রথমে 'সরোজিনী'তেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এই উদ্দীপনা সরোজিনীর পূর্বে জাগাইয়াছিল। কিন্তু যত লোকে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' পড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'সরোজিনী'র অভিনয় দেখিত।········ পরোক্ষভাবে 'সরোজিনী' ও রাজপুত-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লোকেদের মনে ইংরাজ বিদ্বেষই জাগাইয়াছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) নাটকটিতে তৎকালীন জাতীয় সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সূত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতী ও সেলিমের প্রতি তাঁর অনুরাগ ইতিহাসানুমোদিত নয়। তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে এ-প্রসংগটি খুব প্রীতিসহ হয়নি। বহু পত্রাঘাতে তাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জর্জরিত করেছেন। অশ্রুমতী-সেলিমের প্রেম-কাহিনী একদিকে তাঁর কল্পনাকে যেভাবে উদ্দীপিত করেছিল, আবার অপরদিকে সেই প্রেমকে তিনি স্বদেশবোধের সংস্কারমুক্ত মন নিয়েই চিত্রিত করতে চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবোধ-নিরপেক্ষ মনোভাবের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছিলেন : "যদি

কেহ বলেন, প্রতাপ সিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিলেন—সে জানিত না রাজপুত কে—মুসলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করিল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?" অশ্রুমতীর প্রেমিকাসত্তার জাতি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীর প্রতিও নাট্যকার আলোকপাত করেছেন,—"আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি।" অশ্রুমতীর প্রণয় প্রসংগ বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রতাপ সিংহের বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে—তাঁর স্বদেশবোধ কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধ সর্বভারতীয় পটভূমিকায় ব্যাপ্ত না হলেও রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য ও বংশ গৌরবের পরিচয়ে উজ্জ্বল—মাঝে মাঝে তা ব্যাপ্তি পেয়ে সামগ্রিকভাবে হিন্দু জাতীয় গৌরবেও পরিণত হয়েছে। কাজেই লক্ষ্য করা যায়, ইতিহাসের সনাতনী তথ্যাশ্রয়ী ঘটনারাজি এ-নাটকের বহিরঙ্গে বিকশিত হলেও আভ্যন্তরীণ সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের স্বদেশ চিন্তামুখর মন ও মনন।

সমাজজীবনের স্বদেশচিন্তানুগত্যের যে ধারা 'অশ্রুমতী'তে জ্যোতিরিন্দ্র-মানস নির্মাণে সহায়তা করেছিল—সেই জাতীয়তাবোধের চিন্তাই সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতির মধ্য দিয়ে 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ব্যক্ত। হিন্দু জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে তৃতীয় অংকের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্বপ্নময়ীর যবন নিন্দাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। দেবমন্দিরে ম্লেচ্ছপদাঘাত, গো-হত্যা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বর্ধমানের তালুকদার শুভসিংহের স্বদেশ চিন্তানুগত্য ও বিদ্রোহের পরিচয় নাটকখানিতে বিধৃত। কিন্তু ইতিহাসের মূল সত্যকে বিপর্যস্ত করে শোভা সিংহ চরিত্রকে পবিত্র জাতীয়তাবোধের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাটকের সূচনাতে স্বদেশবোধ সম্বন্ধে শুভ সিংহের চিত্তে যে দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সমকালীন যুগোচিত দ্বন্দ্বেরই প্রতিরূপ। লক্ষ্যসর্বস্ব য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানতে পারেননি। লক্ষ্যকে সাধ্যের মহত্ত্ব দ্বারা গ্রহণীয়রূপে কামনা করেছেন তিনি। ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেছেন রাজকন্যা স্বপ্নময়ী। দেশমাতৃকার রূপদর্শনে আক্ষেপোক্তি করেছেন:

> "হ্যাঁ, সেই জননী সম মোর জন্মভূমি—
> সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের—

দ্যাখো দ্যাখো আজি তার একি দুর্দশা।
বামহস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস—
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃংখল।"

শুভ সিংহের অনুচর সুরজমলের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করি: "আমি দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, ধর্মের জন্য আর সকল ক্লেশ ও সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন করছি।" নাট্যকারের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী মতবাদের প্রচারক শুভসিংহ। মানবিকতাহীন ও বিচারহীন স্বদেশবোধ যে আজ উত্তেজনায় বিকৃত, শুভ সিংহ তাঁর ব্যর্থ জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। শুভসিংহের উক্তির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক স্বদেশবোধের সুরও উচ্চারিত হয়েছে:

"কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তবে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধনধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?"

জাতীয়তাবোধের স্পর্শে 'স্বপ্নময়ী' নাটকে শোভা সিংহের দুঃখাভিমানের সংগে নাট্যকারের অনুরূপ স্বগতোক্তির দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পাই আমরা:

'তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়,
ভারত গাইছে মোগলের জয়—
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি
কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত আসা—
লয়েছে কাড়িয়া করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—
ভারতে আজি কি সুখের দিন?'

৪

হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলায় বিভিন্ন প্রাদেশিক বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার মধ্যে যুগপৎ প্রাচীন ও বর্তমান ধারাকে মিলিত করেছিলেন

মনোমোহন বসু। পৌরাণিক নাটকের প্রাচীন বিষয়বস্তুর মধ্যেও তিনি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন। গীতাভিনয়ের সংবেদনশীল আবেদনের মধ্য দিয়ে সহৃদয় সামাজিকগণ সেদিন নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এরও ফলে একটি সুদূর-প্রসারী প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল পরবর্তী নাট্যযুগে। এ-বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আলোকপাত করেছেন: "জাতীয় রস ও রুচির অনুগামী করিয়া পূর্ব হইতেই যদি মনোমোহন এই ক্ষেত্র রচনা করিয়া না রাখিতেন, তবে ইহার সঙ্গে সাধারণের যোগস্থাপন করিতে আরও বিলম্ব হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাও ত্বরান্বিত হইত না। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের ভাবগত ঐক্যের সঙ্গে মনোমোহনের স্বদেশী গান কিংবা তাঁর নাটকে সংযোজিত স্বদেশী সংগীতের ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করি। মনোমোহনের গান স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী। নীলদর্পণ পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক। নীলদর্পণে যার সূত্রপাত হিন্দুমেলার গানে তারই পরিণতি।" মনোমোহনের স্বদেশীগানে কোন মহৎ উদ্যোগ বা রাজনৈতিক প্রচেষ্টার আভাস না থাকলেও সর্বপ্রকার বিজাতীয়তার বিরোধী মনোভাব ও ঐক্যের পরিচয় আছে। এই আকাঙ্ক্ষা জাতীয় আদর্শের সঙ্গে কিরূপ অভিন্ন সে-বিষয়ে ডঃ রবীন্দ্রকুমার-দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "সমদুঃখিতাই তার জাতীয় ঐক্যের প্রথম সূত্র। মনোমোহনের গানে জাতিভেদ নেই—জাতীয়তার দুর্দশার কথা আছে। এই স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ঐক্যের আদর্শের প্রথম সার্থক প্রকাশ হিন্দুমেলায় এবং এই হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত মনোমোহনের এক বক্তৃতায় দেখি তাঁর দেশাত্মবোধ প্রায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।"[৫] —মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫) নাটকে সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব একটি অত্যন্ত স্পষ্টপ্রত্যক্ষ দিক। সমকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকটি এ নাটকে কিভাবে উদাহৃত—সে-বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার রীতি-নীতি বিচার, রাজস্ব আদায়ের রীতি, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের নানাদিক তিনি রূপকছলে আলোচনা করেছেন। এরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত হল:

"বিশ্বা। শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ?

৫ দেশ—ফাল্গুন, ১৩৬২

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তাতেও আমাদের ভয়ানক দুরবস্থা। প্রভু জানেন, ভারতের তন্তু জাত কোষের আর সূত্রবসনেই সমস্ত সভ্য জাতি সজ্জিত হত, কিন্তু হায়, আজকাল ভারতের সেই অসংখ্য তন্তু নিস্তব্ধ—সে সব কেবল ইন্ধনকাষ্ঠ হয়ে রয়েছে। প্রভু, বলতে লজ্জা করে, এখন তুঙ্গ দ্বীপ হতে বস্ত্র এনে ভারতের সজ্জারূপে লজ্জা নিবারণ করছে। আজ যদি বস্ত্র আনা বন্ধ হয়, কাল পরিধেয় বসনের জন্য দেশে হাহাকার পড়ে যায়। আমাদের কর্মকার শ্রেণী কেবল সামান্য কুদ্দাল, নিড়ান, হাতা-বেড়ী, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি গোটাকতক স্থূল কর্মেই যা নিযুক্ত আছে, নচেৎ যত সূক্ষ্ম কারু তুঙ্গদ্বীপ হতেই এখানে আনীত হচ্ছে। আর ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কি উচ্চ অঙ্গের বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান, দেশে যা প্রবর্তিত হচ্ছে, তাতে এদেশের লোক অতি নিম্নস্তরেই যা কিছু সহকারিতা কর্তে পায়, নতুবা তুঙ্গদ্বীপের লোকই সব।"

৫

জাতীয়তা ও গণতন্ত্রমূলক ভাবধারার প্রভাব সমসাময়িক আরও কয়েকখানি নাটকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩) নামীয় রোমান্টিক নাটকটি কিছুটা ইংরেজী আদর্শে পরিকল্পিত হলেও দেশের পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ দিকটি নাটকে ফুটেছে। হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারত-দুঃখিনী' (১২৮২), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই ভারত' (১৮৮২), কুঞ্জ-বিহারী বসুর 'ভারতঅধীন'? (১২৮১) ইত্যাদি নাটকগুলির কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ রঙ্গালয়ে স্বদেশাত্মক নাট্যধারার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যুগ ও জীবনের সমসাময়িক সংবেদনশীল মনটিকে আমাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে। জনপ্রিয় আন্দোলনের অংশীদার হওয়ায় এই শ্রেণীর নাটকের পৃথক শিল্পমণ্ডন কলাগত দিকটি বিকশিত হতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নির্ণয়ে কিংবা মুসলমান চরিত্র-চিত্রণে এই যুগের নাট্যকারেরা সুচিন্তিত নির্দিষ্ট কোন সামাজিক-অভিপ্রায় নির্ণয়ে সমর্থ হননি। হিন্দু-মুসলমানের সৌভাগ্যের আদর্শ যেমন চিত্রিত করেছেন, আবার সেই একই সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তার পৌরাণিকী আদর্শের গৌরবাত্মক পরিচয় মাত্রকেই সন্নিবিষ্ট করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় এবং বঙ্গচ্ছেদের কালের ইতিহাসের মধ্যেই এর কারণ

নিহিত। ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও অত্যাচারকে বৃটিশ অত্যাচারের সমার্থক রূপক হিসেবে চিত্রিত করে বহু নাটকই রচিত হয়েছিল। হিন্দুমেলায় অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল হরিমোহন ভট্টাচার্যের 'সমরে কামিনী নাটক' (১৮৭৫)। অজ্ঞাতনামার 'বীরনারী' (১৮৭৫) নাটক, অঘোরনাথ-ঘোষের 'ডাহির সেনাপতি' নাটক (১২৮৫), মহেন্দ্রলাল বসুর চিতোর—রাজসতী 'পদ্মিনী' (১৮৮৫), রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভারতবিজয়, নবীনচন্দ্র-বিদ্যারত্নের 'ভারতের মুখশশী যবনকবলে', মনোরঞ্জন গুহের 'ভারতবন্দিনী' (১৮৭৬) ইত্যাদি নাটকেরও পরিচয় মেলে।

রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভারতবিজয়' (১৮৭৫) নাটকেও নাট্যকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে কয়েকটি চরিত্র নির্বাচন করে দেখিয়েছেন, স্বাজাত্য-বোধ ও একতার সাহায্যে শত্রুকে কিভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। নাট্যকার এখানে ইতিহাসের ছদ্মনামায় দেশাত্মবোধকে স্ফূরিত করেছেন। রাজপুত ইতিহাসের বীর চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করে 'ভারতবিজয়' নাটকে নাট্যকারের ভারত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও যুগোপযোগী স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা পৃথ্বীরাজ ও কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগেই যে যবনেরা পবিত্র ভারতভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে—এ-বিষয়ে নাট্যকার নিঃসংশয়িত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পৃথ্বীরাজের মন্ত্রী বিজয়ের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলেছেন,—"গৃহবিবাদ ভয়ানক……… আপনাদের দুই রাজ্যে বিবাদ না থাকিলে যবনেরা কখনই ভারতে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।"

অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ভারত অধিকার' (১২৮৪) নাটকে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা প্রভৃতির মাধ্যমে ইতিহাসের পটভূমিকা সৃষ্ট হলেও মূলত নাটকটি পারিবারিক ট্র্যাজেডি ও গার্হস্থ্য রসে পর্যবসিত হয়েছে। নাটকটির প্রথমাংশে নাট্যকার পৃথ্বীরাজের একমাত্র কন্যা চন্দ্রকলার বিবাহ প্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজকে চিন্তান্বিত দেখিয়েছেন এবং যবন সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধের শেষেই পৃথ্বীরাজ কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করবেন বলেছেন। এদিকে চন্দ্রকলা রাজ্যের সেনাপতি চন্দ্রনাথের প্রতি প্রণয়াসক্ত। সেনাপতির আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পৃথ্বীরাজ তাঁর ক্ষাত্রতেজ প্রকাশ করেছেন। এদিকে চন্দ্রকলা ও চন্দ্রনাথের মধ্যে মনান্তর ঘটেছে, চন্দ্রকলার বিমাতার ষড়যন্ত্রে এবং স্বয়ংবর সভায় চন্দ্রকলা

তার প্রেমাস্পদ চন্দ্রনাথ কর্তৃক অপমানিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজও কন্যার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ করেছেন এবং পরে নিজের ভুল বুঝেও ষড়যন্ত্রের সংবাদ জেনে অনুতপ্ত হয়েছেন। চন্দ্রনাথকে রাজ্য অর্পণ করে পৃথ্বীরাজ অনুতপ্ত চিত্তে বনগমন করতে চেয়েছেন। সপ্তমাঙ্কে নাট্যকার দেখিয়েছেন যে, চন্দ্রকলা জীবিত আছে জেনে চন্দ্রনাথ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রস্থান করেছেন এবং যখন বিষপান করে মৃত্যুপথযাত্রী, তখনই চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে। ইতিমধ্যে সেনাপতি রণে ভঙ্গ দেওয়ায় যবন সৈন্য ভারত অধিকার করেছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' কথোপকথন নাট্যবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকের ক্রমোন্মুখ জাতীয়তাবোধের পরিচয় এতে আছে। নাটকের প্রত্যক্ষ ঘটনারূপে স্বজাতীয় পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে পরাজিত এবং নির্বাসিত রাজা রুদ্রচণ্ডের অস্ত্রসাধনার উল্লেখ আছে। অপরটিতে আক্রমণকারী বিদেশী শত্রু মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বীরাজের স্বাধীনতা সংগ্রাম। পৃথ্বীরাজকে ঘিরে স্বদেশ বিষয়ক বোধের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও সেদিকটি চিত্রিত করেননি।

হিন্দুমেলার জাতীয়তাবোধ ও সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বদেশিযানার ঢেউ সেদিন পরোক্ষভাবে এই সকল নাট্যসৃষ্টির সহায়তা করেছিল।

চতুর্থ পর্ব : তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক ভাববিপ্লবের কালান্তর ও ঐতিহ্য-মুক্তি (১৮৮০-১৯০০)

উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকেই জাতীয় সচেতনতা বিস্তৃততর দৃষ্টিভংগীর মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হতে লাগল। দেশীয় নানা সংবাদপত্র দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতায় এই ক্রমোন্মুখ রাজনৈতিক ভাববাদ বিশ্লেষণে মুখর হল। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' বিভিন্ন শাখায়িত কর্মধারার মধ্য দিয়ে সম্ভাবিত হল,—'the awakening of a spirit of unity and solidarity'; এই উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিক্রমা করে জাতীয় ঐক্যশক্তিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হলেন। 'ভারতসভা' সামাজিক ও রাজনৈতিক একটি বড় অভাব মোচন করেছিলেন। এ-বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে (পৃ. ২১২) বলেছেন : "যখন ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি—তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি সভা থাকা আবশ্যক।" অতএব এই সভা রাজনীতি ও সমাজনীতির সামগ্রিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করল।

এই সময় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে জনমতদলনের কারণে 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' (১৮৭৮) ও 'ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণ আইন' চালু হয়। মধ্যবিত্তের জাতীয়চেতনা-এর ফলে শতমুখে অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। গ্ল্যাডষ্টোন ও ১৮৮০ সালে লর্ড রিপণের আমলে এই আন্দোলন মন্দীভূত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটনের দরবারে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়েছিল। এই অর্থহীন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান যখন

আয়োজিত হয়েছিল, তখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক দিয়েই ভারতবর্ষের অবস্থা বিপর্যস্ত। আফঘান যুদ্ধের হামলায় এবং কল্পিত রুশ আতঙ্কের প্রতিরোধের কারণে সৈন্যবৃদ্ধির ফলে রাজকোষ শূন্য, ভূমি-ব্যবস্থার অব্যবস্থা, কুটীর-শিল্পের ক্রমিক উচ্ছেদ, দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এই সর্ববিধ্বংসী পরিস্থিতিতে উক্ত 'দরবার' জনগণকে আহত করেছিল। ভার্ণাক্যুলার প্রেস এ্যাক্ট চালু হলে শিক্ষিত জনমানস-এর তীব্র সমালোচনা করল। এই সময় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয়েছিল—তারই সাধারণীকরণ লক্ষ্য করি জনমানসে : "It would be worthwhile to study the condition of the Vernacular Press during the time, with what vigour they propagated nation-alistic sentiment among the masses by criticising the opp-ressor's wrong, their injustice, exploitations and other adminis-trative failures."[১] এই ভার্ণাক্যুলার এ্যাক্টের ধারাগুলি নিম্নরূপ ছিল :

(a) Seditions libels, malicious and calumnious attacks on the Government, accusing it of robbery, oppression and dis-honesty and imparting to it bad faith and partiality.

(b) Libels on Government officers.

(c) Contemptuous observation on the administration of Justice, pointing to its alleged impurity and worthlessness.

(d) Libels on the character of Europeans attributing to them falsehood, deceit, cruelty and heartlessness.

(e) Libel on Christian and Christian Governments and mischievous tendencies to excite race and religious antipathies.

(f) Suggestions and insinuation which their authors believe fall short of seditions libels by reason of the absence of positive deelarations.

১ National Awakening and the Bangabasi—Shyamanda Banerjee P. 101

ভার্ণাকুল্যার প্রেস-এ্যাক্টের বিরুদ্ধে সেদিন জাতীয়তাবোধ রাজনৈতিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল।

১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন সুরু হল। লর্ড রিপণ ভারতে ভাইসরয় হয়ে এসে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার-স্পৃহার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে স্বায়ত্ত-শাসন বিধির আশু পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন—"The time was fast opproaching when popular opinion even in India would become the irresistible and unresisted master of the Government." রিপণের নির্দেশে তাঁর আইনসচিব ইলবার্ট বিচারবিভাগে ভারতীয় ও ইংরেজের বর্ণবৈষম্যজনিত অধিকার ভেদের প্রশ্নটি দূর করবার জন্য চেষ্টিত হলেন। ভারতের বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভারতীয় জনমত স্বার্থান্ধ প্রচারের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সপারিষদ বড় লাটকে য়ুরোপীয় দাবীকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। এ ঘটনা ভারতীয় মধ্যবিত্ত-মানসে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ প্রকটিত করল। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বৎসরেই আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হলেন। এর ফলে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিকচেতনা আরও সম্প্রসারিত হল।[২] এদিকে 'as a further restrictive measure against the press, an "Official Secrets Act" was passed on October 17, 1889, which was subsequently amended by Act V of 1904···the official secrets Act of 1889 was the direct result of the Amritabazar Patrika's disclosures of certain official documents.' ১৮৮২ সালেই সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সুরেন্দ্রনাথ কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে এসে ভারত সভার আনুকূল্যে এবং সহকর্মীদের সহযোগিতার ১৮৮৩ সালের ২৮, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান করেন। ১৮৮৫ সালে

২ ১৮৮২ সালে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার নবমন্ত্র ঘোষণা করলেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এবং পর বৎসর ১৮৮৩ সালের ৭ই মে ন্যাশনাল থিয়েটারে কেদার চৌধুরী-কৃত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরূপ সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ জনসমাজেও মাতৃমন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ন্যাশনাল কনফারেন্সের ও জাতীয় ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সার্থকতায় উৎসাহিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৫ সালে যখন ব্যাপকতর দ্বিতীয় সম্মেলন আহ্বানে ব্যস্ত—ঠিক তখনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—কিন্তু এ উদ্যোক্তারা রাজানুগত্যের ছত্রছায়ায় থেকে রাজনৈতিক দাবী ও অভিযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ —আনন্দমোহন—মনোমোহন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর জনপ্রিয় হওয়া যে সম্ভবপর নয়—তা বুঝতে পেরেই দ্বিতীয়বর্ষে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে 'কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভার' দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩] কংগ্রেসের এই দুই অধিবেশনের পার্থক্য বিষয়ে অফিস-সংক্রান্ত নথীপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে: "The leading characteristic of the Congress of 1886 was that it was the whole Country's Congress. The Congress of 1885 had been got together with some difficulty by the exertions of few leading reformers and included less than one hundred of the more advanced thinkers belonging to the most prominent centres of political activity." জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীনতা বিষয়ে তখনও চিন্তা করেননি। বৃটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদন কিংবা প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীস্বার্থের আংশিক চরিতার্থতার যে প্রয়াস প্রকাশিত হয়েছিল—সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতার সীমা তার মধ্যে ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় আমাদের সমাজজীবন জাতীয় আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নব শক্তিতে উৎসারিত হল।

২

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান: ঘরে ফেরার দিন

কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ব্যক্ত করার পর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (কার্তিক ১৮০৮ শক)

---

৩ দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজী—বিভিন্ন স্থান থেকে নির্বাচিত ৪৩৬ জন সদস্য প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন সংগীত— 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। / ঘরের হয়ে পরের মতন / ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?' গীত হয়ে দেশাত্মবোধে ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করেছিল।

রাজনারায়ণের প্রস্তাব সমর্থন করে উল্লেখ করেছিলেন: "এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে আমাদের অনেক উৎকর্ষ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে······ এখন স্বদেশানুরাগী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহার রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।·········যিনি এই হিন্দুজাতির বিনাশোন্মুখ ধর্মনীতি রক্ষা করিবার সূচনা করিবেন, তিনি বাস্তবিক এদেশের একজন পরম বন্ধু।" ইতিপূর্বে হিন্দুরা রামমোহনের কালে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা' গঠন করেছিলেন।[৪] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাণসংস্কৃতিকে নব্য-জীবন পরিস্থিতিতে বিচার একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হয়ে উঠল—তখন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধের সুযোগে নব্য হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ হয়েছিল। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের মধ্যযুগের উগ্র হিন্দুবিরোধী মনোভাব তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। এককালে অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থখানিতে হিন্দু-বিরোধী প্রচারকার্য সংরক্ষণপন্থী হিন্দুদের পীড়িত করেছিল। কাজেই হিন্দু-ধর্মের এই পুনরুত্থানকে অনেকে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও যথার্থ সমাজতত্ত্ববিদ এই আন্দোলনের পশ্চাতে ক্রমোন্মুখ স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদের ধর্মকেই উপলব্ধি করবেন। তা অগ্রগামিতায় অতি-চঞ্চল কিংবা পশ্চাদ্‌গামিতায় ঊনার্থক নয়। হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্যলাভের এই যুগে যুগপৎ ভক্তি-আশ্রয়ী ও জ্ঞান-আশ্রয়ী মতবাদ মানবতন্ত্র-বাদের নবসাজুয্যবাদ গঠন করেছিল। রাজনারায়ণ-কেশবচন্দ্র বা পরবর্তী কোন ব্রাহ্মনেতাই হিন্দুসমাজের গভীরে প্রোথিত এই যুগ্মধারাকে উপলব্ধি করতে পারেননি। হিন্দুরক্ষণশীলেরা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় প্রভাব নির্মূল করতে চেয়েই ব্রাহ্মসভার নকলরূপে 'হরিসভার' প্রতিষ্ঠা করে সক্রিয়ভাবে ধর্মাভিযান প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত রক্ষণশীল হিন্দুদের চেষ্টাতেই হিন্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ রূপান্তর ঘটতে থাকে। কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ লোকচিত্ত জয় করবার মনোভাব থেকে 'গুরুবাদ' পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

---

৪ "রামমোহন ঔপনিষদিক ধর্মসাধনা এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববাদকে অংশতঃ স্বীকার করিয়াছেন; পৌরাণিক সংস্কৃতি, আবেগমূলক ভক্তিবাদ—এ সমস্ত ধর্মপ্রণালীর প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না।" কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাস: ভূমিকা; (২য় সং) ডঃ অসিতকুমার-বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৯:

এই হিন্দু নবজাগরণের আন্দোলন সুসংগঠিত কোন প্রয়াসের ঐক্যবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট না হলেও এর মধ্যে সীমা-উত্তীর্ণ একটি নিখিল ভারতীয় রূপও ছিল এবং তার মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনের মৌল-কেন্দ্রে শক্তির অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ পরিব্রাজকদের প্রচারকার্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রতিফলন এবং ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সামাজিক গতির অভিমুখীন হয়েছে। নব্য হিন্দুদের এই মননধর্মী আন্দোলন (১৮৮০-১৯০০) শশধর তর্কচূড়ামণি—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুসৃত ধারা ও বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ধারা এই দু'টি খাতে প্রবাহিত হয়। শশধর তর্কচূড়ামণি[৫] হিন্দুধর্ম ও তার আচার-পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বক্তৃতায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে কৌতূহলের সঞ্চার করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন। আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি যে বিজ্ঞানানুমোদিত এটি প্রমাণ করাই ছিল শশধরের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। তাঁর রচিত 'ধর্মব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থের মধ্যেও এই পরিচয় স্পষ্ট।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৪৯-১৯৩৯) উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে তাঁর বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সংগঠনশীল মনোজীবনের পরিচয় দেন। তিনি 'আর্যধর্ম-প্রচারিণী সভা,' 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' প্রভৃতি সভার সৃষ্টি করেন। 'ধর্ম প্রচারক' মাসিকপত্র, 'সুনীতি' নামীয় পাক্ষিক পত্রিকা এবং 'The Motherland' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে এবং ভারতের নানাস্থানে হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে কাশীধামে 'বেদবিদ্যালয় ও

---

৫ উনিশ শতকের শেষদিকের এই ধর্মান্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মনীষুদ্ধের কথা স্মরণীয়। 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) ব্যঙ্গকাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'শ্রীহরি গোস্বামী' নামীয় কবিতায় শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উদ্ভটত্বকে কটাক্ষবিদ্ধ করেছিলেন :

'হা বাঙালী নব্য ; হয়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব
ডুবছে 'খাবি খাচ্ছে সবে' সভ্যতা হিল্লোলে ;
হায় ব্যাসের কর্ম, হায় মনুর মর্ম,
ডুবল কি এ কলিকালে সবই মুর্গীর ঝোলে ?
(এখন ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাহি জানি)
—যে মরে সে মরে, ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মরে গেলে প্রাণী।

'যোগাশ্রমের' প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুর গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে তাবৎ ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'ভারত তুমি স্বাধীনতা চাও?' এই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "যিনি পিতামাতার ভক্তির অধীন, স্ত্রী-পুত্রের প্রেমের অধীন, বিষয়বৃত্তির অধীন এবং কোন না কোন প্রকারে সমাজের অধীন, তিনি স্বাধীন কিরূপে?...বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই যথার্থ বলবান, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, সেই ব্যক্তিই পুরুষপ্রধান, সেই মহাত্মাই প্রভু ও ধন্য, যিনি তপস্তেজোবলে মহাবলশালী দুর্জয় ষড়্‌বৈরী পরাভবপূর্বক পঞ্চকোষরূপ দুর্গভেদে সমর্থ।...আমরা সেই মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠকে স্বাধীন জানিয়া বার বার নমস্কার করি।"

হিন্দুধর্মের নব-অভ্যুত্থানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা প্রসংগে একটি নবতর রসগ্রাহী দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী: "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দুধর্মের যে নবজাগরণ দেখা দেয়, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার দার্শনিক, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যাহার কবি, ভূদেব-কৃষ্ণপ্রসন্ন ও চন্দ্রনাথ যাহার নিবন্ধকার—সেই জাগরণে বিদ্যাসাগরের স্থান কোথায়?...যে বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' বা 'সীতার-বনবাস' রচয়িতা, আমরা সে বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি না......যিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি রচনা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা হইতে বাঙালী জাতিতে মুক্ত করেন, আমরা সেই বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছি......এই জাগরণে বিদ্যাসাগর পরোক্ষভাবেই সহায়তা করিয়াছেন।" কবি হেমচন্দ্র তাঁর সামাজিক-কবিতায় স্বজাতীয়ের দুর্গতির বেদনাময় পরিচায়নের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'ভারতবিলাপ' জাতীয় উদ্দীপক কবিতায়, পৌরাণিক আখ্যানকাব্য এবং সামাজিক কবিতায় এই সংস্কারমুক্ত প্রাগ্রসর মনোভাবের পরিচয় ফুটেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বদলে গেল মতটা' কবিতায় খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, 'বসু-ঘোষের' হিন্দুধর্ম ও সর্বশেষে থিওজফির গর্ভ, বাঙালীর তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের দ্বিধাগ্রস্ত দোলাচল-মানসিকতার পরিচয়বহ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'হাসির গান'-এর 'হিন্দু' কবিতায় এরই চিত্ররূপ এঁকেছেন:

'এখন ঘোষের নিকট বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।'

মনীষী চন্দ্রনাথ বসু যুক্তিবাদী হলেও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভারতের সাহিত্য ও শাস্ত্রের চর্চা করতে পারেননি। তথাপি ভারতের গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীমানসকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে জাতীয়তা মন্ত্র পৌরাণিক আদর্শবাদের সংগে মিলিত হয়ে নব্য হিন্দুবাদের সৃষ্টি হল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে একদা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছিলেন: 'Not that Hinduism as a social faith is a perfectly true representative of the ends of human life or as a rule of action rightly leads to these ends, but divested of its grosser superstitions, it is infinitely superior in both these respects to the philosophy and maxims of European life.' বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতীয় পুরাণের মধ্যে এই নিঃশ্রেয়স মূল্যবোধ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু পুরাণদর্শনকে অভিজ্ঞামূলক জ্ঞানবাদ ও 'পজিটিভিজম্'-এর আলোকে বিচার করেছেন। শুধুমাত্র শাস্ত্রসবস্ব পৌরাণিক আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না—'I do not believe that it is either possible or desirable to promote social reforms by invoking the authority of Sastras if society were every where governed by the Sastras, it is doubtful whether the result will be social welfare···Hinduism is catholic in its scope. (বিজয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের নিকট লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাংশ) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Statesman পত্রিকায় পাদ্রী হেষ্টি সাহেব[৬] হিন্দুদের শাস্ত্রীয় আচার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করলে—বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে উক্ত প্রতিক্রিয়াশীল মতামত খণ্ডনে তৎপর হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষবাদী সমাজাদর্শের দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের কাছে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক পত্রাবলীর মধ্যেও হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটনের সচেতন প্রয়াস ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি।

৬ হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব বিষয়ে হেষ্টির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিতর্ক হয়, তাতে তিনি বলেন: "Let us revere the past but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life."

পৌরাণিক আদর্শকে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত করে উগ্র ধরনের পৌরাণিক আদর্শ ও স্মার্ত আচার-আচরণ প্রণালী জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সম্পাদক, তখন ধর্মীয় পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে কিভাবে জাতীয়তার জাগরণ ঘটেছিল—সে বিষয়ে 'National Awakening and the Bangabasi' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে :

'He (krishnachandra) revived the sacred scriptures and glorified their majesty, purity and illumination. ......He was opposed to such revolutionary reforms in the Hindu Religion, as would overthrow the shastric instructions and thought that "what we need in religion is not new light, but new sight, nor new paths but new strength to walk in the old ones." He not only proclaimed the aforesaid principles through his editorials but practiced it meticulously in the conduct of his life. The European Renaissance introduced the rationalistic conception··· striking at the root of the Hindu religious concept, turning quite a large number of English-educated people irreligious, who avidly propagated contempt for their religion, tradition, family life, sanctity of marriage, desecrating all that was holy in Indian life and thoughts···He passionately loved his country and acted in the best interest of society, proving that he was a decided friend not only of morality, but of religious institutions, which he supported with head and heart." (p. 210-11); পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নায়ক' পত্রিকায় (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১) এ-বিষয়ে বলেছিলেন,—'Under the advice of Indranath Banerjee, Kishna Chandra (Editor of Bangabasi) ·········uplifted the status of the Hindus, their religious thoughts, their mode and conduct of life. Prior to that the English-educated people

were ashamed to openly declare themselves as Hindus. The Bangabasi removed the embarrasment."

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' নামে প্রকাশিত দুটি পত্রিকাতেও সনাতন ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র মতামত ব্যক্ত করেন। 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিই পরে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রচার' পত্রিকাতেও তিনি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীমালার উপরে প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সময়ে ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনাতেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভারতীয় অনুশীলনের আদর্শকেই পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নব্যহিন্দুধর্মের যে অভিনব ব্যাখ্যা এখানে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, সে ধর্মের নাম সর্ববৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য, এ ধর্মের লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—আর সেই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতিরূপ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মের সনাতনী সত্তাকে পরিত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধিকর ব্যবহারিক সত্তার সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন তিনি। ঐতিহাসিক চরিত্র 'সীতারামের' আশ্রয়ে বর্তমানের দীনতা ও হীনতাবোধকে অতীতের গৌরবের উজ্জ্বল পটভূমিতে স্থাপন করে বলেছেন: 'তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।' হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী, কল্যাণময় রূপকে তিনি অনুরঞ্জিত করেছেন 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী ও 'সীতারাম' উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতা ব্যাখ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষের আধুনিক ভাব-ব্যাখ্যা সমন্বিত বৈষ্ণব ভক্তিবাদ প্রচার পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার অনুকূলে নতুনরূপে উপস্থাপিত করল। এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন তাঁর কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই নব্যহিন্দুধর্ম প্রচারে প্রয়াসী হন। প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য থাকলেও পরে তিনি ব্রাহ্মবিদ্বেষী হয়েছিলেন। মধ্যজীবনে কৃষ্ণের ভাগবতী ঐশী লীলাকে পাশ্চাত্য আলোকে ঐতিহাসিক তাৎপর্য দিয়েছেন। কৃষ্ণকে তিনি স্বাদেশিক আদর্শে গড়তে চেয়েছেন। নবীনচন্দ্রের গীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর

বঙ্গানুবাদের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ভাবের পুনর্জাগরণই ছিল মৌল উদ্দেশ্য। সার্বজনীন ধর্মে ও উদার সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় মহাজাতি গঠনের প্রয়াসে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে বর্তমান ভারতের পারিপার্শ্বিকতায় যতখানি পারেন পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন।

ভারতীয় আদর্শের মধ্যে যা শুভ, ধ্রুব এবং সনাতন—ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে জাতীয় ঐক্যবোধকে দৃঢ় করবার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক জাতির জীবনেই ধর্ম ও আচার ওতপ্রোতরূপে জড়িত। 'আচার' প্রবন্ধে ভূদেবের বক্তব্য,—'শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।' 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সংগে হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্মসর্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য-কুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।' 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দুর সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভূদেব ভূয়োদর্শন ও দূরদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধে' হিন্দুর পরিবারাদর্শের নিষ্ঠাবান কর্তব্য-পরায়ণ আদর্শের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন।[৭]

সমাজসংস্কারের চেষ্টার মধ্য দিয়েও হিন্দু-নবজাগরণ আন্দোলনের একটি দিক আমরা লক্ষ্য করেছি। অবশ্য এ আন্দোলনগুলি সংস্কারের চেয়ে সংরক্ষণ-মুখীই বেশী। এই আন্দোলনের মধ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্যসমাজ

---

৭ "পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে, এবং রাজকায-ব্যাপদেশে জাতীয়-জীবনে, তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি প্রস্তাব ও প্রবন্ধের সাহায্যে দেশবাসীগণকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন। বাঙালী হিন্দুর সামাজিক ও জাতীয় সমস্যাগুলি নিপুণভাবে দেখাইয়া সেই সকল সমস্যা ও সেগুলির সমাধানও তিনি অপূর্ব সুন্দরভাবে দেশবাসীগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে অনেকেরই চোখ ফুটিল—অনেকের মনে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্ম-বোধ জাগিল। বঙ্কিম, ভূদেব ও পরে বিবেকানন্দ এই তিনজনের চেষ্টায় বাঙালী হিন্দু অনেকটা আত্মস্থ হইতে পারিয়াছিল।"

—ভারত সংস্কৃতি (২য় সং); সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ. ১৬৭-১৬৮

আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। দয়ানন্দ সরস্বতীর সংগে ব্রাহ্মনেতাদের কিছু মতৈক্য থাকিলেও মত পার্থক্যও ছিল। দয়ানন্দ বললেন, আমাদের বৈদিক সভ্যতার আদি ও অকৃত্রিম বেদবাহ্ আর্যধর্মের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। দয়ানন্দ রামমোহনের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের দেবদেবীর আরাধনা, প্রতিমা পূজা কিংবা পশুবলি প্রথাকে মানতে পারেননি। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণের আগমনে আর্যসমাজের মধ্যে স্পষ্ট হল হিন্দুর সম্প্রদায়িকতার নগ্নরূপ। দয়ানন্দের প্রগতিপন্থী সমাজদৃষ্টি জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তন চেয়েছে কিংবা সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশ হবে এ মতবাদেও দয়ানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে আধুনিক প্রগতিবাদী রীতিনীতির প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বিরোধিতার ভাব ছিল এবং এর ফলে তাঁর আন্দোলনে খানিকটা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভংগীর অনিবার্যতা রোধ করা যায়নি। দয়ানন্দের রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' (১৮৭৪) গ্রন্থে তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। দযানন্দের হিন্দুধর্ম পৌরাণিক হিন্দুধর্মের চেয়ে বহুলাংশেই ভিন্ন ছিল। বেদের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের মূলানুসন্ধান করেছেন। বেদের সায়ণ-ভাষ্যকে অস্বীকার করে বৈদিক সূক্তের যে অভিনব ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন—দেশের শিক্ষিতসমাজের কাছে তা কতদূর গ্রহণযোগ্য হযেছিল, সন্দেহের বিষয়। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সংগে জড়িত না হযেও আর্যভূমি এবং আর্যজাতির জন্য জাতীয়তাবোধ জাগরণে তিনি অপ্রত্যক্ষভাবেও সহায়তা করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিযে তিনি দেশ-প্রেমের ভাবকেই সুগভীর করেছেন। দয়ানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুচরদের মধ্যে লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায় ইত্যাদিরা তাঁর নীতি ও আদর্শকে প্রচার করতে থাকেন। কিছু কিছু দিনের মধ্যেই সংরক্ষণশীল 'নিরামিষাশী দল' ও সংস্কারকামী 'কলেজদল' রূপে দয়ানন্দের শিষ্যবর্গ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সংরক্ষণশীলেরা সামাজিক আচার-আচরণে যেমন ভারতীয়ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন—সংস্কারকামীরা তেমনি বৈদিক হিন্দুধর্মের নামে পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতিকে সমর্থন করতে থাকেন।

পরাবিদ্যা বা ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধানী থিওজফি আন্দোলন এ-যুগের সনাতনপন্থী সংস্কার-আন্দোলনের আর একটি বিশেষ দিক। পূর্বযুগের সংশয়বাদী ডিরোজিও-পন্থীদের সংঘর্ষ থেকে মুক্ত এই সনাতনপন্থীদের কোন ধর্ম

বিরোধিতা বিচলিত করতে পারেনি। নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ অহিন্দুসুলভ আচারদ্রোহে তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট্ পরিচালিত থিওজফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলনকে ভারতবর্ষীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবল করে তুলেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার অ্যানি বেশাণ্ট। সনাতন ভারতীয় মানসিকতায় দৃঢ়নিষ্ঠ এই আন্দোলন পরাবিদ্যার নির্বাপিত দীপ পুনঃ প্রজ্বলিত করে প্রাচীনযুগের অধ্যাত্মবিদ্যাকে ফিরিয়ে এনে তার মধ্যে নতুন করে আত্মদর্শন করতে চাইলেন। হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক রূপের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য জড়বাদের বিষময় ফলকে তাঁরা পর্যুদস্ত করতে চাইলেন। এই সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁরা মনুর বিধানকে সামাজিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় থিওজফিক্যাল সোসাইটির শাখা স্থাপিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র এই সংস্থার সভাপতি এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুকাল এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনে এ সংস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য নব্যহিন্দুধর্মের পরিণতি-পর্ব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্ব। ভক্তি-বিশ্বাস ও হৃদয়-প্রধান জীবনাদর্শ নবতর আধ্যাত্মিকবোধ সৃষ্টি করে হিন্দু-সমাজের মধ্যে বিশেষ গতি সৃষ্টি করল। হিন্দুধর্মের তুচ্ছতম নির্দেশের দৃঢ়চেতা সমর্থক হয়েও ধর্ম ব্যাপারে রামকৃষ্ণ সংকীর্ণ মনের পরিচয় কখনই দেননি। ধর্মকেন্দ্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষকে তিনি মনেপ্রাণে অসমর্থন করেন। ভক্ত-যুক্তি ও মানবপ্রেমকে সমসূত্রে বিধৃত করলেন বিবেকানন্দ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরাতনী গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনগণের শারীরিক ও মানসিক জড়তাকে নির্জিত করে সভ্যতার মঙ্গল-বিভাসিত দিকটিকেই তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করবার অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নব্যহিন্দুবাদের প্রচারকার্য পরিচালনায় লক্ষণীয় অংশ-গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। হিন্দুদের সামাজিক রীতি-পদ্ধতি, শিল্পকলা থেকে নব্যহিন্দুবাদের গার্হস্থ্য জীবনের মহিমময় পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমেও প্রচার লাভ করেছিল। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন হৃদয়বেদ্য সারস্বত রসবস্তুতে ও আত্মোপলব্ধিতে উদ্দীপনাময় হয়ে উঠেছিল।

বাংলা নাটকে নব্যহিন্দুধর্মের প্রভাব

সমাজ-পরিবেশের বিশিষ্টতা অনুযায়ী বাংলা নাটকের ভাব ও রূপের মধ্যেও লক্ষণীয় পার্থক্য ও প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। উনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়চেতনার যে নবোন্মেষ আমরা লক্ষ্য করেছি, আদর্শান্বিত মানসবৃত্তির মধ্যে তার সংবদ্ধ রূপই দেখেছি—চিত্তস্বরূপ আবিষ্কার করলেও বহির্জীবন, অন্তর্জীবন ও অর্জিত জীবনের সংগে আমাদের কুলধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। তখনও আমাদের জাতীয়ভাবের ভাবযোগের পর্ব চলেছে। ইয়ংবেঙ্গলদের 'কালাপাহাড়ী' আন্দোলন, সমাজ-সংস্কারমূলক খৃষ্ট-ব্রাহ্ম আন্দোলন বাঙালীর সমাজ ও জীবনকে যে সংগঠনশীল ভাবৈষণার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—জাতির সমাজজীবনের নতুন পর্বে অর্থাৎ নবান্বিত ধর্মচেতনায় তার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলা নাট্যসাহিত্যও এই সর্বাঙ্গীণ ধর্মভিত্তিক বৈশিষ্ট্য থেকে দূরবর্তী থাকতে পারেনি। প্রাকৃতিক ও বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের সংগে সংগে সমাজের লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ও পরিবর্তিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের অনুশীলনেই উনিশ শতকীয় প্রথমার্ধের প্রগতি দ্বিতীয়ার্ধে পরাগতিতে রূপ নিয়েছিল।

মুসলমান অধিকারের ফলে বাংলার সমাজজীবনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি-তার চেয়েও বেশী প্রখর হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় দ্বন্দ্ব—অনন্যা ভক্তি ও অভেদ দৃষ্টি। শুষ্ক কর্ম বা জ্ঞানবাদ প্রাধান্য পেলেও সর্বান্তঃকরণে সামাজিক মানুষ তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-উত্তীর্ণ উন্নততর মার্গ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের নির্দেশিত পথ ও জ্ঞান-ভক্তিবাদের পথরূপে দুটি পথ চিহ্নিত হল। এই পথ ধরেই ভক্তিবাদ ও লীলাবাদ প্রকটিত হল। এই ভক্তিবাদ এককালে পৌরাণিক যাত্রাগানের মধ্যে দিয়ে জাতির রস পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের সামাজিক রসচৈতন্য বাস্তবভিত্তিক নাট্যরচনায় বা নাটক-দর্শনে মনের ক্ষুধার রস নিষ্পত্তি ঘটাতে পারেনি। যাত্রার পশ্চাদপসরণের কালেও নাটকের ছদ্ম-রূপী মাধ্যম হিসেবে গীতাভিনয়ের মধ্যে দর্শকমন আনন্দরস খুঁজে পেয়েছে। এই হিসেবে মনোমোহন বসুর গীতাভিনয় সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে সৃষ্ট মনোমোহনের এই গীতাভিনয়ের নাট্যধারা রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ও ক্ষীরোদপ্রসাদে এসে পরিণতি লাভ করল। মনোমোহন নাটকে সংগীত-বাহুল্যের পক্ষপাতিত্ব যেমন করেছেন—যুগপৎ ভক্তি ও কারুণ্যের ভাব সৃষ্টি করে পুরাণ-প্রসংগের দিকেই মানসিক আনুকূল্য দেখিয়েছেন। মনো-মোহনের 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), নাট্যসমাজের উদ্বোধন-আনুষ্ঠানের জন্য লিখিত হয়েছিল। তাঁর 'সতী নাটক' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয়' নাটক (১৮৮১), রাসলীলা নাটক (১৮৮৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'সতীনাটকে' গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক প্রতিবেশে তত্ত্ব পরিবেশনের দিকটিও লক্ষণীয়। মনোমোহনের পৌরাণিক নাট্যসংগীতগুলির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের দিকটিও ফুটেছে।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্য দিয়েও এই জাতীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভক্তিভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮) নাটকে নারদের গানের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বলেছেন :

"অর্থ চাহি না আমি হে,—
চাহি মোক্ষ পদ, ওই রাঙা পদ
বিপদে ও পদ অতুল সম্পদ
তুমি মোর রাজা, আমি তব প্রজা,
তুমি প্রভু আমি দাস তোমারি।"

এই ভক্তিরসের প্লাবন নবপ্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিকচেতনা প্রবাহের অনিবার্য ফলশ্রুতি। প্রত্যক্ষবাদের চেয়ে আদর্শবাদেব এই আত্যন্তিক সাধনা যুগ-প্রভাবের আদর্শের বাণীবহ। পূর্বযুগের মত সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-জাত সমস্যা থেকে এ নাট্যাদর্শ মুক্ত। উচ্চতর আদর্শবাদ এখানে নাট্যসাহিত্যের নিয়ামক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিকজীবনের মধ্যে আদর্শের সামঞ্জস্য-সাধন, ধর্মচিন্তার রসসৃষ্টি, নৈতিক-আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের মধ্যেই এ-যুগের নাট্যকারেরা পুরাণের জাতীয় অনুশীলন করেছে। দেশের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নাটকগুলিও সামাজিক মানুষের অনুভূতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই যুগের নাট্যলক্ষণ বিষযে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : "এই যুগের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া গণ-মনের সংগে সংযোগ স্থাপনের যে বিপুল প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল বর্তমান যুগ পর্যন্তও অনুভূত হইতেছে—সমগ্রভাবে বাঙালীর মধ্যে নাট্যরস জাগ্রত

রুমিয়া দিবার কৃতিত্ব এই যুগেরই প্রাপ্য।" আবার নাট্যচেতনা গণ-রুচির অনুসারী হয়ে উঠেছে। এ যুগ বাংলা নাট্যসাহিত্যে সামাজিক কারণেই 'আত্ম নির্লিপ্তির কাল'।

২

উনিশ শতকের শেষভাগে নব্যহিন্দুবাদের প্রভাবে বিতর্কিত ধর্মবোধ জাতির বিশিষ্ট সংস্কাররূপেই দেখা দিয়েছিল। এই পথরেখা ও সমাজমনের নির্ধারক হিসেবেই পৌরাণিক নাট্য-আসরে গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতি। রঙ্গমঞ্চবিষয়ক চিন্তাও এ ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ছিল। সমসাময়িক মঞ্চ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা গিরিশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টিতে প্রেরণা ততখানি দেয়নি। ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশনে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক তাঁর কৌতুকপ্রদ চিন্তার ও ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি অনীহার পরিচয় পাই তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তিতে : "যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে-সব চরিত্র বোঝে না ; বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন ; রাজ-মুকুট, রাজ-অলংকার কুমারটুলী হইতে আসে,......একখানি রাজসভা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন।"[৮] পৌরাণিক নাটকে ভক্তিভাবটিই প্রধান—ঐতিহাসিক নাট্যাদর্শের মতো পরিব্যাপ্ত নির্দিষ্ট শতাব্দীর কোন চিন্তা সেখানে অনুপস্থিত। কাজেই পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালী নাট্যরসিকতা 'চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন' করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। পুরাণের ভাবসাধনা ও শ্রদ্ধাশীল গাম্ভীর্য বিষয়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : "বিগত যুগের কবি ও লেখকদের মধ্যে বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন যেভাবে পুরাণকে নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শ্রদ্ধাশীলভাবেই তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা intellect বা ব্যবহারিক বোধ-বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই করিয়াছিলেন, পুরাণের আভ্যন্তর ভাবগাম্ভীর্য অথবা পুরাণ হইতে আহৃত নিছক aestheticism তাঁহাদেরপ্রেরণাদেয় নাই। ভক্ত কবি গিরিশচন্দ্রও পুরাণের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—

৮ বর্ত্তমান রঙ্গভূমি

তবে পুরাণের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য অপেক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত ভক্তিবাদই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে রাগরঞ্জিত করিয়া দিয়াছে।" (ভারত-সংস্কৃতি, পৃ. ১৯৭-১৯৮)

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রসংগে সমালোচক মোহিতলাল বলেছিলেন,—"গিরিশচন্দ্রই শেষ বাঙালী প্রতিভা, বাঙালীর জাতীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শ, এমন কি নাটকীয় ছন্দও সেই প্রতিভার সৃষ্টি। বাঙালীর যাত্রার ও নাটকের সমন্বয় এমন করিয়া আর কেহ করিতে পারেন নাই। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালীর প্রতিনিধি ও নাট্যসংস্কৃতির ভাষ্যকার। রেনেসাঁসের আশীর্বাদধন্য শিক্ষিত বাঙালীর নতুন জীবনায়ন ও মুক্তমনের সমৃদ্ধিকে কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। জীবনের উচ্চ-আদর্শ ও ভাবুকতার রসচিত্র প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসে। কিন্তু তখনকার বাঙালীর কেবল চিত্তোৎকর্ষেই নয়—তাদের একান্ত বাস্তবজীবন, যে জীবনে প্রগতিশীলতার পাশেই সংস্কারানুগত্য, মুক্তবুদ্ধির সংগে ধর্মানুরাগ, সূক্ষ্মরুচির সংগে স্থূলবোধের একাকার—সেই বৃহত্তর অন্তর্জীবনের বিচিত্র ইতিহাস গিরিশচন্দ্রে আছে। তাই জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের নাটক বাঙালীজীবনের একটি বিশিষ্ট দর্পণ। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যেও খাঁটি বাঙালী হিন্দুভাবেই তিনি জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের এই বাঙালী জাতীয়তা-প্রীতির পশ্চাতে যে মনোধর্ম সক্রিয় তা হল নব্য-হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান-বিষয়ক সামাজিক শক্তি। সাহিত্যমূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই যুগচেতনা একটি বিশিষ্ট দিক। Mead-এর দার্শনিকতার সূত্র সন্ধান করে বলা চলে,—'Mind and self can best be understood as emergents from amore basic social process.'

একটি সামগ্রিক সংস্কৃতি নিয়েই গিরিশচন্দ্রের জীবনসাধনার হর্ম্য নির্মিত এবং তার সংগে মিলিত হয়েছে একটি জীবনধর্মী প্রাণসত্তা। অপরেশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়ের মতে,—'বাঙালীর প্রাণের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়াই নাট্যসাহিত্যে তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই।' সমগ্রভাবে বাঙালীর সহজ ধর্মবিশ্বাস ও অধ্যাত্মবোধকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনিই সে সময়কার রঙ্গমঞ্চের নেতৃস্থানীয় পুরুষ এবং বাঙালীর রসজীবনের দিক দিয়েও সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র। গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্য

দিয়ে জাতীয় রসপিপাসা চরিতার্থ করতে চাইলেন। 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম আশ্রয় করে' তিনি যে সকল নাটক রচনা করেছিলেন, চিরন্তন সাহিত্যের মানদণ্ডে তার যে মূল্যই নির্ধারিত হোক—সমসাময়িক বাঙালীর প্রত্যক্ষ রস-বিচারে তা সন্দেহাতীতরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিল। পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলারই পুরাণ কথা প্রচার করেছেন। বাংলার নিজস্ব সমগ্র সাধনার মূল শক্তিকেই তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত সম্পর্কিত ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ গীতিভারাক্রান্ত যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন—বাঙালীর নিজস্ব অধ্যাত্ম-বোধের দ্বারা তার চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত। "অকালবোধন' নামক গীতিনাট্য রচনার পর তাঁর 'রাবণ বধ' নাটক রচিত হয়। নয়টি দৃশ্যে সমাপ্ত গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণবর্জন' নাটক 'রাবণবধ' নাটকের উপসংহার রূপে রচিত হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে 'সীতার বিবাহ' ও 'রামের বনবাস' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন। কাশীদাসী মহাভারতের অভিমন্যুবধ আখ্যান কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'অভিমন্যুবধ' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক।

জৈমিনী ভারতের মূল কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'জনা' (১৮৯৪) নাটক। জৈমিনী ভারতের জনা চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতার রূপটি কাশীদাসী মহাভারতে অনুপস্থিত। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রটিকে পটভূমিকার দিক দিয়ে তদানীন্তন বাঙালীসমাজমন ও রুচির অনুগামী করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শের দুটি ধারা এই নাটকে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মতো পাশাপাশি রয়েছে। দেশীয় আদর্শ ও সমসাময়িক রুচি একই সংগে এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত ও ট্র্যাজিক চরিত্ররূপ এই নাটকে স্থান পেলেও দেবতার লীলা ও মহিমা উপলব্ধির চিরন্তনী ভারত-বর্ষীয় শান্তরসের সুরটিও এ নাটকে উপস্থিত। উনিশ শতকের শেষ পাদের বাংলার ভক্তিবাদের পুনরুত্থান ও অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তির বিনির্মল স্বরূপ এ নাটকের একটি স্বতন্ত্র পাঠ। অতএব যুগোচিত আধ্যাত্মিক প্রেরণা যেমন নাটকটির প্রত্যঙ্গে বিচ্ছুরিত—তেমনি আবার তা গণরুচি ও সমাজমনের অনুসারী।

মহাভারতের পার্শ্বঘটনা নিয়ে রচিত নাটকে পৌরাণিক সিদ্ধরসের প্রতিষ্ঠার চেয়ে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্যবাদই বড় কথা হয়ে উঠেছে।

তা হল সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূলনীতির প্রতি ভক্তিবাদমূলক আনুগত্য। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবেই তাঁর পরবর্তী পৌরাণিক ও অবতারমূলক নাটকে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি আনুগত্য, ভক্তিরসের মধ্য দিয়ে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের পরিণতির সূচনায়, নলদময়ন্তী, চৈতন্য ভাগবত অবলম্বনে 'চৈতন্যলীলা' বা 'নিমাইসন্ন্যাস' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকের নিজস্ব চিন্তা ও চেতনায় ভক্তিরসই মুখ্য উৎস।[১] বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ ও পরিণামের মিলনকে কেন্দ্র করে রচিত 'তপোবন' নাটকে তিনি সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদেরই ভাবপ্রচারক। পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে অবিমিশ্র পৌরাণিক পরিবেশের মধ্যেই ধর্মসংস্কারের ভাব ব্যাখ্যা করে আত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তীকালের পৌরাণিক তত্ত্বনাট্যের ধারা হল, নব্যহিন্দুধর্মাদর্শে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মসাধনায় প্রত্যাবর্তন করবার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যের সংগে পুরাতনী জীবনীমূলক নাটকগুলির নাটকীয়ত্বের যোগ আছে। বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি বিনম্র মানসচর্গার ইতিহাসই তাঁকে এ জাতীয় জীবনী নাটক রচনায় প্রণোদিত করেছে। চৈতন্য-বুদ্ধ-নিত্যানন্দ-শংকরাচার্য প্রভৃতি চরিত্র-অবলম্বী নাটকে অলোকসামান্য ভাগবতীয় লীলাই

—

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ সালের ৫ই আশ্বিন চৈতন্যলীলা দেখতে আসেন। ১৮৮৪ সালের ২রা আগষ্ট (১২৯১, ১৯ শে শ্রাবণ) ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা প্রথম অভিনীত হয়। ভারতের থিওজফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাদাম ব্লাভাট্স্কি সহযোগী কর্ণেল অলকট্ 'চৈতন্য লীলা' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অভিনীত 'চৈতন্যলীলা'র প্রভাব বিষয়ে অমৃতলাল বসু বলেছিলেন,—'নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্য চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।'

গিরিশচন্দ্র যে পর্বে চৈতন্যলীলা রচনা করেন—সে যুগে যুক্তির স্থান গ্রহণ করেছিল আত্যন্তিক ভক্তিবাদ। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা কথঞ্চিৎ নয়। তাঁর নগর সংকীর্তন পরিকল্পনা গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মানুসারী। কেশবচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গৌরাঙ্গভক্তি পুনরুত্থানে ব্রতী হয়ে শেষ পর্যন্ত জটিয়া বাবা নামে খ্যাতি লাভ করেন। সমসাময়িককালে বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ বৈষ্ণবধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। রামকৃষ্ণের অনুসরণে যুক্তিবাদ ত্যাগ করে ভক্তির আতিশয্যকেই এ নাটকে গিরিশচন্দ্র জয়যুক্ত করলেন :

ব্যঞ্জিত—আবার বিল্বমংগল, রূপসনাতন প্রভৃতি ভক্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভক্তি ও তত্ত্বমুখ্য নতুন ধরনের নিবিড় রসচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'চৈতন্যলীলা' নাটকে গিরিশচন্দ্র চৈতন্যচরিত্রের মানসিক রসস্ফুরণের দিকটি গ্রহণ না করে নিজস্ব আধ্যাত্মিক আদর্শের নবপরিমণ্ডলেই নাটকটি রচনা করেছেন। চৈতন্যভাগবত অবলম্বনে প্রেম ও বৈরাগ্যবিষয়ক আর একখানি নাটক 'রূপসনাতন'। সনাতনের ভক্তিরসোদয়ের পরিচয়ই এ নাটকের মূল অঙ্গীরস। 'ভক্তিমাল' গ্রন্থের বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চরিত্রকাহিনীকে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে রূপ দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তিবাদকেই প্রধান করে তুলে গিরিশচন্দ্র আধ্যাত্মিক মনোভাবের বিকাশকেই মুখ্য স্থান দিয়েছেন। 'বুদ্ধচরিত' নাটকেও বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর তদানীন্তন আধ্যাত্মিকতারই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'শংকরাচার্য'নাটকে জ্ঞানবাদের উপর অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকচেতনার নতুন পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র সুলভ ভক্তি ও উদ্ভাসিত করুণরসের মধ্য দিয়ে পুরাণের নীতিকথা-ভিত্তিক যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন—তার শিল্পমূল্যের চেয়ে সমাজমনের পশ্চাৎপট ও স্বরূপ-বৈচিত্র্য অধিকতর কৌতূহলজনক। এ-বিষয়ে

"পাপ। ভাল যদি ঈশ্বর কৃপায়
রিপুচয় পায় পরাজয়,
যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে
শাসন করিব ধরা।
কলি। ভক্তিস্রোতে যুক্তি ভেসে যায়
হেরি তরঙ্গ নিচয়
সভার হৃদয়-বিজ্ঞান পালায় দূরে।"

হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন, থিওজফিষ্ট আন্দোলন ও নব্যবৈষ্ণব আন্দোলন এবং সর্বোপরি পরমহংসদেবের ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা নাটকাভিনয়ের পশ্চাৎ-পটভূমি।

গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন,--'সেবাধর্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম।' 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর ও 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল চরিত্রে বিবেকানন্দের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গিরিশচন্দ্র: 'মানুষ আমার দেবতা! যারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান বলে—ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে, এ-কথায় তর্ক-বিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ।'

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "বঙ্কিমযুগে পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি যখন শিক্ষিত-সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট হল, তখন গিরিশচন্দ্র সেই পৌরাণিক ভক্তির আবেগ ও সুলভ তত্ত্বকথাকে নাটকে প্রচার করে বাঙালীমানসের আর একটা দিকের পরিচয় তুলে ধরলেন। যুক্তিবাদী বাঙালীর মনে যেমন ক্ষুরধার মননের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি আবার ভক্তি, করুণরস, প্রাক্তন নিয়তি প্রভৃতির প্রতিও তাঁর আকর্ষণ প্রবল। গিরিশচন্দ্র নাটকে সেই ভক্তিভাব-ব্যাকুল বাঙালীচিত্তের চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুললেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, উনিশ শতকে বাংলা নাটকের অভিনয়মূল্য যতটা ছিল, বা তার দিকে অধিকারী মহাশয়েরা যতটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার শিল্পকলা বা সাহিত্যগুণের দিকে ততটা সচেতন হননি। কারণ নাটক-উপভোগের যারা ছিল সামাজিক, তাদের অধিকাংশের মানসিক পরিমণ্ডল উচ্চতর কলা-কৌশল বা গভীরতর সারস্বত মূল্যের প্রতি উদাসীন ছিল। কাজেই জনরুচিকে নাটকের একমাত্র মূলধন করা হয়েছিল বলে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সুস্থায়ী শিল্পাদর্শ বড় একটা গড়ে উঠতে পারেনি। তা সে যাই হোক্ উনিশ শতকের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের মারফতে যে সাধারণ বাঙালীমনের প্রবণতার যথার্থ সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১০] শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মুখর নারীকে আবার গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসিয়ে গিরিশচন্দ্র যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন—তাও নব্যহিন্দুবাদের প্রভাবপুষ্ট। যৌথ-পরিবার প্রথার পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের মধ্য দিয়েও গিরিশচন্দ্র নব্যহিন্দু মতাদর্শের সমর্থন করেন। পরিবারের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার আভ্যন্তরীণ সংযোগ-সাহায্য ঘটেছে। পারিবারিক জীবনেরই অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যের বিপর্যস্ত রূপ 'প্রফুল্ল' নাটকে ফুটে উঠেছে।

'কালাপাহাড়' (১৮৯৬) নাটকটিকে 'ভক্তিরসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক' বলে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই চিহ্নিত করেছেন। 'কালাপাহাড়' গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের আধ্যাত্মিক সংকটের কথাতেই উজ্জ্বল। চিন্তামণি নামীয় চরিত্রই রামকৃষ্ণের আদর্শে কল্পিত। গিরিশ-জীবনের ক্রমোন্মুখ আধ্যাত্মিক বিচিত্র

---

১০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা—কার্তিক, পৌষ ১৩১৩

বিবর্তনের সংশয়ক্লিষ্ট দ্বন্দ্ব সংঘাতমুখর পরিণতি নাটকটির মূল পাঠ। প্রেম-প্রীতি ও ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম স্বীকৃতির আদর্শই বড় কথা হয়ে উঠেছে :

> 'এক বিভু বহু নামে ডাকে বহুজনে,
> যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
> বোঝায় সলিলে, সেইমতো আল্লা, গড্,
> ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে, নানা স্থানে
> নানা জনে ডাকে সনাতনে।'

৩

নাট্যকার অমৃতলাল গিরিশ যুগের প্রতিনিধি। নব্যহিন্দুধর্মের আবির্ভাবের সংগে সংগে সনাতনী পৌরাণিক নীতি ও আদর্শের স্বীকৃতিতে হিন্দুসমাজমন নবপ্রবুদ্ধ হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য ভাবাগত মতবাদ ও আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠল। উনিশ শতকের শেষ দিকে তথাকথিত উগ্র প্রগতিমূলক দৃষ্টিভংগীর পথ পরিত্যাগ করে শাস্ত্রশাসিত ও ধর্মনিযন্ত্রিত যে পথ গিরিশচন্দ্র গম্ভীর ভাবানুভূতির মধ্য দিয়ে নির্দেশ করলেন—অমৃতলাল কৌতুকরস ও অসহিষ্ণু ব্যঙ্গের প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রগতির পরাগতি ও অসার ব্যর্থতার কথাই প্রমাণ করলেন। 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রহসনে হিন্দুধর্মের পুরাতনী মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করবার সাবলীল প্রয়াস অমৃতলালে লক্ষ্য করা যায়।

ভক্তিরস একটি ঐতিহ্যগত সংস্কার এবং তা জাতীয় অনুভূতিরই অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শতকীয় জাগরণমুখর যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকচেতনা জাতীয় জীবনের ও সমাজমনের এই স্বতঃস্ফূর্ত রসধারাটিকে শুষ্ক করতেপারেনি। রামকৃষ্ণের সাধনায় সেদিন দেবতাবোধ ও অধ্যাত্মকল্পনা প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠে হিন্দুমনকে যখন নতুন করে প্লাবিত করতে সুরু করল—তখন তা অতীত ঐতিহ্যের সংগে যোগসূত্র দৃঢ় করে তুলতে চাইল। বাঙালী এর মধ্যে তার মনোধর্মগত ঐতিহ্যসংস্কারকে সব চেয়ে ঘনিষ্ঠরূপে প্রতিফলিত হতে দেখেছে। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও এই ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর

'নাটক ও তাহার অভিনয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এ-বিষয়ে উক্তি করেছিলেন,—"ধর্মের একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতির গঠন হয়। সেই সূত্রটি ধরিয়াই আবার নাট্যকলা লীলা করিয়া থাকে। অনেক সময় স্থূল দৃষ্টিতে যদিও তাহা সকলের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু একটু গবেষণার সহিত নিরীক্ষণ করিলে সে সূক্ষ্ম সূত্রটি দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।" ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বভ্রুবাহন', 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'উলুপী' (১৩২৩), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে এই পৌরাণিক-চেতনার বিস্তার লক্ষ্য করি।

আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাবের পরিস্ফুটনে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের' যুগটি কার্যকর হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে আধ্যাত্মিকতার অবাঙ্-মনসগোচর দিব্যানুভূতির ক্ষেত্রে মানবীয় রস দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রলালের পুরাণদৃষ্টি ছিল ভিন্নতর। তিনি হলেন উনিশ শতকীয় পুরাণের নবরূপায়ণের ধারার নাট্যকার।

পঞ্চম পর্ব : প্রথম অধ্যায়

সমাজজীবনে খরস্রোত : স্বদেশভাবনার 'কর্মযোগ' (১৯০০-১৯০৫)

বাঙালীর সমাজচিন্তার ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা ও স্বাদেশিক ভাবনায় বৃটিশ শক্তি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন—তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের আন্দোলনকে বৃটিশ শক্তি প্রত্যক্ষ রাজদ্রোহ বলেই মনে করেছে। বিদ্রোহভাবনা থেকে ভারতবাসীর মনকে কেন্দ্রচ্যুত করে এনে ইংরেজের অনুকূলে আবেদন-নিবেদনের দাবী জ্ঞাপনের দ্বিতীয় ভাবনায় উৎসাহিত হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫-র কংগ্রেস। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বভারতীয় বাঙালী নেতারা এ অধিবেশনে স্থান পাননি। সমাজজীবনের খরস্রোতের আবর্তে দ্বিতীয় অধিবেশনে অবশ্য বাঙালী নেতাদের বাদ দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের চিন্তা তাঁরা করতে পারেননি।

ভারতের অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতাও এই সময়ে চরমে পৌছেছিল। বৃটেন থেকে ভারতে আমদানী ও ভারত থেকে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণগত বিভেদনীতি এ দেশের অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে বিপর্যস্ত করেছিল। বৃটিশশক্তি বৈশ্যনীতির বিস্তারকল্পে সারাভারতময় রেলপথ নির্মাণ, যানবাহনাদি চলাচলের যে ব্যপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন—তার ব্যয়ভারও ভারতীয়দের শোষণ করেই নির্বাহ হত। এর মধ্যে ১৮৭৬ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত ব্যাপক দুর্ভিক্ষে কবলিত ভারতের বিপর্যয় চরমে পৌছেছিল। জীবনভূমির এই কঠিনতম পরীক্ষার মধ্যেও ভারতবাসী তার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি। ইংরেজ সরকার তখন আরও ব্যাপক দলন-নীতি সুরু করল। মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতির জন্ম, শিবাজী উৎসব বা গণপতি মেলার প্রচলন হয়। ১৮৯৪ সালের আদেয়ার রণক্ষেত্রে আবিসীনিয় কৃষ্ণকায়দের কাছে ইতালীয় শ্বেতজাতির পরাজয় চিন্তাশীল ভারতীয়দের বিশেষ উৎসাহিত করেছিল। ১৮৯৩-র বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ে ভারতবাসী আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়চেতা হয়ে উঠল। দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষে জনগণের জন্য কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তাঁর বিচারের সময়

জাতির কণ্ঠরোধকরণে প্রযুক্ত হল 'Sedition Bill' [১] রাশিয়ার জনগণের আত্মচেতনা আমাদের রাষ্ট্রিকবোধকে প্রভাবিত করেছে। ১৮৬৭ সালের পর থেকে জাপানের রাষ্ট্রিক অগ্রগতি শক্তি মদোন্মত্ত পাশ্চাত্যের দরবারে যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল—তাও পরাধীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ শক্তির ও উৎসাহের ভূমিকা তৈরী করেছিল। রাজপুত-শিখ-মারাঠা জাতির শক্তির অভ্যুদয়ের ইতিহাস ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহায় শক্তির সঞ্চার করেছিল। এইভাবে উনিশ শতকের শেষের রাজনৈতিকচেতনা প্রকাশ্য বিরোধিতার মধ্য দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবোধে রূপান্তরিত হল। আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে বাঙালীমানস শৃঙ্খলমোচনের বিপ্লবে ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তি কামনায় মুখর হল। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করেন কার্জন। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশীয় প্রজাদিগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমর্থনে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির কোন আস্থা ছিল না। ১৮৯৯ সালে 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট' দ্বারা তিনি নাগরিকবৃন্দের স্বাধীনতা হরণ করলেন। ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশিত হতে থাকে। কমিশনের একমাত্র সদস্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে রিপোর্টের পরিশিষ্টে প্রকাশ করেন। তথাপি ১৯০৪ সালে কার্জন 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট চালু করলেন। শিক্ষাসংকোচ করে ও ইংরেজি শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার স্পৃহাকে দমন করতে তিনি উৎসাহী হলেন। ১৯০৫-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জনের সমাবর্তন অভিভাষণে প্রাচ্যবাসীর অসংগত নিন্দার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠিত হয়; ১৯০৫ সালের ১০ই মার্চ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে যে কার্জন-বিরোধী নিন্দাত্মক সভা অনুষ্ঠিত হয়—আন্তঃ ভারতীয় ক্ষেত্রেও তারই অনুসরণে

---

১ "The law of Sedition was transplanted on Indian soil from England. Upon the Charter Act of 1823, a law of commission was appointed with Lord Macaulay as a member, who proposed insertion of section 113 of the Draft Penal Code making excitation of feelings of disaffection against the Government established by law in the territories of the East India Company criminal."

প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। কার্জনের সামগ্রিক শাসননীতি ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর বিক্ষোভ প্রধূমিত হল।

শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কারণে ১৮৯১ সালে বাংলার আয়তন সংকীর্ণ করবার জন্য বৃটিশ সরকার চিন্তা সুরু করেন। ১৮৯৬ সালে তৎকালীন আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তির জন্য এক পরিকল্পনা করেন। ১৯০১ সালে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার এনড্রু ফ্রেজার সরকারী পত্রে উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সংগে সংযুক্তির প্রশ্ন তোলেন। এরপর এনড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হয়ে ১৯০৩ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। লর্ড কার্জনও এর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জিলিং ব্যতীত রাজসাহী বিভাগ একত্রিত করে একজন ছোটলাটের অধীনে স্বতন্ত্র প্রদেশসংগঠনে পূর্ববঙ্গবাসীদের অনুগামী করে তুলতে চান—কিন্তু বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। ১৯০৪ সালের ১৮ই মার্চ কলকাতার টাউনহলে সমগ্র বাংলার প্রতিনিধিগণ এক মিলিত প্রতিবাদ সভা করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ একটি প্রতিবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। সরকার পক্ষও বেশ কিছুদিন নীরব থাকে। ১৯০৪ সালের ৫ই এপ্রিল বিলেতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় হেনরি কটন্ শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' পত্রিকায় ভারত-সরকারের বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রকাশিত হলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্যগণ এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসু হলেও কোন যোগ্য প্রত্যুত্তর তাঁরা পান না। ১৯০৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ স্যার হেনরীর অধিনায়কত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে মে মাসে বিলেতের বিখ্যাত 'স্টাণ্ডার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতসচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীকে সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত করল—আনন্দমোহন বসু সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে অগ্নিময় শপথের বাণী উচ্চারণ

করলেন: 'Lord Curzon had done us indeed signal service and enables us to lay the priceless foundation of a new national life- ১৯০৫-এর ১৩ই জুলাই 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের বলিষ্ঠ কর্মসূচী প্রণয়ন করে 'কর্তব্য নির্ধারণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় আহ্বান পৌঁছে দেওয়া হল সমগ্র জাতির কাছে: "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয়—ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে······বাঙালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার জন্য মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।······জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে তবু বিদেশী চিনি খাইবে না।··· জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার বা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।" বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংগে সংগে ঐ দেশে দেশীয় শিল্পের নানা কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরাণী 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী শিল্পের বিপণী খুললেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় জাতীয় হিতবাদী সমিতি গঠন করে স্বাদেশিকতা প্রচারে ব্রতী হলেন। রবীন্দ্রনাথ উগ্র বয়কট নীতি সমর্থন না করলেও এই আন্দোলনের মহতী অনুপ্রেরণার জাতীয় শক্তিকে স্বাগত জানালেন: "কিন্তু এই ব্যাপারে দেশ যে আমার—এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ সংগঠন ও সমবায়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর সেই সংগে পল্লীগুলিকে নবপ্রাণে সজীব করে তুলতে নির্দেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাতির কাছে নিবেদন করলেন: "আমরা নিজেদের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষে স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃ পুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে।" শক্তিচর্চার মহান নির্দেশ দিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করে। বিপিনচন্দ্র পাল র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভংগীর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে ঐক্যমূলক ভাবগ্রন্থিতে রাজনৈতিক-চেতনাকে সম্প্রসারিত করে তুলতে চাইলেন। সরলা দেবী

ধীরাষ্টমী গানে মাতৃভূমির অপরাজেয় শক্তির মহিমাকেই স্বীকৃতি দিলেন। বাঙালীর এই অনমনীয় বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যের শক্তির সামনে বৃটিশ শক্তিকে বঙ্গভঙ্গ বিল রোধকরণে প্রণোদিত করা। কিন্তু ১৯০৫ সালের ১৯ শে জুলাই ভারত সরকার সিমলায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক বিলটিকে আইনে পরিণত করলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখলেন: "We felt that the whole of our future was at stake and that it was a deliberate blow aimed at the growing solidarity and self-consciousness of the Bengalee-speaking populatation." রবীন্দ্রনাথ বললেন,—"এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায়-উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে······আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে।" বাঙালীর অখণ্ডতার ঐক্য স্মরণ করে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,' গান রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাখী বন্ধন' উৎসবে যোগ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের পরিকল্পনা প্রকাশ করে জাতিকে শোনালেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। ইংরেজ সরকার মুসলমান জাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার বিষস্ফোটক সৃষ্টি করতে চেয়েও বিভেদ নীতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন।

দেশের রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের মহান ভূমিকা স্মরণ করে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় স্বার্থেই তরুণ ছাত্রদের আহ্বান জানালেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্রে। 'সঞ্জীবনী' (৩রা আগষ্ট, ১৯০৫) পত্রিকায় 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও ছাত্রদল' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ছাত্রমণ্ডলীর প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হয়:

"যতদিন অঙ্গচ্ছেদের হুকুম রহিত না হয়, ততদিন ছাত্রমণ্ডলী চারি প্রতিজ্ঞায় আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতেছেন।

১ম প্রতিজ্ঞা। যে সকল দ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডজাত সে সকল দ্রব্য স্বয়ং ব্যবহার করিব না। অন্যকে সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিবৃত্ত করিব।

২য় প্রতিজ্ঞা। কোন প্রকাশ্য আমোদ-প্রমোদে স্বয়ং যোগ দিব না, অন্যকেও এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

৩য় প্রতিজ্ঞা। অঙ্গচ্ছেদের হুকুম রহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থদান করিব।

৪র্থ প্রতিজ্ঞা। যতদিন জন্মভূমি পুনর্মিলিত না হয়, ততদিন শোকচিহ্ন ধারণ করিব।"

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'ব্রতী সমিতি' যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বন্দে মাতরম্' ও নলিনীরঞ্জন সরকারের 'বন্দনা' নামক স্বদেশী সংগীত থেকে যুবশক্তি আত্মশক্তির অন্তপ্রেরণা লাভ করেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অধিনায়কত্বে 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় গঠন, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় 'সন্তান সম্প্রদায়' গঠন, অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে 'বরিশালের ছাত্র-আন্দোলন' ইত্যাদি সংগঠনশীল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও যুবশক্তির ভূমিকাটিও সম্পূর্ণ করেন। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের দমনার্থ বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ কার্লাইল প্রকাশিত এক ইস্তাহার (১৯০৫, ২২শে অক্টোবর) অমান্য করে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে ছাত্রদল 'Anti-Circular Society গঠিত হল। বাংলার চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করে জাতীয় শিক্ষায়তন ও নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে দেশানুপ্রাণিত গণশিক্ষার ভূমিকা তৈরী করল। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ জাতীয়তার দাবীতে সোচ্চার হল।

১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতির সংগে সংগে ভারতের রাষ্ট্রিকচেতনায় বৃটিশ শক্তির অবস্থিতির প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে নরম ও চরমপন্থী বিভেদ বাঙালীর জাতীয়চেতনার স্রোতকে দ্বিধাবিভক্ত করল। চরমপন্থীরা ইংরেজ বিরোধিতায় এবং নরম-পন্থীরা ইংরেজ শক্তির সংগে সদ্ভাবের পোষকতা করতে চেয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের রাজানুগত্য মতবাদ ও আপোষহীন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্য দিয়ে আর এক নব্যশ্রেণীর বিপ্লবীদলের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর' পত্রিকা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা এবং অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজী পত্রিকার মধ্য দিয়ে এই ত্রিধা-বিভক্ত জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন রূপায়িত হয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন না করে ব্রহ্মবান্ধব আত্মশক্তিকে অন্তর্মুখী করতে চেয়েছেন। অরবিন্দ দেশাত্মবোধক আচরণকে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সন্ত্রাসবাদীদের শক্তিচর্চা ও ভক্তিচর্চার পরিচায়নে

'যুগান্তর' পত্রিকা কর্মযোগেরই ব্রতী ছিলেন। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করে গণঅভ্যুত্থানের প্রচারে 'যুগান্তর' যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে রাশিয়ার 'নিহিলিষ্ট' দর্শন ও আয়ারল্যাণ্ডের সন্ত্রাস-বাদীদের কর্মপন্থার অনুসরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। স্বরাজের এই দাবীর মধ্যে স্বদেশচিন্তার ভাবরূপ ও গণসংযোগের কর্মরূপের বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছিল।

পঞ্চম পর্ব : দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বদেশী-আন্দোলন ও বাংলা নাটক

সমাজজীবনের খরস্রোতে জাতির এই জাতীয়চেতনার মহামুহূর্তে নাট্য-কারেরাও দূরে সরে ছিলেন না। দৃশ্যকাব্যরূপে অভিনয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা জনচিত্তে স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছেন। দেশবাসীকে মহৎ ঐক্যের অনুভূতিতে ভাবিত করে দেশের আর্থিক-বাণিজ্যিক পারমার্থিক কল্যাণে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন তাঁরা। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনে নাটকের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিচার-বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের অতীত পর্যালোচনা করতে হবে। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকে ভারতবোধ বিচারকালে আত্মশক্তিতে দেশবাসীর সামগ্রিক জাগরণ পর্বের একটি অংশ আমরা অনালোচিত রেখেছিলাম। শাসনকর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধতায় কতকগুলি নাটকে প্রজার বলপ্রয়োগের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। বৃটিশ শক্তি নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল (১৮৭৬) প্রণয়ন করে এই জাতীয় নাটকগুলিকে দমন করেছেন। অবদমিত পর্যুদস্ত শক্তিও তাতে পরাজয় মানেনি। রাজশক্তির সংগে জাতীয়তাবাদী নাট্যশক্তির এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসও সমাজ-অভিপ্রায়ের নির্ণায়ক। স্বদেশী আমলের নাটকগুলির অন্তর্বেগ শক্তির পূর্বপটভূমি বা উপক্রমণিকা অংশ হল পূর্বযুগের নাটকগুলি। স্বদেশীযুগের নাট্যশক্তির যথার্থ ভূমিকা পর্যালোচনার জন্যেই পূর্বযুগের কিছুটা ইতিহাসের ব্যাখ্যা এখানে করবো।

২

রাষ্ট্রিক অর্থে অখণ্ডতার পুনর্বাসন প্রয়াসে জাতীয়তাবাদী নাটকের অভিনয় সাফল্য ইংরেজ সরকারকে ভাবিত করে তুলেছিল। নাট্যকারেরা অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা চিন্তায় ভূগোলের পরিসীমা মানেননি—ইতিহাসের পথ ধরে প্রাচীনকালে পৌঁছে হিন্দুশাস্ত্রের কথা ভেবেছেন। ভারতীয় ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে তাঁরা স্মরণ করেছেন—যখন ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে পরস্পর নিরপেক্ষ

হয়নি। বীররসের স্বাদিষ্ট সহনীয়তায় তাঁরা আত্ম-অবগাহন করেছেন। তটস্থ ইংরেজ সরকার এ দেশীয় নাট্যদর্পণের গণবিক্ষোভে নিজেদের শাসনতান্ত্রিক প্রতিরূপ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৈশ্যনীতির বিচ্ছিন্নতার সংশয়ে ভাবিত হয়ে উঠলেন। প্রতিফল স্বরূপ অনুদার ও অদূরদর্শী শাসনতান্ত্রিক দমন আবার কার্যকর হয়ে উঠল। শাসক শ্রেণীর এই মানসিকতার ব্যাখ্যা প্রসংগেই হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'Indian Stage' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "The Hon'ble Mr. Hobhouse the law-member of the Viceroy's Legislative Council, wanted special powers of the Executive quoting history, that in time of excitement there was no surer method of directing public feeling against individuals or classes or the Government itself, than by exhibiting them on the stage in an odious light and the best remedy was, therefore, to suppress such dramas."

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড রাজধানী কলকাতায় এলেন। যুবরাজ সংবর্ধনায় নাগরিক সমাজ রাজভক্তির উদ্দীপনায় কোন প্রাবল্যের পরিচয় দিলেন না। কিন্তু রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সর্বসাধারণের প্রবল উপেক্ষা সত্ত্বেও যুবরাজকে নিজ অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপন পরিবারের নারীদের দিয়ে তাঁকে বরণ করালেন। হিন্দু অন্তঃপুরে এই বিজাতীয় আহ্বানে আলোচনা, আন্দোলন ও গুজবে সমগ্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা মন্তব্য করলেন—'যে মূল্যে ইনি রাজসম্মান ক্রয় করলেন তাতে সমস্তজাতির মানসম্ভ্রম আজ পদ-দলিত হল।' অমৃতবাজার পত্রিকা বললেন,—"যে পাষণ্ড নিজ পরিবারের মর্যাদা এইভাবে ধূলিসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না—সে দেশের, জাতির ও সমাজের ব্যাধিস্বরূপ ঘোর কলঙ্ক।" জনমতের এই ক্ষুব্ধ বিরূপতা রঙ্গমঞ্চকেও স্পর্শ করল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালে বাঙালীসমাজের এই ঘটনাটি-কে কেন্দ্র করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'গজদানন্দ' প্রহসন অভিনয় করলেন। প্রহসনটি উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র সংগে ১লা মার্চ যখন অভিনীত হচ্ছিল, তখন পুলিশ এসে অভিনয় বন্ধ করে দিয়ে এর বিরুদ্ধে অর্ডিনান্স জারী করেন। কর্তৃপক্ষ ভীত না হয়ে প্রহসনটির নাম বদল করে ২৬শে ফেব্রুয়ারী 'হনুমান চরিত' অভিনয় করতে থাকেন। বড়লাট স্বয়ং

এবারে রাজভক্ত প্রজাকুলের মান রক্ষার্থ এই প্রহসন অভিনয় বন্ধ রাখতে আদেশ দেন। নাট্যদমনের চিন্তায় শাসকবর্গ সচেতন হলেন। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অভিনয়ের পর 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয়ের দিন ৪ঠা মার্চ পুলিশ এসে থিয়েটারের মালিক ও অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করল। ৫ই মার্চ মিঃ ডিকেন্সের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২, ২৯৪ ধারায় বিচার হয়। নাটকটি অশ্লীল নয় বলে বিজ্ঞজন মত দিলেও তা উপেক্ষা করে মিঃ ডিকেন্স উপেন্দ্রনাথ দাসকে একমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। হব্ হাউস ২০শে মার্চ নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণ করেন।[১] জনসাধারণের প্রাণে আবেগের সঞ্চার করে বলে নাটকের শক্তি অমোঘ এবং নাটকের ক্রান্তিকারী পরিবর্তন সাধনের শক্তি অপরোক্ষভাবে নৈতিক নেতৃত্ব ও চিন্তা-নেতৃত্ব দিতে পারে বলেই নাট্যনিয়ন্ত্রণ করে এই ভিত্তিভূমিকে বন্ধ্যা করে দিতে উদ্যোগী হলেন বৃটিশশক্তি। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড লিটনের অনুমোদনে এই বিলটি আইনে পরিণত হল। বৃটিশশক্তি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটকগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ ও জাতীয় মনের মুক্তিকামী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেই এই সরকারী আঘাত হানলেন। জাতীয় জীবনের মুকুর নাট্যমঞ্চের মুক্তির দাবীতে অমৃতবাজার পত্রিকা (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬) ঘোষণা করলেন: "নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাহা

১ তিনি এই উদ্দেশ্যে বলেন: "A respectable Hindu gentleman holding a good position in society, one of the legal advisers of the Government and a number of the Legislative Council of Bengal gave an entertainment at his house, which some of the Castefellows disapproved. In order to punish him they got up a play in which this gentleman, though he had done nothing, but what was perfectly lawful, perfectly innocent, perfectly honourable was represented as deliberately, setting the honour of himself and his family, in order to get promotion and money.

It was the case, which induced H. E. the Viceroy to issue an ordinance for the purpose of giving the Government of Bengal, power to control 'dramatic performance' and the Bill which was framed on the model of this ordinance. —Englishman; March 16, 1876

গৃহীত হইল না। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এই আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এই আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজআজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসী এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।" লর্ড নর্থব্রুকের নাট্যনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পরিকল্পনাকেও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে অবদমিত করতে চেয়েছিলেন ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্রের 'সম্পাদকীয়'তে।

নাট্য পরিস্থিতির এই পটভূমি বিশ্লেষণের পরে আমরা নাট্যকার উপেন্দ্রনাথদাস ও তাঁর রচিত দু'খানি নাটকের পর্যালোচনা করবো। বৃটিশ রাজশক্তির চণ্ড শোষণ নীতি ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সীমাহীন প্রত্যয় নিয়ে বজ্রকণ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রকাশ্যভাবেই তাঁর নাটকে রূপ পেয়েছে। 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের ভূমিকায় স্বর্গসুখ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—নাট্যকারের মানস-কামনা হল 'মুহূর্তেক যদি পাই, স্বাধীন জীবন।' স্বাধীনতা ব্যাকুল শিক্ষিত বাঙালীর যুগোচিত মনোভাবের পরিচয় এতে আছে। শাসক-শাসিতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা স্পষ্ট করে তুলে বাঙালী যুবকদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে—রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে না দেওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের সংলাপের মধ্য দিয়ে: "আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না।" বাঙালী কুলবধূদের প্রতি ইঙ্গ-অত্যাচারের অশ্লীল ইংগিতকে নাট্যকার নীরবে সহ্য করেননি। 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটকের এরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করছি:

"ম্যাক্রেণ্ডেল। তোমার এক সুন্দরী ভগ্নি আছে না? তাহাকে একদিন আমার শয্যায় পাঠাইয়া দিও। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার আছি।

সুরেন্দ্র। (ক্রোধান্ধ হইয়া) কি? (ম্যাক্রেণ্ডেলের বক্ষে সবলে পদাঘাত ও তাহার পতন)"

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বিচারহীন নিম্নগামী স্বরূপকেও এই নাটকে তীব্রকণ্ঠে সমালোচনা করেছেন সুরেন্দ্রের মুখ দিয়ে:

"আত্মরক্ষা প্রকৃতির প্রথম অনুশাসন। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি স্থলে অভিষিক্ত হয়ে, সত্য বিচার করবেন, এই শপথপূর্বক সেই গুরুতর কর্মের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে ওঠেন, যখন ধর্মাসনসকল পক্ষপাত দুষ্ট হয়; যখন 'শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণের' তারতম্য অনুসারে বিচার ফলেরও তারতম্য হ'তে আরম্ভ করে··· তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্তন করে······তখন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যবায় আছে।"

নাটকটি অভ্যন্তরের এই বীর্যবলিষ্ঠ শক্তি ও উদ্দীপিত জাতীয়চেতনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেই নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল কার্যকরী করা হয়েছিল। 'বান্ধব পত্রিকা' (১২৮৩ বঙ্গাব্দ, ৯ই বৈশাখ) সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "বাঙ্গালার নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ রুদ্র বর্ণনা আছে কিনা, আমরা জ্ঞাত নহি। সুরেন্দ্রবিনোদিনীর রচয়িতা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' (১২৮১) নাটকের নায়ক-নায়িকা একটি করে গোরা হত্যা করেছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'বাংলা সাহিত্যে ও নাট্যে ভারতচিন্তার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম আভাস উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে প্রথম দেখা গেল।' প্রস্তাবনা অংশের পর দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে ইডেন গার্ডেন বর্ণনা উপলক্ষে একটি গানের মধ্য দিয়ে যথার্থ নাট্যারম্ভ:

"যত বৃটন সন্তান, সহদারা, পুত্রগণ,
আনন্দে মগন হয়ে, মিলে সবে করিছে বিহার॥
রণবাদ্য ভীমরোলে, সুরভি-বায়ু-হিল্লোলে
ঘোষিছে বীর গরবে, ইংরাজের বিক্রম অপার।

হায় মম দেহ মন: ব্যথিত রে নিশিদিন;
কে পারে ভুঞ্জিতে সুখ, পায়ে যার দাসত্ব নিগড়।"

উচ্চশিক্ষিত শরৎকুমার দেশোদ্ধারে ব্রতী এবং প্রেম ব্যাপারে বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা তাঁর—'প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? ...পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহংকার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মতো ধাবিত হয় না। ...এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?" কিন্তু এই শরৎকুমারই শিক্ষিত ও সুন্দরী সরোজিনীর প্রতি অনুরক্ত—যদিচ মুখে সে ভাবকে শরৎ আমল দেয় না। শরতের প্রতি ভালোবাসা আর চাপা যায় না দেখে সরোজিনী একদিন নিরুদ্দেশ হল। সরোজিনীর খোঁজে রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকাভূমিতে এসে ইংরেজ বিদ্রোহী আমীর খাঁয়ের দলের হাতে পড়ে। এই অংশের খানিকটা সংলাপ:

"আমীর। (বিদ্রূপ করিয়া) ইংরাজদিগের মধ্যে সকলেই জিতেন্দ্রিয়—নিরীহ মেষ শাবক!

শরৎ। আমি তা বলছি না। কিন্তু মুসলমানদিগের যথেচ্ছচারিতার সীমারেখা ছিল না। ইংরেজদিগের যথেচ্ছচারিতা কিয়ৎ পরিমাণে—যদিও অত্যল্পমাত্র—সভ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আমীর। ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে ঘোর অত্যাচার করে, তাহা কি আপনি অজ্ঞাত আছেন? না স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

শরৎ। উভয়ের কোনটাই না।

আমীর। আপনাদের দেশ স্বাধীন হলে আপনি খুশী হন না?

শরৎ। তাহা কি আবার জিজ্ঞসাসাপেক্ষ?"

'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের শেষাংশে নায়ক-নায়িকার যখন মিলন হল—তখন পরীরা আবির্ভূত হয়ে গান ধরল:

'সকলের অযতনে দেশের কি দশা ঘটিল।
তোমাদের নিজ দোষে, আছ সব পরবশে
হীনবল অপযশে, ত্রিজগৎ পূরিল॥
নরনারী পরস্পরে, ভারত উদ্ধার তরে,
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল॥'

দু'খানি নাটকের মধ্য দিয়েই স্বদেশপ্রেম ও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে।

৩

বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবদমননীতি নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল সৃষ্টি করেও বাঙালীর নাট্যরসস্পৃহাকে খর্ব করতে পারল না। উদ্ধত নিশ্চল নিষেধের সংকেতকে অস্বীকার করে বাঙালী দৃঢ়ব্রত মনোভূমিতে দাঁড়িয়ে ত্যাগ-প্রেম-মৈত্রী-ঐক্যের ভাবনায় স্বাদেশিকতার কর্মময় যৌবনমুক্তির পর্ব সৃষ্টি করল। সমাজজীবনের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য, সভাসমিতিতে ব্যক্ত মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার আকুলতা, জাতীয় হিতবাদী কর্মতৎপরতার চাঞ্চল্য ইত্যাদি বস্তুমুখীন দ্বন্দ্বসংঘাতে উদ্বেলিত সামাজিক মানুষ সে-যুগে স্বাভাবিকভাবেই ভাবমার্গীয় পথ পরিত্যাগ করল। জাতীয় আন্দোলনের অনিবার্য প্রভাব স্বাধীনতা-ঈপ্সায়, নবোত্থিত সামাজিক শক্তি তার ভাবাদর্শ-পরিস্ফুটনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে গ্রহণ করল ঐতিহাসিক নাটককে। এই প্রসংগে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন: "বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে ধূমায়মান জাতীয় বিক্ষোভ এক সর্বগ্রাসী অগ্নিবিপ্লবে পরিণত হইল—ভাববিলাসের উত্তুঙ্গ পরিমণ্ডল হইতে মুক্তিকামী জীবন নামিয়া আসিল দুঃখ ও ত্যাগ লিপ্ত বাস্তব সংগ্রাম ক্ষেত্রে। এক অভূতপূর্ব জাতীয় মাদকতায় দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতিয়া উঠিল। জাতীয় নাট্যশালা এই মাদকতা হইতে দূরে থাকিতে পারিল না। জাতির প্রবল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবানুপ্রাণিত নাটক রচনা করিলেন।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস ৩য় সং পৃ. ২৪০) ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রীতিকে ভারতীয় সনাতন ধর্মাদর্শের সংগে সংযুক্ত করে ধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তাকে সমসূত্রে বেঁধে যে মানদণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন—তাঁরই অনুসৃতি এ-যুগের নাট্যকারদের প্রয়াসের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। স্বাদেশিক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে ধর্মবিপ্লবাত্মক নৈতিক আদর্শবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে সেই দৃষ্টিভংগীরই শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে নাটক ও নাট্যশালায়। জনমনে জাতীয় আন্দোলনের এই আবেগময় রূপটিকেও সম্ভাবিত করেছিল বাংলা নাটক। স্বাদেশিকতার প্রথম পর্বে ঐতিহাসিক নাটকের পটভূমিকায় লুপ্ত বীর্য ও বাহুবল উদ্ধারের মধ্য দিয়ে একটি সৃষ্টিমুখী দিক চলেছিল। এই পর্বের নাট্যকারেরাও ঠিক একই কারণে অতীতমুখী হয়েছিলেন। আত্মনির্ভরতার মহামন্ত্রের সংগে সাম্প্রদায়িকতা উত্তীর্ণ নীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তাঁরা। বৃটিশ শক্তির সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টির

রাজনৈতিক প্রয়াসকে ব্যর্থ করবার জন্যই নাট্যকারেরা সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্যের ভাবাদর্শকে স্পষ্টোজ্জ্বল রূপ দিয়েছেন। নাট্যপর্যালোচনার পূর্বে জাতীয়তার প্রভাবপুষ্ট স্বদেশাত্মক যাত্রাপালার কথাও একটু উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূষণদাসের 'শুম্ভনিশুম্ভবধ' ও 'মাতৃপূজা', মথুরা সাহার 'ভরতপুরের দুর্গবিজয়', মুকুন্দদাসের প্রায় সমস্ত যাত্রাপালাই উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর সংগ্রামী মনোভাব ও রাজনৈতিক মুক্তির বাণী মুকুন্দদাসের যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে জাগরণী চিন্তার শুভসূচনা করল।

৪

ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবোধ গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হলেও নাটকে স্বাদেশিকতার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে জাতীয়তাবোধ প্রস্তুতির মানসভূমিকা তাঁর পূর্বেই ছিল। তাই স্বদেশী আন্দোলনের মহামুহূর্তে জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনের অনুকূলে নাট্যরচনা ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করেছেন। যুগধর্মের প্রয়োজনকে তিনি স্বীকার করেছেন এবং স্বদেশী যুগের প্রবল দেশহিতৈষণার দ্বারা রঙ্গালয় যে প্রভাবিত হবেই তাও উপলব্ধি করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর নিজের স্বীকোরোক্তি: "রঙ্গালয়কে 'পাওয়ারফুল' করতে এটা একটা মস্ত সুযোগ। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পড়লে একটা বিশেষ সত্য দেখতে পাবে—রঙ্গালয় দেশের জাতি ও সমাজকে উন্নততর স্তরে চালিয়ে নিতে কতটা সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষের প্রাণে একটা নতুন প্রেরণা জাগাতে। আমার ইচ্ছা, আমাদের বাঙ্গলার, ভারতের এমন কতকগুলি মহামানবের চরিত্র নিয়ে নাটক লিখি, যে নাটক পড়ে বা অভিনয় দেখে মানুষ সত্যকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। ······একটা জাতির জীবন যে রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে প্রতিফলিত হয়, সেই সত্য কথা বোঝাবার জন্যেই আমি রঙ্গালয়ে তিরস্কার পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করে অভিনেতার জীবন হতে নাটক পর্যন্ত লিখে চলেছি।" স্বদেশী সংগীত রচনার মধ্য দিয়েও তিনি দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশীযুগে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে 'বয়কট' নীতির মধ্য দিয়ে সমানুপাতিক মূল্য দিয়েছি। গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির প্রয়োজনকে অস্বীকার না

করলেও দরিদ্রশ্রেণীর সামান্য পুঁজির উপর 'বয়কট' নীতির প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সচেতন সমর্থন জানাননি। গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে কর্মযোগীর ভূমিকা ছিল তাঁর। জনহিতবর্জিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শে স্বীকৃতি তাঁর ছিল না।

উপরোক্ত মনোধর্মের পটভূমিতে এবারে আমরা গিরিশচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা-সমৃদ্ধ নাটকগুলির মূল্যায়ন করবো। রাজনৈতিক জাতীয়তা অপেক্ষা ধর্মাশ্রিত জাতীয়তা ও শাস্ত্রমুখীন ব্যাখ্যাবৈশিষ্ট্য 'সৎনাম' (১৯০২) নাটকটিতে ফুটেছে। ধর্মভাবই গঙ্গোত্রী-উৎস বলে স্বদেশী আমলের সমসাময়িক হয়েও 'সৎনাম' নাটকে রাজনৈতিক প্রত্যক্ষতা আসতে পারেনি। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত বলে এ নাটকে বঙ্কিমচন্দ্রীয় যুক্তিবাদ ও ধর্ম-কেন্দ্রিক ভাবরূপের ছায়াচ্ছন্নতা আছে। হিন্দুজাতির বীর্যহীনতা বা পরাজয়ের কারণরূপে তিনি নির্দেশ করেছেন জাতিবৈষম্য, পারস্পরিক প্রীতিহীন অনৈক্য, অযৌক্তিক শাস্ত্রাচার ইত্যাদিকে:

"স্বতন্ত্রতা ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব—
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।"

ভীরুতাকে জীবনধর্মের পরিপন্থীরূপে বিচার করে, স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে হিন্দুমুসলমান ঐক্যের ভাবাদর্শ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সংগীতের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে:

"ভৈরব-উৎসব-মগনা-নারী,
চঞ্চল বীর-করে তরবারি
ভীমা শুভঙ্করী, জয় কৌমারী।
স্বদেশ বৎসলা প্রদর্শনী পথ
অরি-রক্তস্রোত পান বীর-ব্রত।
ধূমকেতু সম উড্ডীন কেতন
অসি উন্মোচন মোগল নিপীড়ন
হুঙ্কারে গভীর নাদিনী সারি,
উত্থিত-ভারত রোদন-হারী
ভীমা রণাঙ্গনা জয় কৌমারী।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম বছর ১৯০৫ সালে প্রত্যক্ষতঃ স্বদেশী-আন্দোলনের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'।[২] ১৯০৫-এর ৯ই সেপ্টেম্বর 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের হিতবাদী চিন্তা তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকের ছত্রছায়ায় অনুকূল স্বদেশিয়ানার টানে স্বদেশহিতব্রতী চরিত্রের অনুসন্ধানে তৎপর হল। 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করেছেন,—'আলীবর্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহে বঙ্গসিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্ফুটিত হয় না। আলীবর্দীর জীবিতাবস্থাতেই সিরাজ চরিত্র বিকাশ পাইতেছিল। শেক্সপীয়রের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক দুই-তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু আমি শেক্সপীয়র নহি। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি রাজা ও পরিষদবর্গের সম্মুখে অভিনীত হয়। অনেক দর্শকই নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণের বংশধর......সাধারণ দর্শকও স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক প্রজা। সুতরাং স্বদেশে ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিকাশ ও জাতীয় গৌরব যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদভিনয় দর্শনে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমার সে সুযোগের অভাব।" বৃটিশ ঐতিহাসিকদের কুৎসা-কলঙ্কিত সিরাজ আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা দেশভক্তরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন এবং স্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহরূপে তাঁকে চিত্রিত করেছেন গিরিশচন্দ্র। বিষয়বস্তুর মধ্যেও পরাধীনতার জ্বালা প্রকাশের সুযোগ ছিল বলেই গিরিশচন্দ্রের কর্মচিন্তা যুগোচিত সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজউদ্দৌলা' অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র এটি রচনা করেন। মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র, নন্দকুমার, মাণিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা, অসহায় নবাবের ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি উপাদান গ্রহণ করে এবং তার যুগোচিত রূপদান করে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশের যথার্থ স্বরূপটিকে ফুটিয়েছেন নাট্যকার। নাট্যমধ্যে বক্তৃতার প্রাধান্য স্বাদেশিক পটভূমি পরিস্ফুটনে সাহায্য করেছে। ইতিহাসের কিছু কিছু বিপরীত তথ্য জাতীয়ভাবের অনুপ্রাণনায় ব্যবহৃত হয়ে বিরূপ সত্যকেও ভাবের মায়াজালে বিশ্বাসযোগ্যতায় পরিণত করেছে। করিমচাচার আপাত হাস্যবিদ্রূপের

২ মুদ্রিত হয়ে নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে

অন্তরালে লাঞ্ছিত বঙ্গদেশ ও তার ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবের প্রতি যে বিষণ্ণকরুণ সমবেদনা উচ্চারিত, তা নিঃসন্দেহে অন্তস্পর্শী এবং দেশপ্রীতির মনোভাবই তার মূল অবলম্বন। জাতীয়তার মহিমান্বিত রূপ ও আদর্শায়িত স্বরূপ সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে যতখানি ফুটেছে—নাটকীয় রসোত্তীর্ণতা হয়তো ততখানি ঘটেনি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল জনজাগরণের পটভূমিতে বৃটিশ বিরোধিতার ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে আদর্শকে নাট্যকার রূপ দিয়েছেন—তা-ই হল নাটটির যুগ ও সমাজগত মূল্যের পরিচয়বহ—

'ওহে হিন্দু-মুসলমান—
এসো করি পরস্পর মার্জনা এখন ;
ভুই বিস্মরণ পূর্ব বিবরণ ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জন।

বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।'

জাতীয়তাবোধ প্রচারের কারণেই ১৯১১ সালের ৮ই জানুয়ারি গভর্ণমেণ্ট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। উগ্র স্বদেশপ্রেম প্রচারের কারণেই বৃটিশ সরকারের স্থূল হস্তাবলেপের আরও প্রতিক্রিয়া নাটকটির পশ্চাৎপটে রয়েছে। প্রথম রচনাকালের রূপ অভিনয় ও প্রকাশকালে অবিকল সংরক্ষিত হতে পারেনি—কিছু কিছু বাধ্যতামূলক রদবদল করা হয়েছিল। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক গ্রন্থে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই নেপথ্যের রাজপীড়নের ইতিহাসটুকু বিবৃত করেছেন: "সিরাজদ্দৌলা পুলিশ হইতে পাশ করিবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাণ্ডুলিপির বহুস্থানে আমরা অদল বদল করিতে বাধ্য হই। শেষে এমন হইয়াছিল যে গিরিশচন্দ্রকে একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পুলিশ অফিসে ধর্ণা দিতে হয়। সেইদিন অদল-বদলের মধ্যস্থ হয়েন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও সুরেশ সমাজপতি।"

গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসিম' নাটকখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ৭ই নভেম্বর। এ নাটক রচনার পশ্চাৎপটেও বঙ্গভঙ্গ যুগের বৃটিশ বিদ্বেষ, স্বদেশী গ্রহণ, সর্বতোভাবে বিদেশী বর্জন, হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক বিভেদ দূর করে ঐক্য স্থাপনের আহ্বান ঘোষিত হয়েছে। ইতিহাসাশ্রিত এই নাটকে মীরকাসিম 'জাতীয় বীর' চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। এই নাটকটির সম্বন্ধে বহুতর তথ্য ও মতামত প্রচলিত থাকলেও এটির রচনাকাল আমাদের পরিধির বহির্ভূত বলে বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত হলাম।

ভারতের অতীত ইতিহাসের জাতীয় বীর চরিত্র চয়ন করে ধর্মাশ্রিত জাতীয়তার সাধনা করেছেন 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭) নাটকে। জাতীয় অনুভূতির সংগে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আদর্শকে ইতিহাস-সমন্বিত পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র শিল্পরূপ দিয়েছেন। অনুরূপ কারণে এ নাটকটিরও দীর্ঘ পরিচয় দেওয়া গেল না। গিরিশচন্দ্রের নাটকের এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির কাছ থেকেও জাতীয় মন কম অনুপ্রেরণা লাভ করেনি।

৫

রসরাজ অমৃতলাল বসু সামাজিক আন্দোলনের উগ্রতাকে কখনই স্বীকৃতি জানাননি। চিন্তাক্ষেত্রের এই রক্ষণশীলতা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পশ্চাতেও সক্রিয়। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিকোণে তিনি স্বদেশীযুগে নাটক রচনা করেছিলেন। জাতির সামাজিক সংহতি ও রাজনৈতিক ঐক্যকে অমৃতলাল দেশানুগ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালীর পাশ্চাত্য-প্রীতিকে তিনি কোনদিনই সমর্থন করতে পারেননি। জাতীয় পরিকল্পনা কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারই তাঁর কাম্য ছিল। পরানুগৃহীত মনোভাব মুক্ত স্বয়ংনির্ভরতাকে অমৃতলাল স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছেন। জীবনের বহির্মুখী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতায় ও অবক্ষয়ে অধঃপতিত উনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালীসমাজকে শিল্পবিদ্যা অধিগত করতে আহ্বান করেছেন। আত্মনির্ভর বাণিজ্যিক উন্নতির জন্যও আবেদন জানিয়েছেন। পরানুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে বাণিজ্যসমৃদ্ধি ও কৃষি-উন্নয়ন বিষয়েও স্বাদেশিক ভাবনার পরিচয় আমরা পেয়েছি 'কালাপানি'

(১৮৯৩) নাটকে—'কৃষিকর্ম তো বাণিজ্যের অন্যতম ফল—তা চাষবাস কর না কেন? দেশজুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তা ত আর বিলেত থেকে মাথায় করে আনতে হবে না!' কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্গতির প্রতিবিধানে দেশপ্রীতির ভাবাতিশয্যকে পরিহার করে যথার্থ কর্মময় পথের সন্ধান দিয়েছেন,—'আধমরা বলদটা নিয়ে ক্ষিদেয় মরে, জলে কেঁপে যা দুটি-চারটি পারছে করছে আর মহাজনের খতে ঢেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবে না তো কি ধনেধান্যে মাচা ভর্তি হবে? এখনও ঢের কাজ আছে যে, দেশে থাকতেই করতে পার।' দেশপ্রীতির ভংগীসর্বস্ব আতিশয্যকে তিনি 'নিমাইচাঁদ' (১৮৮৯) নামক নকশা নাটকেও ব্যঙ্গ করেছেন। 'বৌমা' প্রহসনে, কিশোরীর স্বামী বাবুরামবাবু একটি ভ্রান্তবুদ্ধি 'সংস্কারক ভারতসন্তান' 'র‍্যাডিকাল ইস্পিরিট' ও 'নোব্‌ল এ্যাসোসিয়েশন' নিয়ে সে দেশের মঙ্গল সাধনে ব্রতী পোলিটিক্যাল ট্রেনিং নিতে রাজনীতির পাঠশালায় যায়। বাইরে 'ভারতমাতা'র জন্যে তার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, কিন্তু ঘরে স্ত্রীকে যথাসময়ে চা দিতে দেরী হলে মাকে ভৎর্সনা করতে সে অকুণ্ঠ। পারিবারিক ও সামাজিক সংহতিবিধানের মধ্য দিয়ে স্বদেশাত্মক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রিকচিন্তা জাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কল্যাণসাধিত করতে পারে বলেই বিভিন্ন নাটকে তিনি ভেবেছেন।

১৯০২ (বঙ্গাব্দ ১৩০৮) সালে প্রকাশিত 'নবজীবন' নামীয় রচনাটিকে অমৃতলাল 'মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একটি নাট্যলীলা' রূপে চিহ্নিত করেছেন। 'নিবেদন' অংশে অমৃতলাল বলেছেন: 'দ্বিজেন্দ্র-নাথবাবুর 'মলিন মুখ' সত্যেন্দ্রবাবুর 'মিলে সবে' রবিবাবুর, 'অয়ি ভুবন [মনো] মোহিনী' এবং বঙ্কিমবাবুর 'বন্দেমাতরং'-এর পরিবর্তে আমার নূতন গান রচনা করিয়া দেওয়া ধৃষ্টতা—তাই সেই হৃদয়োন্মাদকারী অমৃতবর্ষী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় গ্রথিত করিয়া আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ পবিত্র করিলাম। নাটকটি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্করকে উৎসর্গীকৃত। ১৮৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নাটকের অভিনীত একটিমাত্র দৃশ্য দেখেই অমৃতলাল 'রঙ্গভূমি' (মাঘ, ১৩০৭) পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন,—'তখন সুরেন্দ্রবাবুও ছিলেন না আর কংগ্রেসও ছিল না। তখন নাটকের সাহায্যে শহরবাসী ও প্রবাসীর মনে এ সম্বন্ধে যে ধারণার বীজ বপন করা গিয়েছিল আজ তা-ই ফল-ফুলে ভরে উঠেছে।

'নবজীবন' রচনাকালে কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন চলছিল। জাতীয়চেতনার উদ্দীপনা রঙ্গালয়েও সঞ্চারিত হয়েছে এবং রঙ্গালয়ও তখন অনুরূপভাবে দর্শকচিত্তে প্রত্যক্ষভাবেই দেশপ্রেম জাগ্রত করে শুভবুদ্ধির সঞ্চার করছে। নাটকটির মধ্য দিয়ে আত্মচিন্তার অহংমুখীনতা এবং ভারতসন্তানদের আলস্যমুখর জীবনচর্যাকেই দেশমাতৃকার দুর্দশার কারণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রথম দৃশ্যে—সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কার্যাবলীর পর্যালোচনা ও জাতীয়-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের বিশ্লেষণ আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিষণ্ণা ভারতলক্ষ্মীর গীত সহযোগে কলকাতা পরিক্রমা এবং সমাজের নানাস্তরের মানুষের সংগে ভারতলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার, বাগ্গন পেচকের মুখ দিয়ে ভারতবাসীর বর্তমান বিষয়ে শ্লেষবিদগ্ধ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে হিমালয়ে উপবিষ্টা ভারতমাতার বিলাপ ও সম্মুখে নিদ্রিত ভারতসন্তানগণ:

> 'নিরখিব কতদিন কতদিন বল এই অলক্ষণ
> যাতনা স্বপন-সনে ঘুমঘোরে অচেতন।
> ... ...
> উঠরে উঠরে যাদুমণি, আর কেন ঢালিয়ে কায়।
> দেখিয়ে তোদের দশা, এ হৃদি বিদরে হায়॥'

শেষের দিকে দু একজন সন্তান আবির্ভূত হয়ে ভারতমাতাকে অভয়দানের চিত্রের মধ্যে স্বদেশীযুগের ভাবাদর্শের রেখাভাস লক্ষ্য করা যায়। ভারত সন্তানদের সংগে ভারতনারীরাও স্বদেশকল্যাণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। পারিবারিক ও ধর্মনৈতিক জীবনাচরণের ক্ষেত্রে রাজনীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে বিধৃত করতে চেয়েছেন। স্বদেশী আমলের কয়েক বছর পূর্বের রচনা হলেও অমৃতলালের স্বদেশী আমল-বিষয়ক নিজস্ব চিন্তা-চেতনার পরিচয় নাটকটিতে আছে। কিছুটা পূর্বের রচনা বলে রাজবিদ্বেষী কোন প্রচার নাটকটিতে নেই। বরং রাজভক্তির শান্তিবারি নিক্ষেপ করে ভারতমাতার দুঃখ প্রশমিত করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় সুরেন্দ্রনাথের অনুগামিতার কথাও প্রসংগতঃ স্মরণ রাখতে হয়।

অমৃতলালের স্বাদেশিকতার স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পোষণ করে সামাজিক সংগঠন ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধে মহান। এ আদর্শ

ব্যাতিরেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা সর্বপ্রকার কল্যাণময় প্রয়াস যে ব্যর্থ হতে বাধ্য—'বাবু' (১৮৯৪) নাটকে সে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অমৃতলালের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ভূমিকাগুলি প্রসংগে তাঁর বিশ্লেষণ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাই আমরা 'মাসিক বসুমতী'র ১৩২৯-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক-আকারে প্রকাশিত অমৃতলালের প্রবন্ধ 'স্বরাজসাধনা'য়। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের তর্ক-সমাচ্ছন্ন ও বিরোধ-বিদীর্ণ পটভূমির পরিপ্রেক্ষিত প্রবন্ধটির মূল্য ও তাৎপর্যের মধ্যে সমুপস্থিত। 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের ৭ই আগষ্টের টাউনহলের সম্মেলনে গৃহীত 'বয়কট্' নীতিতে[৩] আন্তরিকভাবেই অমৃতলাল বিশ্বাসী ছিলেন। বিলাতী-বর্জনের দৃষ্টান্ত রূপায়িত করেছেন 'সাবাস বাঙালী' (১৯০৬) নাটকে এবং এই আন্দোলনে অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে অংশগ্রহণ করে এই বিষয়ক একটি সংগীতও রচনা করেন। তাতে ইংরেজ অপশাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন :

'ওরা জোর করে দেয় দিক্ না বঙ্গবলিদান।
আমরা বব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সংগে মিশিয়ে প্রাণ॥
আমরা জাত বাঙালী প্রেম কাঙালী—
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লবণ দান।
....
তোদের ওই চক্চকানো মধুর চাকে করবো না আর বিষপান।

৩ ঐ বছর কাশীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে স্বদেশীর সমর্থন করলেও বিদেশীবর্জনে আনুগত্য পোষণ না করায় বয়কট্ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মদনমোহন মালব্য ও লালা লাজপত রায় বিলাতী-বর্জনের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি
ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখার আবার রাখবে মান॥

....

এই বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান॥'

'স্বরাজ-সাধনা' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হবার পরে কংগ্রেসের মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে যথার্থ স্বদেশের কল্যাণকামী পর্যবেক্ষকের মতোই অমৃতলাল সমীক্ষা করে রাজনীতির আতিশয্যের বিরুদ্ধে নির্ভয় ও অকম্পিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে ভাবসর্বস্ব আত্মপ্রসাদের মনোভাব ছিল না। আবার ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধেও তিনি যে কতোখানি সোচ্চার ছিলেন—তার পরিচয় সমসাময়িক ঘটনা ও তথ্যভিত্তিক 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫) নাটকে দেখেছি। কাজেই অমৃত-মানসে দীর্ঘকালের অনুশীলনে ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে স্বরাজ-সাধনার ভূমিকা তৈরী হচ্ছিল। 'সাবাস বাঙালী' নাটকও এই মানস-আন্দোলনেরই নাট্যফসল। দু'টি অঙ্ক ও তদ্ব্যতীত 'প্রস্তাবনা' ও 'পট পরিবর্তন' অংশ থাকলেও অবিচ্ছিন্ন কাহিনী অনুপস্থিত। বাঙালী-সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বদেশী আন্দোলনজনিত প্রতিক্রিয়ার বিশ্বস্ত চিত্ররূপ নাটকটিতে আছে। নাটকে নয়নচাঁদ বলেছে,—'পাশ করা ছেলের দাম বিলাতি কাপড়ের মতো সিকি নেমে গেছে।' 'থ্রেড্ নিড্ল কোম্পানীর' অঘোর চাকুরীগতপ্রাণ বাঙালীর প্রতিনিধি—অথচ তার পুত্র মোতি স্বদেশী-আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবক। মিসেস গুপ্তাকে বিলাতী দ্রব্যক্রয়-নিরোধে প্রণোদিত করে এবং বিদেশী বস্ত্র সম্ভারে অগ্নি প্রজ্বলিত করে স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনা মুহূর্তটিকে সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। চরণরঞ্জন ও সেবক-রামকে সাহেবভক্ত ও মোসাহেবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। দেশের শিশুদের মনেও বিদেশী বর্জনের নীতিকে আবেদনগ্রাহ্য ও ক্রিয়াশীল করে তুলবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। আবার বিদেশীবর্জনের সুযোগে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে সমাজের ক্ষতি করছিল এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—চিনিবাসকে তাদের প্রতিনিধিরূপে এঁকেছেন নাট্যকার। শুধু বিদেশী পোষাক নয়—বৃটিশ

রাজদত্ত খেতাব-শিক্ষা-গোলামী সব কিছু বর্জনের ধ্বনিতে ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে :

"পাঁশ চাপা দাও পাশ করাতে
পুড়িয়ে ফেল কেতাব
দায়ে-পড়া রায়বাহাদুর পুড়িয়ে দাও খেতাব।"

'প্রস্তাবনা' অংশের মধ্যে বঙ্গমহিলাগণের গীতে ধীরোদাত্ত যুগের শপথ মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র মর্যাদা পেয়েছে :

"আজ শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিচ্ছি বরণডালা।
হলো বাঙালী ফের বাঙালী উলু দেলো বঙ্গবালা॥"

ঘটকী, মুচিগণ, চুড়িওয়ালীগণ, ধোপানীগণের পৃথক পৃথক গানের মধ্য দিয়ে বিদেশী বর্জনের ও দেশাত্মবোধ জাগরণের প্রয়াস আছে। এমন কি মাতাল পর্যন্ত বিলাতী হুইস্কি ছেড়ে 'ধান্যেশ্বরী ভাঁটি'র দেশজ মর্যাদা দিয়েছে :

"তোমরা গোরার গোলামী ছাড়
আমি তার মদ ছাড়লুম আজ
তবে রাজভক্তি কোত্তে বজায়
রাখবো বজায় ধান্যেশ্বরী ভাঁটি।"

দেশের সংরক্ষিত অর্থনৈতিক বনিয়াদকে নাট্যকার এইভাবে দৃঢ় করে তুলতে চেয়েছেন। আর সেই সংগে দেশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করে সম্প্রীতির সেতু নির্মাণই সমাজরূপ ও যুগচিন্তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তামুখী সমাজরচনায় অমৃতলালের এই ভূমিকা স্মরণযোগ্য।

৬

জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিরও একটি পরমতম পাঠ। নাটককে তিনি 'জাতীয়ত্বের প্রথম সমুজ্জ্বল বিকাশরূপে মনে করতেন। প্রবন্ধান্তরে বলেছেন, "ধর্মের একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতিগঠন হয়, সেই সূত্রটি ধরিয়াই নাট্যকলা লীলা করিতে থাকে।' স্বদেশী আমলের সেই খরস্রোতের সংকটাবর্তে অতীত ইতিহাসের পবিত্র ও স্বাদিষ্ট, জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামী বেদান্ত নির্ভর

শক্তিতত্ত্বের ধারণাকে যুগের স্বাধিকার চিন্তার উদ্দীপনার সংগে মিশ্রিত করে দিলেন। 'পদ্মিনী নাটকে' (১৯০৬) নাট্যকার জাতির ধর্মনৈতিক অনুদারতা ও মনুষ্যত্ব-বোধের অভাবকেই ভারতের অবনতির জন্যে দায়ী রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

মারাঠাদের 'শিবাজী উৎসবের' অনুকরণে বাংলাদেশেও জাতীয় উৎসব প্রবর্তন করবার জন্য বঙ্গবীরের অনুসন্ধান চলছিল—জাতীয় আন্দোলনের সেই যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ রচনা করলেন 'প্রতাপ-আদিত্য (১৯০৩) নাটক।[৪] স্বদেশী যুগে নাটকটির প্রয়োজন ও প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েই নাটকটির ভূমিকায় মন্মথমোহন বসু উল্লেখ করেছিলেন,—'প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস···বাঙালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার যে দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।" নাটকটির মধ্যে বিক্ষিপ্তাকারে স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত হলেও সামগ্রিকরূপে একক সাধনার মহৎ স্বরূপের পরিচয় ফোটেনি। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭) নাটকটি ঐতিহাসিক তথ্যের সংগে নাট্যরূপের বাঞ্ছিত রসসমন্বয় ঘটিয়েছে। ইংরেজের অত্যাচার ও শঠতায় মীরজাফরের চৈতন্যোদয় ঘটেছে এবং পূর্বকৃত পাপবোধের অনুশোচনা তাঁর বিবেককে পীড়িত করেছে। মোহনলালের মধ্য দিয়েও বীরের অন্তরের বেদনাবোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী ভারত শাসনের মূলে ইংরেজি সভ্যতার ও স্বার্থপরতার মূল চরিত্র-পরিচয় লাভ করেছিল। দেশবাসীর মনোবলকেই জাতীয়তার পাথেয়রূপে গ্রহণ করেছেন নাট্যকার। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী নাটকগুলির মধ্যে 'পদ্মিনী' (১৯০৬), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ (১৯১০), 'আলমগীর' (১৯২১) উল্লেখযোগ্য। এগুলির রচনাকাল আমাদের নির্ধারিত কালসীমার বাইরে বলে আলোচনা করা গেল না।

---

৪ "নাটকটির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ষ্টার থিয়েটারে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে এবং তাহা প্রথম রজনী হইতেই এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, রঙ্গালয়ে দুই তিনশত অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও প্রতি রজনীতে শত শত দর্শককে স্থানাভাবে ফিরিতে হইত।"

—বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : মন্মথমোহন বসু ২য় সং, পৃ ১৬৭

৭

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বদেশী সমাজমনের এই চিন্তা-চেতনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে। যে জাতীয় উন্মাদনা সে-যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণ লক্ষণ ও মৌলিক প্রেরণা—সেই জাতীয় আন্দোলনকে দ্বিজেন্দ্রমানস কোন্ দৃষ্টিভংগীতে গ্রহণ করেছে তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। নাট্যকাব্য রচনার ভিতর দিয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্ণ উত্তেজনার যুগেই তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামতের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের প্রতি যে একান্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেন—তার পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার উল্লেখ করেছেন,—"·········তৎকালে দেশপ্রেমে মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙালীর এই দেশব্যাপী স্বদেশী-আন্দোলনের অতি-বড় উৎসাহী অনুবর্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়া-ছিলেন।·········যে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এ দেশে সেই আন্দোলনের আবির্ভাব যদিচ তাহার সংগে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবু মূলে এই দেশাত্মবোধ বা স্বদেশীভাব সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া জাগাইয়া দিতে তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।" বাঙালীর সমাজজীবনের এই উচ্চাভিমুখী জাগরণস্পৃহাকে সমর্থন জানালেও কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় যুগধর্মকে স্বীকৃতি জানালেও শুধুমাত্র আবেগাত্মক মত্ততার বিরোধিতা করেছেন। তবে এ বিরোধিতা জাতীয়তার অস্বীকৃতি নয়—পাশ্চাত্য 'প্যাট্রিয়টিজম্'-এর আদর্শ উদ্বুদ্ধ প্রশ্নমুখর প্রতিপক্ষতামাত্র। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারার অনুবর্তনে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শকে সমর্থন করেছেন। 'বয়কট্'নীতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল সংশয়াকীর্ণ মতামত পোষণ করেছেন : 'আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোন মতেও সম্ভব নয়। এ-দেশ যদি আজ পর-প্রসংগ ও বিজাতির বিদ্বেষ ভুলিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয়, তবে এমন কোন শক্তিই নাই যে তাহার সে বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে······আমাদের এ রকম অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না।' দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী

বলেছিলেন যে, ব্যক্তিগত জীবনের পরস্পর বিরোধী আচরণকে তিনি আপন ইচ্ছামতো যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতেন। বঙ্গভঙ্গ প্রসংগেও এই জাতীয় দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তারই বিপরীত ক্রমের পোষকতা করেছেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিষয়ে তাঁর এই প্রবণতার দিকটি লক্ষণীয়:

"পার্টিশান (বঙ্গবিভাগ) রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুনেছি। কিন্তু, বেহারের সংগে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি?……পার্টিশানের আগে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব 'ব্রাইট্ সাইড' আছে। তোমরা ত তখন আমার উপরে খড়্গাহস্তই ছিলে! সে ভালোর দিকটা এই যে, একদিকে বাঙালী আসামীদের শিক্ষিত করুক্, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক্। নইলে একা বাঙালীর আর বল কতটুকু?"

কিংবা—"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে 'একতা' রাখে, 'পার্টিশানে' তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পূর্বে তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।" জাতীয়তা ধর্মের পরিচয়ের মধ্য দিয়েই একটা জাতির জীবন পরিচয়ের যথার্থ অভিব্যক্তি। বাঙালীর এই মৌলিক ভাববৃত্তির উপরে ছেদ টানার অপচেষ্টাকেই বঙ্গভঙ্গের মধ্যে সেদিন বাঙালীসমাজ প্রত্যক্ষ করেছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ-বোধের দ্বারা তাড়িত ছিল না বলেই বাঙালীর সেদিনকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় জাতিবৈরতার সংকীর্ণতা ছিল না। বুদ্ধিবাদী ও কর্মযোগী দ্বিজেন্দ্রলাল ধর্মে ও ঐক্যে বদ্ধ, স্বদেশের হিতবাদী ধারণায় বিনম্র, দেশের অন্তঃশক্তির ও মানব-চৈতন্যের অনুগ্র স্থিতধী আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিজাতি-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে 'সহজ-স্বাভাবিক অকৃত্রিম আগ্রহে' মাতৃ-আরাধনার কথা তিনি বলেছেন। এ ক্ষেত্রে অবিচার, আনুগত্য, যুক্তিহীন অনুরাগকে মানেননি। স্বদেশের অতীত শৌর্যে ও আধ্যাত্মিকতায় যেমন অটুট অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন—আবার পাশ্চাত্যের হিতবাদ ও যুক্তিবাদকে গ্রহণ করেও মানসিক প্রসারতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্মভূমিতে মানবহিতবাদী ভাবনার সংগে মনুষ্য প্রেম ও প্রীতির মহিমাকে মিশ্রিত করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে এই চেতনারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি। সর্বধর্ম-সমন্বয়ী প্রেমধর্মের সাধনায় জাতির অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুগধর্মের ও সামাজিক তাৎপর্যের অনুকূলে তিনি ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছেন। সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার সংঘর্ষে পীড়িত ভারতবাসী যখন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উগ্রতায় প্রয়াসী, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তখন অতীত গৌরবময়তার গাথাঞ্জলিতে ত্যাগ-বীরত্ব-বৈরাগ্য ও ধর্মাদর্শের মাল্য গ্রন্থিত হয়েছে। স্বাদেশিক সমাজ-চেতনার পটভূমিতে আত্মসংরক্ষণ ও আত্মসংগঠনের যুগ্ম দায়িত্ব পালন করেছেন নাট্যকার। 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যের বাইরে কল্পনা-শক্তির যে পর্ব সূচিত হয়েছিল—তার পশ্চাৎপটে তৎকালীন দেশাত্মবোধের পটভূমি লক্ষণীয়। বিভেদ-আত্মকলহ এবং ধর্মবিষয়ক অনুদার গোঁড়ামী ভারত-বর্ষীয়দের জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। জাতীয় জীবন-হীন, স্বাধীনতাহীন নিশ্চেষ্টতা থেকে মুক্তির মধ্যেই যে হিন্দুধর্মের জাতীয় জাগরণ সম্ভব—সে কথাই মানসিংহের মধ্য দিয়ে বলেছেন: 'হবে সেইদিন যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক, শূন্যগর্ভ অত্যাচারের খোলস হতে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত, জাগ্রত, বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম গ্রহণ করবে।' আবার প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা ও সম্রাট আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসার মধ্যে যে সখীত্বের ভূমিকা তৈরী করেছেন—তার অন্তর্মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক ঐক্যবোধ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলি 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮) 'মেবারপতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), 'সিংহলবিজয়' (১৯১৫) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক ও পুরাবৃত্তাশ্রয়ী নাট্যরোমান্সের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ঐকের কথা, হিন্দুধর্মের ও সামাজিক আদর্শের সারসত্যে দেশবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার কথা, দেশমাতৃকার ধ্যানরূপে তন্ময় বঙ্গ-প্রীতির কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। যুগোচিত সামাজিক পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের পরম পাঠ হল—"স্বদেশ কি ভোলা যায়। সুখে-দুঃখে-বিপদে-সম্পদে, আলোকে-অন্ধকারে, গৌরবে-লাঞ্ছনায় স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।"

অপ্রধান নাট্যকারদের নাটকে স্বাদেশিক সমাজাদর্শ

বাংলার স্বাদেশিক পর্বের সমাজচেতনা ও তার নানামুখী আদর্শের-বিরোধের সমৃদ্ধি ও সংকীর্ণতার পরিচায়ক মুখ্য নাট্যকারদের নাট্যাবলীর উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু বহু অবজ্ঞাত অপ্রধান নাট্যকারও জাতীয়তা-বোধের সেই কর্মচঞ্চল মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাপন শক্তির পরিচয় নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন নাট্যাঙ্গণে। পূর্বসূরীর ধ্রুবপথ ধরে তাঁরাও যুগধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন—দীক্ষান্তিক আদর্শও যথাসাধ্য প্রচার করেছেন। এই জাতীয় কয়েকজন নাট্যকারের ও তাঁদের সৃষ্টির পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নাটকটি ১৯০৫ সালের ৯ই আগষ্ট প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটিতে একালেরই জাতীয় আবেগ রূপায়িত হয়। কিন্তু নাট্যকার জাতীয় জীবনের এই অসাধারণ লগ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য নাটকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ (১৩১৪) নাটকটিরও নাম উল্লেখযোগ্য।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকালে তিনি 'ঔরঙ্গজেব' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিছুকিছু ঘটনায় ঐতিহাসিক তাৎপর্য আদৌ না থাকায় এবং কিছু কিছু অংশে ইতিহাসের ছিন্নপত্র পুনর্যোজিত হওয়ায় বঙ্গভঙ্গ যুগের যথার্থ তাৎপর্য ফোটেনি।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র যুগপ্রভাবিত স্বাদেশিকতার অবলম্বনে রচনা করেন 'নন্দকুমারের ফাঁসি' নাটক। গোপাললাল শীল 'স্টার থিয়েটার ক্রয় করে এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপন করলে অতুলকৃষ্ণ সহকারী ম্যানেজার ও নাট্যকার-রূপে থিয়েটার পরিচালনা ভার গ্রহণ করে এই নাটকটি রচনা করেন।

মদনমোহন গোস্বামী ১৯০১ সালে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন শিবাজীর ইতিহাসকেন্দ্রিক 'রোশিনারা' নাটক—বছর দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণে নাটকখানির নামকরণ হল 'শিবাজীর অভিনয়'। স্বদেশী সংগীত রচনায় নাট্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তার বীজ এখানে গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী'র অগ্রবর্তী।

মনোমোহন রায়ের 'জাগরিতা' (১৩১২) নাটকে বঙ্গভঙ্গকালীন স্বজাতি-বোধ প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজপুত শৌর্য ও মোগলশক্তির মধ্যে সংঘর্ষই নাটকটির অবলম্বিত বিষয়। নায়ক প্রতাপসিংহের খেদোক্তির মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমেরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন :

> 'মাতঃ জন্মভূমি, তবে কি তোমার ভাগ্যে নাহি
> পরিত্রাণ!.........হায়
> বিধি! হিন্দুজীবনের এই নিদারুণ
> অভিশাপ হবে না কি দূর।'

জাতীয় সংগ্রামে নাট্যকার নারীর সমাধিকারের প্রশ্নটির গুরুত্বও সমর্থন করেছেন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাদেশিক চিত্তের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নন্দকুমার' রচিত হবার পূর্বেই বিবৃত হয়েছে 'নন্দকুমারের ফাঁসি' (১৮৮৬-৮৭) নামক নাটকটিতে। নন্দকুমারের স্বাদেশিক-চিত্তের বৈশিষ্ট্য যেমন নাটকটিতে বিশেষিত—তেমনি অধঃপতিত জাতীয় চরিত্রের পরাজয়ের কারণও নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। নাটকটির সমরসিংহ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাক্‌সর্বস্ব নেতাদের বাহ্যাড়ম্বরের সমালোচনা করা হয়েছে।

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় পুরাণাশ্রয়ে জাতীয়ভাব প্রচার করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। 'তারকসংহার' (১৮৮০) নাটকে ঐক্যভ্রষ্ট দেবতাদের পরাজিত করেছেন ঐক্যবদ্ধ অসুরজাতি। সমকালীন যুগ ও তার প্রয়োজন নাটকটিতে রূপকাশ্রিত তাৎপর্য পেয়েছে। 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) নামক নাটকে মন্দোদরীর মুখে বিভীষণের কর্ম ও আচরণ জাতীয় বিদ্রোহরূপে নিন্দিত হয়েছে :

> "হেন কাপুরুষেরে হেন পাতকীরে
> এ জগতে কেহ ক্ষমে কভু কি রে?
> জাতীয় গৌরব দিয়ে বিসর্জন
> সে লহে নরের চরণে শরণ
> গৃহানুসন্ধান যে অরিরে কয়,
> তার ক্ষমা আজো নাহি রে নিশ্চয়।"

এই সংলাপের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদে আস্থা, দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে

আস্থা ভক্তিরূপকের অন্তরালে ব্যাখ্যাত। পরাধীনতার মর্মবেদনায় স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা নাট্যকার যেমন প্রকাশ করেছেন—শক্তিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে সংঘবদ্ধ একতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও নাট্যকার এখানে তেমনি চিন্তিত। 'ভারতসান্ত্বনা' নামক কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক নাটিকায় ভারতের পরাধীনতা নাট্যকারকে ব্যথিত করেছে। ভারতের শেষ নরপতি পৃথ্বীরাজ যবনকর্তৃক পরাজিত হল। পরাধীন ভারত ব্যক্তি স্বার্থপরতা, ঐক্যহীন পারস্পরিক সংঘর্ষ ইত্যাদি কারণেই এই শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছিল। পরবর্তীকালেও ভারতের 'কাচেরে আদর করে ফেলিয়া রতন' মনোবৃত্তির দুর্বল রন্ধ্রপথেই সার্বিক ধ্বংসের শনিরূপ প্রবেশ করেছিল। দেশবাসীর জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য 'ঐক্য', 'সাহস' ইত্যাদি রূপক চরিত্রমাধ্যমে জাতীয়তা উদ্বোধনে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে ভারতবাসীর আত্মজাগরণের নির্ভয় বাণী শুনিয়েছেন—

'মাভৈ মাভৈঃ ভারত দুঃখিনী
পোহাইবে তব দুঃখের যামিনী,
মাভৈ মাভৈঃ ভারতবাসী।'

অপ্রধান নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসও এইভাবেই তৎকালীন যুগপটভূমির সত্যতাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সামাজিক কর্তব্য পালন করেছে।

উপসংহার

১৮৫০ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিবর্তনের বিচিত্র ধারাবাহিকতাকে বিশ্লেষণ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের সামাজিক ও আধিমানসিক মূল্যায়ন করবার প্রয়াস পেয়েছি আমরা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং চলিষ্ণু গতিশক্তির অপ্রতিরোধ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে নাটকে প্রতিফলিত জীবনরূপের মধ্যেও প্রত্যক্ষ গতিশক্তির পরিচয় নিহিত। এই কালপটভূমির নাট্যসাহিত্যে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নানাজাতীয় সামাজিক সমস্যার প্রতিরূপ যেমন ফুটেছে—তেমনি য়ুরোপীয় জীবনবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির রসে ক্রমবিকশিত হয়ে বন্ধনহীন নবজীবনায়নের ভূমিকা কিভাবে তৈরী করছিল তাও বিশ্লেষিত হয়েছে। বাঙালী ও বাংলার সমাজজীবনের বহমান সংকুচিত প্রাচীন ঐতিহ্য ও নবাগত ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ঐ কালসীমার বাংলা নাটককে কিভাবে প্রভাবিত করেছে—তার অনুসন্ধান কারণে সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্য, সাময়িক পত্র, তথ্যসংক্রান্ত নথীপত্র এবং সমাজ-আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত বিশেষ বিশেষ সমাজমানস থেকে বিশেষ শ্রেণীর নাট্যরচনার প্রয়াস অনিবার্য কারণেই এসেছে এবং সে সকল কারণও তাই সমাজতত্ত্ব অনুমোদিত। আবার নাট্যকারেরাও সব সময়ে যুগ-প্রভাবের অনুবর্তী হয়ে থাকেননি—মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির বিশেষত্ব দিয়ে যুগকেও প্রভাবিত করেছেন। নাটক ও নাট্যশালায় অভিনয়ের ও আবেগের অনুপ্রাণনার মধ্য দিয়ে তাঁরা সমাজমন প্রস্তুতির সহায়তা করেছেন। সমাজের মনোভূমিতে অবস্থান করে এই কারণেই নাট্যকারেরা কখনও প্রত্যক্ষ সমাজ সমস্যায় নিজেদের জড়িয়েছেন, কখনও জাতীয় ধর্মাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত ধর্মাবেগের দিকে তাকিয়ে আধ্যাত্মিকতার কুহেলীমণ্ডিত নাট্যাদর্শ সৃষ্টি করেছেন এবং কখনও জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় এবং সারস্বত সাধনায় যুগের নানা স্বতোবিরোধী ধারার মধ্যেও দেশ ও দেশের ইতিহাস বিষয়ে জনমন ও

সমাজমানসকে সচেতন করে দেশপ্রীতির তর্পণ করেছেন। বক্ষ্যমান আলোচনায় সমগ্র বাঙালী জাতির ও সমাজের এই জীবনরহস্যের চালচিত্রে সামাজিক অর্থ নির্ধারণের তাৎপর্যকে নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি। নাটকগুলির সাহিত্যমূল্যের চেয়েও তাই অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে বাঙালীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের শৃঙ্খলমুক্তির ক্ষেত্রে সেগুলির অভিপ্রায় ও ভূমিকা-বিচার।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : ১

(Legislative Council-Marriage of Hindoo widows-Petition of certain inhabitants of Bengal, submitting a Draft Bill for legalizing the Marriage of Hindoo widows.)

To

The Honourable the Legislative Council of India,

The Humble Petition of the undersigned Hindoo inhabitants of the Province of Bengal.

Respectfully Sheweth.

1. That by long established custom the marriage of Widows among Hindoos is prohibited.

2. That, in the opinion and firm belief of your Petitioners, this customs, orel and unnatural in itself, is highly prejudicial to the interests of morality, and is otherwise fraught with the most mischievous consequences to society.

3. That the evil of this custom is greatly aggravated by the practice, among Hindus of marrying their sons and daughters at very early age, and in many cases in their infancy, so that female children not unfrequently become widows before they speak or walk.

4. That, in the opinion and firm belief of Your Petitioners, this custom is not accordance with the Shastras, or with a true interpretation of Hindoo Law.

5. That your petitioners and many other Hindoos have no objection of conscience to the marriage of widows, and are prepared to disregard all objections to such marriages, found

on social habit or on any screple resulting from an erroneous interpretations of religion.

6. That your petitioners are advised that by the Hindoo Law, as at present administered and interpreted in the Court of Her Majesty and the East India Company, such marriages are illegal, and the issue thereof would be deemed illegitimate

7. That Hindoos, who entertain no objections of conscience to such marriage, and who are prepared to contract them not withstanding social and religious prejudices are by the aforesaid interpretation of Hindoo Law prevented thereform.

8. That, in the humble opinion of your petitioners, it is the duty of the Legislature to remove all legal obstacles to the escape from a social evil of such magnitude which though sanctioned by custom, is felt by many Hindoos to be a most injurious grievance, and to be contrary to true interpretation of Hindoo Law.

9. That the removal of the obstacles to the marriage of widows, would be in accordance with the wishes and feelings of a considerable section of pious and orthodox Hindoos, and would in no wise affect the interests, though it might shock the prejudices of those who conscientiously believe that the prohibition of the marriage of widows is sanctioned by the Shastras, or who uphold it on fancied ground of social advantage.

10. That such marriages are neither contrary to nature nor prohibited by law or custom in any other country of any other people in the world.

11. That Your Petitioners, therefore, humbly pray that your Honourable Council will take into early consideration

the propriety of passing a law (as annexed) to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo widows, and to declare the issue of all such marriages to the legitimate.

And your petitioners, as in duty bound, shall ever pray.

AN ACT

To declare the lawfulness of the marriage of Hindoo Widows

WHEREAS the marriage of Hindoo widows is by long established custom and received opinion prohibited, and whereas this prohibition is not only a grievous hardship upon those whom it immediately affects, but also tends generally to deprevation of morals, and the injury of society ; and whereas it is believed by many Hindoos that this prohibition is not in accordance with a true interpretation of the Shastras ; and whereas it is expedient to declare the lawfulness of such marriages, and to make provision for the consequence of the second marriage of a Hindoo widow as regards her rights in her first husband's estate. It is hereby declared and enacted as follows :

1. No marriage contracted between Hindoos, shall be deemed invalid, or the issue thereof illegitimate, be reason of the woman having been previously married or betrothed to another person since deceased, any custom or interpretation of Hindoo Law to the contrary notwithstanding.

II. All rights and interests which any widow may by law have in her deceased husband's estate, either by way of maintenance or by inheritance shall, upon her second marriage, cease and determine as if she had then died, and the next heirs

of such deceased husband then living, shall thereupon succeed to such estate. Provided that nothing in this Section shall affect the rights and interests of any widow in any estate or other property to which she may have succeeded or become entitled under the will of her late husband or in any estate or other property which she may have inherited from her own relations, or in any stridhan or other property acquired by her, either during the life-time of her late husband, or after his death.

পরিশিষ্টঃ ২

বল্লাল সেনের আমলে যে সমস্ত ব্যক্তি কৌলীন্য লাভ করেছিলেন, বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থে তাঁদের নাম নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ আছে :

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়		বন্দ্য
ঐ	মহেশ্বর	”
ঐ	দেবল	”
ঐ	বামন	”
ঐ	মহাদেব, মকরন্দ ঈশান	”

কাশ্যপ গোত্রীয়

বাৎস্য : চট্ট বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল গোবর্ধন, পুতিতুণ্ডী, শিব ঘোষাল, কানু কান্‌জিলাল, কুতূহল কান্‌জিলাল

ভরদ্বাজ : উৎসাহ মুখট, গরুড় মুখট।

সাবর্ণ : শিশু গাঙ্গুলী, রোষাকর কুন্দলাল।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় : সাধু, বাক্‌চী, রুদ্র বাক্‌চী।

কাশ্যপ ” : লোকনাথ লাহিড়ী, ক্রতু ভাদুড়ী, মধু মৈত্রেয়।

বাৎস্য ” : লক্ষ্মীধর সান্যাল, জয়নাল মিশ্র।

ভরদ্বাজ ” : শায়নাচার্য ভাদুড়ী।

বৈদ্য

ধন্বন্তরী গোত্রীয় : বিনায়ক সেন।

মৌদগল্য : চারু দাস, পানু দাস।

কশ্যপ : কায়ু গুপ্ত, ত্রিপুরা গুপ্ত।

কায়স্থ

গৌতম : ” : কৃষ্ণ বসু, পরা বসু।

বিশ্বামিত্র ” : শ্রীধর মিত্র, অশ্বপতি মিত্র।

ধরাশূরের কুলবিধি যে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, বল্লাল সেন সে ক্ষেত্রে সকল বর্ণের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। দাক্ষিণাত্যবৈদিকদের মধ্যেও কুলধর্ম প্রচারিত হয়। বল্লালের বিধানের ছত্রিশ বছর পরে যখন প্রথা সংস্কারের সময় এলো—তখন বল্লাল সেন নেই। সেন শক্তি রাঢ় ত্যাগ করে শেষ আশ্রয়স্থল বিক্রমপুর চলে গেছে। রাজধানীতে যে কোন সময় তুর্কী আক্রমণ হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থার আলোড়ন তখন উচিত নয় বলে রাজা দেশে পূর্বতন কুলীনদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখলে এবং কয়েকজন নতুন কুলীন সৃষ্টি করা হল।

প রি শি ষ্ট ঃ ৩

অনূঢ়া কুলীন কন্যার উক্তি

জীব সাথে সমরে, এই গানের সুর।

সবদুঃখ কব কায়, দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়। পিতা কপাল দোষে কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুল লক্ষ্মীর সেবায়, আজন্ম পালিয়ে এ সব কুল মেয়ে বলি দেবে কুললক্ষ্মীর পায়॥ আমরা অবলা নারী তাই, কি হইবে গতি, না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে, কঠিন পিতামাতা হায়, স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দুজনে, বোন, ভ্রাতৃ জায়াগণের দাস্যবৃত্তি কৈরে, পেটে উদর পোষী আজীবন ভরে, আছি ভ্রাতার আলয়ে ভ্রাতার মন যুগে, পাছে পাছে কোন ত্রুটি পায়।

বেহাগ

আমার সংসারে সুখ কি আছে আর,
নিরাশ্রয় হয়ে ফিরি বিনে কর্ণধার।
পতি পুত্র নাহি মোর, কি আশায় জীবন ধরি,
সিন্দুর নাহি পাড়ি, জন্মে একবার, বৃথা এ সংসারে এল,
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কত না যাতনা লয়ে বহি দেহভার

বহুবিবাহকারীর স্ত্রীগণের উক্তি, ঐ সুর

রানীগো আমরা নালিশ করি এত অবিচারতো সইতে
নারি, পিতা প্রতিবাদী হয়ে রাখলে ঘরে কয়েদ করে,
মোদের পতিধনকে লুটে নিলে সতিনীরা চোদ্দবুড়ি।
স্বামী সব আসামী হয়ে মনাগুণে মারে ঝুড়ি।
'তারা' পলায়ে পলায়ে ফিরে, যুগান্ত ধরিতে নারে।
তোমার কাছে মাগো ওদের গ্রেপ্তারী প্রার্থনা করি,
মোদের উকীল আছেন বিদ্যাসাগর মোক্তারিতে রাসবিহারী,

আশা নাই যে হবে বিয়ে, আমি নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে,
বরের ঘরে মেয়ে আমি, আমায় যমের ঘরে দিবে বিয়ে,
আমি কুলীনের দৌহিত্র বলে, তবে এলেন বিয়ে খেয়ে।

বাউল সুর

ভাল এক মল্ল যুদ্ধ চলবে, বল্লালী দলে।
ওসব শ্বশুর বাড়ীর অসুরগণের কসুর নাই কো দলেবলে।
কুল লক্ষী দেবীর বরে, জাগো বর দিয়েছে দেবী বরে,
কাঁপায়ে ভারত ভরে খেপিল সে বীর সকলে,
মোদের। রাসবিহারী জিদ কৈরেছে জিতব সে যে অন্তঃকালে।

কুলীন তনয়াগণের উক্তি

ফিরে আয়রে বল্লাল, কুলবালা কুলের পাল,
তুই নাকিরে রাজা ছিলি, এই সুবিচার করে গেলি। কত
অবলারে ভাসাইলি, রাজা নয় তুই ছিলি কাল, তোর
কুরীতি ছল কৈরে, পিতা বেন্ধে রাখল ঘরে
(মোদের) পতিগৃহ ভাগ্যে নাইরে, জ্বলে মরব কতকাল।
কত অবলা পোড়ায়ে, সবংশ মেলে পোড়ায়ে,
দেখবে এল, চক্ষু খেয়ে, কৈ রে গেছিস কি জঞ্জাল,
সেখানে থাক যে বসে দেখবে এসে তোর এদেশে দুঃখে অবলা ভাসে,
নিরাশ্রয়ে চিরকাল।

ব্রাহ্মণ কুলীনগণের মেলবন্ধনজনিত যে সকল অবৈধ ঘটনা এবং বিবাহ ইত্যাদি হয় তদুপলক্ষে গীত।

—কুলীন কীর্তন—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট : ৪

"Report of the committe appointed in 1866 by the Government of Bengal to report on the necessity of legislating on the subject of polygamy among the Hindus.

From C. Hobhouse, Esq., and others,
To The Secretary to Govt. of Bengal·

Dated the 7th February, 1867.

We have the the honour to acknowledge the receipt of your letters Nos. 1647 to 1651 T, dated Darjeeling, 22nd August, 1866, to our respective addresses, and we beg to submit the following reply :—

We understand that the Hon'ble the Maharajah of Burdwan, and some 21,000 other Hindu inhabitants of Lower Bengal, prayed for an enactment to prevent the Abuses attending the practice of polygamy amongst the Hindus in Lower Bengal ; that His Honour the Lieutenant Governor was in favour of the measure of bringing the said practice strictly within the limits of ancient Hindu Law ; that, on the other hand, His Excellency the Governor-General in Conncil was of opinion that the Hindu inhabitants of Lower Bengal were not prepared, either for the suppression of the system of polygamy, or yet for that strict limitation of it which His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal recommended, but desired only a remedy for the special abuses practised by the sect of Koolin Brahmins; that His Excellency would therefore be prepared to take into consideration any deliberate measure which His Honor the

Lieutenant-Governor might in consultation with some of the ablest of the leading native gentlemen in Bengal, think fit to recommend for the suppression of the special abuses above named, provided that such measure had not, on the one hand the effect of restricting the general liberty now possessed by all Hindus to take more than one wife, and that it did not, on the other hand, give the expressed sanction of English Legislation to the system of polygamy, and that to us has been committed the duty of reporting on the best means of giving practical effect to the wishes of His Excellency the Governor-General in Council, and of framing and submitting a Draft Bill for that purpose.

In order that it may be seen exactly what we understand that system to be, for which we are instructed to suggest a remedy, we thing it necessary, briefly, to trace the history of Koolinism back; to state how it arose and what it was, and what we believe it to be, and what in the main are declared to be those evils to which it has given rise, and which it perpetuates.

In the Institutes, of Manu, we do not find any distribution of the sect of the Brahmins into distinct denominational classes, but we find it declared that certain Brahmins were by conduct and acquirements entitled to higher respect than other Brahmins whose conduct was not so strict, and whose learning was not so great, and this declaration may possibly have laid the foundation of that distribution of the Brahmins into denominational classes which subsequently was made.

It was not until the time of the Hindu King Bullal Sen, who reigned some 284 years before the Mahomedan conquest,

or about 877 A.D. that any distribution into denominatoinal classes took place. This distribution was confined to the descendants of those Brahmins who had migrated from Kanouj into Bengal on the invitation of the Rajah Adisur, and it is stated that the cause of this distribution was the fact that the sect of Brahmins generally had fallen off in knowledge and in practice of the strict Hindu Shastras.

There were two chief divisions of Koolins, viz. the Barendros of what was then known as the geographical division of Barendrobhoom, and the Rarhis of Burdwan and other places,

The Koolins of Barendrabhoom were divided into two classes :—

1st—Koolins ; and

2ndly—Kaps;

but as it is not amongst the Barendro Koolins that any abuse of the system of polygamy exists, we shall not further refer to these Koolins.

The Rarhi Koolins were also divided into two classes, viz. :

1st—The Koolins;

2nd—The Shrotryos,

and subsequently to these classes was added a third, the Bhongshojo, the origin of which is somewhat obscure.

The Koolin class was an order of merit, and was composed of those Brahmins who had the nine qualifications—

1st—of observance of Brahmin duties;

2nd—of meekness;

3rd—of learning;

4th—of good report;

5th—of a disposition to visit holy places;

6th—of devotion;

7th—of the preservation of the custom of marriages and inter-marriages amongst equals only ;

8th—of asceticism; and

9th—of liberality.

The Shrotryo was composed of those Brahmins who were supposed to have eight only of the nine qualifications of the Koolins.

When the above classes were first created, a peculiar Code of Laws the bulk of which has in process of time swelled, and which is called by the Koolins the Kooleena Shastras, was laid down for the guidance of the Koolins.

If it were possible, it would be superfluous to trace the history of the Koolins from the time above mentioned up to the present time ; it is sufficient that we should now state, not in its numerous ramifications and complications, but in its main features only, what we believe to be the present condition of the Koolin class or of Koolins and Koolinism as best known by these terms. We are speaking of the Rarhi division of Brahmins, and we believe we are right in stating that the chief distinctive classes amongst them at the present day are four in number, and are these, viz. :—

The Koolins, of first class.

Bhongo Koolins, or second class

Bhongshojo Koolins, or third class.

Shrotryo Brahmins, or fourth class.

The first class is composed of persons who are supposed to possess the nine qualifications of the order of merit, and

who, at any rate, are presumed never to have forfeited their title to that order by intermarriages out of their own class.

These men, it said, usually marry two wives,—one out of their own class, and one out of the class of the Shoryos, and they take a consideration from the bride on the occasion of all inter-marriages with the Shrotyos, and also of all inter-marriages amongst themselves, except in cases where there is an exchange of daughters.

The second class is composed of Koolins of the first class, who have fallen from this latter class by inter-marriages with daughters of families in the third class.

This second class is again subdivided into—

1st—Swakrito Bhongo Koolins ;

2nd—Bhongo Koolins of second generation ;

3rd—Bhongo Koolins of the third generation ;

4th—Bhongo Koolins of the fourth generation.

The male members of the first and second subdivisions of this second class contract an unlimited number of marriages during the life-time of the first wife, and except in cases of exchange, whether these marriages are contracted with koolin women of their own class, or with the daughters of parents in the inferior classes, a consideration is given by the parents of family of the bride to the birdegroom.

In the fifth generation after the first act by which a Koolin of the first class has fallen into the second class, i. e., has become a Bhongo Koolin, he falls into the third class, i. e., has become Bhongshojo, and the fourth class, the Shrotryo, is composed of person who have never been Koolins at all.

It will be most convenient here to state that the marriages

most sought after are marriages with Bhongo Koolins of the first and second subdivisional classes, i. e.,the Swakrito and the Bhongo Koolin of the second generation, and that the daughters of the class Bhongo Koolins generally are not permitted without degradation to marry beneath their class.

We will now describe some of the main customs in the matter of marriage, which, on the authority of the statements made in petitions to the Legislative Council, and in some instances within the knowledge of more than one of the native gentlemen on our Committee, obtain amongst the Bhongo Koolins, and we will state what are declared in the papers to be the evil results of some of those customs.

1st. In addition to the Presents usually given amongst all classes of Hindoos on the occasion of marriage, a Bhongo Koolin always, except when he gives his daughter to a brother Bhongo and takes in exchange that brother Bhongo's daughter, exacts a consideration for marriage from the family of the birde.

2nd. A present is often given in addition on the occasion of any visit made to the house of the father-in-law.

3rd. If the daughters of the first and second subdivisional classes of Bhongo Koolins cannot be given in marriage to husbands of their own classes, they must remain unmarried.

4th. The number of wives, including these of the same class, is said to be often as many as 15, 20, 40, 50 and 80.

5th. Polygamy is said to be resorted to as a sole means of subsistence to many Bhongo Koolins.

6th. Marriage, it is said is contracted quite in old age, and

the husband often never sees his wife, or only at the best visits her once in every three or four years of so.

7th. As many as three and four marriages have been known have been contracted in one day.

8th. Sometimes all a man's daughters and his unmarried sisters are given in marriage to one and the same individual.

9th. It is so difficult to find husbands in the proper class for Koolin women that numbers, it is said, remain unmarried.

10th. The married or unmarried daughters and the wives of Koolins are said to live in the utmost misery ; and it is alleged that crimes of the most heinous nature, adultery, abortion and infanticide, and that prostitution are the common result of the system of Bhongo Koolin marriage generally.

11th. Cases are cited of men who have married 82, 72, 65, 60 and 42 wives, and have had 18, 32, 41, 25 and 32 sons, and 26, 27, 25, 15 and 16 daughters.

12th. Lists have been adduced of families in the Burdwan and Hooghly districts alone, showing the existence of a plurality of wives on the above scale, and in numerous cases.

13th. The principle on which Koolinism was perpetuated, viz. that of preventing inter-marriages between certain classes, is violated.

14th Families, it is said. are ruined, in order to provide the large sums requisite to give a consideration on the occasion of their daughters' marriages, or are unable to marry their daughters at all for want of means to procure such consideration.

15th. Marriages are, it is said, contracted simply in order to this consideration. and the husbands do not even care to

enquire what becomes of their wives, and have even had any intention of fulfilling any one of the marriage duties.

16th. The crimes that are said to result from the Koolin system of marriage are said to be habitually concealed by the actors in them and by their neighbours, and this so as to baffle the efforts of the Police at discovery,

17th. No provision is made for the maintenance of one wife before marriage with an unlimited number of others.

The above are said to be some of customs and are declared to be some of the evils said to result from the system of polygamy as practised by the sect of Bhongo Koolins, and the evils may thus be briefly summed up : –

1st, The Practical deprivation of the indulgence of natural ties and desires in the female sex in a legitimate manner ; 2nd, the virtual sometimes the actual, desertion of the wife by her natural and legal protector, the husband ; 3rd, the encouragement of the practice of celibacy amongst the female sex ; the 4th, the non-maintenance of the wife by the husband ; 5th, the supersession or abandonmentent of the wife at the mere pleasure of the husband , 6th, the formation of the contract of marriage for money considerations simply ; 7th, the denial of nuptial intercourse except upon special monetary consideration given ; 8th, the ruin, in a property point of view, of families ; 9th. the contraction of the marriage tie avowedly without any intention even on the part of the husband of fulfilling any one of the duties of that tie ; 10th, the binding down the female sex to all the obligations of the marriage state whilst yet withholding from that sex every one of the advantages of the state ; 11th. prostitution ; and lastly, the

encouragement of the actual crimes of adultery, abortion, and infanticide and of the habit and practice of the concealment of such crimes.

The customs detailed above, as obtaining amongst Bhongo Koolins in the matter of marriage, have, on the whole, we think, been accurately detailed. The evils said to result from these customs are, we have reason to believe, greatly exaggerated and the abuse of the permission to take a plurality of wives is, we believe, on the decrease ; yet we do not doubt but that great evils exist, and those evils divide themselves naturally into two classes ; first, that class which is contrary to religion and morality, and second, that which is contrary to established law.

We think that the following extracts, containing a brief view of the Hindu system of religion and morality as applied to the marriage state, will show that the system of polygamy, to whatever extent it is abused by the Bhongo Koolins, is opposed to the ordinances to the Hindu code of religion and morality :—

Brahmins are to shun the allurements of sensual gratification. Indulgence in sensual pleasure incurs certain guilt ; abstinence from it heavenly bliss. Neither the Vedas,nor liberality, nor sacrifices, nor strict observances, nor pious austerities over procure felicity foi the man contaminated by sensuality. The husband is to approach his wife in due season ; he is to honour and adorn her ; when he honours her, the deities are pleased ; when he dishonours her, religious acts are fruitlesss a wife unless guilty of deadly sin, must not be deserted, the husband who does not approach his wife in due season is

reprehensible ; he is one person with her, and she cannot by desertion be separated from him ; once a wife is given in marriage and the step is irrevocable ; only after a wife has treated a husband with aversion for a whole year can he ceases to cohabit with her ; immorality, drinking spirituous liquors, affliction with an incurable or loathsome disease, mischievousness, waste of property, barrenness after eight years' cohabitation, death of all children after ten years of cohabitation, the production of only female children after eleven years of cohabitation and speaking unkindly are the sole grounds for supersession of a wife ; desertion of a blameless wife is penal ; substraction of conjugal rights is denounced with heavy penalties ; supersession of the wife is justifiable on grounds which regard the temper, conduct or healty of the wife, and is tolerated on other grounds ; where neither justified nor tolerated, it is illegal ; abandonment of a blameless and efficient wife, without cause given or without her consent, is illegal ; the principles peculiar to the Brahmin forms of marriage are those of equal consent and disinterested motives ; immemorial custom, regulating marriage in general and in its different forms, and the relations of husband or wife, is to be observed, and non-observance leads to forfeiture of the fruits of the Vedas.

Manu, Chapter I, 109, 110 to 115.
" " III, 45, 55 to 57.
" " VIII, 889.
" " " IX, 4, 45 to 47, 77, 80, 81.
Strange, Chapter II, pP. 46, 47, 48, 52 to 54.
Macnaghten, Vol. I, 58, 60.

The above texts clearly seem to us to indicate the Bhongo Koolins to what extent they marry out motives of sensuality only, or do not cohabit with, or abandon without any cause or supersede or neglect, or do not maintain their wives, or disregard the sanctity of the marriage tie generally, act contrary to the plainest injunctions of the Hindoo Shastras.

To the extent that the system of inter-marriages amongst the Bhongo Koolins encourages celibacy amongst women, and exacts a consideration for the contract of marriage; it is questionable whether there is any practice which is at variance with the letter at least of the Hindoo Shastras.

In the matter of celibacy, the whole tenor of the Hindoo system of marriage does certainly advocate the marriage of women even before they have arrived at puberty; penalties are prescribed for those fathers and famil ities who neglect to marry their daughters before they have arrived at puberty, and daughters had formerly even the privilege of giving themselves in marriage in case of protracted neglet on the part of others to give them in marriage, yet on the other hand, perpetual celibacy is inculcated rather than the act of giving the daughter in marriage "to a bridegroom void of excellent qualities"—Manu, Chapter IX, Section 89.

And again on this subject—a father is prohibited from receiving any gratuity, however small, for giving his daughter in marriage, on the principle that he who through avarice takes such a gratuity is a seller of his offspring—Manu, Chapter III, Section 51.

The case, however, that we have to contemplate is that of a father who gives, not one who takes, a gratuity in order to

the marriage of his daughter, and who is not actuated by avarice, but by what the Hindoo Law declares to be the laudable desire of marrying his daughter early in life, and to Brahmin of excellent qualities, and there is no text that we know of that prohibits a person from taking a consideration on the occasion of marriage.

The utmost that can be said against the taking of this consideration is that it is contrary to the principle on which the four first forms of marriage, which are peculiar to the Brahmins, are base, viz. that both parties to the marriage should be actuated by disinterested motives-Macnaghten, Vol. I, paragraphs 59, 60.

Looking at the subject generally, however, there cannot be a doubt but that the system of polygamy as practised by the Bhongo Koolins is opposed to the strict ordinances of the Hindoo Shastras, and it is also said to be productive of the special offences against the law which we have named, and we are instructed, if we can, subject to the restrictions imposed upon us by His Excellency the Governor-General in Council, to suggest a legislative measure by which the system may be suppressed.

The root of the evil is in that custom by which Bhongo Koolins of the inferior grades and Bhangshojo Koolins eagerly offer, and Bhongo Koolins of the higher grades as eagerly accept, valuable considerations for the marriage of a woman of the former classes to a man of the latter class.

A law could, of course, be passed, rendering such contracts illegal under penalties on both the contracting parties.

But in the first place it is not clear that the latter of Hindoo

Law Is not rather in favour of, than against such contracts; and in the second place, in a case such as this, where both parties are interested to conclude the contract in question, it is evident that either the Provisions of any law prohibiting such contracts would be evaded, or that violations of any such law would be effectually concealed.

And evasion of such a law is all the more easy under that part of the Hindoo system of religion and morals which inculcates acceptance by the Brahmin sect of gifts from the virtuous, if they themselves are poor, and this is one of the means of subsistence—Manu, Chapter X, Sections 75, 76.

Systems of registration of marriages, of fines increasing in amount for every marriage after the first, of certificates of all marriages after the first, to be taken out in the Civil Courts, and such like schemes have been suggested and have suggested themselves to us; but in all these schemes, even if they were not otherwise objectionable, there would, it seems to us, be an element which would, indirectly at least, affect that "general liberty which is now possessed by all Hindoos to take more than one wife" with which we are instructed not to interfere.

The scheme which has at first sight seemed most feasible is that of framing a Declaratory Law, setting forth what the law is on the subject of polygamy, and prohibiting any infraction of it under penalties.

Such a Declaratory Law would certainly "regulate polygamy amongst the Hindoo inhabitants of Lower Bengal generally", and we are not quite certain, therefore, that. in proposing such a law, we should not be transgessing that part

of our instruction which forbids us to "give the express sanction of English legislation to the Hindoo system" of polygamy ; but for the sake of considering the subject, we will suppose that we are not prohibited from proposing a Declaratory Law.

No such a law must, in our judgements, clearly be declaratory of what the Hindoo syetem of polygamy is, and nothing more and nothing less ; if it be more or less, then it ceases to be simply declaratory, and becomes inactive.

The following is that which after consultation of the best authorities, we find to be the law which, strictly taken, should regulate the practice of polygamy amongst the Hindoos.

We find that, according to one of the ordinances of Manu, a Brahmin is enjoined to marry one wife, and this a woman of his own caste ; but that, if he be so inclined, he is permitted to marry more than one wife, during the life-time of his first wife, and he is recommended to select a second, a third, and a fourth wife in the order of the classes, viz. out of the Kshatria, the Vaisya, end the Sudra classes respectively and consecutively.—Manu, Chapter III, Sections 12, 13.

This was an ordinance of the time of Manu, but we are now in the iron age of the Hindoo system, and so a Brahmin is now forbidden to marry any but a woman of his own caste.

It is contended, however, by the advocates of polygamy that the permission to marry a plurality of wives. which formerly extended to women of all the four classes, is to be construed, not so as to abolish polygamy altogether, but simply so as to confine it to inter-marriages amongst the various classes.

To this opinion Strange so far seems to incline, in that he states that it does not appear how many wives a Hindoo is competent to have at one and the sametime (Chapter II, p. 56); and in Section 204, Chapter VIII, Manu, there is a case in which it is evidently contemplated that a man may be the husband of two persons of the same caste at one and at the same time, though in this instance, the Permission was evidently only accorded under circumstances of an exceptional nature ; and again, in Section 161, Chapter IV, there is a general maxim, a maxim allowing the widest margin conceivable, to the effect that any act, though it be not prescribed, and if be not prohibited, is lawful provided that it gratifies the mind of his who performs it.

Machaghten, on the other hand, points out the illogical nature of the deduction made from the texts quoted, and states that action taken in the matter of marriages from this deduction is considered by the Pundits be reprehensible—. Volume I, pp. 58, 59.

In our view the texts 12, 13, Chapter III, Manu, relied on must be held to be absolute and inapplicable, Those texts refer to an era in the Hindoo system in which it was permitted to a Brahmin to marry out of his own sect and thus prescribed the order. and put on restraint upon the circumstances under which he might contract such marriages ; but we are now presumed to be living in a purer era, when marriages of this looser kind, which were before permitted, are now prohibited, and the logical deduction seems to us to be that those texts, which had for their main object the regulation of such

marriages, have, with the marriages themselves, become obsolete.

We turn, therefore, to those other authorities which seem to us to declare most definitely the Hindoo system of polygamy.

Immemorial custom, which is defined to be good usages long established, is declared to regulate the laws concerning marriages, and the relationship of husband and wife.—Manu, Chapter I, Sections 112, 115, and Chapter II, Section 18.

A Brahmin who has not violated the rules of his order, who has read certain portions of the Vedas, who has obtained the consent of his spiritual guide, and who has performed certain ceremonial ablutions, may then espouse a wife of the same class as himself, who is endowed with certain excellencies, and not marked by certain defects—Manu, Chapter III, Sections 2 and 4, and 7 to 11.

On the decease of wife, the husband may, after performance of sacrifice and the funeral rites, marry again.—Manu, Chapter V, Section 168.

If a wife drinks spirituous liquors, if she acts immorally, if she shows aversion to her husband, if she be afflicted with any loathsome or incurable disease, if she be mischievous, if she wastes her husband's property, if she be afflicted with a blemish of which the husband was not aware when he married her, if she have been given in marriage fraudulently, if before marriage she had been unchaste, if after seven years of married life, she has remained barren, if, in the tenth year of marriage, her children be all dead, if after ten years of marriage, she has produced only daughters, and if she has spoken unkindly to

her husband, she may in some of those contingencies, be altogether abandoned and in all superseded by her husband. Manu, Chapter IX, Sections 72, 77, 80, 81.

But the wife who is beloved and virtuous, though she be afflicted with disease, may yet not be superseded by another wife without her own consent.—Manu, Chapter IX, Section 82.

These causes are accepted by Strange as those which lead to separation (Chapter II, p. 47), and he remarks upon the latitude which they give to the will and caprice of the husband, whenever there is in him the disposition to take advantage of the letter of the law.

And further on, he points out that, where supersession of the wife is not justifiable nor permissible, under, we would suppose, any one of the above contingencies, there it is illegal; and he defines illegal supersession to be the abandoning, with a view to another wife, a blameless and efficient wife who has given neither cause nor consent. ph. 52 to 54, Chapter II.

If we have rightly quoted, and if Mr. Justice Strange has rightly interpreted the law, then in any Bill declaratory of law, we should have the propose to give the sanction of English legislation to supersession of a wife on grounds the most trivial and inadequate, to say that she might be superseded, because she was found blemished (perhaps within the meaning of Sections 7 to 11, Manu, Chapter III) or was mischievous (whatever that may mean), or had spoken unkindly, or was barren (and who is to say where the fault of barrenness lies, for if it is with the husband, then under Section 79, Chapter IX, Manu, there is no supersession), or for many other causes more or less ridiculous, or incapable of proof.

On these considerations, we find that it is not in our power to suggest the enactment of any Declaratory Law, neither can we think of any legislative measure that, under the restricted instructions given for our guidance, well suffice for the suppression of the abuses of the system of polygamy as practised by the Koolin Brahmins, and we beg to report to that effect.

C. P. HOBHOUSE.
H. T. PRINSEP,
SUTTO CHURN GHOSAL.
ISHWAR CHANDRA SURMA.
RAMNAUTH TAGORE.
JOYKISSEN MOOKERJEE.
DEGUMBER MITTER.

While subscribing to the report generally, we deem it due to record our opinion separetely on the following points :—

1. It is stated in page 6, Clause 4, that among other evils, of Koolin polygamy the "number of wives is often as many as 15, 20, and 80." Whatever might have been the case in times gone by we can distinctly state that it is not so now. The rapid spread of education and enlightened ideas as well as the growth of a healthy public opinion on social matters among the people of Bengal, has so sensibly affected this custom that the marrying of more than one wife, except in cases of absolute necessity, has come to be looked upon with general reprobation. Even among Bhongo Koolins of the 1st and 2nd class, the number of wives nowadays seldom exceeds four or five except in very rare instances, but there is ample reason to believe that this class of people will settle into a monogamous habit like the other classes of community, as education will

become more general among them and the force of social opinion be more widely felt.

2. From the report it will appear that polygamy, as an institution, is confined to a certain class of Rarhi Koolins called Bhongo of the 1st and 2nd order, and that at present the practice even amongst them obtains in a much more mitigated form than a few years before. We need not notice that the number comprised in that class forms but a fraction of the population of Bengal ; the catalogue of crimes, therefore, given in page 6 of the report, even if their correctness were unimpeached, must, it can be easily imagined, be infinitesimally small, so far as the same are traceable to polygamy as their immediate cause. However much we deprecate polygamy and lament its abuse, we cannot still conceal from ourselves the fact that the evils which are plausibly enough inferred as inseparably associated with it are not wholly ascribable to it They are seen to exist in full force even where polygamy is not known or is considered a crime, and would appear to be simply the natural consequence of an imperfect knowledge of social laws not confined to India alone. A legislative enactment, however stringent and rigidly enforced, might be effectual in diverting those evils from their original course, but it is quite powerless to stop the source from which they take their rise.

3. Our countrymen are already awakened to proper sense of the duties which they owe to themselves and to their offsprings to be swayed by those considerations which rendered polygamy at one time an unavoidable necessity. We are accordingly of opinion that this question may, without injury to public morals, be left for settlement to the good sense and

judgement of the people. The Government cannot directly interfere with it without producing serious harm in diverse ways. All that it can and ought to do is to assist in the spread of that enlightenment which has already so much advanced the desired reform.

Some explanation is due from Baboo Joykissen Mookerjee, who had signed the petition, praying for a law for restricting the practice of polygamy. He desires to say that he has always been against this custom, and that when the movement was initiated about ten years ago, he was strongly in favour of it from a belief that the evils flowing from it would not be rooted out without the force of law, and when it was revived last year, he also gave his adhesion. But he is now satisfied by enquiries instituted by himself, as well as from representations made to him by others, that a remarkable change in the opinion of his countrymen has, within the last few years, taken place on this subject, that with others signs of social progress not the least is that which marks with strong disapprobation the old custom of taking a plurality of wives as a means of a man's subsistence, and that it would consequently be in the true interests of morality as well as of the cause of improvement for the State to abstain from interfering in the matter.

RAMANAUTH TAGORE.
JOYKISSEN MOOKERJEE.
DEGUMBER MITTER.

CALCUTTA :
The 1st February, 1867.

I sign this report with the following reservations :

I am of opinion that the evils alluded to in pages 435-5 are not "greatly exaggerated," and that the decrease of these evils is not sufficient to do away with the necessity of legislation.

I would translate the term "speaking unkindly" in page 438 to mean "habitually abusing." and the term "mischievous" to mean "exceedingly cruel."

I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage.

ISHWAR CHANDRA SURMA.

The 22nd January, 1867. (VIDYASAGAR).

পরিশিষ্ট : ৫

বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ গ্রন্থে কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহ সংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা সমাজ-পর্যালোচনার তথ্যভিত্তিক ধারাটি উপলব্ধি করার কারণেই সেই তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

হুগলী জেলা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রবালি
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	”
তিতুরাম গাঙ্গুলী	৫৫	৭০	”
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	অজসুব
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়িশ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রখালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্সা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোন্নগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	”
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়ঘা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছী
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যত্নাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রবালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মাহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোযাড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	১৬	ভুঁইপাড়া
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যত্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	”
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলী	১৫	৪৫	পশপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
সূর্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	"
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোণা
কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভূঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলী	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভঞ্জপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিশাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	"
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	"
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৫৫	"

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আক্না
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৫৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৫০	নপাড়া
সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	”
চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	বৈঁচী
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলী	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ভঞ্জপুর
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরসুবা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলী	৭	৫০	চিত্রশালী
শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোণা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাথরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর
গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটি
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকড়া
হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোণা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	"
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যতরূপ ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীন-দিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪।৩।২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক, বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের সংখ্যা যত— বর্ধমান, নবদ্বীপে, যশোর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় তাহা অপেক্ষা নূতন নহে, কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের যে বিবাহের সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিক সংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোন প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোন কথা নাই। যদি নূতন হয়, তাহা হইলে কুলীন পক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু সেরূপ করি নাই, অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছি। জ্ঞানপূর্ব্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩৫
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৯
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী	৭	৫৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	৫	৬২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫১
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৬৭
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮

নাম	বিবাহ	বয়স
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ঐ	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৯
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলী	৩	২৬
দীননাথ গাঙ্গুলী	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৫০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৪৩
নীলমণি গাঙ্গুলী	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৭
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	৩	৫০
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০
সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০

নাম	বিবাহ	বয়স
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	২৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২

"বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক সুবিস্তৃত গ্রন্থে অতি বিস্তৃত-ভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিবৃত্ত এবং কৌলীন্যপ্রথা নিবন্ধন যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সেই সকল অনাচারকে সদাচারে পরিণত করিতে সমাজকে কতদূর খর্ব ও হীনবল হইতে হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শন ও লোকহিতৈষণার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে তিনি বহুবিবাহকারীদের যে সকল তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে গভীর বিষাদ ও অবসাদে হৃদয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গললনাগণের ভাগ্যাকাশ সুপরিষ্কৃত হইল না! বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টার প্রথম উদ্যম বিধবা-বিবাহের প্রথম আন্দোলনের চাপে ম'রা যায়। বিদেশীর রাজা এককালে এই দুইটি বৃহৎ সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইতে সম্মত হন নাই। বিধবা-বিবাহের বাধা বিদূরিত করিয়া তাঁহারা সে সময়ে অবসরগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও তৎপরে তদীয় পুত্র সতীশচন্দ্রের আবেদনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ মহাতাপ চাঁদের সুতীব্র সমালোচনাপূর্ণ ও বহু বিস্তৃত আবেদন পত্রের অত্যল্প অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল: কুলীনেরা টাকার লোভে বিবাহ করে, বৈবাহিক জীবনের কোন কর্তব্যই সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প তাহাদের নাই। দাম্পত্য-সুখের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়া যে সকল স্ত্রীলোককে এই নামমাত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তাহারা হৃদয়ের প্রীতি অর্পণের পাত্র না পাইয়া, হয় ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়, নতুবা সুশিক্ষার অভাবে প্রবৃত্তিকুলের প্রবল উত্তেজনার অধীন হইয়া পাপের পথে পদার্পণ করে।

এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার যদিও সহজবোধ্য এবং শাস্ত্রসম্মত, তথাপি হিন্দুসমাজের বর্তমান বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে, আইনের সহায়তা ভিন্ন জনসাধারণের এই দুর্নীতি নিবারণেচ্ছা কিংবা অন্য কোনো সদুপায় কোনো মতেই ফলপ্রদ হইবে না।

বহুবিবাহ রহিত করিবার নবদ্বীপাধিপতি, দিনাজপুরের রাজা বাহাদুর ও কলিকাতা, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি নানা স্থানের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক আবেদন করিয়াছিলেন। ঢাকার জমিদার বাবু রাজমোহন রায় বহুবিবাহ ও সাধারণভাবে বিবাহবিষয়ক নানাবিধ কুসংস্কার নিবারণের পক্ষে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে বহু সংখ্যক অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই আবেদন পত্রের এক স্থানে লিখিত আছেঃ বালিকারা পূর্বোল্লিখিত বৃদ্ধ, অসমর্থ, উপায়হীন ও হীন চরিত্রের লোকের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে আজীবন পিতৃগৃহে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে, নাম মাত্রে শ্রুত স্বামীগণ ইহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং ইহাদের কোন প্রকার সংবাদও লয় না। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তী সূত্রে শ্রুত অপরিজ্ঞাত স্বামীর মৃত্যুতে ঐ সকল স্ত্রীলোক আইন ও সমাজশাসন ভয়ে বৈধব্যজীবনের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুবিবাহকারী কুলীনগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, মোট ৮৬ খানি গ্রামের ১৯৭ জন কুলীন সন্তান সে সময়ে বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহারা সর্বসমেত ১২৮৮ জন বঙ্গ রমণীব পাণিগ্রহণ করিয়া ইহাদের অধিকাংশকেই চিরদুঃখানলে দগ্ধ করিয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীর বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন মহাশয় ১৬২টি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে যিনি সংখ্যায় অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সেরূপ দুই মহাত্মার প্রত্যেকের গৃহিণীর সংখ্যা ১০। এতদ্ভিন্ন সমগ্র হুগলী জেলার বহুবিবাহে বিপন্না স্ত্রীর সংখ্যার তুলনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহাশয় গড়ে ১১টির অধিক পরিমাণ কৌলীন্য রক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৫৫ বৎসর তখন তিনি কুড়ি গণ্ডা বিবাহ করিয়া অক্ষয়কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জানি না তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট

কালের মধ্যে আর ৮০টি বিবাহ করিতে অবসর পাইয়াছিলেন কিনা ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকান্তর্গত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ সে যুবক অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে একাদশে পদার্পণ করিয়াছিল, অপরজন বিশ বৎসরের সময়ে ষোড়শাঙ্গনার পরিচর্যায় পরম পরিতুষ্ট ! পাঠক মহাশয়, যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট হন ভালই, নতুবা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের যে দুখানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সে বিচিত্র বিবরণ বিবৃত আছে; তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। সে বিবরণ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমরা সেই তালিকা হইতে কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এই তালিকাভুক্ত ১৭৭ খানি গ্রাম: ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত, ঐ সকল গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়দের মোট সংখ্যা ৬৫২। ইঁহারা সর্বসমেত ৩৫৮৭টি বঙ্গবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৫॥ সাড়ে পাঁচটি গড়ে। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কলসকাটি গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে সময়ে উল্লিখিত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১০৭টি মাত্র প্রাণীর স্বামিত্বে বৃত হইয়াছিলেন! বোধ হয় তৎপরবর্তীকালে জীবনের শেষদিন এই সুপবিত্র বিবাহ সাধন পথে দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন।"

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত···তালিকা পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু বহু-বিবাহের নূতন তালিকাও আছে। অতি অল্প দিন হইল সন ১৯২৮ সালে সঞ্জীবনী পত্রিকায় যে অসংখ্য বঙ্গ রমণীর দুঃখ-কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা সেই বিবরণের সার সংগ্রহ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলায় ২৭৬ খানি গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়গণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় ঐ সকল গ্রামবাসী ১০১৩ জন কুলীন মহাশয় ৪৩২৩টি কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের

হিসাবে ৪॥০ সাড়ে চার পড়ে। পূর্বোল্লিখিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিলেও, ১০, ১২, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০টি বিবাহেরও অভাব নাই। ৬০, ৬৫, ৬৭ও আছে, এইরূপ বিবাহকারী তালিকার উল্লেখ করিতে গেলে স্থান সঙ্কুলান হয় না। কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, পূর্বেও যেমন, এখনও সেইরূপ অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও বহুভার্যা গ্রহণকার্য নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে। এ-বিষয়ে লোকের রুচি বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হয় নাই। একজন ৩৩ বৎসর বয়সে ৩২টি স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৭ বৎসরে ২২টি, ২৫ বৎসরে ৭টি, ২২ বৎসরে ৮টি, এবং ২০ বৎসরের যুবকের ৮টি বিবাহ কার্য সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে। এরূপস্থলে আর আর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে কিরূপে বলিব ভাল, এ পর্যন্ত হইলেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন বলা যাইতে পারিত, কিন্তু এইখানেই শেষ হয় নাই। এতদপেক্ষা গুরুতর চিন্তার বিষয় আছে! বর্তমান সময়ের সামাজিকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর গমনে অবসর গ্রহণ করিয়া, যদি দয়া না করিয়া এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে এবং প্রতিবিধানে প্রাণপাত করেন, বঙ্গ ললনাগণের দুঃখ দূর করিতে, তাহাদের যন্ত্রণা ও বিষাদের অশ্রুজল মুছাইতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরিত, এই তালিকা দৃষ্টে অশ্রুমোচন করিবার কি কেহ নাই এখনও যে ১৪, ১৫, ১৬ বৎসরের বালকগণের বহুভার্যার উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। একটি ষোল বৎসরের বালক তিনটি বালিকার স্বামী হইয়াছে, দুটি ১৫ বৎসরের বালকের একটির দুটি বিবাহ হইয়াছে, অপরটি ২টির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। একটি চতুর্দশবর্ষীয় বালক দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর পূর্বে যে দুগ্ধপোষ্য শিশু বরের বিবাহের উল্লেখ করিয়াই নিজেই চিন্তিত ছিলাম, ১২৯৮ সালের সঞ্জীবনীর তালিকায় সেইরূপ চারি বৎসরের এক শিশুর কণ্ঠে তিনটি স্ত্রীরত্ন লম্ববান। আমরা খরগোসের ন্যায় পত্রাবরণে মুখ লুকাইয়া মনে করি, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমাদের সমস্তই ঠিক চলিতেছে। কিন্তু হায়, এ দুঃখ-কাহিনী শুনিবার, শুনিয়া ভাবিবার এবং প্রয়োজন মতো উপায় অবলম্বন করিবার লোকের যে অভাব পড়িয়াছে, স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ কি একটিবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।"

—বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট : ৬

বহুবিবাহ সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা

প্রেরিত তেঁতুল

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া প্রেরিত তেঁতুল নামে গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হইল। এইক্ষণে প্রার্থনা এই যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে, প্রথমতঃ সামান্য নাম অনুসরণ করিয়াই কেহ পরিত্যাগ করিবেন না। ইহার কেবল অম্লরস নহে, মধ্যে মধ্যে মধুরতাও আছে। অতএব আদ্যোপান্ত অবলোকন করা আবশ্যক।

১২৭৮ সাল — অলমতি বিস্তরেণ

তারিখ ২২ শে আশ্বিন। — কস্যচিৎ উচিতবাদিনঃ

প্রেরিত তেঁতুল

অনেকেই শ্রুত আছেন বহুদিন বিগত হইল একবার সাগরের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ঐ তরঙ্গ যে কত রঙ্গ দেখাইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অনেকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, কেহ কেহ একেবারে জ্ঞান হারাইয়াছেন, অদ্যাপিও তাদৃশ জ্ঞান হয় নাই। সাগর অতি গম্ভীর স্বভাব এবং ধীর প্রকৃতি, আকৃতি দেখিলেও মনের ভাবান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সাগরে যখন তরঙ্গ উঠিয়া থাকে তখন নানাপ্রকার আশ্চর্য ভয়ানক শব্দ প্রকাশ পায়। ঐ সময় পণ্ডিতগণও শ্রুতিরক্ষার জন্য যত্নবান হন, ইষ্টমন্ত্রও স্থির থাকে না, ভুলিয়া যাইতে হয়, চিত্তেও চাঞ্চল্য জন্মে। আর অধিক কি বলিব পূর্ব্বের ভাবেরও পরিবর্তন হয়। সাগরের আস্বাদন করা বড় কঠিন। সাগরের প্রকাশ্য-রসের যদি বিকার না থাকিত, তবে সকলেরই বরণীয় হইত, সন্দেহ নাই, কেবল বিকার দোষে দূষিত বলিয়া বয়স্য বর্গেরা ঐ রসে নিরত হইয়াছেন। যাঁহারা ভ্রমবশতঃ ঐ রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যপিও সমস্ত ভাব ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ ঐ সাগর বেগবান্ হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণ রূপ ধারণ

করিয়াছে এবং প্রায়ঃ স্থান আক্রমণ করাতে ভয়ানক গোল উপস্থিত হইয়াছে।

কেবল চারিদিকে একি একি এমত কেহ কোনদিন শ্রুত ও দৃষ্ট হয় নাই ইহাতে যে জল থাকিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয়, কিন্তু প্রসিদ্ধ পথ ডুবিয়া গেল ভদ্রলোকের যে কিরূপ অবস্থা হইবে তাহার উপায় ভাবিয়া পাই না। আহা! যাহারা কখনও কুপথে পদার্পণ করেন নাই, সর্বদাই প্রসিদ্ধ পথে গমন করিতেছেন তাঁহারা কি প্রকারে প্রসিদ্ধ রাজনির্মিত পথ পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ নবীন পথের পথিক হইবে, কি প্রকারেই বা স্বঘর রক্ষা করিবে। বিপদাপন্ন ব্যক্তির যদি মর্য্যাদার ব্যাঘাত হয় এবং স্বঘর রক্ষা করিতে সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহাদের জীবিতেই মরণ। স্বঘর এবং মর্য্যাদা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য কেবল সহজ ব্যাপার নহে। স্বঘর না থাকিলে যে, স্বভাবের অভাব হইবে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। সহৃদয় মহাজন বাক্যং যথা দুঃখাতি দুঃখং ধনহীনতাচেৎ ততোতি দুঃখং কৃপণস্য সেবা। ততোতি দুঃখং সুচির প্রবাস ততোতি দুঃখ পরগেহ বাসঃ। অতএব পরঘরের আশ্রয়তা স্বীকার হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে উপায়ও কিছু দেখিতেছি না। এবার সাগরের যেরূপ প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করাও কঠিন ব্যাপার। তবে ভরসাব মধ্যে এইমাত্র লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকগুলি ভদ্রসন্তানেরা ঐ বেগ নিবারণে নিতান্ত যত্নবান্ আছেন। বোধকরি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত যত্নবান্ থাকিলে সাগরের তরঙ্গে কাহারও কোন বিশেষ অপকার ঘটিবে না। বিশেষতঃ দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সাগরের ভয়ানক তরঙ্গ অধিককাল থাকে না, যে পর্য্যন্ত পবনেব প্রাদুর্ভাব থাকে ঐ পর্য্যন্তই সাগরের চাঞ্চল্য হয এবং ভীষণভাব লক্ষিত হইতে থাকে। পবনের সমতা হইলে তত্ক্ষণেই তরঙ্গেরও সমতা হয। কিন্তু তাহা ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা শ্রেষ্ঠ লোকের উচিত নহে। কি জানি কখন কি হয়, নদী নদ ইত্যাদিকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। তথাচ নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শাস্ত্রপাণিনাং বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ। স্ত্রীযুরাজকুলেষুচ নদী অর্থাৎ সাগরাদি যাহাতে তরঙ্গের সম্ভাবনা আছে, নখী, কুক্কুরাদি, শৃঙ্গি মহিষাদি এবং অস্ত্রধারি, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না, কারণ তাহারা হঠাৎ অপকার করিতে পারে এই কারণই পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আরও এক আশ্চর্য কথা শুনিতেছি কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ অর্থাৎ ঐ ভীষণ সাগরকে অবলম্বন করিয়া কোন সংবাদ দূর দেশে প্রেরিত হইবে ইহা নিতান্ত অন্যায় নহে। কারণ সে দেশে গমন করিতে হইলে সাগর অবলম্বন ভিন্ন আর গতি নাই।

ধন্য সাহস। যে সাগর প্রসিদ্ধ পথ ভাসাইয়া দিতে উদ্যত ঐ সাগরকে অবলম্বন করিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছেন, করুন্ তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। তবে একটি কথা না কহিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সাগর স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য, ধৈর্য গুণবিশিষ্ট, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বায়ুভরে প্রফুল্লিত হয়। ঐ সময়ে তাহার আপন পর জ্ঞান থাকে না। তখন উৎপথে স্রোত যায় অর্থাৎ বায়ুতে যে মুখ নরম করে ঐ মুখেই ধাবমান হইতে থাকে। ঐ সময়ে যাহারা সাগরে থাকেন তাহাদের ডূবিবার সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর না করেন আশ্রমের সজ্ঞান হইলে উত্তরকালে আরোহিগণের যে কত দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না। দাঁড়াইবেই বা কোথা এইটি প্রথমেই বিবেচনা করা আবশ্যক, অভিপ্রেত কার্য সিদ্ধি করিতে না পারিলে অবশ্যই লজ্জা হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণ এবং পরিণামদর্শী লোকেরা তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হন না, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোত্র দোষ। অল্পবুদ্ধি, অত্যন্ত অভিমানী ব্যক্তিরা তাদৃশ বিবেচনা না করিতে পারিয়া মনের খেদে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া স্থির করে। ঐ সময়ে সজ্জনগণের উচিত যে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করেন তাহাতেও যদি ঐ ব্যক্তিরা সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ভাল বোধ করে, করুক, তাহাতে সহৃদয়গণের কিছুমাত্র দোষ হইবে না। ঐ ব্যক্তিরাই আত্মঘাতি বলিয়া জনসমাজে ঘৃণিত হইবে। সম্প্রতি আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে তাহা এইস্থানেই ব্যক্ত করিলাম।

সকলেই জানেন যে যাহাকে আশ্রয় করিলে নানাপ্রকার সুখের সম্ভাবনা আছে এবং ইষ্ট ধর্মও রক্ষা হয়, কুলাভিমান আর থাকে না, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি হয়, উত্তম অধম ইত্যাদি ভেদজ্ঞানেরও তিরোভাব হইতে থাকে, স্বয়ং চন্দ্রশেখর যাহার ভার বহন করেন এবং সর্বদা পঞ্চাননে গুণগান করেন, দেবগণেরাও যাহাকে সমাদর করেন, প্রার্থনা করিলেই অভিলাষ পূর্ণ করেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সেবনীয়া, আশ্রিতের জাতিকুল বিচার

করেন না, দর্শন মাত্রই অপূর্ব্ব এক অসদ্ভাবের উদয় হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে সাগরের সহিত অন্তঃসলিল বাহিত্যক্রমে যাঁহার সহিত নিয়ত সঙ্গম হইতেছে, তাহাকেই সাক্ষাৎ সুরতরঙ্গিনী বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়াছে। স্মার্ত চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ইহার যুক্তি প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমরাও ঐ সকল ভাবের তুল্যতা বিধায় কোন প্রসিদ্ধা সভাকে সুরতরঙ্গিণী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম সম্প্রতি একটি আশ্চর্য্য ভাব বিদিত হইয়া সন্দেহ হইতেছে। শ্রুত আছি ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ। আরোগ্যং বিত্ত সম্পত্তি গঙ্গা স্মরণং ফলং নানাপ্রকার গৃহ, নানা আভরণযুক্তা অনেক স্ত্রী, আরোগ্য, বিত্ত, সম্পত্তি গঙ্গা স্মরণং ফলং নানাপ্রকার গৃহ, এই সকল গঙ্গা স্মরণের ফল। কিন্তু কথিত সভার নিয়মে নানাবিধ স্ত্রীলাভ হইবে না। যাহারা পূর্ব্বে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও সম্প্রতি নিরন্তর কটুকথা শুনিতেছেন, এক স্ত্রীরও যদি বিধান না দিতেন তবে বরং ঐ সভাকে ভীষ্ম প্রসূতি বলিতাম, এযে আবার একটা পাণিগ্রহণ আবশ্যক বলিতেছে এবং বন্ধনাদি কতকগুলি দোষ নিবন্ধন বহুবিবাহের বিধি আছে, ইহাও প্রকাশ করিতেছে, এইক্ষণে বিবেচনা করুন ঐ সভাকে কি বলা যাইতে পারে যদি গঙ্গা বলা না গেল তবে সামান্যতম নিম্নগা বলাই উচিত। কারণ ঐ সভার আশ্রিত জনগণের সন্তাপ থাকে না, ইচ্ছামত অপরিমিত পরিষ্কৃত জল লাভ হয় এই কারণই অনেকের অনেক ভাবের প্রকাশ হইতেছে অলমতি বিস্তারেণ॥ ইদানীং প্রকৃতমনুসরামঃ।

এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এ পর্যন্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণ যুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া জানিলাম বহুবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্য নানাবিধ ভাবযুক্ত সুললিত বঙ্গ ভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে। সে-সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষলাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূত-বাহন কৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উত্তম রচনারূপ দুগ্ধসমূহ তাহাতে কামতন্ত্র প্রবৃত্তা-

নামিমাঃস্যুঃ ক্রমশো বরাঃ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য ইত্যাদি বচনের নূতন অর্থরূপ গোমূত্র দ্বারা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছে, না হইবেই বা কেন যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের লাঠি বাজে এই কারণই নিম্নভাগে, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকার সহিত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল। নিরপেক্ষ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্যই আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

নবম অধ্যায়

সংপ্রত্যেক পিতৃকাণাং সর্বণানুলোম পরিণীত
স্ত্রী জাতানং পুত্রানাং বিভাগঃ কথ্যতে
অস্তি চ সবর্ণানুলোমস্ত্রী পরিণযনং তথাচমন্তঃ
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দার কর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃখ্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচবিশঃ স্মৃতে।
তেচস্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রা জন্মনঃ।
শূদ্রৈব তেব্যকারঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্য তে সাতে তা
ইত্যনন্তর পূর্ব্বোক্ত পরামর্শাৎ প্রতিলোম পরিণয়নং
সর্ব্বথৈবন কার্য্য মিত্যার্থঃ—কামতস্তু প্রবৃত্তানা
মিতি দোষাল্প নতু দোষাভাবঃ তদাহতুঃ
শঙ্খলিখিতৌ ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ
সর্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুরিতি প্রথমং কল্পঃ
ততোনুকল্পঃ তেস্রোব্রাহ্মণস্যনুপূর্ব্বেণ
তিস্রোরাজন্যস্য একা শূদ্রস্য জত্যবচ্ছেদন
চতুরাদি সংখ্যা সমাধ্যতে। ইতি জীমূতবাহনঃ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিত্যাদি এতেন সোপি বিবাহো ভবতি কিন্তু তত্রগার্হস্থ-ধর্ম্মোণ প্রবর্ত্তকঃ কিন্তু কামএব। অতএব শঙ্খলিখিতাভ্যাং তদ্বিবাহানা মনুকল্পবং রক্ষ্যতে অনুকল্পেচ মুখ্য ধর্ম্ম প্রাপ্তৌ বাধকা ভাবাৎ ইথ্যঞ্চ কামতোধিবেদনাদি নিমিত্তমন্তরেণ স্ববর্ণা বিবাহেপি বোধ্যং বিবাহত্বে সিদ্ধ এব কামস্য হেতুতা কথ্যতে তথাহি পুংষঃ কামোস্তি সচ বিবাহমন্তরেন কন্যায়াং পর-স্ত্রিয়াং বা উপজায়মানঃ প্রত্যবায়জনক ইতি তদ্ভাবে বিবাহো ভবতীতি কামস্য বিবাহ হেতুত্বাৎ। তিদ্বিবাহস্য ন কর্ম্মবং। নতু বিবাহবাভাবঃ অন্যথা তদুৎপন্ন পুত্রানাম পরিণীতা পুত্রবেনাবিভাগা ইহাপত্তেঃ। ইতি শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি টীকা।

নন্বপ্রতিজ্ঞেয়ং বাস প্রলপিত মেব ঐতেরেব গুণৈ যুক্তিঃ সবর্ণ শ্রোত্রিয়োবরঃ ইতি যাজবল্‌কেন সবর্ণা বিবাহ মাত্রস্য প্রতিপাদনাৎ অসবর্ণা বিবাহস্যা প্রসক্তেরত আহ। অস্তিচেতি প্রশস্তা পাইসেছাচিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মোপযোগিনী সবর্ণায়া এব সহত্বেন ধর্ম্মকর্ম্মাধিকারস্য ভর্তুঃ শরীর সুশ্রূষাং ধর্ম্মঃকার্য্যঞ্চ নৈতিকং। স্বা দ্বৈবকার্য্যাঃ সর্ব্বেষ নং নান্য জাতিঃ কথঞ্চনেতি মনুনা প্রতিপাদনাৎ—কামতঃ বিষয় গোচরাতিরাগতঃ নতু গৃহিধর্ম্মাণি পসরা তেনৈতিষাং বিবাহো ভবত্যেব কিন্তু কেবলং রাগাধীন এব সইতি প্রতিপন্নং। অতএব চতস্রো ব্রাহ্মণস্য পরিণীতাঃ তিস্রোদ্বৈকা চেতরেষামিতি সথ্যয়াপ্যাহস্ম জাত্যবচ্ছেদে-নেতি জাত্যাইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণস্য পঞ্চষড় ব্রাহ্মণী বিবাহোন বিরুদ্ধ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার টীকা—শ্রীরামভদ্রন্যায়ালঙ্কার—অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তি মহেশ্বর ভট্টারমপীদৃশ রত্যা সমাধানং।

এইক্ষণে বিবেচনা করুন, কামতঃ বিবাহের যে প্রকার উক্ত মহোদয়েরা বিধান এবং মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে সকলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, কামতঃ অধিক বিবাহ করিতে হইলে প্রথমতঃ সবর্ণাই শ্রেয়স্করা। তদভাবে অসবর্ণাদির গ্রহণ সবর্ণা বহুবিবাহ যে, শাস্ত্রসম্মত, ইহাই মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি বিবাহও ব্রাহ্মণে করিতে পারিবে। তাহাও বিরুদ্ধ নহে। আর বহুবিবাহের শাস্ত্র বোধিতত্বের শঙ্কা কি থাকিল ইহাতে যাহাদের চিত্ত হইতে ভ্রম রোগ দূর না হইবে তাহাদের আর ঔষধ নাই। সে যাহা হউক, এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সবর্ণারকামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্ত্তব্যতা

প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির বুদ্ধিগম্য নহে। আমরা তাশ্চস্বাচাগ্র জন্মনঃ ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রস্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যাশূন্য বুদ্ধিতে পারেন। পঞ্চমুখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগ প্রাপ্ত কুকুরাদি ভক্ষণ করিবে না, ইহাতে পঞ্চনখীর মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য, শূদ্র ইহা ভিন্নের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ করিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যা লেখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং জিজ্ঞাসুদিগের নিকটে তাহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি। আমাদের ঐ পরিসংখ্যার বিষয়ে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছার কারণ এই কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্তের মধ্যে শিরোমণি বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মা ও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটি বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে এইরূপ বারবার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ প্রশংসা করিলেন অপর কোন নূতন দাপোৎপন্ন প্রসিদ্ধ তার্কিক কুলোৎপন্ন নব্য স্মার্ত মহাশয় যে নানাবিধ বচনাদিযুক্ত রচনা দ্বারা বহুবিবাহ অনুচিত বলিয়াছেন, তিনি কি কামতস্তু প্রবৃত্তানামিত্যাদি বচনে লোচন দিয়া আলোচনা করেন নাই অথবা কামত বিবাহই স্বীকার করেন না কেবল শ্রীরামের ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন, তাহার কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ঐ সকল বচনের মীমাংসা করা আবশ্যক ছিল। তাঁহাকে আর অধিক বলা উচিত নহে। এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহুবিবাহ বিরোধী দলের এক সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তির অধিক বিবাহ শুনিতে পাওয়া যায় ঐ স্থলেই বন্ধ্যাত্ব দোষ কারণ, সে স্থলে একদিনে অনেক বিবাহ শুনা যায় অর্থাৎ চন্দ্র সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে একদিনে বিবাহ করেন ঐ স্থলে তেজীয়সাং ন দূষণং এইটিই তাহাদের কল্পনা! আমরা দেখিতেছি বন্ধ্যাষ্টমে ইত্যাদি বচন পুত্রার্থ বিবাহ স্থলে। ইহাই ধর্ম্ম প্রজা সম্পন্নে দারেনান্যং কুর্ব্বীত ইত্যাদি আপস্তম্ব রচনা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কেবল বচনেও ধর্ম্মতঃ স্ত্রীয়ং ইহার দ্বারা ধর্ম্ম বিবাহ স্থলের বোধ হইতেছে। অপর কেবল কাম বিবাহ স্থলেই সবর্ণার বিবাহ বিধান হইয়াছে। তাহাই কামতস্তু প্রবৃত্তানামিত্যাদি বচন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবাহ ভেদে বচন ভেদ করিলেই কোন বিরোধ থাকে না। তবে মীমাংসানাভিজ্ঞ বিজ্ঞাভিমানি পণ্ডিতগণেরা বুদ্ধির কৌশলে আর কি করিবেন নানাবিষয়ক বচনগুলিকে এক বিষয়ক কল্পনা করিয়া জল্পনা জাল বিস্তার করিয়াছেন। যেমন পৃথক পৃথক রস না জানিয়া বালকগণ তিক্ত অম্ল মধুর কটু ইত্যাদি সকল রস একত্রিত করিয়া আস্বাদন করে ইহাদের মীমাংসাও সেইরূপ। অলমতি বিস্তারেণ।

পরিশেষে পাঠকগণের প্রতি একটি বিজ্ঞাপন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মহোদয়গণ, জীমূতবাহন এবং শ্রীনাথ, অচ্যুতানন্দ, রামভদ্র, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কামতঃ বহুবিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন তাদৃশ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতিরও এইরূপ মীমাংসা। অতএব আপনাদের যেমত গ্রহণ করা অভিপ্রায় করিবেন ইতি। এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত কুলীন কামিনীর আক্ষেপ দর্শনে কোন প্রধানা কুলীন কামিনীর উক্তি—

কেন কান্দে বল হেমা কেন কান্দে বল হেমা,
কামারের করে কেন দেখিতেছি বেমা
কেন দেখিতেছি বেমা।
বলি বন্দ্য মহাশয় বলি বন্দ্য মহাশয়,
রচিত উচিত নহে এসব বিষয়
এসব বিষয়।
যদি থাকে হে ক্ষমতা যদি থাকে হে ক্ষমতা,
দারুণ কর পীড়ন এবে করহে সমতা
এবে করহে সমতা।
জান কুলীনের কুল জান কুলীনের কুল,
তবু কেন লেখ হেন হয়ে প্রতিকূল
হেন হয়ে প্রতিকূল।
পড়ে তোমার রচনা পড়ে তোমার রচনা,
আমরা করি না কভু ভাল বিবেচনা
কভু ভাল বিবেচনা।

ভাল লেখ একাবলী ভাল লেখ একাবলী,
সকলেই বলে আমি নহি একাবলী
আমি নহি একাবলী।

কিন্তু তব এ লেখায় কিন্তু তব এ লেখায়,
হবে তুষ্ট কুল দুষ্ট করিতে যে চায়
দুষ্ট করিতে যে চায়।

মোরা যে ভাবেই রই মোরা যে ভাবেই রই,
তোমার কাছেতে কভু দুঃখিত না কই
কভু দুঃখিত না কই।

তুমি লেখ নাম ধরে তুমি লেখ নাম ধরে,
কেন্দেছে কুলীনা কেবা তব হাত ধরে
কেবা তব হাত ধরে।

মোরা জানি কুলমান মোরা জানি কুলমান
কুল না থাকিলে মোরা হই ম্রিয়মাণ
মোরা হই ম্রিয়মাণ।

আছে ব্যভিচার দোষ আছে ব্যভিচার দোষ,
ঐ দোষে কোন ঘর না করে পরশ
ঘর না করে পরশ।

দিলে সাগরেতে ঝাঁপ দিলে সাগরেতে ঝাঁপ,
অপমৃত্যু হবে তবে রবে মহাপাপ
তবে রবে মহাপাপ।

রবে অকুলে মা বাপ রবে অকুলে মা বাপ,
পড়িবে চক্ষেই জল সদা মনস্তাপ
জল সদা মনস্তাপ।

আর কি কব অধিক আর কি কব অধিক,
এমন কন্যারে দেই শতবার ধিক
দেই শতবার ধিক।

দিব শাকান্ন উদরে দিব শাকান্ন উদরে,

তথাপি সমাজে সবে ডাকিবে আদরে
সবে ডাকিবে আদরে।
মোরা নাহি ভাবি দুঃখ মোরা নাহি ভাবি দুঃখ
কুলমানে আছি, মনে সেই বড় সুখ
মনে সেই বড় সুখ।
বলি ওমা মহারাণী, বলি ওমা মহারাণী
একবার শুন গো মা দুঃখিনীর বাণী
গো মা দুঃখিনীর বাণী।
এতো তব অধিকার এত তব অধিকার,
তুমি মা থাকিতে কেন হেন অবিচার
কেন হেন অবিচার।
যত কুলহীন জুটে যত কুলহীন জুটে,
কুলীনের পদ দেখে মরে মাথা কুটে
দেখে মরে মাথা কুটে।
তারা করেছে শপথ তারা করেছে শপথ,
কুল পাশ করে পুরাইবে মনোরথ
পুরাইবে মনোরথ।
যারা আছে কুল হত যারা আছে কুল হত,
সেই মা সমভাব হইতে উদ্যত
ভাব হইতে উদ্যত।
একি সহে গো জননী একি সহে গো জননী,
শৃগাল সিংহের সহ বসিবে এখনি
সহ বসিবে এখনি।
তারা মিথ্যা করি সবে তারা মিথ্যা করি সবে,
কুলীনের কুচ্ছা করি কত মত করে
করি কত মত করে।
তুমি শুন গো মা তাই তুমি শুন গো মা তাই,
জননী গো! যোড় করে সে সব জানাই
করে সে সব জানাই।

যারা কুলটা হয়েছে যারা কুলটা হয়েছে,
তারা তো ত্যাজিয়ে কুল অকুলে রয়েছে
কুল অকুলে রয়েছে।
সেই দোষে কি সবাই সেই দোষে কি সবাই,
অকুলে ডুবাবে কুল শুনে ভয় পাই
কুল শুনে ভয় পাই।
কুল ত্যাজিতে না চাই কুল ত্যাজিতে না চাই,
নগরে মাগিয়ে খাব তাহে ক্ষতি নাই
খাব তাহে ক্ষতি নাই।
মাগো তোমারে জানাই মাগো তোমারে জানাই,
তোমা বই কারে কব কোথা বা দাঁড়াই
বল কোথা বা দাঁড়াই
যদি না থাকে স্বঘর যদি না থাকে স্বঘর,
স্বভাব অভাব এবে হইবে সত্বর
এবে হইবে সত্বর।

কস্যচিৎ
বরিসালবাসিনঃ।

পরিশিষ্ট : ৭

সমাচার দর্পণ

১৮৩১-এর ১২ই ফেব্রুয়ারীতে সমাচার দর্পণে কৌলীন্যের অত্যাচার সম্বন্ধে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। কৌলীন্য প্রথার জন্যে দেশের অন্য যে সকল অনাচার হত তা আমরা জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা থেকে পাই :

সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন বঙ্গজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি, আপনি বিবেচনা করিবেন বঙ্গজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব, কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ ব্যবস্থা থাকাতে বঙ্গজ ব্রাহ্মণেরা মুসলমান কন্যা পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন। আমি ইহার এক প্রমাণ লিখিতেছি।

১. এক সময় কন্যা বিক্রয়ী দুই ব্রাহ্মণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে এক সুযোগ্যা বালিকা দেখিয়া তাহাকে ক্রয় করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহাদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জননী কহিল ব্রাহ্মণ ঠাকুর এইটি মুসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই। কিন্তু কালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি। তোমরা মুসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে, সম্প্রতি তুমি দিবা কিনা তাহা বল। অনন্তর জননীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না। পরে ঐ ধূর্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল। তাহার দুইমাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন। সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বাসলেন, ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল। অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিযা মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল। বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল। কিন্তু শেষে চারিশত টাকায় রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গুণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতেই বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী

সকল জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসর পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন এবং তাহার একদিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে, কছু কে কেয়া ছালনা হোগা এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল, শুন্ শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে, তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবনকন্যা আপন জাতি কুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২. কলিকাতা সহরের সীমাসংযুক্ত পূর্বাংশবাসী মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাত পরে তাহার গর্ভে মুখুজ্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসী এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিশিষ্ট এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্যাকে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মায় পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কি, পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩. কাজলাপাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষে টের পাইলেন ঘটকের প্রতারণাপূর্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪. ভাট পাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং কিছুকাল সহবাস করিয়া শেষে জানিলেন পোদ জাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এতদভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের প্রধান২ বাঁড়ুজ্যের ঘবেষে তাহারদিগের পুত্র-পৌত্রাদি-গৃহিণী সকল আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব, মালি, কামার কাপালীর কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা। ব্রাহ্মণী হইয়া পড়িয়াছেন এখন তাঁহাদের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। এই একই মর্ম্মের আলোচনা আরও কয়েকটি দুই তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এবং প্রশ্ন উঠে গবর্ণমেণ্ট কৌলীন্য প্রথা রহিত করিতে পারেন কিনা। এই বিষয়ে সমাচার দর্পণ। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৩০ লেখেন :

এই কু-ব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও লোকের সুখবিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে,ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমানে দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে। এবং এই কু-ব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণের যেমন উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অন্য কোন বিষয় এ তাহা উপকার দৃষ্ট হয় না। এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত বর্তমান ব্যবহারেতে যে অনুপকার ও তদুপকার যে উপায়ে নির্বিত্ত হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত যদি গভর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত যে তথায় সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলে আপত্তি অন্যায় করে আর একজন লেখেন—

যদি কেহ বলেন গভর্ণমেণ্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলন করিলে, এতদ্দেশীয় অনেক মান্য ঃ লোকেরা মন:পীড়া পাইবে।

কৌলীন্য প্রথার জন্যে শ্রেণী বিশেষের পুরুষের যে অসুবিধা হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছিল স্ত্রী লোকের। সুতরাং স্ত্রী লোকদিগের পক্ষ থেকেও যে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি হবে এ আশ্চর্য্য বিষয় নয়।

১৮৩৫ সালের ১৫ই-মার্চ চুচুঁড়া নিবাসী স্ত্রী-গণস্য শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু,

১. হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যায় হয় তদ্রূপ আমাদের কি নিমিত্ত বা হয়।

২. আপনারা কহেন যে আমাদের কুলধর্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহাদের সঙ্গে আমাদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কোন্ ছাইর কুলের নিমিত্ত আমাদের বিবাহ দিতেছেন। এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমাদিগকে দান করিতেছেন, সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়।

৩. হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাহাদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই।

পরিশিষ্ট : ৮

১৯২৯ সালের ১৯ আইন

১. ক। এই আইনের সন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বাল্য বা শিশুবিবাহ বিরোধী আইন।

খ। ইহা সমগ্র বৃটিশ ভারত, বৃটিশ বেলুচিস্তান এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রযুক্ত হইবে।

গ। ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল। বাং ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৬। ইহা কার্য্যকরী হইবে।

২. ক। এই আইন শিশু অর্থে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে এবং ১৪ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে বুঝাইবে।

খ। যাহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে, ঐ বিবাহ শিশু বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে।

গ। বিবাহের পক্ষ বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

ঘ। নাবালক বলিতে ১৮ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোককে বুঝাইবে।

৩. ১৮ বৎসরের বেশী এবং ২১ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ শিশু বিবাহ করিলে, তাহার একহাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৪. ২১ বৎসরের অধিক বয়সের পুরুষ শিশু বিবাহ করিলে তাহার একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে।

৫. যে কেহ শিশু বিবাহ সম্মত করিবে, পরিচালনা করিবে অথবা তত্ত্বাবধান করিবে তাহার একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়প্রকার দণ্ড হইতে পারিবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, এই বিবাহ শিশু বিবাহ এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ তাহার ছিল, তবে তাহার দণ্ড হইবে না।

৬. ক। কোনও সাবালক বা সাবালিকা যদি শিশু বিবাহ করে এবং সাবালক বা সাবালিকার পিতামাতা, অভিভাবক বা বে-আইনীভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি

যদি সেই বিবাহ সম্পাদনের অনুকূলে কিছু করে, কিংবা তাহাতে অনুমতি দেয়, অথবা গাফিলতির জন্য সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তবে সাবালক বা সাবালিকার পিতামাতা, অভিভাবক অথবা রক্ষকের একমাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে কিন্তু কোন নারীর কারাদণ্ড হইবে না।

৬. খ। কোন সাবালক বা সাবালিকা শিশু বিবাহ করিলে, সাবালক বা সাবালিকার অভিভাবক প্রভৃতি যদি বিপরীত প্রমাণ দিতে না পারেন, তবে এই ধারা প্রয়োগকালে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তিনি গাফিলতি করিয়াই এই বিবাহ বন্ধ করেন নাই।

৭. ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস আইনের ২৫ নং ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার সময় কোন আদালত এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন না যে, অর্থদণ্ডের টাকা আদায় না হইলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবে।

৮. ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯০ ধারার যাহাই থাকুক না কেন, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অপর কেহ এই বিবাহ আইন সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা গ্রহণ বা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯. যে বিবাহ সম্পর্কে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইবে, সেই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে বালিকা রুজু না করিলে কোন আদালত সেই মামলা গ্রহণ করিবেন না।

১০. এই আইন অনুসারে কোন আদালত যদি কোন মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইনের ২০৩ ধারা অনুসারে যদি মামলা ডিসমিস না করেন, তবে ঐ কার্য্যবিধি আইনের ২০২ ধারা অনুসারে ঐ আদালত এ সম্বন্ধে স্বয়ং তদন্ত করিবেন অথবা আপনার অধীন প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই মর্মে আদেশ দিবেন।

১১. ক। ফরিয়াদীর অভিযোগ শুনিবার পর এবং কাছারীতে হাজির হইবার জন্য আসামীর নামে শমন জারী করিবার পূর্বে, আদালত অভিযোগকারীকে ১০০৲ টাকার অতিরিক্ত জামিন সমেত বা বেজামীন মুচলেকা দিবার

আদেশ দিবেন। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ২৫০ ধারা অনুসারে অভিযোগকারী আসামীকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে আদিষ্ট হইলে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা এই মুচলেকার টাকা হইতে দেওয়া হইবে। বিচারক ইচ্ছা করিলে কাহাকেও এই মুচলেকা দেওয়া হইতে রেহাই দিতে পারেন। এরূপ স্থলে তিনি মুচলেকা না লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিবেন। আদালতের নির্দেশমত উপযুক্ত সময়ে মুচলেকার জামিন দিতে না পারিলে, নালিশ ডিসমিস করা হইবে।

খ। এই ধারা অনুসারে কোন মুচলেকা লওয়া হইলে তাহা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে লওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং ঐ কার্য্যবিধির ৪২ অধ্যায়ের ধারাগুলি সেখানে প্রযুক্ত হইবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন—

বিনয়কৃষ্ণ সেন সংকলিত

ফাল্গুন, ১৩৩৬

পরিশিষ্ট : ৯

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবাহ বর্ণন

রাগিনী মিত্রসিন্ধু—তাল ঠুংরি

রূপচাঁদ পক্ষী

আমরি কি নাকাল কন্যার বিবাহকাল, আজকাল হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায়, পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায় ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যাপারে॥
কত শত মানীর মান হানি, ছাই চাপা পড়ে গেছে মানের মূলেতে বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হল বিমূল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরুতে হতে।
এনট্রেন্স এক পেশে, এল্. এ দোপেশে, বি. এ. তেপেশে, মধ্য ভারতে॥
বল্লভি সর্বানন্দ, ফুলে খড়দ্রহ হয় না সন্ধ, পাস করা ছেলে পসন্দ, সকল ছেলেতে
কন্যা দিতে হন ব্যস্ত অর্থ নাই শূন্য হস্ত, হই যে ঋণ গ্রস্ত পড়েন দায়েতে।
অর্থাভাবে কত লোকে, পড়িয়ে বিষম বিপাকে, থুবড়ী মেয়ে ঘরে রাখে নিরুপায়েতে।
খত লিখে কর্জ করে খুঁজে দেশ দেশান্তরে, সগর্ভা দান করে বৎস সহিতে॥
বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের ততোধিক, কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে।
সম্বন্ধ না হতে, বরের মুরুব্বিতে, লম্বা ফর্দ দেয় হাতে নবাবি মতে।
মহামান্য কুলীন ঘরে, পাশ করা বাহাত্তুরে, আদর করে ধীরে ধীরে হয় কন্যা দিতে।
জড়াও গহনা রূপার খাট, ঘড়ি চেন আলবার্ট, বরযাত্রীর মদের চাট হয় যোগাতে॥
কন্যাকর্তা এসে নিষেধ করে বিশেষে দিও না মর্মে ব্যথা ধরি করেতে।
বরযাত্র রেগে কয়, আমরা তো কুলীন নয়, তেপেশে দ্বিগ্বিজয় উনবিংশেতে
বাইস কোঁচ কালা কফি্ষান করার বিষ জারি পাত্রী খোঁজে সুশ্রী কিন্নরী হতে।

পাক্কা বাড়ী মার্বেল ম্যাজ, দরয়ানের রূপার ব্যাজ
হীরের আংটি সোনার ল্যাজ ঝুলবে পশ্চাতে॥
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জাতির ছিল না কো এ পদ্ধতি, সর্ব বর্ণে হয় সম্প্রতি, দেশের
রীতিতে
জম্মে পাশ করা নয়,বওয়াটে ফেল নয় বরের বাবা মিথ্যা কয় ধনলোভেতে॥
দাতব্য পাঠশালে চিরকাল পড়ে ছেলে, বিয়ের সম্বন্ধ এলে, দেন স্কুলেতে
বিবাহে মোরে মাল ওমনি গুটিয়ে নেয় জাল,যে রাখাল সেই রাখাল
পাঁচনী হাতে॥
চারপেশের কর্ত্তা পক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ, যার ছেলে গণ্ড মূর্খ সে মরে
দুঃখেতে।
ছেলে হলে গুণবন্ত, একরাতে হতাম ভাগ্যবন্ত, পোড়াকপালী ভ্যাড়াকান্ত
ধল্লে গর্ত্তেতে॥
বিয়ের গোল দেখে ভারী, বণিকে কমিটি করি, এক হুকুম কল্লে জারি
সপ্তগ্রামীতে॥
এরূপ সোনা দেনা লেনা, অধিক চাটতে কেউ পাবে না, স্বাক্ষর করে
সর্বজনা চলে না মতে॥
অলঙ্কার চায় না ইদানী, কোম্পানীর কাগজ রেডিমণি, বাড়ীর পাট্টা
সোনার গিনি, চায় হাতে হাতে॥
মেয়ের বেলা বেলতলা, নিমতলা ছাদ খোলা, মরা দু গাছা সোনার বালা
ছালনা তলাতে॥
বিয়ের এই গণ্ডগোলে, যত ইয়ংবেঙ্গলে, ঢুকচে গিয়ে ব্রাহ্মের দলে
এ জ্বালা এড়াতে।
জাতির বিচার কে আর করে, কোর্টসিপেতে কার্য সারে
কেহ দিচ্ছে কুচবিহারে, কেহ বা স্বজাতিতে।
উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি হবে।
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যা জ্যোতিতে॥
হিতে হল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত,
এ শিক্ষা কার মনোনীত, হয় অনিষ্ট যাতে॥

৩০

সভ্যভব্য গুণবন্ত, সকলে কর সিদ্ধান্ত যাতে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত
চূড়ান্ত মতে।

বিয়ে কর্ত্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়,
আর্য্যের কলঙ্ক রটায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীতে॥
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সংগতি,
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি, হোক্ ধর্ম্মমতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ, হায় রে কি হাস্যাস্পদ, মনুষ্য কি চতুষ্পদ,
হল ভারতে॥

অতিরিক্ত সংযোজিত পরিশিষ্ট

সম্মতির বয়স-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি

সমস্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ও এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নিকট প্রেরিত ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের সারকুলার।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী-বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইনের বিধানের প্রতি এবং ১৯শে মার্চ তারিখের ব্যবস্থাপক সভায় যে অধিবেশনে পাণ্ডুলিপি আইনের পরিণত করা হইয়াছিল সেই অধিবেশনে মহিমবর শ্রীযুত রাজ প্রতিনিধি মহাশয় পার্শ্বে উদ্ধৃত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমি আদ্দিষ্ট হইয়াছি।

এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করা হইলে পর যাহাতে ইহার অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য আরো বিধিব্যবস্থা করা আবশ্যক কিনা ইহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইযাছে। আমি আহ্লাদ সহকারে এই অভয়দান করিতেছি আমরা এই আইনের কার্য্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করাইব এবং আইনের অপব্যবহার নিবারনার্থ যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াছি তাহা যদি অসম্পূর্ণ প্রমাণ হয়, তবে আমরা যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াছি তাহা যদি অসম্পূর্ণ প্রমাণ হয়, তবে আমরা সেই সকল বিধিব্যবস্থা বাড়াইয়া আরো মজবুত করিতে প্রস্তুত থাকিব।

২. ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে যে প্রকাশ উপদেশ প্রদান করিলে এই আইনের বিধান সকল উপযুক্ত সাবধানতা ও সতর্কতা সহকারে প্রয়োগ করা হইবে।

যে তাহাদিগকে সেই প্রকার উপদেশ দিবেন মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গভর্ণর জেনারেল সাহেবের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আইনে কেবলমাত্র কতকগুলি

বহুদর্শী কর্মচারীকে তদন্ত করিবার ও বিচারার্থ মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, সেই সকল বহুদর্শী কর্মচারীবিশেষ যে উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারা সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিবেন বটে। কিন্তু যৎপরোনাস্তি সাবধানতা ও বিবেচনা সহকারে তাহাদের এই আইনটির কার্য্য এক বৎসর হইলে পর ঐ কার্যে গোলযোগ বা বাধাবিঘ্ন ঘটিযাছে কিনা তাহার উল্লেখ করিয়া জেলার কর্মচারীগণ যদি অবগতির নিমিত্ত এক একখানি রিপোর্ট দেন তাহা হইলে সুবিধা হয়। এইরূপে যে সকল রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট আহ্লাদ সহকারে সেই মন্তব্য সহ সেই সকল রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করিবেন।

স্বা: সি. জে. লায়াল,

ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বাংলা

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস (৫ম সংস্করণ)—অজিতকুমার ঘোষ—কলকাতা, ১৯৭০।

২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)—আশুতোষ ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৯৬০।

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড (২য় সং)—আশুতোষ ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৯৬১।

৪. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১ম সং)—আশুতোষ ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৯৬৪।

৫. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা (২য় সং)—বৈদ্যনাথ শীল—কলকাতা, ১৯৭২।

৬. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (২য় সং)—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।

৭, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা—বৈদ্যনাথশীল কলকাতা,১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

৮. বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কলকাতা—১৯৭২।

৯. দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার—রথীন্দ্রনাথ রায়—কলকাতা, ১৯৫০।

১০. নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে—কলকাতা, ১৯৫৪।

১১. বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ্—অরুণ সান্যাল, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

১২. বিচিত্র সাহিত্য (১ম খণ্ড)—সুকুমার সেন—কলকাতা, ১৯৫৬।

১৩. নাটকের কথা—অজিতকুমার ঘোষ—কলকাতা, ১৯৫৯।

১৪. বাংলা নাটক ও নাট্যকার—প্রদ্যোত সেনগুপ্ত—কলকাতা,১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

১৫. বাংলা নাটকে গান—প্রভাতকুমার গোস্বামী—কলকাতা, ১৯৭১।

১৬. বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা—নীলিমা ইব্রাহিম—নওরোজ কিতাবীস্থান, ঢাকা, ১৩৭৯।

১৭. যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—হংসনারায়ণ—ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

১৮. বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি-চেতনা—জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
১৯. নাট্যতত্ত্বমীমাংসা—সাধনকুমার ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৯৬৩।
২০. ট্র্যাজেডির তত্ত্ব ও রূপ—জীবনকৃষ্ণ শেঠ—কলকাতা, ১৯৭৫।
২১. নাট্যতত্ত্বপরিচয়—অজিতকুমার ঘোষ—কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
২২. নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা—বিভাস রায়চৌধুরী—কলকাতা, নিউ এজ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।
২৩. বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী—কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
২৪. নাটক লেখার মূলসূত্র—সাধনকুমার ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
২৫. প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ—অবন্তীকুমার সান্যাল—কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
২৬. শতবর্ষে নাট্যশালা—আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত —কলকাতা, ১৯৭৩।
২৭. বাংলা নাটকের বিবর্তন—সুরেশচন্দ্র মৈত্র—কলকাতা, ১৯৭৩।
২৮. বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ—প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)।
২৯. বিলাতী যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৭২।
৩০. নাট্যচিন্তা—সূত্রধার সম্পাদিত—কলকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
৩১. বাংলা নাটকের টেক্‌নিক—চিত্তরঞ্জন লাহা—কলকাতা, ১৯৭৪।
৩২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড, ৪র্থ সং)—সুকুমার সেন—কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩৩. সাহিত্য কোষ নাটক—অলোক রায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৬৩।
৩৪. নট নাট্য নাটক—সুকুমার সেন—কলকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
৩৫. নাট্যকার মধুসূদন—ক্ষেত্র গুপ্ত—কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩৬. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা(৩য় সং)—নরহরি কবিরাজ,কলকাতা ১৯৬১।
৩৭. উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র—সুকুমার মিত্র কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
৩৮. বঙ্কিমমানস—অরবিন্দ পোদ্দার—কলকাতা, ১৯৬৬। (৪র্থ মুদ্রণ)

৩৯. বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৮।

৪০. নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীসমাজ—প্রমোদ সেনগুপ্ত—কলকাতা, ১৯৬০।

৪১. বাংলা ঐতিহাসিক নাটক—শক্তি ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

৪২. স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য—সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

৪৩. রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বিশ্বভারতী, ১৯৭২।

৪৪. রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ সংকলন—নিখিল সেন সম্পাদিত—কলকাতা, ১৯৫৯।

৪৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা-নাটক ও নাট্যশালা—মন্মথ রায়—কলকাতা, ১৯৬৫।

৪৬. আত্মজীবনচরিত—দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়—কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৪৭. মাইকেল রচনাসম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত—কলকাতা, ১৩৬৮।

৪৮. ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্লকুমার সরকার—কলকাতা, ১৯৪৫ (৩য় সং)

৪৯. বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ (৩ খণ্ড)—বিনয় ঘোষ—কলকাতা ১৯৫৭-১৯৫৯।

৫০. বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ—কলকাতা, ১৯৬১।

৫১. কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ—কলকাতা, ১৯৭৫।

৫২. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৫ খণ্ড) বিনয় ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬২

৫৩. উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনন ও সাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ—কলকাতা, ১৯৬৮।

৫৪. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য (২য় সং)—প্রণবরঞ্জন ঘোষ—কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

৫৫. উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ—সুশীলকুমার গুপ্ত—কলকাতা, ১৯৫৯।

৫৬. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলাসাহিত্য—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৫৭. পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—কলকাতা, ১৯৭৫।

৫৮. প্যারীচাঁদ রচনাবলী—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা, ১৯৭১।
৫৯. বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতা,
৬০. সংবাদপত্রে সেকালের কথা—(১ম ও ২য় খণ্ড)—কলকাতা, ১৯৪৯-৫০।
৬১. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (২য় সং)—যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতা,১৯৬৩।
৬২. বাংলার নবজাগরণের কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা ১৩৭০বঙ্গাব্দ।
৬৩. বাংলার নব্যসংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল—বিশ্বভারতী, ১৯৫৮।
৬৪. জাগৃতি ও জাতীয়তা—যোগেশচন্দ্র বাগল—কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
৬৫. হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল—কলকাতা, ১৯৬৮।
৬৬. বঙ্কিম রচনাবলী (১ম ও ২য়)—যোগেশচন্দ্র বাগল—সাহিত্য সংসদ কলকাতা, ১৯৬৯।
৬৭. বাংলা সাময়িকপত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৯৪৮।
৬৮. বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আনন্দধারা সং, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
৬৯. সেকাল-একাল—রাজনারায়ণ বসু, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
৭০. আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু—কলকাতা, ১৯৫২।
৭১. ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলাসাহিত্য—সঞ্জীবকুমার বসু—কলকাতা, ১৯৬৪।
৭২. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কলকাতা, ১৯৭৫-৭৬।
৭৩. রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা—সোমেন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা ১৯৭৫।
৭৪. রামমোহন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী)—অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত কলকাতা, ১৯৭৩।
৭৫. মধুসূদন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী)—অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত কলকাতা, ১৯৭৩।
৭৬. তিন শতকের কলকাতা—নকুল চট্টোপাধ্যায়—কলকাতা,১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
৭৭. বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন —যোগানন্দ দাস, কলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।
৭৮. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সং)—ভবতোষ দত্ত—কলকাতা, ১৯৭৩।
৭৯. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ—অমলেন্দু দে—কলকাতা, ১৯৭৪।

৮০. বাংলার নব্যচেতনার ইতিহাস—স্বপন বসু—কলকাতা, ১৯৭৫।

৮১. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র—কলকাতা, ১৯৬৯।

৮২. বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার—কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

৮৩. বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার—কলকাতা, ১৮৭৯ বঙ্গাব্দ।

৮৪. উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৯৭১।

৮৫. সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন—জয়ন্ত গোস্বামী, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৮৬. বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ—কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৮৭. নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৮৮. বাংলার রেনেসাঁস—অন্নদাশংকর রায়—কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

৮৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং)—শিবনাথ শাস্ত্রী—কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৯০. বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ—কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৯১. বাংলাদেশের সঙ্ প্রসঙ্গে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কলকাতা, ১৯৭২।

৯২. স্বাধীনতা সংগ্রাম—ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৭৩।

৯৩. বিদ্যাসাগর রচনাবলী (১ম-৪র্থ খণ্ড) দেবকুমার বসু সম্পাদিত—কলকাতা, ১৯৬৬—১৯৬৯।

৯৪. গিরিশ রচনাবলী (১ম-৫ম খণ্ড)—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ—কলকাতা, ১৯৬৯—১৯৭৫।

৯৫. দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (১ম, ২য়)—রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত—সাহিত্য সংসদ—কলকাতা, ১৯৬৪।

৯৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—সুশীল রায়—কলকাতা, ১৯৬৫।

৯৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ—বিশ্বভারতী, ১৯৬৯।

৯৮. বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য—জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত—জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-কলকাতা, ১৯৭৫।

৯৯. বিপিনচন্দ্র পাল জীবন, সাহিত্য ও সাধনা—শিবদাস চক্রবর্তী, কলকাতা ১৯৭৩।

১০০. একশো বছরের বাংলা থিয়েটার—শিশির বসু—কলকাতা, ১৯৭৩।

১০১. কলকাতার থিয়েটার (১ম ও ২য়)—শঙ্কর ভট্টাচার্য—কলকাতা, ১৩৭৮-১৩৭৯।

১০২. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত—কলকাতা, ১৩৮৪।

১০৩. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(গ্রন্থন সংস্করণ) কলকাতা, ১৩৭২।

১০৪. বাঙালীর নাট্যচর্চা—অহীন্দ্র চৌধুরী—কলকাতা, ১৩৭৯।

১০৫. থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৫—১৮৮২)—ভবেশচন্দ্র মিত্র।

১০৬. নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৬।

১০৭. ১৮৭৫ ও বাংলাদেশ—সুকুমার মিত্র, কলকাতা, ১৯৬০।

১০৮. যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সতীশচন্দ্র মিত্র। ৩য় সং—১৯৬৩।

১০৯. ,, (২য় খণ্ড)—২য় সং, কলকাতা, ১৯৬৫।

১১০. অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—অরুণকুমার মিত্র, কলকাতা, ১৯৭০।

১১১. কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র, কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজী

1. Literature and the Image of Man : Lowenthal.
2. Art and the Social Order : Gotshalk.
3. Drama and Education : Philip A. Coggin.
4. Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818—1835) A. F. Salahuddin 1965.
5. Studies in Social History : O. P. Bhatnagar, 1964.
6. Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents), Vol. I—Gautam Chattopadhaya, Calcutta, 1962.
7. Indian Awakening and Bengal (3rd. Ed.)—N. S. Bose, Calcutta, 1976.
8. Nineteenth Century Bengal—P. Singha, Calcutta 1965.

নির্দেশিকা

ঔ

ক

ফ

ব

য

র

হ

য়

ইংরেজী

Results of the L. M. (First Exam.) for each year since the commencement of the University

Year	No. of Candidates.	Average Age.	Average proportion educated at Govt. Schools.	Religion			No. Passed		Average proportion of passed to total No. of candidates
				Hindu/Mohamadan		Christian	1st Div.	2nd Div.	
1857	12	20	12	8	...	4	6	6	100
1858	40	22	40	34	...	6	9	15	60
1859	31	21	31	25	...	6	6	6	38·70
1860	31	......	100	26	...	5	4	9	41·93

Result of the B. L. Exam. for each year since the commence of the University.

Year	No. of Candidates.	Average Age.	Average proportion educated at Govt. Schools.	Hindu/Mohamadan		Christian	1st Div.	2nd Div.	Average proportion
1858	19	...	19	18	...	1	...	11	57·88
1859	20	...	20	20	...	...	...	3	15
1860	22	...	100	20	...	2	...	10	45·45

From Calcutta Review Dec. 1860

Result of the Entrance Exam. for each year since the commencement of the University.

Year	No. of Candidates	Average Age	Avg. proportion educated at Govt. Schools	Religion: Hindu	Religion: Mahamadan	Religion: Christian	No. Passed: Ist Div	No. Passed: 2nd Div	Avg. proportion of passed to total number of candidates.
1857	244		74·18	202	12	30	115	47	66·39
1858	464	17·82	74·35	416	11	37	29	82	23·92
1859 (March)	706	18·4	78·75	653	18	35	107	223	48·15
Do (December)	705	17·96	69·50	626	27	52	65	178	34·46

Results of the B. A. Exam. for each year since commencement of the Calcutta University.

Year	No. of Candidates.	Average A/c.	Avg. proportion educated at Govt. School	Religion: Hindu	Religion: Mohamadan	Religion: Christain	No. Passed: Ist Div.	No. Passed: 2nd Div.	Avg. proportion of passed to total number of candidates.
1858	13	22	84·61	10	×	1		2	15·38
1859	20	23	75	17	×	3	3	7	50
1860	65			55	4	6	6	7	20

Crops of Indigo in Bengal, Imports, Deliveries, Stocks and Prices in London 1811-51

(Shows the quantity annually exported for forty years)

Crops in Bengal			Years	Total Imports from India into Great Britain.	Total Delivery for exports & Home Consumption.	Stock in Great Britain. 31st Dec.	Years.	Average Price in London											
								Fina Bengal				Ordinary Bengal				Low Oude.			
Years	Mounds	Chests.		Chests	Chests	Chests		S.	D.	@ S.	d.	S.	d.	@ S.	d.	S.	d.	@ S.	d.
1811 - 12.	70000	19500	1812	17200	14600	29500	12	8	0	10	6	4	0	5	3	3	0	3	6
1812 - 13.	78000	22000	1813	14300	19300	24500	13	10	0	14	0	6	3	8	3	4	6	6	0
1813 - 14.	74500	21300	1814	24200	23800	24900	14	10	0	14	6	6	6	9	0	4	0	5	6
1814 - 15.	102500	27000	1815	28900	23400	20400	15	8	0	11	0	5	0	7	0	3	0	4	6
1815 - 16.	115000	29000	1816	15500	20200	25700	16	6	6	10	0	3	0	5	6	2	8	3	3
1816 - 17.	87000	23500	1817	13500	15700	23500	17	6	7	10	0	5	6	7	6	4	0	6	0
1817 - 18.	72800	19000	1818	16600	16100	24000	18	8	0	9	6	6	6	8	0	5	0	6	0
1818 - 19.	68000	17000	1819	11500	15800	19700	19	7	6	9	0	5	0	6	0	3	3	4	6
1819 - 20.	72000	19000	1820	16500	21600	14500	20	7	6	9	6	5	6	6	6	3	3	4	6
1820 - 21.	107000	25000	1821	13000	17300	9800	21	7	6	9	6	5	6	7	0	4	0	5	9
Total :	846800	222300		171200	187800	216500	Avg.	8	0	@ 10	8	5	4	@ 7	0	3	8	@ 4	11
1821 - 22.	72400	19500	1822	13500	15100	8200	22	11	0	@ 12	6	8	6	@ 10	3	4	9	@ 6	0
1822 - 23.	90000	24000	1823	21700	16800	13100	23	9	6	11	0	5	9	8	6	3	6	4	6
1823 - 24.	113000	28000	1824	16300	17200	12200	24	12	0	13	6	8	0	10	6	5	0	6	3
1824 - 25.	79300	22000	1825	25300	21100	16400	25	13	0	15	0	8	6	10	6	4	3	5	9
1825 - 26.	144000	41000	1826	27800	21900	22300	26	8	0	9	6	4	6	7	0	2	3	3	9
1826 - 27.	90000	25000	1827	19000	18300	22800	27	11	6	13	6	7	0	9	6	3	0	4	6
1827 - 28.	149000	42000	1828	35800	27500	31100	28	8	0	10	0	5	3	7	3	2	0	2	9
1828 - 29.	98000	26000	1829	23200	23100	31200	29	7	6	8	6	3	9	6	6	2	6	3	6
1829 - 30.	141000	40000	1830	32120	25700	37600	30	6	6	7	6	3	3	4	6	2	0	2	6
1830 - 31.	166000	33600	1831	23330	24980	35970	31	6	0	6	6	3	0	4	3	2	0	2	6
Total :	1092400	301100		238070	211880	230870		9	3	@ 10	9	5	9	@ 7	10	3	1	@ 4	2

Crops in Bengal			Years	Total Imports from India into Great Britain.	Year	Average Price in London							
						Fine Bengal				Ordinary Bengal			
Years	Mounds	Chests.				S.	d.	@ S.	d.	S.	d.	@ S.	d.
1831 - 32.	122000	35000	1832	25470		5	6	6	3	2	3	2	9
1832 - 33.	122000	35000	1833	25000		7	0	7	9	3	0	4	0
1833 - 34.	93000	26800		16100		7	0	7	9	3	3	4	3
1834 - 35.	106000	30000		16370		6	6	7	3	2	11	3	9
1835 - 36.	110000	31000		25600		7	6	8	3	3	3	4	0
1836 - 37.	110000	31000		25000		8	0	8	6	3	6	4	6
1837 - 38.	112500	32000		24800		9	0	9	5	4	0	5	0
1838 - 39.	89500	24700		18800		8	9	9	3	3	6	4	6
1839 - 40.	119900	32100		28800		8	6	9	0	2	6	3	6
1840 - 41.	121700	33600		28600		6	9	7	6	2	6	2	9
Total :	1106600	311200		234540		4	10	@ 5	11	3	0	@ 3	10

Years	Mounds	Chests.	Years	Total Imports	Total Delivery for exports & Home Consumption.	Stock in Great Britain. 31st Dec.	Average Price in London											
							Fine Bengal				Ordinary Bengal				Low Oude.			
							S.	D.	@ S.	d.	S.	d.	@ S.	d.	S.	d.	@ S.	d.
									8	6	5	0	6	3	3	6	4	3
1841 - 42.	162000	44700	1842	34400	30100	22100	7	9										
1842 - 43.	79000	21792		21847	22954	21781	6	0										
1843 - 44.	172000	47448		36636	32253	25975	4	10										
1844 - 45.	14300	39448		36232	29928	33507	5	3										
1845 - 46.	128000	35310		27174	28441	33181	5	2										
1846 - 47.	101000	17862		29766	30392	31902	4	4										
1847 - 48.	108000	29793		22986	27553	28962	4	4										
1848 - 49.	126000	34758		33070	32772	29036	4	6										
1849 - 50.	122000	33655		26206	28690	27205	6	3										
1850 - 51.	110000	30344		31793	29220	30358	5	3										
Total :	1122300	335110		300110	292303	284007	5	4	@ 6	4								

INDIGO CULTIVATION

Per Beegah

No.	Crop.	Crops grown with Indigo.	Rent.			Seed.			Ploughing & Sowing.			Weeding.			Reaping.			Total cost of one crop.			Total cost of three crops.			Average cost of a corp.			Average cost of a crop of indigo with Oats			Average cost of a crop of indigo with Barley			Average cost of a crop of Indigo with Mustard.		
			Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As	P.	Rs,	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.
1.	Indigo		1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	8	0	3	0	0	7	8	0	2	8	0									
2.			1	12	0	0	4	0	0	12	0	0	4	0	0	8	0	2	8	0															
3.			0	6	0	0	4	0	0	12	0	0	4	0	0	6	0	2	0	0															
1.		Wheat				1	0	0		......			......		0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8									
2.						1	0	0		......			......		0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0		......			......		0	5	0	1	8	0															
1.		Oats				1	0	0		......			......		0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8	4	1	8						
2.						1	0	0		......			......		0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0		......			......		0	5	0	1	8	0															
1.		Barley				1	0	0		......			......		0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8				4	1	8			
2.						1	0	0		......			......		0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0		......			......		0	5	0	1	8	0															
1.		Mustard plant.				0	1	0		......			......		0	8	0	0	13	0	1	15	0	0	10	4							3	2	4
2.						0	1	0		......			......		0	6	0	0	10	0															
3.						0	1	0		......			......		0	5	0	0	8	0															

(From Calcutta Review—March 1860)

INDIGO CULTIVATION

Per Beegah

No.	Crop.	Crops grown with Indigo.	Rent.			Seed.			Ploughing & Sowing.			Weeding.			Reaping.			Total cost of one crop.			Total cost of three crops.			Average cost of a corp.			Average cost of a crop of indigo with Oats			Average cost of a crop with Barley			Mustard.		
			Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As	P.	Rs,	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.
1.	Indigo		1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	8	0	3	0	0	7	8	0	2	8	0	4	1	8	4	1	8	3	2	4
2.			1	12	0	0	4	0	0	12	0	0	4	0	0	8	0	2	8	0															
3.			0	6	0	0	4	0	0	12	0	0	4	0	0	6	0	2	0	0															
1.		Wheat				1	0	0							0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8									
2.						1	0	0							0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0							0	5	0	1	8	0															
1.		Oats				1	0	0							0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8									
2.						1	0	0							0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0							0	5	0	1	8	0															
1.		Barley				1	0	0							0	8	0	1	12	0	4	13	0	1	9	8									
2.						1	0	0							0	6	0	1	9	0															
3.						1	0	0							0	5	0	1	8	0															
1.		Mustard plant.				0	1	0							0	8	0	1	13	0	1	15	0	0	10	4									
2.						0	1	0							0	6	0	1	10	0															
3.						0	1	0							0	5	0	1	8	0															

INDIGO CULTIVATION—Crop.

No.	Crop.	Crops grown with Indigo.	Bundles per Beegah.	Bundles per rupee.	Amount	Average	Profit	Mands per Beegah	Price per mand.	Amount	Average	Profit	Profit of indigo with Wheat.	Profit of indigo with Oats	Profit of indigo with Barley.	Profit of Indigo with Mustard plant.
					Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.		Rs, As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.	Rs. As. P.
1.	Indigo		22	6	4 0 0											
2.	...		18	6	3 0 0											
3.	...		14	6	2 10 8	3 3 6	0 11 6									
1.	...	Wheat	...	...	...			8	2 0 0	16 0 0						
2.	...							4	2 0 0	8 0 0						
3.	...							3	2 0 0	6 0 0	10 0 0	8 6 4				
1.	...	Oats	...	...	...			8	1 4 0	10 0 0						
2,	...							6	1 4 0	7 8 0						
3.	...							3	1 4 0	3 12 0	7 1 4	5 7 8				
1.	...	Barley	...	...	...			8	2 0 0	16 0 0						
2.	...							6	2 0 0	12 0 0						
3.	...							3	2 0 0	6 0 0	11 5 4	9 11 8				
1.	...	Mustard plant.	...	...	...			3	2 0 0	6 0 0						
2.	...							2	2 0 0	4 0 0						
3.	...							1	2 0 0	2 0 0	4 0 0	3 5 8	9 1 10	6 3 2	10 7 2	4 1 2

(From Calcutta Review—March 1860)